নবদ্বীপ-মহিমা

অর্থাৎ

নবদ্বীপের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ।

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

পরিশোধিত, পরিবর্দ্ধিত ও চিত্রসম্বলিত।

শ্রীজিতেন্দ্রিয় দত্ত
ও
শ্রীফণিভূষণ দত্ত
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সন ১৩৪৪ সাল।

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

নবদ্বীপ-মহিমা কার্য্যালয় হইতে
শ্রীঅমিয়গোপাল দত্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—
দি বুক কোম্পানি লিঃ
৪—৩বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
ও
নবদ্বীপে প্রকাশকের নিকট।

নবদ্বীপ, কান্তি প্রেসে
শ্রীজিতেন্দ্রিয় দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

সম্পাদকের নিবেদন।

আমাদের পূজ্যপাদ মাতামহ নবদ্বীপ-মহিমার গ্রন্থকার কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়, মৃত্যুর পূর্ব্বে নবদ্বীপ-মহিমার দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য পাণ্ডু-লিপি প্রস্তুত করেন ; এবং মুদ্রণ কার্য্যের ব্যবস্থার চেষ্টায় থাকেন। সেই পাণ্ডুলিপি তাঁহার পরম সুহৃদ্ রায় রসময় মিত্র বাহাদুরকে দেখিতে দেন। রসময় বাবু পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিবার পূর্ব্বেই ১৩২১ সালের ভাদ্রমাসে ১২ দিনের জ্বররোগে গ্রন্থকার মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দেহত্যাগের পর আমরা রায় বাহাদুরের নিকট হইতে পাণ্ডুলিপিখানি লইয়া আসি। সেই অবধি নবদ্বীপ-মহিমা প্রকাশের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও, নানাবিধ অভাব অসুবিধা হেতু এতদিন তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর অতীত হইয়াছে। এতদিন পরেও যে তাঁহার বড় আদরের নবদ্বীপ-মহিমা প্রকাশ করিতে পারিলাম, ইহাও তাঁহার আশীর্ব্বাদের ফল বলিয়াই মনে করি।

গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবার পর, এতদিনে নবদ্বীপের ইতিহাসের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সময়ের নূতন বিষয়গুলি, এবং চতুর্থখণ্ডের কিয়দংশ ও কতকগুলি পাদটীকা আমরা সন্নিবেশিত করিয়াছি অপর সমস্তই তাঁহার পাণ্ডুলিপিতে ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থ প্রথম সংস্করণের প্রায় তিনগুণ হইয়াছে। যে সকল পণ্ডিতের চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিলিপি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। অনেকগুলি প্রাচীন মূর্ত্তিরও চিত্র দেওয়া গেল। অনুসন্ধান করিলে, এখনও বহু প্রাচীন মূর্ত্তি ও পুথির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। নবদ্বীপ-মহিমার যদি আর কখন সংস্করণ হয় তবে সেগুলি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রথম সংস্করণের নবদ্বীপ-মহিমায় কয়েকটি ভ্রম ছিল। তাহার মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জন্ম সময়, এবং দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ

সম্বন্ধীয় ভ্রমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ নবদ্বীপ-মহিমার এই ভ্রমগুলি অবিচারে গ্রহণ করায়, গ্রন্থকার বড় আক্ষেপ করিতেন। দীর্ঘকালের অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের ফলে, তিনি এই প্রকারের বহু ভ্রম সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি এরূপ বিরাট্ গ্রন্থ এবং বহু-সংখ্যক পণ্ডিত ও গ্রন্থকারের জীবনী যে ভ্রম-প্রমাদশূন্য ও সম্পূর্ণ হইবে একথা বলা দুঃসাহসিকের কার্য্য। যদি কোন পাঠকের চক্ষে ইহার ত্রুটী পতিত হয়, আমাদিগকে জানাইলে, আনন্দিত হইব।

গ্রন্থকার যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, আমরাও সেই মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। ইহাতে সূত্রাকারে বহু বিষয় সন্নিবিষ্ট হইল, ইহার এক একটী সূত্র লইয়াই এক একটী গ্রন্থ হইতে পারে। ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনে নবদ্বীপ-মহিমা যদি কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য করিতে পারে, তাহা হইলেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

আজ গ্রন্থকার নাই, তাঁহার উৎসাহদাতা মহামহোপাধ্যায় অজিত-নাথ ন্যায়রত্ন ও পণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণিও নাই। তাঁহার পরম বন্ধু রসময় বাবুও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। আরও পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের বিশেষ উৎসাহ-দাতা মঃ মঃ পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতিও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহা-দিগকে যে নবদ্বীপ-মহিমার দ্বিতীয় সংস্করণ দেখাইতে পারিলাম না, এ দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই।

বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশে নবদ্বীপস্থ 'এংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরীতে' রক্ষিত পুস্তক ও পুথির যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। এই সাহায্য প্রাপ্তির সুযোগ দিয়া লাইব্রেরীর সম্পাদকগণ আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। জগদীশবংশী পণ্ডিত শ্রীযতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় তাঁহার গৃহরক্ষিত পুথির সাহায্য

মৌখিক উপদেশ দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ তর্কতীর্থ, এবং রাজপুরোহিত-বংশীয় শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীনীলতনু ভট্টাচার্য্য, তাহাদের গৃহ-রক্ষিত পুথির সাহায্য দিয়াছেন। মাধব তর্কসিদ্ধান্তের পৌত্র ৺হরিদাস সিদ্ধান্তও বহু পুথির সাহায্য ও বাচনিক উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। নবদ্বীপের আলোক-চিত্র-শিল্পী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে কতকগুলি মূর্ত্তির ফটো তুলিয়া দিয়াছেন। হিন্দুস্কুলের পণ্ডিত শ্রীরেবতীরমণ গোস্বামি-কাব্যতীর্থ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেক প্রাচীন পুথির পাঠোদ্ধারে সাহায্য করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। নবদ্বীপবাসী অনেকেই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল ভদ্রমহোদয়গণের সাহায্য ব্যতীত আমাদের পক্ষে এইভাবে গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটই আমাদের ঋণ স্বীকার করিতেছি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কর্ত্তৃপক্ষগণ "View of the Large Pagoda at Nuddea" নামক ২০৯৯নং চিত্র, নবদ্বীপ-মহিমায় প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া গ্রন্থের চিত্র সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ। এতদ্ব্যতীত বহুলোকের নিকট বহুবিধ সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নহে। সেই সাহায্যের জন্য তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ।

নবদ্বীপ,
৫ই ভাদ্র, ঝুলন পূর্ণিমা,
সন ১৩৪৪ সাল।

সম্পাদকদ্বয়।

প্রথম সংস্করণের পূর্ব্বভাষ।

নবদ্বীপ মহিমায় পরিপূর্ণ। তাহার সম্যক্ মহিমা বর্ণনা করা আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। নবদ্বীপের পাণ্ডিত্য ও দেবত্ব সমস্ত ভারতবর্ষকে সময়ে সময়ে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে সকলের বিস্তারিত বর্ণনা করিতে হইলে যে সকল উপাদান প্রয়োজন আমার তাহার কিছুই নাই। তথাপি এই দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট একটী কৈফিয়ৎ দেওয়া বিবেচনা বোধে এই কএক ছত্র লিখিত হইল।

আমি নবদ্বীপ-নিবাসী। বাল্যকাল হইতে সর্ব্বদাই নবদ্বীপের প্রাচীন লোকদিগের মুখে নবদ্বীপের মহিমার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় ও মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নবদ্বীপ সম্বন্ধে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি যাহা দেখিতে পাই তাহাতে নবদ্বীপবাসীদের মুখে যে সকল কথা শুনা যায়, তাহার অনেক কথাই দেখিতে পাই না। এই জন্য বহুকাল হইতে নবদ্বীপের মহাজনদিগের সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ যতদূর সঙ্গত বোধ হয় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইতিহাস লিখিতে হইলে যে বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান ও অবসর এবং ধনের আবশ্যকতা তাহার কিছুই আমার নাই। আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা যদি কোন ইতিহাস লেখকের কিছুমাত্র সহায়তা করে তাহা হইলেই ক্ষুদ্রজীবী আমি যে পরিশ্রম, অর্থ ও অবসর ব্যয় করিলাম তাহার সম্পূর্ণ সার্থকতা হইবে।

এই পুস্তক সঙ্কলনে নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়, অনেক শ্লোকাবলী ও উপদেশ দিয়া সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এবং মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, যদুনাথ সার্ব্বভৌম এবং পূর্ব্বস্থলী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতগণও

অনেক উপদেশ দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বালি-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ ভট্টাচার্য্য বি-এ, অনেক ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্‌ব্যতীত কএক জন প্রবন্ধ লেখক ও গ্রন্থ লেখকের রচনা আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। "বঙ্গে সংস্কৃতচর্চ্চা" প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল এবং "চৈতন্য চরিত্র" লেখক শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত, বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, শুভকরী পত্রিকা ও বঙ্গদর্শনাদির রচনা হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তদ্‌ভিন্ন অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগের নিকট ঋণ স্বীকার করিলাম।

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল, ও শিবনারায়ণ শিরোমণি এই পুস্তকের অধিকাংশ দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকটও আমি ঋণী রহিলাম।

হুগলী,
১২৯৮ ২১ আশ্বিন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র রাঢ়ী।

শুদ্ধিপত্র

মুদ্রাকর-প্রমাদ জনিত গ্রন্থমধ্যে কয়েকটি অশুদ্ধ পরিলক্ষিত হয়, পাঠকগণ তাহা শুদ্ধ করিয়া লইবেন। কয়েকটি তারিখের অশুদ্ধি নিম্নে শোধিত হইল।

১৮৪	১৭ পংক্তিতে	১৮৮৭ স্থলে	১০৮৭ হইবে।
৩৬২	২৩ ,,	১৮৯৫ ,,	১৮৮৫ ,,
৩৬৭	৪ ,,	১৮৬৮ ,,	১৮৭৩ ,,
৩৭৪	১১ ,,	১৮৭৩ ,,	১৮৭৬ ,,

রামানন্দ বাচস্পতি প্রসঙ্গে ৩৪৯ পৃষ্ঠায় ৫ম পংক্তিতে লিখিত হইয়াছে—"রামানন্দের বংশধর কেহ আছেন কিনা জানা যায় নাই।" সেই স্থলে—"লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ রামানন্দের পৌত্র ছিলেন" লিখিত হইবে।

৪১৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত "রত্নমণি কুণ্ডু ও নীলমণি কুণ্ডু" শীর্ষক প্রস্তাব, তদ্বংশীয় শ্যামাদাস নন্দীর প্রদত্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
নবদ্বীপ	১
বঙ্গদেশ	২—৯
বঙ্গে আর্য্য-সমাগম।	
গঙ্গারাষ্ট্র বা রাঢ়দেশ	৯—১৮
পারুলিয়া, সমুদ্রগড়, কর্ণসুবর্ণ, ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী, অম্বিকা (কালনা), সপ্তগ্রাম।	
নবদ্বীপের উৎপত্তি	১৮—২৫
নবদ্বীপে গঙ্গার অবস্থান ও পরিবর্ত্তন, নূতন দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ।	
নদীয়া বা নবদ্বীপ আখ্যা	২৬—২৯
নদীয়া বা নবদীপ, নয়টী দ্বীপে নবদ্বীপ।	
গৌড়দেশ	২৯—৩৩
নবদ্বীপ রাজধানী	৩৩—৩৫
শূরবংশ	৩৫—৪৩
আদিশূর, ভূশূর, ক্ষিতিশূর।	
পালরাজগণ	৪৪—৪৫
ধর্ম্মপাল, বিগ্রহপাল, দেবপাল, রামপাল, কুমারপাল, মদনপাল।	
সেন রাজগণ	৪৬—৬৭
সামন্তসেন, হেমন্তসেন, বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন।	
নবদ্বীপে বৌদ্ধপ্রভাব	৬৮—৮৬
পাড়ডাঙ্গার শিব, যুগনাথ, পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্ত্তি, ষষ্ঠীঠাকুরাণী, দণ্ডপাণি, পাড়ডাঙ্গা, সুবর্ণবিহার, পানশিলা ও ভালুকা, দেবপল্লী।	
শূর ও সেনরাজগণের সময় বিদ্যাচর্চ্চা ...	৮৬—৯৫
শ্রীধরভট্ট, উদয়নাচার্য্য, শূলপাণি, হলায়ুধ, ঈশান ও পশুপতি, শ্রীধরদাস, ধোয়ী, উমাপতি ধর, জয়দেব গোস্বামী।	

বিষয়			পত্রাঙ্ক।
হিন্দুরাজত্বে বাঙ্গালার অবস্থা	...	...	৯৬—১০১

শাসনপ্রণালী, ভাষা, শিল্পী, ধাতুব্যবহার, অলঙ্কার, অধিবাসী, ব্যবসায়, গ্রাম্যদেবতা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বাঙ্গালীর গৌরব ...	...	...	১০২—১০৩
মুসলমান রাজত্ব ...	...	...	১০৪—১১৫

পাঠানশাসন, হরিহোড়, কৃত্তিবাস, বুদ্ধিমন্ত খান্, আনন্দভট্ট, মোগল শাসন।

মিথিলা বিদ্যালয় ...	...	...	১১৬—১২০
নবদ্বীপ ন্যায়-বিদ্যালয়	...	...	১২০—১৩০

বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি।

নবদ্বীপ-ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপন	...	...	১৩০—১৪৭

রঘুনাথ শিরোমণি।

অন্যান্য গ্রন্থকারগণ।...	...	...	১৪৭—১৮৫

হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার, জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, রামভদ্র সার্ব্বভৌম ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, মধুসূদন বাচস্পতি, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, ২য় বাসুদেব সার্ব্বভৌম, দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ, হরিরাম তর্কবাগীশ, বিদ্যানিবাস, রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর, রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, জয়রাম তর্কালঙ্কার, শিবরাম বাচস্পতি।

স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র ...	...	...	১৮৫—১৮৮

মেধাতিথি, বিজ্ঞানেশ্বর, কুল্লুকভট্ট, বাচস্পতি মিশ্র, জীমূতবাহন, শ্রীনাথ আচার্য্য-চূড়ামণি।

স্মৃতির প্রাধান্য স্থাপন	...	...	১৮৯—১৯৯

রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য।

অন্যান্য স্মৃতি গ্রন্থকারগণ	...	...	১৯৯—২০৩

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার।

আগম বা তন্ত্র শাস্ত্র	...	...	২০৩—২০৯

পূর্ণানন্দগিরি পরমহংস, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, মাধবানন্দ।

তৃতীয় খণ্ড।

বিষয় ... পত্রাঙ্ক।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম ... ... ২১০—২৬৩

মহাপ্রকাশ, জগাই মাধাই, কাজী উদ্ধার, নূতনপথে, মাতাপুত্রে, পতিপত্নী, সন্ন্যাসের পূর্ব্বদিন, সন্ন্যাস গ্রহণ, পুরীযাত্রা ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তীর্থযাত্রা ও রায় রামানন্দ, বৃন্দাবন পথে গৌড়দেশ, রূপ ও সনাতন, বৃন্দাবন যাত্রা, প্রকাশানন্দ স্বামী, চৈতন্যের ধর্ম্মমত, গৌরাঙ্গ বিগ্রহ।

চৈতন্যদেবের ভক্তগণ ও গ্রন্থাবলী ... ... ২৬৩—২৭২

অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, রূপ ও সনাতন, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস আচার্য্য, হরিদাস ঠাকুর।

চৈতন্যযুগে বঙ্গসাহিত্য ... ... ২৭২—২৭৫

চৈতন্যযুগে নবদ্বীপ ... . ২৭৫—২৭৮

চতুর্থ খণ্ড।

বাঙ্গালার জমিদার—নবদ্বীপ রাজবংশ ... ২৭৯—৩০৮

ভবানন্দ মজুমদার, রাঘব, রুদ্র, রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য, রঘুরাম, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজ শিবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গিরিশচন্দ্র, হটহটিকা, জগদ্ধাত্রী, নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্র, মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র।

ইংরাজ রাজত্বে সংস্কৃত শিক্ষা ... ... ৩০৮—৩১৩

ইংরাজ রাজত্বে পণ্ডিতবর্গ ... ... ৩১৩—৩৬৩

বুনো রামনাথ, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, ন্যায়ের প্রাধান্যপদ, রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, শঙ্কর তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, কাশীনাথ চূড়ামণি, শ্রীরাম শিরোমণি, মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, গোলোক ন্যায়রত্ন, হরমোহন চূড়ামণি, প্রসন্ন তর্করত্ন, হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, যদুনাথ সার্ব্বভৌম, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, আশুতোষ তর্কভূষণ, সীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি, চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ স্মার্ত্তপণ্ডিতবর্গ, গোপাল ন্যায়পঞ্চানন, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, রামানন্দ বাচস্পতি, লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, শিবনারায়ণ শিরোমণি, কাশীনাথ শাস্ত্রী, শিবগোবিন্দ ভারতী, জ্যোতিষ, বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব, বর্ত্তমান নবদ্বীপের চতুষ্পাঠী, ন্যায়ের টোল, স্মৃতির টোল, চৈতন্যচতুষ্পাঠী, মিউনিসিপাল টোল।

বিষয় পত্রাঙ্ক।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন .. ... ৩৬৪—৩৭২

রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, মিশনারি স্কুল, হিন্দুস্কুলের জন্মকথা, বকুলতলা ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সপ্তম এডোয়ার্ড এংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী।

ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ .. ... ৩৭২—৩৯৬

তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ব্যাদড়া বংশ, কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী, নীলমণি চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য ডাঃ সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যা-ভূষণ সুরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী নলিনীমোহন ভাদুড়ী, অতুলকৃষ্ণ বাগচি, মণিলাল কুণ্ডু, জষ্টিস বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার।

সঙ্গীত চর্চ্চা ... . ৩৯৬—৪০৩

মতিলাল রায়, বৌকুণ্ডু, নীলকণ্ঠ দত্ত, নীলকণ্ঠ বাগচি, সতীশ ওস্তাদ, দেবকণ্ঠ বাগচি, অদ্বৈতদাস বাবাজী, রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল ভট্টাচার্য্য গোস্বামী।

বৈষ্ণব মহাত্মা ও আখড়া ... ... ৪০৪—৪১৫

তোতা রামদাস বাবাজি, মাধবচন্দ্র দত্ত, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, মণিপুর রাজবাটী, সিদ্ধ-চৈতন্যদাস, সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী।

শিল্প ও বাণিজ্য ... ... ৪১৫—৪২১

গুরুদাস দাস, রত্নমণি কুণ্ডু ও নীলমণি কুণ্ডু, তন্তুবায়, শংখবণিক, কুম্ভকার, নীলকুঠী ভূবণচন্দ্র দাস, প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

সাধারণ বিবরণ ... ... ৪২২—৪২৮

মিউনিসিপালিটি, স্বাস্থ্য, হাঁসপাতাল, লোকসংখ্যা, সভাসমিতি, বঙ্গবিবুধজননী সভা, পূর্ণিমা-সম্মেলন, রাধারমণ সেবাশ্রম, বৈদেশিক বিবরণ।

গ্রন্থকারের জীবনী ... ... ৪২৯—৪৩৫

চিত্র পরিচয় ৪৩৬

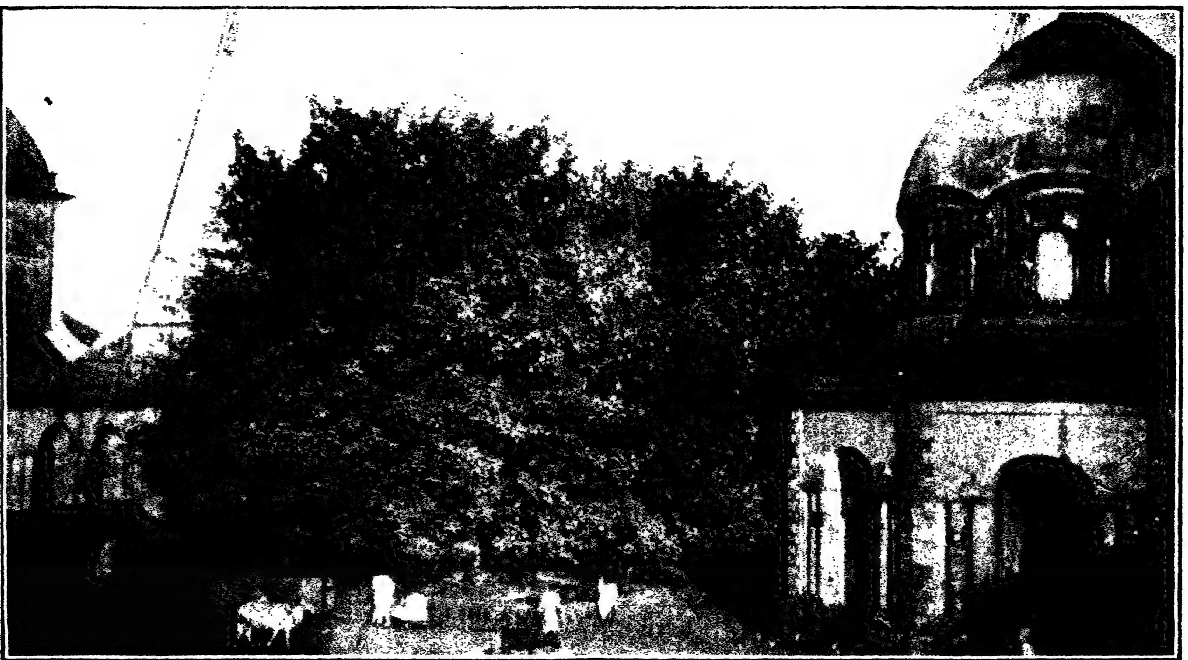


Photo by A. Dutta. **বিদগ্ধ জননী** (পোড়ামা) Publishers—

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

নবদ্বীপ-মহিমা।

প্রথম খণ্ড।

নবদ্বীপ।

বঙ্গদেশের মধ্যে নবদ্বীপ একটী প্রসিদ্ধ নগর। ইহার অপর নাম নদীয়া। এই নগর এখন নদীয়া জেলার অন্তর্গত, ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। হিন্দু অধিকার কালে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। প্রায় আট শত বৎসর গত হইল, ইহার সেই রাজ-সৌভাগ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন যদিও এই নগরে আর রাজধানী নাই তথাপি হিন্দু সমাজের উপর অদ্যাপি নবদ্বীপের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই স্থানের শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় ও সাহিত্যবিষয়ক মতামত সমস্ত বঙ্গভূমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং রাজপুরুষেরাও অনেক স্থলে হিন্দু-ব্যবহারবিধি সংশ্লিষ্ট বিচারকার্য্যে নবদ্বীপের মত অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই স্থানের ব্যবস্থা লইয়া বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে বহুবিধ সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং নবদ্বীপ এখনও হিন্দু-সমাজ শাসন করিতেছে।

নবদ্বীপের ইতিহাসের সহিত বঙ্গদেশের ইতিহাস বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছে, এইজন্য এই প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের বিবরণ লিখিত হইলে কখনই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বঙ্গদেশ।

বঙ্গদেশ অতি প্রাচীন। যে সময়ে আর্য্য ঋষিগণ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর তীরবর্ত্তী পুণ্যভূমিতে উপনিবিষ্ট হইয়া পবিত্র বেদগানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে ভারতবর্ষকে মুখরিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গদেশের নাম আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। ঋগ্বেদের অনুগামী ঐতরেয় আরণ্যকে আমরা বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাই। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—"বঙ্গ বগধ (মগধ) এবং চেরপদ (সৌরাষ্ট্র আদি) ত্রিবিধ প্রজা বাস করে। তাহারা দৌর্ব্বল্যে কাকতুল্য, অমিতাহারে চটকের ন্যায় এবং বহু-অপত্যে পারাবতের ন্যায়।"[১] মনুসংহিতাতে বঙ্গ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—'তীর্থযাত্রা ব্যতীত কোন আর্য্য অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধদেশে গমন করিলে, তাহাকে পুনরায় সংস্কার করিতে হয়।'[২] আবার রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বঙ্গদেশের এইরূপ বর্ণনা আছে—"দশরথ কহিতেছেন, 'দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য এবং সমৃদ্ধিশালী কাশী কোশল দেশ আমার রাজ্যান্তর্গত। সেই সকল দেশে ধন-ধান্য ছাগ ও মেষ প্রভৃতি বহু দ্রব্য উৎপন্ন হয়। হে কৈকেয়ি, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা যাহা তোমার ইচ্ছা হয় তাহাই প্রার্থনা কর।'"[৩] মহাভারতেও বঙ্গদেশের নাম উল্লিখিত আছে।

---

(১) "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাস্ত্বন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি॥" (ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১।)

(২) অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি। (মনু)

(৩) দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রাদক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥ ৩৭
তত্রজাতং বহুদ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ কৈকেয়ি যদ্যত্ত্বং মনসেচ্ছসি॥ ৩৮
(রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ১০ম সর্গ।)

রাজসূয় যজ্ঞের সময় বীরবর ভীমসেন ভারতবর্ষের পূর্ব্বরাজ্য জয়ের ভার পাইয়াছিলেন। তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে—"পাণ্ডববীর (ভীম) মোদা-গিরিস্থিত অতিবলশালী রাজাকে মহাসমরে বাহুবলের দ্বারা নিহত করিলেন। অতঃপর তীব্রপরাক্রম বলশালী পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছ নিবাসী রাজা মহৌজা এই দুই বীরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। তথায় সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নৃপতিকে তিনি পরাজিত করিয়া তাম্রলিপ্তরাজ, কর্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও সাগরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।"[৪] এই বর্ণনায় বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে এবং পুণ্ড্রের পর তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

উপরি-লিখিত প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বঙ্গদেশের উল্লেখ থাকায় বহু প্রাচীন কালেও যে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল তাহা প্রমাণিত হয়।

এই বঙ্গদেশ কোথায়? মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ-কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন—"রঘু রণতরীসম্পন্ন বঙ্গদেশীয় ভূপাল-গণকে বলপূর্ব্বক উন্মূলিত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপের উপর জয়স্তম্ভ-সকল স্থাপন করিলেন।"[৫]

(৪) অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেণ নিজঘান মহামৃধে॥ ২১
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসং॥ ২২
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥ ২৩
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥ ২৪
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ॥ ২৫। ৩০ অধ্যায়, সভাপর্ব্ব)

(৫) বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ॥ ৩৬ (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ)

অতএব কালিদাসের কথায় বঙ্গদেশ যে গঙ্গাতীরে অবস্থিত তদ্বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। গঙ্গাদেবী হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণমুখে আসিয়া, প্রয়াগে যমুনা ও অন্তঃসলিলা সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছেন ; পরে পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া মালদহের দক্ষিণে দুই ধারায় বিভক্ত হইয়াছেন। এক ধারা পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া মেঘনায় মিলিত হইয়াছে, এবং অপর ধারা দক্ষিণমুখী হইয়া ত্রিবেণী নামক স্থানে সরস্বতী ও যমুনা হইতে পৃথক্ হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গার যে ধারা পূর্ব্বমুখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহার নাম পদ্মা ও দক্ষিণমুখী ধারার নাম গঙ্গা। গঙ্গা যেস্থানে সাগরে যাইয়া মিলিয়াছেন তাহাকে গঙ্গাসাগর বলে—তাহা একটি মহাতীর্থ। কালিদাসের বঙ্গবিজয় স্তম্ভ-সকল যখন গঙ্গামধ্যস্থ দ্বীপ মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল, তখন কালিদাসের উল্লিখিত বঙ্গদেশ নিঃসন্দেহে এই ভাগীরথী তীরবর্ত্তী ভূমি।

ঐতরেয় আরণ্যক, মনু ও রামায়ণে বঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাভারতে আবার এতদ্ব্যতীত এক পুণ্ড্রদেশের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের বর্ণনায় এই পুণ্ড্র বঙ্গের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়াই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের রংপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, মালদহ, রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলার অন্তর্গত ভূভাগই অতীত কালের পুণ্ড্রদেশ। মহাভারতে কথিত হইয়াছে, পুণ্ড্রাধিপতিকে জয় করিয়া বঙ্গরাজকে আক্রমণ করা হইল। তাহা হইলে, রংপুর প্রভৃতি স্থান ব্যতীত ভূভাগই মহাভারতের বঙ্গ। কালিদাসের বঙ্গ যদি এই মহাভারতের বঙ্গ হয় তবে আজকালকার পশ্চিম বঙ্গই সেই বঙ্গ হইয়া পড়ে।

কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্ববঙ্গই শাস্ত্রোল্লিখিত বঙ্গদেশ। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। বর্ত্তমান সময়ে পদ্মা নদীর পূর্ব্ব ও মেঘনা বা ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম ভূভাগই (বর্ত্তমান ঢাকা বিভাগ) পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া পরিচিত। ঐ স্থান গঙ্গার তীরবর্ত্তী নহে। যদিও ইংরাজদিগের সময়ে সর্ভে মানচিত্রে

পদ্মাকে গঙ্গা বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু পদ্মা কি পুরাণে, কি ব্যবহারে, কি মাহাত্ম্যে, কি নামে কখনই গঙ্গা বলিয়া অভিহিত হয়েন নাই।[৬] এই নদীর সাগরসঙ্গম স্থল গঙ্গাসাগর তীর্থও নহে। কৃত্তিবাসরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই—

"কাণ্ডারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া।
গৌড়ের নিকট গঙ্গা মিলিলা আসিয়া॥
পদ্ম নামে এক মুনি পূর্ব্ব মুখে যায়।
ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাতে গোড়ায়॥
যোড় হাত করিয়া বলেন ভগীরথ।
পূর্ব্বদিকে যাইতে আমার নাহি পথ॥
পদ্মমুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী॥
শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে।
মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তোর নীরে॥" কৃত্তিবাস

আর এক কথা—অদ্যাপি পদ্মাতীরবাসী হিন্দুসন্তানগণ এই পশ্চিম বঙ্গের ভাগীরথী-নীরেই অবগাহন করিয়া পবিত্র হইয়া থাকেন। অতএব পদ্মা কখনই গঙ্গা বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। সুতরাং মন্বাদি শাস্ত্র-লিখিত বঙ্গভূমি পূর্ব্ববঙ্গের নির্দ্দেশক নহে।

প্রাচীন কালে পূর্ব্ববঙ্গ সমুদ্রগর্ভ নিহিত ছিল। মনু আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমায় সমুদ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৭] বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমায় সমুদ্র নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে,

(৬) পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত—বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত পৃঃ ২২।
"The Banks of the Bhagirathi" by Revd. J. Long, Calcutta Review, Vol. VI, December, 1846.

(৭) আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥ (২অ মনু)

মনুর সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল। যদি মনুর সময়ে, বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগর স্থলে সমুদ্র থাকা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে বঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। কিন্তু বঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ছিল না। অতএব এখন যেখানে সমুদ্র আছে মনুর সময়ে সেই স্থানে সমুদ্র ছিল না। মহাসাগর তখন আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমারূপে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভূতত্ত্ববিদ্ সার চার্লস্ লায়াল্ (Sir Charles Lyell) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে অতি প্রাচীন কালে পূর্ব্ববঙ্গ সমুদ্রগর্ভ নিহিত ছিল। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের আনীত মৃত্তিকারাশি দ্বারা ক্রমে ঐ সমুদ্রগর্ভ উন্নত হইয়া স্থলে পরিণত হইয়াছে।[৮] ঐ ভূমি বঙ্গদেশের সহিত সংলগ্নভাবে উৎপন্ন হওয়ায় বঙ্গদেশের সহিত একত্র হইয়া 'পূর্ব্ববঙ্গ' এই বিশেষ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই পূর্ব্ববঙ্গই 'উপবঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়াছে।[৯] খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বরাহমিহিরকৃত বৃহৎসংহিতাতে বঙ্গ ও উপবঙ্গ নামে দুইটী পৃথক্ জনপদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[১০] খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, ভাগীরথীর পূর্ব্বভাগে দুই যোজন ভূমির পর পঞ্চযোজন পরিমিত স্থান 'উপবঙ্গ' নামে অভিহিত।[১১] খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে লিখিত শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে ভাগীরথীর পূর্ব্বাঞ্চল বঙ্গ নামে কথিত হইতে দেখা যায়।[১২]

---

(৮) Sir Charles Lyell's Principle of Geology.

(৯) পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত—পৃঃ ১০৪।

(১০) উদয়গিরি-ভদ্রগৌড়ক-পৌণ্ড্রোৎকলকাশিমেকলাম্বষ্ঠাঃ একপদ তাম্রলিপ্তক কোশলকা বর্দ্ধমানশ্চ আগ্নেয্যাং দিশি কোম্পলকলিঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গ-জাঠবঙ্গাঃ।—
(বৃহৎ সংহিতা ১৪।৭,৮)

(১১) ভাগীরথ্যা পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চযোজনপরিমিতো হ্যপবঙ্গোহি ভূমিপ। (দিগ্বিজয় প্রকাশ)

(১২) রত্নাকরঃ সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ॥ (শক্তিসঙ্গমতন্ত্র)
বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত পৃ ১০৪, ১০৭ দ্রষ্টব্য।

মনু বঙ্গদেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত আগমন নিষিদ্ধ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। এই কারণ সম্বন্ধে অনেকে বলেন মনুর সময়ে বঙ্গদেশে আর্য্যনিবাস ঘটে নাই—তাই এই নিষেধ। হইলেও হইতে পারে, কেননা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় ভারতের এই আর্য্যগণ প্রথমে পঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হইয়া ক্রমে লোকবৃদ্ধির সহিত বাসস্থানেরও বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আর্য্য মনু যৎকালে তাঁহার বিধিসকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বঙ্গে তখন আর্য্যনিবাস ঘটে নাই ও বঙ্গভূমি তখন আর্য্যেতর জাতির বাসস্থান ছিল। আর্য্যগণ সচরাচর তদিতর জাতিগণকে কতকটা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া তদধ্যুষিত দেশকেও ঘৃণা করিতেন। সেইজন্য অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ মনুর চক্ষে আর্য্যগণের অগম্য দেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হউক, পরে কিন্তু ঐ সকল দেশ আর্য্যদেশ হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বঙ্গ কবে আর্য্যদেশ হয় তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য।

বঙ্গে আর্য্য-সমাগম।—আর্য্যগণ কোন সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে আর্য্য কথাটার অর্থ কি তাহা বলা আবশ্যক। বর্ত্তমান অভিধানে আর্য্য শব্দের অর্থ—মান্য, বিশিষ্ট ও সৎকুলোদ্ভব। কিন্তু প্রাচীন কালে আর্য্য শব্দ কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণের নির্দ্দেশক ছিল। মহর্ষি পাণিনি বলিয়াছেন "আর্য্যো ব্রাহ্মণঃ" (সিঃ কৌঃ)। তবে গৌণার্থে আর্য্য শব্দে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণকেও বুঝাইত।[১৩] পাণিনি ঋ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া আর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ঋ ধাতুর অর্থ গতি ও প্রাপ্তি। এই গতি ও প্রাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া আর্য্য শব্দের অর্থ—"গুণের উৎকর্ষে যিনি জীবের

(১৩) কাত্যায়ন প্রণীত শ্রৌতসূত্রে উল্লিখিত আছে—

"শূদ্রার্য্যৌ চর্ম্মণি পরিমণ্ডলে ব্যায়চ্ছেতে।" ভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—"শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ।" অর্থাৎ আর্য্যশব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ, চতুর্থ বর্ণের নাম শূদ্র।

পরমাভিলষিতের প্রতি গমন করেন বা তাহা প্রাপ্ত হন তিনিই আর্য্য।” এমনও বলা যাইতে পারে—

“কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥”

বংশবিস্তার-হেতু আর্য্যগণ তাঁহাদের আদিম নিবাস হইতে বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়েন। তাঁহারা ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে প্রথম বাসস্থান স্থাপন করেন এবং ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত ও কান্যকুব্জাদি প্রদেশে বাস করেন। ঐ সকল প্রদেশ আর্য্যগণের নিবাসনিলয় হেতু আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হয়।

মনু বলিয়াছেন আর্য্যেরা আর্য্যাবর্ত্তেই বাস করিবেন।[১৪]

এখন বঙ্গদেশে কোন সময়ে আর্য্যগণ আগমন করিয়াছেন তাহাই নির্ণেয়। বেদ বা মনুর সময়ে বঙ্গদেশে আর্য্যগণের সমাগম দেখা যায় না। তবে রামায়ণের আদিকাণ্ডে (৩৫ সর্গ) প্রকাশ পায় যে অমূর্ত্তরজা নামে একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা প্রাগ্জ্যোতিষপুর অর্থাৎ, কামরূপ স্থাপন করেন। এই প্রাগ্জ্যোতিষপুর বঙ্গের উত্তরপূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। আর্য্যগণ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আসিয়া বাস-স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং প্রাগ্জ্যোতিষপুর স্থাপন কালে বঙ্গে আর্য্যসমাগম অনুমান করা যাইতে পারে।

মহাভারতে বঙ্গদেশে আর্য্যসমাগমের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সময়ে ভীমসেন বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন সেই সময়ে সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নামক দুইজন বঙ্গীয় রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা যে আর্য্যবংশীয় ছিলেন, তাঁহাদের নামেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা রাজা, সুতরাং ক্ষত্রিয় ছিলেন; এবং তাঁহাদের যাগযজ্ঞাদির জন্য যে

(১৪) এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেৎ বৃত্তিকর্শিতঃ॥ (মনু সং ২য় অধ্যায়)

ব্রাহ্মণগণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব মহাভারতের সময়ে বঙ্গদেশে যে আর্য্যদিগের বাস হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারা যায়।

এক্ষণে এই আর্য্যবংশীয়েরা বঙ্গদেশের কোথায় আসিয়া বাস করেন? বঙ্গদেশ অপবিত্র অনার্য্য ভূমি। সুতরাং আর্য্যগণ পবিত্র গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বুঝিতে পারা যায়। বাল্মীকি বলিয়াছেন—

"বরমিহ গঙ্গাতীরে সরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ
ন পুনর্দূরতস্থঃ করিবর-কোটীশ্বরো নৃপতিঃ॥"

পরে তাঁহাদের রাজ্যবিস্তৃতি অনুসারে বঙ্গদেশের নানা স্থানে উপনিবিষ্ট

গঙ্গারাষ্ট্র বা রাঢ়দেশ

বঙ্গদেশে ভাগীরথীতীরে অতি প্রাচীনকাল হইতে অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ আর্য্যরাজ্য বা জনপদ দেখিতে পাই। সেই সকল রাজ্যই পরে গঙ্গারাষ্ট্র বা রাঢ়দেশ নামে অভিহিত হইয়াছে।

সিংহলের মহাবংশগ্রন্থে দেখিতে পাই—খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে 'লালরট্ঠ' দেশের অন্তর্গত 'সিংহপুরে' সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। জৈনদিগের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্র পাঠে জানা যায় যে, জৈন তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানস্বামী 'লাঢ়' দেশে 'বজ্জভূমি' ও 'সুব্ভভূমি'র মধ্যে দ্বাদশবর্ষ বাস করেন। তখন বজ্জভূমিতে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল। অনেক সন্ন্যাসী কুকুর তাড়াইবার জন্য দণ্ড লইয়া বেড়াইতেন।[১] জৈনদিগের

(১) আয়ারঙ্গসুত্ত ১।৮।৩।

চতুর্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনা-সূত্রেও কোটিবর্ষ ও রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে।[২] পতঞ্জলি মহাভাষ্যে 'বিষয়' শব্দের জনপদ অর্থ-প্রসঙ্গে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রের একত্র উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ 'সুহ্ম' অর্থে 'রাঢ়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৪]

আচারাঙ্গ-সূত্রের (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) মতানুযায়ী রাঢ়দেশ বজ্রভূমি ও সুহ্ম এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল। গুপ্ত সম্রাট্‌গণের প্রভাব খর্ব্ব হইলে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে রাঢ়ের অন্তর্গত সুহ্ম ও বর্দ্ধমান পৃথক্ জনপদ বলিয়াই গণ্য হইত। এই রাঢ়দেশ দক্ষিণে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৫] খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে এই স্থান বিভিন্ন রাজবংশের শাসনে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় এই দুই খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়। এখন বর্দ্ধমান বিভাগ বলিলে যতটা বুঝায়, পূর্ব্বকালে তাহার অপেক্ষা অধিক ভূভাগ রাঢ়দেশ নামে পরিচিত ছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক্‌রাজদূত মেগাস্থিনিস্ গঙ্গারিডি (Gangaridæ) নামে একটী বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ রাজ্যের তিনি এইরূপ সীমাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন— "যে বিস্তৃত জনপদের রাজধানী পালিবোথ্রা (Palibothra = পাটলিপুত্র) সেই প্রাচ্য (Prasioi) জনপদের পূর্ব্বদিকে উক্ত 'গঙ্গারিডি' জনপদ।"[৬] "গঙ্গানদী গঙ্গারিডি প্রদেশের পূর্ব্বসীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে।"[৭] "গঙ্গারিডির অধিবাসীদিগের বহুসংখ্যক মহাকায়

(২) কোড়িবরিসং ব লাঢ়া— পন্নবণা।

(৩) মহাভাষ্য—৪।২।১।

(৪) সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ—মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩৩।২৪ নীলকণ্ঠ টীকা।

(৫) দশকুমারচরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

(৬) McCrindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arian, p. 38.

(৭) McCrindle's Ptolemy, p. 172.

হস্তী আছে। এইজন্য এই দেশ কখনও কোন বৈদেশিক ভূপতি কর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই, কারণ অপরাপর সমুদায় জাতিই বিপুল বলশালী অগণ্য হস্তীর কথা শুনিয়া ভয় পায়। বীরকেশরী আলেক্‌জন্দার সমগ্র এসিয়া জয় করিয়াও কেবল গঙ্গারিডিদিগের সহিত সংগ্রামে বিমুখ হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি ভারতের অন্যান্য জাতি পরাজিত করিয়া সমগ্র সেনাবলসহ গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া জানিতে পারিলেন, গঙ্গারিডিগণের যুদ্ধার্থ সজ্জিত সমরনিপুণ চারি সহস্র হস্তী আছে; ইহা শুনিয়াই তিনি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।"[৮]

গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্ত্তী মেদিনীপুর, ভুরসিট্, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জনপদগুলি মেগাস্থিনিসের সময় গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাষ্ট্র নামে অভিহিত হইয়াছিল; পরে গঙ্গারাষ্ট্রের গঙ্গাশব্দ পরিত্যক্ত হইয়া রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে রাঢ় নামে বিখ্যাত হইয়াছে।[৯] এই রাঢ়দেশ দুই ভাগে বিভক্ত – অজয়নদের উত্তর প্রদেশ উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ প্রদেশ দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিত হইয়াছে।

ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড-গ্রন্থে রাঢ়দেশ মধ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রাম বা নগরের উল্লেখ দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণনগর (খানাকুল), বর্দ্ধমান, অম্বিকা, ভুরসিট, বিদ্যাস্থান নবদ্বীপ, পারুল, অগ্রদ্বীপ, পাটলি, কর্ণগ্রাম প্রভৃতি তাহাদের অন্তর্গত।[১০] নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী রাঢ়ের অন্তর্গত পারুলিয়া, সমুদ্রগড়, ইন্দ্রাণী, সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণের বর্ণনা আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

পারুলিয়া।—বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পূর্ব্বস্থলী থানার অধীন পারুলিয়া গ্রাম। প্রাচীন কালে পুণ্য-

(৮) McCrindle's Megasthenes.

(৯) বঙ্কিম বাবুর "বিবিধপ্রবন্ধ" দ্রষ্টব্য।

(১০) ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৭ম অধ্যায়।

তোয়া ভাগীরথী ইহার পূর্ব্বসীমায় প্রবাহিতা ছিলেন। এই নগর যে অতি প্রাচীন তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডের উল্লিখিত পারুল এই পারুলিয়ার নির্দ্দেশক বলিয়া মনে হয়। এই গ্রাম ও ইহার নিকটবর্ত্তী ভূমি কর্ষণ-কালে প্রাচীন প্রোথিত কূপগর্ভ, প্রশস্ত রাজপথের লুপ্তাবশেষ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয়ের পূর্ণগর্ভ খাত, এবং প্রাচীন সুরম্য হর্ম্ম্যের ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমিকর্ষণকালে কেহ কেহ এই স্থান হইতে সুবর্ণমুদ্রা পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় ও বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে জানা যায় যে, এই নগর মগধের উন্নতির সময় স্থাপিত হয়। কিম্বদন্তী এই যে, পারুলিয়া গ্রাম মহারাজ চন্দ্রকেতুর রাজধানী ছিল।[১১] তিনি একজন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন।[১২] রাক্ষস নামধেয় তাঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন। এই পারুলিয়া গ্রামের একদেশে বহুবিস্তৃত একটী উচ্চ স্থান দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানটী 'রাক্ষসীপোতা' নামে বিখ্যাত,—কথিত আছে ঐ স্থানে মন্ত্রী রাক্ষসের আবাস-ভবন ছিল। এই গ্রামেই 'বিষদহ' নামে এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। কিম্বদন্তী এই—ইহার জলপান করিয়া রাজা চন্দ্রকেতু পুত্রগণসহ প্রাণত্যাগ করায়, এই সরোবর 'বিষদহ' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

পারুলিয়া গ্রামের চারি পার্শ্বে ভাতশালা, সুলুণ্ঠন, কাষ্ঠশালী, ভাণ্ডার-টিকারী প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত। কথিত আছে যে, ঐ সকল স্থানে মহারাজ চন্দ্রকেতুর রাজোচিত বিভিন্ন কার্য্যের আগার ছিল। ঐ সকল গ্রামের নাম হইতেই সেই কার্য্যসকলের পরিচয় পাওয়া যায়।

---

(১১) মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত—'বাঙ্গালার বিবরণ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
—অনুসন্ধান পত্রিকা ৩১এ আষাঢ়, ১২৯৯ সাল।

(১২) কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে, এই পারুলিয়া মুদ্রারাক্ষস-বর্ণিত প্রসিদ্ধ রাজা নন্দের প্রতিষ্ঠিত। এবং এই রাক্ষসীপোতার মন্ত্রী রাক্ষস, শকটারের প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাজ নন্দের প্রধান মন্ত্রী।

মহারাজ চন্দ্রকেতু ও মন্ত্রী রাক্ষসের উপাখ্যান রাঢ় দেশের বহু স্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার চিরোটি গ্রামে যে প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ আছে তাহারও উপাখ্যান এইরূপ। এই সকল উপাখ্যান হইতে মনে হয় মহারাজ চন্দ্রকেতু প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং রাঢ়ে তাঁহার রাজ্য সুবিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। যে সকল স্থানের সহিত তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট সেই সকল স্থানে তাঁহার শাসন-কেন্দ্র ছিল বলিয়া মনে হয়।

গ্রীসীয় রাজদূত মেগাস্থিনিস সন্দ্রকোটস্[১৩] নামে পাটলিপুত্রের রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। সন্দ্রকোটস্ চন্দ্রকেতু নামেরই প্রতিধ্বনি। সন্দ্রকোটসের রাজধানী পাটলীপুত্র, এবং চন্দ্রকেতুর রাজধানী পারুলিয়া। তাহা হইলে মেগাস্থিনিসের উল্লিখিত সন্দ্রকোটস্ ও এই চন্দ্রকেতু কি অভিন্ন? ভারতসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যই কি পারুলিয়ার চন্দ্রকেতু? পারুলিয়ার রাক্ষসীপোতা ও সিদুঁরপুরের ঢিবি এবং চিরোটির ধ্বংসস্তূপ যদি কখনও খনিত হয়, তাহা হইলেই চন্দ্রকেতুর প্রকৃত বিবরণ উদ্ধারের আশা করা যায়। নচেৎ ইহা কিম্বদন্তীর আধারেই আবদ্ধ থাকিবে।

যবনাধিকারের পরে এই গ্রাম পিরল্যা নামে অভিহিত হয়। জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল-গ্রন্থে এই পারুলিয়ার বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পারুলিয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপের ২ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত।

"ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥"

(সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত—জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল।)

(১৩) মেগাস্থিনীসকে অবলম্বন করিয়া যে সকল গ্রীক গ্রন্থকার ভারতীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারা সন্দ্রকোটসের বিভিন্ন বানান করিয়াছেন,—Sandrokottos, Sandrakottus, Sandrakottos, Androkottos, Sandrokuptos.

পারুলিয়া গ্রামে বুড়াশিব নামে এক শিবমূর্ত্তি আছেন। মহা-মহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও পণ্ডিত ৺যদুনাথ বিদ্যারত্ন উভয়েই ঐ শিবমূর্ত্তি দেখিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ঐ শিবের পাদদেশে তলভাগে একটী বর্ণ খোদিত আছে, সেই বর্ণটীকে তাঁহারা 'চং' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ বর্ণ চন্দ্রকেতুর সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

সমুদ্রগড়।—নবদ্বীপের দক্ষিণে সমুদ্রগড় নামে একটী গ্রাম আছে। ইহা রাঢ়ের অন্তর্গত অতি প্রাচীন নগর। পূর্ব্বকালে এই গ্রাম পূততোয়া ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী ছিল—এখনও ইহার তলদেশে জাহ্নবীর পুরাতন খাত বর্ত্তমান।

অনুমান করা যাইতে পারে যে, মহাভারতের বঙ্গরাজ সমুদ্রসেনের নামের সহিত ইহার নামকরণে কিছু সম্বন্ধ আছে। সমুদ্রসেনের পরিখা-পরিবেষ্টিত রাজধানী কালে সমুদ্রগড় নাম ধারণ করিয়া থাকিবে। কেহ কেহ আবার ইহার নামের সহিত খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর গুপ্ত সম্রাট্‌গণের অন্যতম রাজা সমুদ্রগুপ্তের সম্বন্ধের কথা বলিয়া থাকেন। যাহাই হউক সমুদ্রগড় স্থানটী দেখিলে উহা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। আধুনিককালে চৈতন্যভাগবত, কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থেও এই নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ণসুবর্ণ।—কর্ণসুবর্ণ নগর বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ নগরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এখনও ইহার ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভে প্রোথিত দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার অধিকাংশ গঙ্গা-গর্ভগত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম রাঙ্গামাটি।

কর্ণসুবর্ণ নগর অতি প্রাচীন। দ্বিতীয় চীনীয় পরিব্রাজক হুয়েন্থসং খৃঃ ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন। সেই সময়ে তিনি কর্ণসুবর্ণ নগরে মহারাজ শশাঙ্ককে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় জানিতে পারা যায় যে, শশাঙ্ক একজন প্রবল-পরাক্রান্ত

রাজা ছিলেন। সমস্ত বঙ্গ, পৌণ্ড্র ও মগধ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিত গ্রন্থে এই শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মহারাজ শশাঙ্ক শৈব ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল। কথিত আছে তিনি মগধের অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি নষ্ট করেন। বুদ্ধগয়ার চিরপ্রসিদ্ধ বোধিদ্রুমও তিনি সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক কর্ত্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন বিনষ্ট হইলে, হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধমানসে কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ ও অধিকার করেন। এই প্রদেশ ৬ বৎসরকাল হর্ষবর্দ্ধনের অধিকারে থাকে।

ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী।—এই নগর অতি প্রাচীন, বর্ত্তমান কাটোয়ার নিকট অবস্থিত। যে সময়ে ভাগীরথী দেবী হিমালয় হইতে অবতরণ করেন, সেই সময়ে ইন্দ্রদেব এইস্থানে গঙ্গাস্নান করেন বলিয়া ইহার নাম ইন্দ্রেশ্বর হইয়াছে।

"নিমেষেতে আইলেন নাম ইন্দ্রেশ্বর।
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর॥
গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান।
ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান॥"

কৃত্তিবাস রামায়ণ—আঃ কাঃ

এই ইন্দ্রেশ্বর হইতে এক্ষণে ইন্দ্রাণী নাম হইয়াছে। প্রাচীন কালে ঐ নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ও বহু-বিস্তৃত ছিল। এখন সেই সকল স্থান ইন্দ্রাণী পরগণা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। এই নগরে ভাগীরথী-তীরে ১২টী ঘাট ছিল—তাহা তীর্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপরে স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা দেবী ভাগীরথী॥" (কাশীরামদাস)

এতদ্ব্যতীত এই নগরে ১৩টী হাট ছিল। তাহাদের নাম—দাঁইহাট, আকাই হাট, বিকিহাট, নৈহাট, সীতাহাটী, কাঁকুড়াহাটী, সেনহাটী ইত্যাদি।

ভক্তি-অবতার চৈতন্যদেবের সময়ে এই নগর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। চৈতন্য-ভাগবতে ইহার নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম॥"

এই বর্ণনায় ইন্দ্রাণী প্রসিদ্ধ, কারণ কাটোয়াকে ইন্দ্রাণীর নিকটে বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কাশীরাম দাসকৃত মহাভারতেও ইন্দ্রাণীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। তখনও ইন্দ্রাণী নগর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। কাল-প্রভাবে ইন্দ্রাণীর কি শোচনীয় অবস্থাই হইয়াছে!

অম্বিকা (কালনা) :—অম্বিকা নগর ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। পুরাকালে এই স্থানে অম্বরিষ নামে এক ঋষি এক প্রস্তর-খণ্ডের উপর ঘটস্থাপন করিয়া অম্বিকা দেবীর আরাধনা করিতেন। সেই স্থানটী এখন গ্রামের মধ্যভাগে বর্ত্তমান আছে। তাহার পার্শ্বেই এক পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীও অম্বিকা দেবীর পুষ্করিণী বলিয়া বিখ্যাত। ঋষি উক্ত অম্বিকা দেবীর আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, এবং 'সিদ্ধেশ্বরী' নামে অম্বিকা দেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। অদ্যাবধি সেই মূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। অম্বিকা দেবীর নামানুসারেই এই গ্রাম অম্বিকা বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

উক্ত ঋষি সিদ্ধ সন্ন্যাসী বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিলে, চারিদিক হইতে জনসঙ্ঘ ইষ্টলাভের প্রত্যাশায় তাঁহার নিকট সমাগত হইতেন বহুদূরদেশীয় লোকসমূহ গঙ্গা বাহিয়া ঐ স্থানে আগমন করিতেন। তাহাতে গঙ্গাতীরে দোকানপশারি ও গঞ্জ বসিয়া যায়। অম্বিকা দেবীর আর এক নাম কলনা। ঋষি ঐ দেবীর নামানুসারে গঞ্জের নাম কালনা রাখেন। এই সময় হইতে ঐ গ্রাম অম্বিকা এবং গঞ্জ কালনা নামে প্রসিদ্ধ হয়।

এই নগর অতি প্রাচীন, চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে রচিত বিপ্র-

দাসকৃত মনসামঙ্গল গ্রন্থে 'আবুয়া' নামে এই গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[১৪] চৈতন্যভাগবত ও কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও অম্বিকানগরের প্রচুর উল্লেখ আছে।

সপ্তগ্রাম।—গঙ্গারাষ্ট্রের মধ্যে সপ্তগ্রাম একটী অতি প্রাচীন ও প্রধান নগর। ইহা ভাগীরথী হইতে সরস্বতী নদীর বহির্গমন স্থলে অবস্থিত। এই নগর এত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল যে, সুদূর রোম পর্য্যন্ত ইহার সুখ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ভৌগোলিক টলেমি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে 'সাটিগং' নামে এই সপ্তগ্রামেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

১৪১৭শকে (১৪৯৫ খৃঃ অঃ) রচিত বিপ্রদাসকৃত মনসামঙ্গলে[১৫] সপ্তগ্রামের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে তৎকালে সপ্তগ্রাম বহু জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দ ভট্টাচার্য্য তাঁহার প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে "দক্ষিণ-প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী দক্ষিণদেশে সপ্তগ্রামের নিকট ত্রিবেণী নামে খ্যাত।"[১৬] এই বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সময়েও সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী অপেক্ষা অধিকতর বিখ্যাত ছিল।

এই সপ্তগ্রাম নগরে বহু হিন্দু ধনী ও ভূম্যধিকারীর বাস ছিল। তাহারা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন, এবং সংসার নির্ব্বাহের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

---

(১৪) আবুয়া ফুলিয়া দিয়া চাপয়ে বুহিত্র। (মনসা-মঙ্গল—বিপ্রদাস)।

(১৫) সিন্দু ইন্দু বেদ মহি সক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেণ সা গৌড়ে সুলক্ষণ॥ (বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গল।)
(Vide J. A. S. of Bengal Vol. V, No. 7, July 1909)

(১৬) দক্ষিণ-প্রয়াগস্তু উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্যা দক্ষিণদেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতে।
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং।)

"হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।
সপ্তগ্রাম বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দুঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সংকুল ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থভূমিগ্রাম দিয়া করেন সহায়॥"

যেদিন সরস্বতী নদীর স্রোতঃ মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই সপ্তগ্রামের দুর্দ্দিনের সূত্রপাত হয়। পাঠকগণ, এখন আর সে সপ্তগ্রাম নাই। একদিন যে সপ্তগ্রাম বাণিজ্য ও গৌরবে বঙ্গভূমির শীর্ষস্থান ছিল, ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের বাণিজ্যতরী-সকল যাহার পাদদেশ পরিশোভিত করিত, সেই সপ্তগ্রাম এখন সামান্য পল্লীরূপ ধারণ করিয়া জনশূন্য হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সরস্বতী নদীর মোহনা বন্ধ হইয়া যায়, এবং সপ্তগ্রামের বণিক্‌দল কেহ হুগলী, কেহবা কলিকাতায় গিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই কলিকাতার উন্নতির সূত্রপাত হয়।

নবদ্বীপের উৎপত্তি

নবদ্বীপও গঙ্গারাষ্ট্রের মধ্যে একটি প্রধান নগর। এই নগর পুণ্যপ্রবাহিনী গঙ্গার পশ্চিমোপকূলে অবস্থিত।

কোন সময়ে নবদ্বীপ সমুদ্ভূত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। পুরাতন প্রমাণ রামায়ণ বা মহাভারতে নবদ্বীপের নাম পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীক বা রোমকদিগের ভারতবর্ষীয় বৃত্তান্তে নবদ্বীপের কোন উল্লেখ আছে কি না তাহাও জানিবার উপায় নাই। তবে বৈষ্ণব কবি ঘনশ্যাম

দাস বা নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বিষ্ণুপুরাণ হইতে নবদ্বীপের পরিচায়ক নিম্নলিখিত বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসম্বৃতঃ॥
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।

সাগর-সম্বৃতঃ ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তীতি শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যা। নবমস্যাস্য পৃথক্ নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপোঽয়মিতি গম্যতে।"[১]

(ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ)

অর্থাৎ—'ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুদ্বীপ, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, বারুণ এবং এই সাগরসংবৃত দ্বীপ, তাহাদের মধ্যে নবম। এই দ্বীপ উত্তর-দক্ষিণে সহস্রযোজন দীর্ঘ। নবম দ্বীপের নাম উল্লিখিত না হওয়ায় নবদ্বীপকে নবম দ্বীপ বুঝাইতেছে। ইহাতে আরও প্রকাশ যে, নবদ্বীপ সাগরের তীরবর্ত্তী।'

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীনকালে সমুদ্র বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহা হইলে প্রাচীনকালে নবদ্বীপের সাগরতীরবর্ত্তী থাকা প্রতিপন্ন হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণ অতি প্রাচীন। আধুনিক পণ্ডিত-গণের মতেও ইহা বৌদ্ধদিগের সময়ে রচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব বৌদ্ধদিগের পূর্ব্বেই আমরা এই দ্বীপের উৎপত্তি দেখিতে পাই।

রামায়ণ মহাভারতাদিতে নবদ্বীপের কোন উল্লেখ না পাইলেও, সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস মহাবংশে নবদ্বীপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাবংশে বর্ণিত আছে—"সিংহ বাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ বিজয়সিংহ ও

(১) মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভারতখণ্ড বর্ণন নামক অধ্যায়ে (মার্ক পুং ৫৭।৫-৭), কূর্ম্মপুরাণ ৪৪ অধ্যায়ে এবং বিষ্ণুপুরাণ (২।৩।৬-৭) এই শ্লোকগুলি পরিলক্ষিত হয়।

তাঁহার পার্ষদ্‌গণ, বিষমাচার হইয়াছিলেন। তাঁহারা বহু দুঃসহ (কার্য্য) করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ জনসমূহ, রাজাকে ঐ অর্থ প্রতিবেদন করিলে, রাজা পারিষদ্‌বর্গের সহিত আগত পুত্রকে ও তৎপরে পারিষদ্‌বর্গকে তিরস্কার করিলেন। পুনরায় ঐরূপ উপদ্রব হইল। তৃতীয়বার হইলে জনসমূহ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বলিল, 'আপনার পুত্রকে মারিয়া ফেলুন'। অতঃপর রাজা, বিজয় ও তদীয় পরিবার, এই সাতশত পুরুষকে, অর্দ্ধ-মুণ্ডিত মস্তক করিয়া, সাগরে বিসর্জ্জন দিলেন। ঐ প্রকারে তাহাদের ভার্য্যাদিগকে (দ্বিতীয় পোতে) ; ঐ প্রকারে তাহাদের কুমার কুমারী-দিগকে (তৃতীয় পোতে)। ঐ পুরুষগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে, বাস করিল। সন্তানেরা যে দেশে বাস করিল, তাহা 'নগ্‌গদিপো' নামে খ্যাত ছিল।" (মহাবংশ)[২]

এই নগ্‌গদিপোই নবদ্বীপের নির্দ্দেশক। এইরূপ মনে করিবার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, গ্রাম্যভাষায় নবদ্বীপ আজও 'নগোদিপ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[৩] দ্বিতীয়তঃ, এই সাতশতের সন্তানেরা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। বাচস্পতি মিশ্রের কারিকা নুযায়ী তাঁহাদের প্রথম গাঁই 'নগড়ি'।[৪] নগড়ি, নগ্‌গদিপো বা নগদ্দিপ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, সপ্তশতীরা যে স্থানে আসিয়া বাস করেন তাহা সপ্তশতী বা সাতশইকা পরগণা নামে বিখ্যাত। এই সাতশইকা পরগণা নবদ্বীপের পার্শ্বেই অবস্থিত।[৫]

---

(২) গৌড়ে সুবর্ণ বণিক—শিবচন্দ্র শীল পৃঃ ১১।
& Turnover's Mahawanso, 55.

(৩) "পেঁচো।.........নগোদিপির ভস্‌চাজ্জি বক্তা দিয়েচে.........।"
(বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো—দীনবন্ধু মিত্র।)

(৪) সম্বন্ধনির্ণয়—লালমোহন বিদ্যানিধি—পৃঃ ২৪৩।

(৫) The Provinces of Bengal situated on the west of the Hóoghly, Map 7-7—by J. Rennel, Oct. 14. 1779.
& Indian Atlas, sheet No. 120.

মহাবংশের বর্ণনানুসারে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ দিনে বিজয় সিংহ সিংহল দ্বীপে উপনীত হন। তাহা হইলে অন্ততঃ ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা নবদ্বীপের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি।

নবদ্বীপে গঙ্গার অবস্থান ও পরিবর্ত্তন।—নবদ্বীপ ভাগীরথীর গর্ভস্থ দ্বীপ। প্রাচীনকালে পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী ইহার চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত থাকিয়া, এই পবিত্রভূমি নবদ্বীপকে অন্যান্য ভূমি হইতে পৃথক্ রাখিয়াছিলেন। অদ্যাপি বর্ষাকালে কলনাদিনী সুরধুনী ইহার চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত থাকিয়া ইহার দ্বীপ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। এই দ্বীপ গঙ্গার অন্তরস্থ বলিয়া ইহার অন্য নাম অন্তর্দ্বীপ।

"এই কতোদূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধুনী-বেষ্টিত পরম রম্য স্থান॥" (ভক্তিরত্নাকর।)

এখন যেখানে বাবলাড়ী, গঙ্গাপ্রসাদ, সহর নদীয়া, তেঘরী, চর গদখালি, মহীশূর এবং মোল্লাপাড়া আছে, সেই সমস্ত ভূভাগ নদীয়া বা নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত, এবং এই সমস্ত স্থানই অদ্যাপি নদীয়া পরগণা বলিয়া বিখ্যাত।[৬] মোল্লাপাড়া গ্রামটী এই দ্বীপ হইতে ভিন্ন হইয়া কিছু দূরে অবস্থিত হইয়াছে। এইরূপ বিপর্য্যয় গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর ভাঙ্গনেই ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বকালে এই প্রকাণ্ড দ্বীপের গঙ্গার পশ্চিম শাখার পশ্চিম পারে—মামগাছি, জান্নগর, বিদ্যানগর, কুলিয়া, চম্পকহট্ট, সমুদ্রগড় প্রভৃতি গ্রামগুলি, এবং পূর্ব্বদিকের শাখার গঙ্গার পরপারে বামুনপুকুরিয়া, সিমুলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা, ব্রহ্মনগর প্রভৃতি গ্রামগুলি অবস্থিত ছিল।

নদীর উভয় শাখা কখনই প্রবল থাকে না। কখন একটী প্রবল হইয়া পড়ে ও অপরটী মন্দীভূত হইয়া যায়। নবদ্বীপ সম্বন্ধেও তাহাই

---

(৬) Boundary Commissioner's Lists, Bengal, No. XII, Thana Krishnagar.

হইয়াছিল। কখন ইহার পূর্ব্বধারার স্রোতঃ মন্দীভূত হইয়া পূর্ব্বদিকে চর উৎপন্ন করিয়াছিল; কখনও বা পশ্চিমের স্রোতঃ প্রবল হইয়া এই দ্বীপের পশ্চিমাংশ গ্রাস করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসিয়াছিল। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন বশতঃ ভূভাগের এইরূপ অবস্থান্তর চিরদিনই ঘটিয়া আসিতেছে। রামের বনগমন ও সীতা-নির্ব্বাসন এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই জনস্থানের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা ভবভূতি উত্তর-রামচরিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।—

"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।"

(উত্তররামচরিত, ২য় অঙ্ক ২৭ শ্লোক।)

বিদ্যানগর, মামগাছি প্রভৃতির পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমের ধারা বহুদিন অবধি প্রবল ছিল। প্রসিদ্ধ বণিক্ চাঁদসদাগর ভাগীরথীর এই ধারা দিয়াই বাণিজ্যার্থে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। যে সময়ে তাঁহার বাণিজ্য তরণী-সকল বিদ্যানগরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময়ে তিনি ঝড় বৃষ্টিতে আক্রান্ত হন। ঐ বিদ্যানগরের উত্তরেই সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণীতলায় ব্রহ্মাণী (মনসা) দেবীর পীঠস্থান প্রতিষ্ঠিত। সদাগর উক্ত দেবীর পূজা না দিয়া অবমাননা করিয়া চলিয়া আসেন। কথিত আছে, এই অপরাধে ঐ স্থানেই তিনি ঝটিকাক্রান্ত হন, এবং তাঁহার নৌকাদি গঙ্গার তরঙ্গতলে ডুবিয়া যায়। অতঃপর তিনি সোপচারে দেবীর পূজা দিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করেন। সদাগর পূজিত ব্রহ্মাণীর ঘট অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে বহু সমারোহে তাহার পূজা হইয়া থাকে।

ভাগীরথী তাহার পর নবদ্বীপের পশ্চিমাংশ গ্রাস করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসায়, ঐ স্থানে এক বিল পড়িয়া যায়। ঐ বিল চাঁদ সদাগরের স্মরণার্থ চাঁদের বিল নামে বিখ্যাত হয়। চাঁদ সদাগর গৌরাঙ্গের জন্মের কিছু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব গৌরাঙ্গদেবের সময়ে

গঙ্গার এই পশ্চিম ধারা প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা চৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই, গৌরাঙ্গ যখন কাটোয়া গমন করেন, তখন ভাগীরথী পার হইয়া যান।[৭] আবার সন্ন্যাসগ্রহণের করেক দিন পরে যখন গৌরাঙ্গদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে অবস্থিত ছিলেন, তখন নবদ্বীপবাসিগণ গঙ্গা পার হইয়া গৌরদর্শনে শান্তিপুর (ফুলিয়া) গিয়াছিলেন।[৮]

কাটোয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে এবং ফুলিয়া পূর্ব্ব পারে পূর্ব্বাপর অবস্থিত আছে। নবদ্বীপ হইতে এই দুই স্থানে যাইবার সময়ে গঙ্গা পার হইতে হইলে, নবদ্বীপের পশ্চিম ও পূর্ব্ব উভয় পারেই গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন। সুতরাং নবদ্বীপ ভাগীরথীগর্ভস্থ একটী দ্বীপ।

আমরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়েও নবদ্বীপে ভাগীরথীর পশ্চিমের শাখা প্রবল থাকা দেখিতে পাই। অমর কবি ভারতচন্দ্র রায় কৃত 'মানসিংহে' এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"মজুমদারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান॥
আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥

(৭) "গঙ্গা পার হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সেই দিন আইলেন কণ্টক নগর॥" চৈ, ভা,

(৮) "এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপবাসী।
শুনিলেন গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী॥
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হইয়া॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী।
আনন্দে চলিলা সব বলি হরি হরি॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হইল খেয়া ঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥" চৈ, ভাঃ,

পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ ॥" (মানসিংহ)

পূর্ব্বস্থলী গঙ্গার পশ্চিম। পূর্ব্বস্থলী হইতে গঙ্গা পার হইয়া নবদ্বীপ আসার বর্ণনা থাকায়, সেই সময়ে নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত থাকা জানা যাইতেছে। গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের আর এক স্থানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জমীদারীর সীমা বর্ণন করিয়াছেন—

"রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ ॥" (অন্নদামঙ্গল)

মহারাজ ভবানন্দ মজুমদারের সময় হইতেই নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজবংশের জমীদারীর অন্তর্গত। উদ্ধৃত অংশে পশ্চিমের সীমা 'ভাগীরথী খাদ' লিখিত থাকায়, তৎকালে নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিত থাকা প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীরথী থাকার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, পূর্ব্বদিকে ত প্রবাহিত আছেনই। অতএব নবদ্বীপ গঙ্গাগর্ভস্থ দ্বীপ। এই দ্বীপের পূর্ব্ব-প্রবাহিত জাহ্নবীধারায় খড়িয়া বা জলঙ্গী নদী পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া মিলিত হইয়াছে। ঐ মিলন-স্থান 'ত্রিমোহিনী' নামে বিখ্যাত হয়। পূর্ব্বকালে নবদ্বীপের পশ্চিম-দক্ষিণ অংশে সমুদ্রগড়ের পূর্ব্বদিকে গোয়ালপাড়ার নিকট এই ত্রিমোহিনী ছিল।[১]

নূতন দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ।—তৎকালে নদী ব্যতীত বাণিজ্যের ও গমনাগমনের অন্য কোন উপায় ছিল না। এই ভাগীরথী নদী

(১) দেওয়ান মহাশয় লিখিত—ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত—পৃঃ ৫৩।

"April 12—We got as high as Nuddia ; in Cassumbazar River, by 8 O'clock in Y^e^ morning, and lay Y^e^ night at a place called Goalpara."—William Hedge's Diary—1683.

দ্বারা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সহিত দক্ষিণদেশীয় সপ্তগ্রামের, এবং জলাঙ্গী দ্বারা উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের বাণিজ্যকার্য্য সম্পন্ন হইত। নদীয়া উক্ত উভয় নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ; সুতরাং উক্ত উভয় নদী প্রবাহিত বাণিজ্যতরী নবদ্বীপের নিম্ন দিয়া গমনাগমন করিত, কখনও বা নঙ্গর করিয়া নবদ্বীপেই থাকিত। এইরূপ যেখানে নৌকাসকল একত্র নঙ্গর করিয়া থাকে, সেখানে সহজেই দোকান-পশারী বসিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ, হিন্দু-ধর্ম্ম মতে ভাগীরথীস্নান বিশেষ পুণ্যজনক কার্য্য ; সুতরাং দূরদেশ হইতে সময়ে সময়ে অনেক যাত্রী গঙ্গাস্নানার্থ এই স্থানে সমাগত হইতেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে 'বারুণী' 'দশহরা' ও অন্যান্য যোগাদি উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অনুরাগ ও গঙ্গার প্রতি তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা যে জলাঙ্গী বাহিয়া উহার সম্মিলন স্থান নবদ্বীপে ভাগীরথী স্নান করিতে আগমন করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং উক্ত সময়ে ঐ স্থানে অনেক যাত্রীর সমাগম হইত, এবং বহু দোকান-পশারীও বসিত। যাত্রীরা প্রত্যাবৃত্ত হইলে, আবার দোকানীরা উঠিয়া যাইত, কেহ বা স্থায়ী হইত। ক্রমে ঐ স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর দেখিয়া পার্শ্ব-বর্ত্তী পল্লী হইতে জনসাধারণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল ; এইরূপে স্থানটী সামান্য পল্লীরূপ ধারণ করিল। দ্বীপের উপর নূতন বসতি বলিয়া উহার নাম "নবদ্বীপ" (নূতন দ্বীপ) হইল।

নদীয়া বা নবদ্বীপ আখ্যা

'নবদ্বীপ' নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী আছে। কেহ বলেন নদীয়া বা নবদীপ, কেহ কেহ নূতন দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ, কেহ বা নয়টী দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ নামের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

নদীয়া বা নবদীপ।—নবদীপ গঙ্গার চরভূমির উপর অবস্থিত। ঐ চরের উপর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য কারণে আসিয়া বসবাস করেন। এই সময়ে একজন সন্ন্যাসী ঐ চরের কোন নিভৃত প্রদেশে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি নয়টী প্রদীপ জ্বালিয়া যজ্ঞ বিশেষের (আরাত্রিক) অনুষ্ঠান করিতেন। কৃষিবর্গ ও ভাগীরথীস্থ নৌকারোহী যাত্রিগণ ঐ নয়টী প্রদীপ দেখিয়া তৎকাল-প্রচলিত ভাষা অনুসারে উহাকে ন-দীয়ার চর বলিয়া অভিহিত করিত। তৎকালে প্রদীপকে 'দিয়া' বলিত। অদ্যাপি অস্মদ্দেশে 'দিয়াকাঠি' 'দিয়াশলাই' প্রভৃতি শব্দে প্রদীপ অর্থে 'দিয়া' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ঐ নয়টী প্রদীপ হইতে এই দ্বীপের নাম 'নবদীপ' বা 'নদিয়া' হইয়াছে।

নূতন-দ্বীপ হইতে কিরূপে নবদ্বীপ আখ্যা হইয়াছে, ইতঃপূর্ব্বেই তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

নয়টী দ্বীপে নবদ্বীপ।—চৈতন্য-ভাগবতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থে নবদ্বীপ একটী মাত্র দ্বীপ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যাম দাস ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে নবদ্বীপ পরিক্রম-বিবরণে নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ নামের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন নয়টী দ্বীপ দ্বারা নবদ্বীপ বেষ্টিত—

> "নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়।
> নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥"

তিনি ঐ নয়টী দ্বীপের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ঃ—

"গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়॥
গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়।
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥"

অর্থাৎ, ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে—

(১) অন্তর্দ্বীপ—এই স্থানই প্রকৃত নবদ্বীপ ; এখন যেস্থানে সহর নদীয়া ও বাবলাড়ী অবস্থিত আছে তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপ ; এই ভূখণ্ডেই গৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) সীমন্ত দ্বীপ বা সিমুলিয়া এই দ্বীপ নবদ্বীপের উত্তর। বামুনপুকুর, মিঞাপাড়া, বল্লালদীঘি ইহার অন্তর্গত।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ—ইহা নবদ্বীপের পূর্ব্ব। গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার ও স্বরূপগঞ্জ ইহার অন্তর্গত।

(৪) মধ্যদ্বীপ বা মাজিদা—ইহাও নবদ্বীপের পূর্ব্ব ও গোদ্রুম দ্বীপের দক্ষিণ। মাজিদা, ভালুকা, পানশীলা আদি ইহার অন্তর্গত।

ভাগীরথীর পশ্চিমপারে

(৫) কোলদ্বীপ—নবদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমে। কুলিয়া বা কোবলা, সমুদ্রগড়, চম্পকহট্ট, ইহার অন্তর্গত।

(৬) ঋতুদ্বীপ—নবদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। রাহুতপুর ও বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত।

(৭) মোদদ্রুমদ্বীপ—নবদ্বীপের পশ্চিম। মামগাছি, মহৎপুর, ব্রহ্মাণীতলা ইহার অন্তর্গত।

(৮) জহ্নুদ্বীপ—নবদ্বীপের পশ্চিম। জান্নগর, পারুলিয়া ও স্বলুণ্ঠ ইহার অন্তর্গত।

(৯) রুদ্রদ্বীপ—নবদ্বীপের পশ্চিম-উত্তর। রুদ্রডাঙ্গা, শঙ্করপুর ও পূর্ব্বস্থলী ইহার অন্তর্গত।

উল্লিখিত বর্ণনায় কোন একটী দ্বীপের নাম নবদ্বীপ নাই, কিন্তু চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে নবদ্বীপ বিশেষ নামে একটী দ্বীপ বা স্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

"নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥
সবে মাত্র গঙ্গা নবদ্বীপ কুলিয়ায়।
কভু পার হইয়া যায়েন কুলিয়ায়॥" চৈ, ভা,

এই স্থানে কুলিয়া ও সিমুলিয়া নবদ্বীপ হইতে পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ গাদিগাছা, মাজিদা প্রভৃতি দ্বীপকে পৃথক্‌রূপে বর্ণনা করিয়া নবদ্বীপের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে। আবার ভক্তিরত্নাকরে নবদ্বীপ বলিয়া কোন একটী বিশেষ দ্বীপের নাম নাই; পরন্তু মায়াপুর বলিয়া একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং সেই স্থানই গৌরাঙ্গের জন্মভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জনমিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥" ভ, র,

ভগবানের জন্ম স্থানকে যোগপীঠ বলে। তাহা হইলে, চৈতন্য-ভাগবতাদি গ্রন্থোক্ত নবদ্বীপের মধ্যে যে স্থানে মহাপ্রভু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই ভক্তিরত্নাকরের উল্লিখিত যোগপীঠ মায়াপুর। উক্ত গ্রন্থে নবদ্বীপের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।

"নবদ্বীপ নাম যৈছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি দীপ্ত যাতে॥" ভ, র

ইহাতে দেখা যাইতেছে, নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় বৃন্দাবনলীলার অনুসরণ করিয়া নবদ্বীপ নামের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং প্রত্যেক দ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক একটী আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকাও প্রদান করিয়াছেন। অতএব এই ব্যাখ্যা ভৌগোলিক ব্যাখ্যা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।*

গৌড় দেশ

এই বঙ্গ বা রাঢ়দেশই পরে গৌড় বলিয়া প্রথিত হইয়াছে।

আমরা ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণান্তর্গত বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্যে বক্রেশ্বর তীর্থকে গৌড়দেশে অবস্থিত দেখিতে পাই।[১] এই বক্রেশ্বর তীর্থ বীরভূম জেলার অন্তর্গত। অতএব বীরভূম গৌড়দেশ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

হর্ষচরিতে মহারাজ শশাঙ্ক গৌড়াধিপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।[২] মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ নগর মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল।[৩] অতএব মুর্শিদাবাদ জেলাও গৌড় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ উভয়েই গৌড়দেশে উদিত হইয়াছিলেন।[৪] নবদ্বীপ চৈতন্যের জন্মভূমি এবং বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচক্রা গ্রাম নিত্যানন্দের জন্মভূমি। অতএব এই উভয় স্থানই গৌড়দেশান্তর্গত ছিল।

---

* ২১ পৃষ্ঠা হইতে ২৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিষয় সমুহ গ্রন্থকার প্রণীত "নবদ্বীপ-তত্ত্ব" গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(১) "গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরসুসংগতং।" (বক্রেশ্বরমাহাত্ম্য)

(২) বিদ্যাসাগর সম্পাদিত—হর্ষচরিত ষষ্ঠ-উচ্ছাস।

(৩) Yuan-Chwangএর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(৪) "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥" (চৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীমান্ কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার 'মন্বর্থ মুক্তাবলী' নামে যে টীকা করিয়াছেন তাহাতে তিনি আপনাকে গৌড়দেশান্তর্গত নন্দন নগর নিবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।[৫] এই নন্দন নগরটি জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত। অতএব রাজসাহীও গৌড় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বর্দ্ধমানকেও গৌড়দেশান্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"দেখি পুরী বর্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশে।"

শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে আমরা অবগত হই যে, বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূভাগ গৌড়দেশ বলিয়া আখ্যাত হইত।[৬] এই তন্ত্রানুসারে আমরা বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি, বর্দ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগস্থ জেলাগুলিকে গৌড়দেশের অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করিতে পারি।

জেলা মালদহের অন্তর্গত সকলজনবিদিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরই গৌড় নগর নামে প্রসিদ্ধ। এক সময়ে এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর গৌড়দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া গৌড়নগর নামে অভিহিত হইত।

বৈদিক ও পৌরাণিক সময়ে গৌড়দেশের উত্তরভাগ পৌণ্ড্র নামে এবং দক্ষিণভাগ বঙ্গদেশ নামে অভিহিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসও এই বঙ্গদেশকে রাঢ়দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐ সময়ে এই প্রদেশের নাম গৌড় থাকিলে তৎকালে ইহা গৌড় বলিয়াই কথিত হইত। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রদেশের গৌড় নাম মেগাস্থিনিসের পর হইয়াছে।

---

(৫) গৌড়ে নন্দনবাসি নাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যোবরেন্দ্র্যাং কুলে।
শ্রীমদ্ভট্ট দিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুক ভট্টোঽভবৎ॥ (মন্বর্থমুক্তাবলী)

(৬) বঙ্গদেশাৎ সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ (শক্তিসঙ্গমতন্ত্র)

এখন কোন সময় হইতে এই প্রদেশের নাম গৌড় হইল? প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পাণিনির উল্লিখিত গৌড়পুর এই পৌণ্ড্রদেশীয় গৌড়নগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পাণিনি প্রথমে সূত্র করিয়াছে—"পুরে প্রাচাম্" (৬।২।৯৯), পরে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"অরিষ্টগৌড় পূর্ব্বে চ" (৬।২।১০০)—যেমন, অরিষ্ট ও গৌড় শব্দ পুর শব্দের পূর্ব্বে প্রাচ্যদেশের পুরবাচী হইবে। যথা অরিষ্টপুর ও গৌড়পুর।

পাণিনি বহু প্রাচীন হইলেও, বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের মতে ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে, উল্লিখিত গৌড়পুর তদপেক্ষা প্রাচীন সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেগাস্থিনিস এই প্রদেশকে রাঢ়দেশ (বা গঙ্গারিডই) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তৎকালে গৌড় এই প্রসিদ্ধ নাম থাকিলে, তিনি কখনও এই দশকে রাঢ়দেশ বলিতেন না।

পাণিনির জন্মভূমি পঞ্জাবের অন্তর্গত পেশোয়ারের নিকট শালাতুর গ্রাম। এইজন্য পাণিনির আর এক নাম শালাতুরীয়। ঐ নগরের পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে গৌড় নামে একটী দেশ ছিল। সম্ভবতঃ পাণিনি ঐ গৌড়েরই উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

মৎস্য ও লিঙ্গ পুরাণে লিখিত আছে—'মহাতেজস্বী শ্রাবস্তিপুত্র বংশক গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগর নির্ম্মাণ করেন।'[৭] এই শ্রাবস্তী নগরী অযোধ্যা প্রদেশে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে (১২৭ শ্লোক) অবগত হই যে, রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর অযোধ্যাপুরী লয়প্রাপ্ত হইলে, রামতনয় লব শ্রাবস্তী নগরে তাঁহার রাজধানী উঠাইয়া আনেন।

আবার, হিতোপদেশে লিখিত হইয়াছে যে, 'গৌড়দেশে কৌশাম্বী

(৭) শ্রাবস্তিশ্চ মহাতেজা বংশকস্তু ততোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তম॥ (মৎস্য ও লিঙ্গপুরাণ)

নামে নগরী আছে।[৮] এই কৌশাম্বী নগরীও প্রয়াগের পশ্চিমে যমুনা-কূলে অবস্থিত। পাণিনি স্বীয় জন্মভূমির পূর্ব্বদিকে এই গৌড়পুরেরই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব পাণিনির উল্লিখিত গৌড়পুর এই পৌণ্ড্র-দেশীয় গৌড়নগরের নির্দ্দেশক নহে।

এই প্রদেশ গৌড়দেশ বলিয়া বিখ্যাত। এখন এই দেশের নাম গৌড় হইল কেন? কেহ কেহ বলেন গুড় শব্দ হইতে গৌড় হইয়াছে।[৯] এই ব্যাখ্যা শ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে হয় না।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী আর্য্য ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে আদিগৌড় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং ঐ সরস্বতী তীরবর্ত্তী গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণই যাগযজ্ঞাদির নিমিত্ত আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারাই গৌড়ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত হন। কান্যকুব্জবাসী কান্যকুব্জ গৌড়, মিথিলাবাসী মৈথিল গৌড়, উৎকলবাসী উৎকল গৌড় প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পৌণ্ড্র ও বঙ্গদেশে এইরূপ গৌড়-ব্রাহ্মণগণের অধিক পরিমাণে বাস হইলে, তাঁহাদের সন্ততিগণ এই দেশে আসিয়া আপনাদিগকে কেবল গৌড়ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই জন্য তাঁহাদের বাসস্থান এই বঙ্গদেশ গৌড়দেশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

এই গৌড়দেশ বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, এবং এই দেশ-বাসিগণ সকলেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। সাহিত্যদর্পণ, কাব্যাদর্শ, কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রে গৌড়দেশীয় রচনা-প্রণালীকে "গৌড়ী রীতি" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে এই প্রদেশে যে সংস্কৃতশাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচিত হইত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ইহাদিগের ভাষা

(৮) "অস্তি গৌড়-বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী।" (হিতোপদেশ)

(৯) "The name of Gauda or Gour is, I believe, derived from Guda or Gur, the common name of molasses, or raw sugar, for which this Province has always been famous........." Archaeological survey of India Reports, Vol. XV.—Cunningham.

সংস্কৃতানুযায়ী বিশুদ্ধভাষা থাকায়, এই প্রদেশের ভাষা গৌড়ীয় ভাষা নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উক্ত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের বাসহেতুই এই বঙ্গদেশ গৌড়দেশ বলিয়া বিখ্যাত হয়, এবং আদি গৌড়ের নাম বিলুপ্ত হইয়া এই বঙ্গদেশই আদিগৌড় নামে অভিহিত হইয়াছে।

নবদ্বীপ রাজধানী

মহাভারতের সময়ে বঙ্গদেশে চন্দ্রসেন ও সমুদ্রসেনকে রাজত্ব করিতে দেখিতে পাই। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সমুদ্রগড় সম্ভবতঃ মহারাজ সমুদ্রসেনের রাজধানী ছিল। ইহার পর, খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে মহারাজ সিংহবাহুকে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর মহারাজ অশোক প্রবল হইয়া উঠেন, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার শাসনাধীন হয়। পৌণ্ড্র ও বঙ্গ উভয় প্রদেশেই তাঁহার রাজদণ্ড পরিচালিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের আরম্ভ হয়। অশোক পরলোক গমন করিলে, কাশ্মীর, কান্যকুব্জ, পৌণ্ড্র ও বঙ্গদেশ স্বাধীন হইয়াছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ানের ভারতবর্ষীয় বিবরণে, খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গদেশের কোন উল্লেখ করেন নাই। তাহার ২০০ বৎসর পরে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে দ্বিতীয় চীন পরিব্রাজক হুয়েন্থসাং ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও কমলাঙ্ক এই কয়টী বিভিন্ন রাজ্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল রাজ্যের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বিশেষ বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। সেই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে

কেহ কেহ কান্যকুব্জ, সারস্বত, মিথিলা, উৎকল ও বঙ্গ এই পঞ্চ গৌড় অধিকার করিয়া পঞ্চগৌড়েশ্বর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। উক্ত ভূপালগণ বঙ্গের উত্তরভাগে (অর্থাৎ, পৌণ্ড্র, দিনাজপুর ও রঙ্গপুরে) এবং পূর্ব্বভাগে (আধুনিক বিক্রমপুর প্রদেশে) রাজ্যস্থাপন করেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এই পালরাজদিগের প্রযত্নে পৌণ্ড্র ও বিক্রমপুর প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। আজিও ঐ সকল স্থানে পুষ্করিণী আদি খননকালে মৃত্তিকা মধ্য হইতে বৌদ্ধমূর্ত্তি উৎখাত হইতে দেখা যায়।

যে সময়ে পৌণ্ড্রে পালরাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গ বা রাঢ়দেশে শূর-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই পাল ও শূরবংশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। কখন পাল রাজারা কখন বা শূরবংশীয় রাজগণ জয়ী হইতেন। এই শূর-ভূপতিগণ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের প্রযত্নে রাঢ়দেশে হিন্দুধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে সংরক্ষিত ছিল। বঙ্গের উত্তরভাগ অপেক্ষা রাঢ়দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিরল-প্রচার ছিল। মহারাজ আদিশূরের সময়ে যে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা সকলেই রাঢ়দেশবাসী।

শূরবংশীয় মহারাজ আদিশূর রাঢ়দেশের অধিপতি ছিলেন। ঐতিহাসিক কেরী ও মার্শম্যান[১] আদিশূরকে নদীয়া বা নবদ্বীপের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই আদিশূর হইতেই নবদ্বীপে প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয়। তিনি শূরবংশের আদি রাজা ছিলেন বলিয়া আদিশূর নামে খ্যাত হন। এই শূরবংশীয়েরা যে রাঢ়দেশের রাজা ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ।

---

(১) Adisur, of the Vidyu, or medical race of kings then ruling Bengal, and holding its Court at Nuddea, became dissatisfied with the ignorance of his priests, and applied to the king of Cunouj for a supply of Brahmins well versed in the Hindu shasters and observances.—Marshman's History—p. 26.

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তিরোমলই (ত্রিমোলী) পাহাড়ে উৎকীর্ণ তামিল ভাষায় লিখিত ডাঃ বুলার সাহেবের দৃষ্ট (এবং ডাঃ হুল্‌স্‌ সাহেবের অনূদিত) শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, রাজেন্দ্র চোলদেব ১০২০ খৃঃ অব্দ হইতে ১০২৪ খৃঃ অব্দ মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ের (তক্কণ লাড়ম্‌) রাজা রণশূরকে পরাজিত করেন, এবং বঙ্গাল দেশও আক্রমণ করেন।[২] তাহা হইলে শূরবংশীয়েরা রাঢ়দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। আদিশূরকে আমরা রণশূরের পিতামহ বা প্রপিতামহ স্থানীয় দেখিতে পাই।

কিম্বদন্তী, নবদ্বীপের দক্ষিণভাগে মহীশূর নামক স্থানে এই শূরবংশের রাজধানী ছিল। এই বংশীয় মহীনামক কোন রাজা এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করায় ইহা মহীশূর নামে খ্যাত হইয়াছে। বেগবতী গঙ্গার ভাঙ্গনে ঐ স্থান বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে উহার প্রাচীন চিহ্নসকলও গঙ্গার কুক্ষিগত হইয়াছে। এক্ষণে সামান্য চররূপে বর্ত্তমান থাকিয়া মহীশূর নামে শূরবংশের রাজধানী থাকার সাক্ষ্য দিতেছে।

শূরবংশ

আদিশূর। মহারাজ আদিশূর পালরাজাদিগকে পরাজিত করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। গৌড় অধিকারের পূর্ব্বে আদিশূরের অবশ্য পৃথক্‌ রাজ্য ও রাজধানী ছিল। সে রাজধানী কোথায়?

সম্প্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া সবডিভিসনের মধ্যে সীতাহাটী ও নৈহাটী গ্রামে বল্লালসেনের প্রদত্ত যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আদিশূরের রাজধানীর বিষয় কিছু জানিতে পারা যায়।

(২) Proceedings, A. S. B. 1876, p. 108.

মহারাজ বল্লালসেনের জননী বিলাস দেবী, সূর্য্যগ্রহণ দিনে স্বুবর্ণময় এক অশ্ব দান করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ পণ্ডিত শ্রীবাসু দেবশর্ম্মাকে বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তররাঢ় মণ্ডলস্থিত বালহিট্টা গ্রাম দান করেন।

উক্ত তাম্রশাসন ১৩১৭ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার কয়েক পংক্তির অনুবাদ নিয়ে দেওয়া গেল।

"সেই চন্দ্রদেবের সমৃদ্ধিশালী বংশে রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা সদাচার-চর্য্যার খ্যাতিতে প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অতুল প্রভাব দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন এবং নিত্য সকলকে অভয় বিতরণ দ্বারা স্থূল-লক্ষ্য হইয়া বিমল কীর্ত্তিতরঙ্গ দ্বারা আকাশমণ্ডলকে স্নান করাইয়া দিয়াছিলেন ;"

"তাঁহাদের বংশে মহাবলশালী শত্রুসৈন্য সমুদ্রের কল্পান্ত সূর্য্যস্বরূপ. কীর্ত্তিরূপ জ্যোৎস্না দ্বারা সমুজ্জলশ্রী কুমুদবনে শশাঙ্কসদৃশ প্রিয়জনের আনন্দবর্দ্ধক আজন্মানুরক্ত সুহৃদ্‌বর্গের মনোরাজ্য হিমাচলের ন্যায় অচল-প্রতিষ্ঠ, সত্যশীল, অকপট করুণাধার সামন্তসেন (নামে রাজা) ছিলেন।"[১]

উক্ত বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ সামন্তসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী চন্দ্রবংশীয় রাজপুত্রগণ অতুল প্রভাব দ্বারা রাঢ়দেশকে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই সামন্তসেনের পূর্ব্বপুরুষ কে ? আমরা ঘটকদিগের

---

(১) বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্য্যা-নিরূঢ়ি-প্রৌঢ়াং
রাঢ়ামকলিতচরৈ র্ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ।
শশ্বদ্বিশ্বাভয়-বিতরণ-স্থূল-লক্ষ্যা বলক্ষৈঃ কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ
স্নপিত বিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ॥
তেষাম্বংশে মহৌজা প্রতিভট-পৃতনাম্ভোধি-কল্পান্ত-
সূরঃ কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লাসলীলামৃগাঙ্কঃ।
আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণ-মনোরাজ্য-সিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপাধি করুণাধাম সামন্তসেনঃ॥
(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা --চতুর্থসংখ্যা ১৩১৭ সাল)

কারিকায় দেখিতে পাই১ যে, সেনবংশীয় রাজগণ আদিশূরের দৌহিত্র-বংশীয়।

উল্লিখিত কারিকা-অনুসারে, সম্বন্ধ-নির্ণয় পুস্তকে[২] আদিশূরের যে বংশাবলী লিখিত হইয়াছে তাহা এই— ১। আদিশূর ২। ভূশূর ৩। লক্ষ্মী (কন্যা) ৪। অশোক সেন ৫। বীরসেন ৬। সামন্তসেন ৭। হেমন্ত সেন ৮। বিজয় সেন বা বিষ্যক্ সেন ৯। বল্লাল সেন ১০। লক্ষ্মণ সেন ১১। মাধব সেন ১২। কেশব সেন।

কেহ কেহ এই বংশাবলী বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে আদিশূর হইতে বল্লাল সেনের মধ্যে—এই দীর্ঘকালে এই কয়জন মাত্র রাজার রাজত্ব করা সম্ভব নহে। বোধ হয়, কোন কোন রাজার নাম পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই আদিশূরের সহিত সেনবংশ সম্বন্ধবিশিষ্ট। সেনবংশীয়েরা আদিশূরের দৌহিত্রবংশসম্ভূত। অতএব উক্ত তাম্রশাসনের বর্ণনানুসারে আদিশূর রাঢ়দেশের রাজা হইতেছেন।

রাঢ়দেশে আদিশূরের রাজধানী কোথায় ছিল? কিম্বদন্তী—আদিশূর নদীয়া বা নবদ্বীপের রাজা ছিলেন। ভাগীরথী নবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত থাকিয়া দুর্গ পরিখার ন্যায় উক্ত নগরীকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছিল। এই স্থানেই আদিশূরের রাজধানী থাকা সম্ভব।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "শূরনগর (আদিশূরের রাজধানী)"[৩] নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ সুসঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া বোধ হইল।

(২) সম্বন্ধ নির্ণয়—৩৬১ পৃঃ।

(৩) ১৩১৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৯শ ভাগ ১ম সংখ্যায় শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী লিখিত "শূরনগর (আদিশূরের রাজধানী)" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই শূরনগর (শূর্‌রো) বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত ; যে স্থানে আদিশূরের রাজধানী ছিল তাহাই শূর্‌রো বা শূরনগর। ঐ স্থানে আদিশূরের প্রাসাদের ভগ্নভিত্তি চিহ্ন, কয়েকটী কূপ ও শ্রীশ্রীহনুমানজী দেবের ভগ্ন বিগ্রহ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ ঐ গ্রামের চতুঃপার্শ্বে বহু পল্লীর নামকরণ দেখিলে তাঁহার রাজধানীর পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ নগর বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রায় পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাচীন কালে নবদ্বীপ আরও পশ্চিমে অবস্থিত ছিল, তখন শূর্‌রোও নবদ্বীপের অন্তর্গত ছিল।

মহারাজ আদিশূর গৌড় অধিকার করিয়া, গৌড়েশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়াছে। কিন্তু এত ঐশ্বর্য্যেও তাঁহার অন্তঃকরণে সুখ নাই। মানুষ যে ধন পাইলে সর্ব্বসুখে সুখী হয়, তাঁহার সেই পুত্ররত্নেরই অভাব,—তাঁহার পুত্রলাভের সময়ও অতীত হইয়াছে। সুতরাং রাজ্যলাভে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। পুত্র-মুখ অদর্শন-জনিত হতাশ্বাসে তিনি বড় ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। তিনি পুত্র কামনায় মহারাজ দশরথের ন্যায় যজ্ঞ করিতে বাসনা করিলেন। আজিও অস্মদ্দেশে পুত্রার্থে কার্ত্তিকেয় পূজা করিতে দেখা যায়।

মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইলেন বটে, কিন্তু তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে ছিলেন, তাঁহারা বহুদিন বৌদ্ধদিগের সংস্পর্শে থাকায় বেদবিহিত যজ্ঞাদি কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তখন মহারাজ আদিশূর যজ্ঞসম্পাদনার্থে কান্যকুব্জাধিপতির নিকট বেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পাঁচজন ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে কান্যকুব্জপতি—কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ, বাৎস্য-গোত্রীয় ছান্দড়, সাবর্ণ-গোত্রীয় বেদগর্ভ এবং শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ নামধেয় পাঁচজন সাগ্নিক নিত্যহোমপরায়ণ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন।

বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের নাম সুধানিধি,

মেধাতিথি, বীতরাগ, সৌভরি এবং ক্ষিতীশ লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত দক্ষাদির পিতা ছিলেন।

এই ব্রাহ্মণপঞ্চকের সহিত শূদ্রবংশীয় পাঁচজন ভৃত্য আসিয়াছিলেন তাঁহারাই বর্ত্তমান কায়স্থগণের আদি পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত।

উক্ত ব্রাহ্মণপঞ্চক আগমন করিয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে মহারাজ আদিশূরের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই পুত্রের নাম ভূশূর।

মহারাজ আদিশূরের ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্বন্ধে 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদা আদিশূরের প্রাসাদের শিখরদেশে এক শকুনি অস্বাভাবিক শব্দ করিতেছিল। ইহাতে আদিশূর রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায়, অশুভ শান্তির নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ-ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। এই ঘটনা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে রচিত। মহারাজ আদিশূরের সময় হইতে ঐ সময় প্রায় ৮০০ বৎসর ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। এই ৮০০ বৎসর পরের রচিত গ্রন্থে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। এই গল্প যে অপ্রামাণিক তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমনকালে হরিবর্ম্ম-দেবের সময়েও অবিকল ঐরূপ গল্প বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আরও প্রকাশ পায় যে, কান্যকুব্জ রাজ্যেও ঐরূপ ঘটনা হইয়াছিল।

এক্ষণে মহারাজ আদিশূরের দুইটী রাজধানী হইতেছে—একটী নদীয়া বা নবদ্বীপ, দ্বিতীয়টী গৌড়নগর। ইহার কোনটীতে বসিয়া তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন? কেহ কেহ বলেন, আদিশূর বিক্রমপুরের রাজা ছিলেন, এবং বিক্রমপুরের রাজধানী রামপালে বসিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। কিন্তু আদিশূরের সময় বিক্রমপুরে আদৌ নগরী স্থাপিত হয় নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত বল্লাল সেনের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিক্রম-

পুর বল্লালসেনের একটী 'সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার' মাত্র। সমাবাসিত বলিলে, উক্ত স্থানে সেনানিবাস তিনিই স্থাপন করিয়াছিলেন বুঝিতে পারা যায়। আদিশূর বল্লাল সেনের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে, আদিশূরের সময়ে বিক্রমপুরে কোন মতে নগর স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে। বাস্তবিক আদিশূর কোন কালে বিক্রমপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-কার বলেন যে, আদিশূর গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কথাটা সঙ্গত বটে—কিন্তু ইহাতেও একটু সন্দেহ হয়। আমাদের মতে নবদ্বীপের রাজধানীতে বসিয়াই তিনি ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এইরূপ মনে করিবার কারণ এই—

যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণেরা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহাদের স্বদেশীয় ব্রাহ্মণবৃন্দ অযাজ্য যাজন ও অগম্য দেশে গমন জন্য তাঁহাদিগকে স্বসমাজে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া এই রাঢ়দেশেই বাস করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনু অগম্য দেশের যে নাম করিয়াছেন পৌণ্ড্র তদন্তর্গত নহে। অতএব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বসিয়া ব্রাহ্মণ আনয়ন করা সম্ভবপর নহে।

নবদ্বীপ গঙ্গাতীরবর্ত্তী এবং বঙ্গদেশের মধ্যে। অতএব নবদ্বীপে বসিয়া যজ্ঞ করিলে উক্ত বিবরণের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। নবদ্বীপ রাজধানীতে বসিয়া যজ্ঞ করিবার আরও কারণ আছে। নবদ্বীপ আদিশূরের আদিম রাজধানী ও জন্মভূমি। এই প্রদেশেই বহু ব্রাহ্মণের বাস ও হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রচার ছিল। রাজক্ষমতাও এই প্রদেশে বদ্ধমূল ছিল। গৌড়নগর তাঁহার অর্জ্জিত নগর। সুতরাং গৌড়ে ব্রাহ্মণ না আনিয়া স্বীয় জন্মভূমি নবদ্বীপে যে তিনি ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাই সম্ভব।

আদিশূরের আবির্ভাবকাল লইয়া নানা মতভেদ আছে। সে, সকলের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ বাড়াইবার আবশ্যক নাই। বারেন্দ্রকুলগ্রন্থে

দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি-গাঞি ওঝাকে একখানি গ্রাম দান করেন।[৪] আবার বপ্পভট্টি, শূরী প্রভৃতি জৈন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের সহিত কান্যকুব্জাধিপতি আমরাজের সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইত। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের প্রকাশিত ১৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দের সংস্কৃত-বিষয়ক প্রস্তাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যশোধর্ম্মদেবের পুত্র আমরাজ ৮৯০ সংবতে বা ৮৩৩ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। আবার ডাক্তার কনিংহামের মতে ধর্ম্মপাল ৮৩১ খৃঃ অব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতএব ৮৩১ খৃঃ অব্দ হইতে ৮৩৩ খৃঃ অব্দ মধ্যে ধর্ম্মপালকে দেখিতে পাই। আদিশূর আনীত ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাও ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে, আমরা মহারাজ আদিশূরকে আদিগাঞি ওঝার এক পুরুষ পূর্ব্বে অর্থাৎ, সংবৎ ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বা খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান দেখিতে পাই।

আদিশূরের আনীত এই ব্রাহ্মণপঞ্চকের সকলেই রাঢ়দেশবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রযত্নে বঙ্গদেশে আবার সংস্কৃত চর্চ্চার উন্নতি হইতে লাগিল। ভট্টনারায়ণ একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তৎপ্রণীত 'বেণীসংহার নাটক' সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ আদৃত। অনেকে বলেন আদিরসাত্মক সুললিত কাব্য 'নৈষধচরিত' আদিশূর আনীত শ্রীহর্ষেরই রচিত। নৈষধে শ্রীহর্ষের এইরূপ পরিচয় দৃষ্ট হয়—"কবিরাজ সমূহের মুকুটালঙ্কার-হীর-স্বরূপ শ্রীহীর ও মামল্লদেবী জিতেন্দ্রিয়চয় শ্রীহর্ষকে

(৪) রাজাশ্রীধর্ম্মপালঃ সুখমমরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞি বিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥

(লাহেড়ী বংশাবলী।)

তনয় লাভ করিয়াছেন।"[৫] ইহাতে দেখা যায় যে নৈষধকার শ্রীহর্ষের পিতার নাম শ্রীহীর। কিন্তু আদিশূর আনীত শ্রীহর্ষের পিতার নাম মেধাতিথি। পিতৃনামের ভিন্নতা দেখিয়া নৈষধকার শ্রীহর্ষকে কেহ কেহ ভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। কিন্তু তাহা নহে—শ্রীহর্ষের পিতা মেধাতিথি ও শ্রীহীর দুই নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

আমাদের আলোচ্য শ্রীহর্ষই যে নৈষধকার তাহা নিঃসন্দেহ। আমরা নৈষধের দ্বাবিংশতি সর্গে দেখিতে পাই, "শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জের রাজার নিকট আসন ও তাম্বুলদ্বয় পাইয়াছিলেন।"[৬] ইহাতে তিনি যে কান্যকুব্জে ছিলেন তাহা বেশ প্রতীয়মান হইতেছে। নৈষধের সপ্তম সর্গের শেষে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীহর্ষ "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি"—অর্থাৎ গৌড়ীয় রাজবংশের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন।[৭] অতএব তিনি গৌড়দেশে আসিয়া এই ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা জানা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত তিনি 'অর্ণববর্ণনকাব্য', 'নবসাহসাঙ্কচরিত', 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' প্রভৃতি পাণ্ডিত্যখনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে. ইহাতে তিনি নৈয়ায়িকদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

ভূশূর।—মহারাজ আদিশূরের পর তদীয় পুত্র ভূশূর গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু ভূশূর পিতার ন্যায় ক্ষমতাশালী পুরুষ না থাকায়, অল্পদিন পরেই মগধাধিপতি মহারাজ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, গৌড়নগর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ভূশূর গৌড়নগর ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ রাজধানীতে আসিয়া বাস করেন, এবং নবদ্বীপের

(৫) শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজি মুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবীচয়ং।
(নৈষধ চরিতের প্রথম সর্গের শেষ শ্লোকার্দ্ধ)।

(৬) 'তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ।' (নৈষধ চরিতম্—২২ সর্গ)

(৭) গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি ভণিতি ভ্রাতর্যয়ং তন্মহাকাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽগমৎ সপ্তমঃ॥ (নৈষধ চরিতম্ ৭ম সর্গ)।

দক্ষিণে পুণ্ড্র নামক এক নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো নগরকে অনেকে পুণ্ড্রনগর বলিয়া অনুমান করেন। বাস্তবিক পেঁড়োর মন্দির দেখিলে উহা যে হিন্দুদিগের মন্দির ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। পেঁড়ো মুসলমানদিগের হস্তগত হইলে ঐ মন্দির তাঁহারা ভগ্ন করিয়া মসজিদ আকারে প্রস্তুত করিয়াছেন।

ক্ষিতিশূর।—ভূশূরের পর তদীয় পুত্র ক্ষিতিশূর রাজাসন প্রাপ্ত হন। তিনি রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে ৫৬ খানি গ্রাম দান করেন।[৮] তদবধি তত্তৎ গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ সেই সেই গ্রামিন্ বা গাঁই বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সময় হইতে শূরবংশীয়গণ বঙ্গদেশে বা দক্ষিণরাঢ়ে এবং পালবংশীয় রাজারা পৌণ্ড্রে বা উত্তররাঢ়ে রাজত্ব করিতে থাকেন।

এই শূরবংশের উৎসাহে ও প্রযত্নে বঙ্গদেশে আবার আর্য্য ব্রাহ্মণগণের পুনরাগমন হইয়াছিল। মানবধর্ম্মশাস্ত্রমতে যে বঙ্গরাজ্য চণ্ডালাদি অস্পৃশ্য অনার্য্যদিগের নিবাস হেতু অপবিত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, আদিশূরের সময় হইতে সেই বঙ্গভূমি আর্য্যদিগের নিবাস স্থানরূপে পরিণত হইয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছে। আদিশূরের পূর্ব্বে এদেশে আর্য্যগণের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। তাঁহার সময় হইতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুৎপত্তির সূত্রপাত হইয়া, বঙ্গবাসিগণের মনে এক মহান্ ভাবের আবির্ভাব করিয়াছিল। এই শূরবংশের দুই এক পুরুষ পরেই তাহাদের গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছিল।

৮) "ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্য সুতেন চ।
ক্রিয়ন্তে গাঞিসংজ্ঞানি তেষাং স্থানবিনির্ণয়াৎ॥"
(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উদ্ধৃত ৺বংশী বিদ্যারত্ন সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা)।

পালরাজগণ

ভূশূরের সময়, **ধর্ম্মপাল** গৌড়ের সিংহাসনে আসীন হইয়া কামরূপ পর্য্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করেন। পরে হিমালয় প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়া তিনি নিহত হন। অতঃপর তাঁহার পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র **দেবপাল** গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পালরাজগণের মধ্যে দেবপাল অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ, সারস্বত প্রদেশাদি পঞ্চগৌড় রাজ্যে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিয়া আপনাকে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' এই সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রাজারা পঞ্চগৌড়ের অধিপতি না হইলেও 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিতেন। দেবপাল সাম্রাজ্য সুশাসনের নিমিত্ত স্থানে স্থানে সামন্ত রাজ্যের সৃষ্টি করেন। উত্তরে রংপুর ও দিনাজপুরে এবং পূর্ব্বে বিক্রমপুরে সামন্ত রাজ্য স্থাপিত হয়।

দেবপালের মৃত্যুর পর গৌড়ের পালবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে **বিগ্রহপাল**কে প্রধান দেখিতে পাই। তৃতীয় বিগ্রহপাল একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল দিনাজপুর প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দিনাজপুরই তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি সেই স্থানে এক প্রকাণ্ড দীঘি কাটাইয়া সর্ব্বসাধারণের উপকার ও আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ দীঘি 'মহীপাল দীঘি' নামে বিখ্যাত রহিয়াছে।

বিগ্রহপালের দ্বিতীয় পুত্র **রামপাল** বিক্রমপুর প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। বিক্রমপুরের রাজধানী রামপালেরই স্থাপিত। তিনিও তথায় এক প্রকাণ্ড দীঘি কাটাইয়া স্বীয় নামানুসারে সেই দীঘির নাম 'রামপাল দীঘি' ও নগরের নাম রামপাল রাখিয়া আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। আজিও ঐ দীঘি ও নগর বর্ত্তমান থাকিয়া

তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই রামপাল যৌবনাবস্থাতেই কুমার-পাল ও মদনপাল নামক দুই পুত্র রাখিয়া ৯৮৮ শকাব্দে (১০৬৬ খৃঃ অঃ) জাহ্নবীজলমধ্যে চক্রীর পদ (শ্রীকৃষ্ণের চরণ) ধ্যান করিতে করিতে দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন।[১] ইহাতে রামপাল বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া বিবেচিত হয় না। রামপালের মৃত্যুর পর **কুমারপাল ও মদনপাল** বিক্রমপুর প্রদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে দক্ষিণ বাঙ্গালায় সেন-বংশীয় রাজারা রাজ্যশাসন করিতেছিলেন।

কিম্বদন্তী আছে যে পালবংশীয় নৃপতিগণ কোনও সময়ে নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বঙ্গের দক্ষিণভাগ পরি-দর্শনে আগমন করিতেন, তখন পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী ও নির্ম্মলতোয়া জলাঙ্গী পরিবেষ্টিত অতি রমণীয় এই নবদ্বীপই তাঁহাদের বাসস্থান জন্য মনোনীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রায় ২ ক্রোশ পূর্ব্বে সুবর্ণ-বিহার নামে এক-ক্ষুদ্র পল্লী আছে। বৌদ্ধগণের মঠ বা আরাধনার স্থানকে 'বিহার' কহে। তৎকালে ভাগীরথীর এক শাখা মিয়াপাড়ার উত্তর দিয়া ঐ সুবর্ণ-বিহারের নিকট পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল। ঐ শাখাতেই খড়িয়া নদী পতিত ও মন্দাকিনী নামে খ্যাত হইয়া গোয়ালপাড়ার উত্তরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন, ঐ সুবর্ণ-বিহার পাল রাজাদিগের বাসস্থান ছিল। ঐ স্থানে এখনও প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল ভগ্ন স্তম্ভ ও প্রস্তর এবং ইষ্টকাদির কারুকার্য্য দেখিলে উহা বৌদ্ধদিগের সমসাময়িক বলিয়া অনুমিত হয়।

---

(১) শাকে যুগ্মকরেণু রন্ধ্র গণিতে কন্যাং গতে ভাস্করে
কৃষ্ণে বাক্‌পতি বাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।
জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্তুন শনৈর্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণো
হা পালান্বয়-মৌলি-মণ্ডলমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ॥
(শেখ শুভোদয়া—শিবচন্দ্র শীলের পাঠ)

সেনরাজগণ

শূরবংশীয় রাজগণের অবসানের পর বঙ্গদেশে সেনবংশীয় রাজগণের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সেনবংশীয় রাজাদের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্প্রতি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগারী থানার দেবপাড়া গ্রামের নিকট যে প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাদের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রস্তর ফলকে জানিতে পারা যায় যে, দাক্ষিণাত্য ভূপতি বীর-সেনের বংশে সামন্ত সেন নামে একজন রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। সামন্ত সেন একজন বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি কর্ণাট-লক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তগণকে কদন (মর্দ্দন) করিয়াছিলেন।[১] ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মহারাজ সামন্ত সেন কর্ণাটরাজের সামন্ত রাজা ছিলেন।

যে সময়ে পালরাজারা পৌণ্ড্রে (উত্তর রাঢ়ে), এবং শূরবংশীয় রাজ-গণ দক্ষিণ রাঢ়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটের

---

(১) বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততকলাসাক্ষিণোদাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈ বীরসেন-প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারা
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥৪

তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন-ব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনিকুলাশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লাস শীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষপ্সরোভির্দশরথতনয়স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ ॥৫

দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্ষ্মী-
লুণ্ঠকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেবাঙ্গবীরঃ।
যস্মাদদ্যাপ্যবিহিতবসা মাংসমেদঃ সুভিক্ষাং
হৃষ্যৎপৌরস্ত্যজনিত দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা ॥৮

(দেবপাড়াপ্রাপ্ত বিজয়-প্রশস্তি—Epigraphia Indica, Vol. 1, p. 307, 308.)

অন্তর্গত চোলরাজ্যের রাজারা প্রবল হইয়া উঠেন। এই চোল রাজ্যের প্রথম রাজার নাম পরকেশরী বর্ম্মা বা রাজেন্দ্র চোল। পূর্ব্বোল্লিখিত তামিল ভাষায় লিখিত তিরোমলই পাহাড়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, রাজেন্দ্র চোল দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূরকে পরাজিত করিয়া ঐ দেশ অধিকার পূর্ব্বক বঙ্গালদেশ আক্রমণ করিলে, তদ্দেশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি সাগরের ন্যায় রত্নসম্পন্ন উত্তর রাঢ় অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই চোল রাজাদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় রাজসমূহের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শূরবংশীয় রাজাদের পর সেন বংশীয় রাজারা চোলরাজগণের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন পূর্ব্বক উভয় শক্তি মিলিত হইয়া পালরাজগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। কাটোয়ার নিকট-বর্ত্তী নৈহাটী গ্রামে প্রাপ্ত বল্লালসেনদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষ **সামন্তসেন** ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ রাঢ় দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।[২] তিনি চোল রাজাদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন। দেবপাড়ায় প্রাপ্ত বিজয়-প্রশস্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সামন্তসেন শেষ বয়সে পবিত্র গঙ্গাপুলিনে সুপরিসর পুণ্যাশ্রমনিচয়ে বাস করেন।[৩]

বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরভাগে বল্লালঢীবি নামে মহারাজ বল্লাল সেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানের নাম 'সীমন্তদ্বীপ' বা 'সিমুলিয়া'। সামন্তসেন ঐ স্থানে আসিয়া গঙ্গাতীরে

---

(২) সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ১৩১৮, পৃঃ ৫৭৬।

(৩) উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্ম্মৃগশিশুরসিতাখিন্নবৈখানসস্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্ম্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্য পুণ্যাশ্রমাণি॥

—Epigraphia Indica, Vol. 1, p. 308.

বসতি-স্থাপন করিয়াছিলেন।[৪] তাঁহার নামানুসারেই ঐ স্থানের নাম ‘সামন্তদ্বীপ’ হইয়াছিল ; পরে উহা সীমন্তদ্বীপ নামে আখ্যাত হইয়াছে।

হেমন্তসেন।—সামন্তসেন গতাসু হইলে, তাঁহার পুত্র হেমন্তসেন নদীয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সমস্ত দক্ষিণ রাঢ়ে তাঁহার রাজ-ক্ষমতা বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশিয়ারী (কাশীপুরী) নামে এক নগর স্থাপন করেন। অদ্যাপি ঐ নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হেমন্তসেনের বিপুল বিক্রম দর্শনে কলিঙ্গরাজ তাঁহার সহিত মৈত্রীস্থাপন করেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বিজয়সেন নদীয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বিজয় সেন।—বিজয় সেনও একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং নবদ্বীপই তাঁহার রাজধানী ছিল।[৫] তাঁহার সময় হইতেই সেনবংশের রাজ্যবিস্তৃতির সূত্রপাত হয়। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই গৌড় নগর, মিথিলা এবং নেপালের অধিপতি নান্যবীরকে পরাজিত করিয়া সমস্ত বাঙ্গালা বিহার কামরূপ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি স্থানে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন,[৬] এবং গৌড়েও রাজধানী স্থাপন করিয়া পঞ্চগৌড়েশ্বর

(৪) Samanta Sen a feudatory Raja of Karnata, after being repeatedly defeated by his overlord, fled to Bengal, where he founded a small colony on the banks of the Bhagirathi. This colony was probably founded at Nabadwip. (A School History of India, p 34 by H. P. Sastri.)

(৫) J. A. S. B. (N. S.) 1908, p. 285.

মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইর জর্ণালে লিখিয়াছেন,—

“Vijayapura is apparently to be indentified with Nudiah (Nadia or Navadwip), which was the capital of Lakhmaneya at the time of Mahammad-i-Bakhtyar. Is this name connected in any way with Vijayasena, grandfather of Laksmanasena ?”

(৬) ত্বংনান্যবীর বিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং শ্রুত্বান্যথামননরূঢ়ঃ নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥২০

(দেবপাড়াপ্রাপ্ত—বিজয় প্রশস্তি)

উপাধিতে আপনাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নান্য, বীর, রাঘব ও বৰ্দ্ধন নামধেয় ভূপতিগণকে পরাজিত করেন।[৭]

দেবপাড়া-প্রাপ্ত বিজয়-প্রশস্তিতে বিজয়সেনের রাজ্যশাসনের কাল সম্বন্ধে কিছু লিখিত হয় নাই। ডাক্তার বুলার সাহেবের দৃষ্ট তামিল ভাষায় লিখিত শিলালিপি অনুসারে (Proceedings, A. S. B. 1876, p. 108) কলিঙ্গরাজ কোলতুঙ্গ চোলদেব ১০৯২ খৃঃ অব্দে গৌড়রাজ মহীপালকে পরাজিত করেন। রাজা বিজয়সেন গৌড় জয় করিয়া, কলিঙ্গ-পতি কোলতুঙ্গকে জয় করেন। তাহা হইলে, আমরা বিজয়সেনকে ১০৯২ খৃঃ অব্দে বৰ্ত্তমান দেখিতে পাই। আবার, নান্যদেব কর্ণাটবংশধ্বংস-প্রবৰ্ত্তক নেপালের প্রথম রাজা ছিলেন। তিনি ১০১৯ শকে (১০৯৭ খৃঃ অব্দ) বৰ্ত্তমান ছিলেন (Epi. Indi. Vol. I, p. 313)। বিজয়সেন নান্যদেবকে পরাজিত করায়, তাঁহাকে ১০৯৭ খৃঃ অব্দেও বৰ্ত্তমান দেখা যায়। অতএব বিজয়সেন ১০৯২ খৃঃ অব্দ হইতে ১০৯৭ খৃঃ অব্দ পৰ্য্যন্ত নিঃসন্দেহে বৰ্ত্তমান ছিলেন।

মহারাজ বিজয়সেনের পরলোক প্রাপ্তির পর, তাঁহার ভুবন-বিখ্যাত পুত্র মহারাজ বল্লালসেন নবদ্বীপ রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

বল্লাল সেন।—বল্লালসেন ১০৯৭ খৃঃ অব্দের পর রাজা হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন মাত্র। বল্লালসেনকে পিতৃহীন ও বালক দেখিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালের রাজা কুমারপাল তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া গৌড়নগর উদ্ধার করিয়া লইলেন। কুমারপালের পর তদীয় পুত্র গোপাল ও গোপালের পুত্র মদন পাল যথাক্রমে গৌড়ে রাজত্ব করেন। বল্লাল নবদ্বীপের রাজধানীতে থাকিয়া সৰ্ব্বদাই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেন। বিজয়শ্রী কখন বল্লালের কখন বা পাল রাজাদিগের আশ্রয় লইতেন। বল্লাল কিন্তু ছাড়িবার পাত্র

(৭) দেবপাড়াপ্রাপ্ত বিজয়প্রশস্তি—২১ শ্লোক।

ছিলেন না। রাঢ়দেশীয় দাসগোষ্ঠীপতি নরোত্তম দাস তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বল্লালসেন তাঁহার সাহায্যে গৌড়নগর উদ্ধার করিয়া লইলেন। গৌড় অধিকার ও দৃঢ় করিয়া লইয়া তিনি পালরাজাদিগের রাজধানী বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালনগর অধিকার ও তথায় জয়স্তম্ভ-স্বরূপ একটী রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ রামপালের কিঞ্চিৎ উত্তরে 'বাড়ী বল্লালসেন' বলিয়া দর্শিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে যে বল্লালসেনের জয়স্কন্ধাবার ছিল তাহা সীতাহাটী-প্রাপ্ত বল্লাল-সেনের তাম্র-ফলকে দেখিতে পাওয়া যায়।[৮]

যাহা হউক বল্লালসেন অল্পদিনের মধ্যেই পিতৃরাজ্যগুলি স্ববশে আনিলেন। উত্তরে রংপুর ও কামরূপ, পূর্ব্বে ত্রিপুরা, পশ্চিমে মিথিলা ও কাশী পর্য্যন্ত প্রদেশ-সকলই তাঁহার বশে আসিয়াছিল। বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটীর রাজারা তাঁহার অধীনে ছিলেন। কিন্তু সে অধিকার বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় নহে। কোন রাজাকেই স্বাধিকারচ্যুত হইতে হয় নাই। এই পরাজয়ের পর তাঁহারা সার্ব্বভৌম রাজাকে কর দিতেন মাত্র। রাজ্য-মধ্যে পূর্ব্বে তাঁহাদের যে ক্ষমতা ছিল, এই পরাজয়ের পরও সেই ক্ষমতা রহিল। প্রজার সহিত সার্ব্বভৌম রাজার কোন সম্বন্ধ থাকিত না। প্রজার নিকট কর আদায় ও বিচারাদি সমস্ত বিষয়ই তদ্দেশীয় রাজার অধিকারে ছিল। ফলে এই জয়-পরাজয়ে প্রজারা কিছুই অনুযোগ করিতে পারিত না।

অধিকৃত রাজ্যগুলি সুশাসনে রাখিবার জন্য মহারাজ বল্লালসেন সমস্ত রাজ্যকে মিথিলা, রাঢ়, বরেন্দ্র, বগড়ি ও বঙ্গ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি কখন গৌড়ে, কখন নবদ্বীপে, কখন বা বিক্রম-

(৮) স খলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীবিজয়-সেনদেব পাদানুধ্যাৎ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজশ্রী মদ্বল্লালসেনদেবঃ কুশলী। (সীতাহাটীপ্রাপ্ত তাম্রফলক)

পুরে বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তার দ্বারা ঐ সকল প্রদেশ শাসিত হইত।

মহারাজ বল্লালসেন যেমন রাজ্যবিস্তার করিয়া অসাধারণ বলবীর্য্য দেখাইয়া গিয়াছেন, হিন্দু-সমাজের উপরও তাঁহার তেমনই ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। রাজ্য-বিস্তার করিয়া ও রাজধানী সুশাসনে রাখিয়া তিনি সমাজ-শাসনে অবসর পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে আদিশূর আনীত পাঁচজন ব্রাহ্মণ হইতে ১১০০ ঘর ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, এবং সেই এক ব্রাহ্মণ আবার রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাঢ়দেশবাসী ৬৫০ ঘর রাঢ়ী এবং বরেন্দ্রভূমি-নিবাসী ৪৫০ ঘর বারেন্দ্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আচার-ব্যবহারে ব্রাহ্মণেরা বিশিষ্টরূপে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। যে মহৎ কার্য্যের জন্য তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আনীত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তাহার অনেক গুণের অভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। মহারাজ বল্লালসেন ব্রাহ্মণগণের এই অবনতি দর্শনে তাহাদিগের মধ্যে যাহাতে সদাচার রক্ষিত হয়, তজ্জন্য কৌলীন্য স্থাপন করেন। তিনি এক মহতী সভা করিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণকে সেই সভায় আহূত করেন, এবং সেই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ ও দানসম্পন্ন তাঁহাদিগকেই কুলীন উপাধিতে ভূষিত করেন।[১]

তিনি এই কুলীনদিগের মধ্যে সদাচার রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিলেন। কুলাচার্য্যগণ কুলীনদিগের মধ্যে দোষাদোষ অবধারণ ও কীর্ত্তন করায় কুলীনগণ উঁহাদের ভয়ে কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। যাঁহারা ঐ নবগুণবিশিষ্ট নহেন অথচ সদাচারী

(১) ছান্দড় বংশের কানু, কুতূহল, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও শিরো; দক্ষের বংশে—বহুরূপ, বঙ্গাল, শুচ, অরবিন্দ ও হলায়ুধ; শ্রীহর্ষের বংশে—উৎসাহ, গরুড় ও বিষ্ণু; বেদগর্ভের বংশে—শিশু গাঙ্গুলী এবং ভট্টনারায়ণের বংশে—ঈশান, জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, মকরন্দ ও কমল এই ১৯ জন সর্ব্বপ্রথম কৌলীন্য প্রাপ্ত হন।

পণ্ডিত তাঁহারা সচ্ছোত্রীয় বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে—ব্রাহ্মণ কেন, সকল বর্ণের মধ্যেই—যাহাতে বিদ্যা, শুচিত্ব, ধর্ম্ম ও কুলমর্য্যাদা রক্ষিত হয়, সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই মহারাজ বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথা স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত প্রথা গুণানুসারী না হইয়া বংশানুগত হওয়ায় ভবিষ্যতে উহা বড় কুফল প্রসব করিয়াছে। কুলীন সন্তানগণ বংশগৌরবে অভিমানী হইয়া, অনেকেই কৌলীন্যগুণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

মহারাজ বল্লাল শুধু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই সমাজ-শাসন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। অপর বর্ণের মধ্যেও তাঁহার প্রচলিত সামাজিক নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। তিনি কোন শ্রেণীর জল আচরণীয়, কোন শ্রেণীর জল অনাচরণীয় বলিয়া সমাজকে অনেক উচ্চ নীচ ভাগে বিভক্ত করিয়া যান। বল্লালের সময় তিনটী রাজধানী ছিল—গৌড়, নবদ্বীপ ও বিক্রমপুর। কোন রাজধানীতে বসিয়া তিনি এই কৌলীন্য প্রথা স্থাপিত করেন তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কুলীনদিগের বাস রাঢ়-প্রদেশে ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলিয়া, খড়দহ প্রভৃতি প্রধান মেলের কুলীনগণও গঙ্গাতীরবাসী। আরও, হরিমিশ্র ও এড়ুমিশ্রের গ্রন্থে জানিতে পারা যায় যে, মুসলমানদিগের অত্যাচারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নবদ্বীপ হইতে উঠিয়া, পূর্ব্ববঙ্গ ও উড়িষ্যায় গিয়া বাস করেন। এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপই মহারাজ বল্লালসেনের জন্মভূমি। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নবদ্বীপের রাজধানীতে বসিয়া যে কৌলীন্য প্রথা স্থাপিত হইয়াছিল তাহাই প্রতীতি হয়।*

বল্লালসেন যেমন বীর, রাজ্যশাসনে দক্ষ ও সমাজের হিত-সাধক ছিলেন, তেমনই বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি নিজে

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের লেখক গৌড়ের রাজধানীতে বসিয়া কৌলীন্য-প্রথা স্থাপিত হওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন, এবং তাৎকালিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বিদ্যার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট উৎসাহদান করিতেন।

মহারাজ বল্লাল 'দানসাগর' নামে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে বল্লালকৃত একখানি দানসাগর পুস্তক আছে। উক্ত পুথিতে তাহার রচনাকাল এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"নিখিল-চক্রতিলক শ্রীবল্লালসেনদেবেন পূর্ণে
শশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ॥"

এই লিপি-অনুসারে আমরা দানসাগরের রচনাকাল ১০৯১ শক প্রাপ্ত হই। কিন্তু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়, এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে সময়প্রকাশ নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া দানসাগরের রচনাকাল ১০১৯ শক নির্ণয় করিয়াছেন। যদি সময়প্রকাশ গ্রন্থে 'নবশশিদশ' এইরূপ পাঠ থাকে তবে সে পাঠ প্রকৃত কিনা সন্দেহ। দানসাগর পুস্তক অতি বিরল। এসিয়াটিক সোসাইটিতে একখানি ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গ্রন্থাগারে একখানি দানসাগর পুস্তক আছে। কিন্তু এই উভয় পুস্তকেই দানসাগরের রচনাকাল নির্দ্দেশক কোন শ্লোক নাই। পরন্তু দানসাগরের রচনাকাল ১০১৯ শকও গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কারণ বল্লালসেন ঐ সময়ে যুবক, ও পিতৃবিয়োগে পালরাজাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। যাহা হউক, এই গ্রন্থে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও বহুদর্শিতার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়।

বল্লালসেন শেষ বয়সে "অদ্ভুত সাগর" নামে আর একখানি পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি ঐ গ্রন্থ শেষ করিতে পারেন নাই। উহা শেষ করিবার জন্য তিনি স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনকে অভ্যর্থনা করিয়া যান।

"শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেঽদ্ভুতসাগরং
গৌড়েংদ্রকুঞ্জরালান স্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ॥

গ্রন্থেঽস্মিন্নসমাপ্ত-এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষামহা
দীক্ষাপর্ব্বনি দীক্ষনান্নিজ-কৃতের্নিষ্পত্তিমভ্যর্থ্য সঃ
নানাদানচিতাংবু সংচলনতঃ সূর্য্যাত্মজাসংগমং
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥"

উক্ত শ্লোকে স্পষ্টই প্রকাশিত আছে যে, বল্লালসেন ১০৯০ শকে অদ্ভুতসাগর রচনা আরম্ভ করেন, এবং রচনা শেষ করিতে না পারিয়া স্বীয় পুত্রকে শেষ করিবার জন্য অভ্যর্থনা করিয়া গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে নির্জরপুর (স্বর্গ) গমন করিলেন, এবং তাঁহার ভার্য্যা সহমৃতা হইলেন। অদ্ভুত-সাগরের এই শ্লোকে বুঝিতে পারা যায় যে, বল্লালসেন ১০৯০ শকে বা তাহার পরেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, ১০৯১ শকে দানসাগর রচনায় বিরোধ ঘটে। অদ্ভুতসাগরের পাঠ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। যাহা হউক বল্লালসেন যে ১০৯০ শক (১১৬৮ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

বল্লালসেনের নবদ্বীপে বাস করিবার কালে—কথিত আছে যে, তিনি এক অজ্ঞাতকুলশীলা শীলাবতী নাম্নী কোন পদ্মিনী রমণীর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন। এই কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় কৌলীন্য-প্রবর্ত্তক বল্লালসেনের সমাজে বড় অপ্রতিষ্ঠা হইল। পরে ঐ নববিবাহিতা পত্নী নীচজাতীয় ডোমের কন্যা প্রকাশিত হওয়ায় মহারাজ বল্লালসেন ভূগর্ভে এক গৃহ নির্ম্মাণ ও তাহাতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যাদির সংস্থান করিয়া, তন্মধ্যে শীলাবতীকে রক্ষিত করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সমকালে বল্লালদীঘির নিম্ন দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। তৎকালে নদীর কূলভঙ্গ হেতু উক্ত অট্টালিকা মৃত্তিকা মধ্য হইতে বহির্গত ও নদীগর্ভে পতিত হইতে অনেকেই দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ গৃহাদিকে 'শীলা ডোমনীর গৃহ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

বল্লালসেন নবদ্বীপ রাজধানীতে বাস করিবার সময়, অনেক ব্রাহ্মণ

পণ্ডিত তাঁহার সহিত আসিয়া নবদ্বীপে বাস করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঘটক-প্রবর মুলোপঞ্চানন তাঁহার গোষ্ঠীকথায় লিখিয়াছেন—

"মুক্তিহেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান।
জহ্নুনগরোত্তরে করে যে বাস স্থান॥
নিজ সভাসদে দেন নবদ্বীপে ঘর।
যে ইচ্ছিল গঙ্গাবাস কিম্বা দ্বিজেতর॥
ক্রমে নবদ্বীপ হ'ল বাণীর নিবাস।
পুণ্যতীর্থ বলি হৃদি সবার বিশ্বাস॥

(সম্বন্ধ-নির্ণয়—পৃঃ ৫৫৮)

উক্ত বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদ[১০] জান্নগরের উত্তরে সামন্তদ্বীপ বা সিমুলিয়ায় ছিল, এবং নিজ সভাসদ্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে তিনি নবদ্বীপে বাস করিতে দেন।

(১০) In the village (Bamanpukur) there is a large mound which is called Ballaldhibi and is believed to be all that is left of the palace of Ballal Sen; and near by is a tank which is called Ballal dighi.—Bengal District Gazetteer, Nadia, p. 165.

এখনও পর্য্যন্ত বল্লালঢীবি বল্লালের স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। সুদীর্ঘ কাল প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া ও ভাগীরথী কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াও যাহা অবশিষ্ট আছে—তাহাও অন্ততঃ ২০ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া আছে। ইহার পশ্চিম অংশ ভাগীরথী গ্রাস করিয়াছেন, সেই স্থানের উচ্চতা এখনও প্রায় ১৬ হাত হইবে। ইহা ক্রমশঃ ঢালু হইয়া উত্তর পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে। ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড় এত উচ্চ যে সেই স্থান দিয়া উপরে উঠা যায় না। ৭০।৮০ বৎসর পূর্বে গঙ্গার ভাঙ্গনে শুনা যায় উহার মধ্য হইতে প্রকোষ্ঠ প্রকাশিত হইয়াছিল, এখনও উহার অভ্যন্তরে প্রকোষ্ঠ বর্ত্তমান আছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার বহু অংশ গঙ্গা গ্রাস করিয়াছেন তাহা বলিয়াছি—আর কত অংশ যে মানুষ স্বেচ্ছায় নষ্ট করিয়াছে তাহার হিসাব নাই। কৃষ্ণনগরের রাজগণ এই স্থান হইতে বহু প্রস্তর খণ্ড ও স্তম্ভ রাজবাটীতে লইয়া যান (ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত—পৃঃ ৫৩)। বামুনপুকুরের বিখ্যাত কাজী বংশের ফজলে খোদার মুখে শুনিয়াছি যে বর্ত্তমান কাজী বাড়ী ও বামুনপুকুরের বিখ্যাত জমীদার মোল্লাদিগের প্রাচীন বাড়ীর বহু ইষ্টকাদি উপকরণ ঐ ধ্বংসস্তূপ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও চাঁদ কাজী সাহেবের সমাধি অঙ্গনে হিন্দু কারুকার্য্যশোভিত দুই খণ্ড

বল্লালসেন এইরূপে প্রবল-প্রতাপে ৬০।৬২ বৎসর রাজ্য ও সমাজ শাসন করিয়া স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনদেবকে একমাত্র উত্তরাধিকারী রাখিয়া ১০৯০ শকে (১১৬৮ খৃঃ অব্দে) প্রয়াগে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে দেহত্যাগ করেন।

লক্ষ্মণসেন।—পিতৃবিয়োগে মহারাজ লক্ষ্মণসেন ১০৯০ শকে (১১৬৮ খৃঃ অব্দে) গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পিতা বর্ত্তমানেই তিনি গৌড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এক্ষণে স্বয়ং রাজা হইয়া স্বীয় নামানুসারে গৌড়নগরের নাম লক্ষ্মণাবতী রাখিলেন। এই সময় হইতে গৌড় লক্ষ্মণাবতী নামে প্রসিদ্ধ হইল।

লক্ষ্মণসেন যখন রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন, তখন তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। ল সং বলিয়া এক অব্দ প্রচলিত আছে। মিথিলার রাজা শিবসিংহ তাঁহার সভাপণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরকে বিস্ফি-নামক যে গ্রাম দান করেন, সেই দানপত্র ল সং "বহ্নিগ্রহদ্বাঙ্কিতে" অব্দে, অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের ২৯৩ অব্দে প্রদত্ত হয়; এবং উহার শেষে ঐ অব্দের সমকাল

প্রস্তর পড়িয়া আছে। শুনিয়াছি এখান হইতে ঐরূপ এক খণ্ড প্রস্তর ত্রিপুরাধিপতি লইয়া গিয়াছেন। কাজী সাহেবের মুখে আমরা আরও শুনিয়াছি যে ঐ প্রস্তর দুই খণ্ড তাঁহাদের বাটীর ভিত্তিমূলে ছিল এবং এখনও বহু প্রস্তর তাঁহাদের ভিত্তিমূলে আছে। আমাদের মনে হয় মুসলমান বিজয়ের পর মুসলমানেরা ভারতের অন্যান্য স্থানে যেরূপ করিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ রাজধানীর ঐশ্বর্য্যসমূহ নষ্ট করিয়া, তাহার উপকরণে নিজেদের আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখনও এই ঢাঁপির মধ্যে নানা প্রকার মাপের ইষ্টক এবং প্রকাণ্ড ভগ্ন প্রস্তর পাওয়া যায়। ইহার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান সিমেণ্টের অনুরূপ এক জাতীয় মশলারও নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সকল ইষ্টকে অদ্যাপি একটুও লোণা লাগে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন মোল্লাসাহেব এই স্থান খনন করিয়া কতকগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সকোষ, একটী বাক্সে রক্ষিত জীর্ণ শাল ও রেশমী বস্ত্র এবং কয়েকটী রৌপ্য মুদ্রা পাইয়াছিলেন। (Vide, Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. II, p. 142.) যদি বাঙ্গালার কোন ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তি ইহার খননের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এই প্রাচীন প্রাসাদের উপকরণে বাঙ্গালার ইতিহাসের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত হইবে বলিয়া আশা করি। সম্প্রতি Archaeological Department ইহাকে সংরক্ষিত করিয়াছেন। বল্লালের দীঘি পূর্ণগর্ভ হইয়া আসিলেও তাহাতে সুবৃহৎ জলাশয়ের স্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

১৪৫৫ সংবৎ ও ১৩২১ শকাব্দ লিখিত আছে।[১১] সুতরাং উক্ত ল সং উহার ২৯৩ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৬২ সংবৎ, ১০২৮ শকাব্দ ও ১১০৬ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয় জানিতে পারা যাইতেছে। এই সময়ে মহারাজ বল্লালসেন গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এই জন্য কেহ কেহ উক্ত অব্দকে লক্ষ্মণসেনের অব্দ বলেন না। তাহারা বলেন উহা বল্লালসেন প্রচলিত করেন। ঐ বৎসর বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয়। বল্লালসেন স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের জন্ম বৎসর হইতে ল সং প্রচলিত করেন, এবং বল্লালের শেষ 'ল' ও সংবতের আদ্যক্ষর 'সং' লইয়া ল সং হয়। কেহ কেহ বলেন লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়া স্বীয় জন্ম বৎসর হইতে আপনার নামানুসারে ল সং প্রচলিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যিনিই ঐ অব্দ প্রচলিত করুন না কেন, উহা যে লক্ষ্মণসেনের জন্ম বৎসর হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। উহাতে জানা যায়, লক্ষ্মণসেনের জন্ম ১০২৮ শকে হইয়াছিল, এবং তিনি ১০৯০ শকাব্দে রাজাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল।

(১১) বিদ্যাপতির একটি মৈথিল কবিতায় দেখা যায় যে—

"অনলরন্ধ্র কর (২৯৩) লক্‌খণণরবাই সক সমুদ্দকর অগিনি সসী (১৩২৪)।"

অর্থাৎ, ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে বা ১৩২৪ শকে মিথিলাধিপতি মহারাজ দেবসিংহ দেবলোকে গমন করেন। (বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩১ পাদ টীকা) উক্ত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে লক্ষ্মণ সংবৎ ১০৩১ শকে (১১০৯ খৃঃ) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আবার, সন হইতে শকাব্দা ও ল সং আনয়ন করিবার জন্য মৈথিল ভাষায় একটী সঙ্কেতসূচক শ্লোক আছে—

"সনমহ লিখহুঁ শরশশিবাণ
সো শাকে জানহুঁ পরমাণ,
পুনি সন বাণইন্দ্রশর থোয়ে
বাঁকি বাএ ল সং বিলোএ॥"

অর্থাৎ, সনের অঙ্কের সহিত ৫১৫ যোগ করিলে শকাব্দা এবং সন হইতে ৫১৫ বিয়োগ করিলে ল সং পাওয়া যায়। এতদনুসারে ১১০৮ খৃষ্টাব্দে ল সং আরম্ভ হয়। (ভারতী, ১৩১৭ সাল, চৈত্র)

লক্ষ্মণসেন রাজা হইলেন। রাজ্য মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা হইল না। কামরূপ, ত্রিপুরা, পঞ্চকোটী প্রভৃতির অধীন সামন্ত রাজগণ তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিলেন। স্ব স্ব রাজ্যে তাহাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, দণ্ডবিধান, করসংগ্রহ ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অক্ষুণ্ণ রহিল। তাঁহারা লক্ষ্মণসেনকে কেবল সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিতেন, ও কিছু কিছু কর দিতেন মাত্র।

গৌড় ও বঙ্গদেশ লক্ষ্মণসেনের নিজ শাসনাধীনে রহিল। তাঁহার সময় এই রাজ্যের তিনটি রাজধানী ছিল—নবদ্বীপ, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী ও বিক্রমপুর। লক্ষ্মণসেন শেষ বয়সে নবদ্বীপেই বাস করিতেন। তিনি বড় শান্তিপ্রিয় রাজা ছিলেন—যুদ্ধ-বিগ্রহাদি একেবারেই ভালবাসিতেন না। রাজ্যশাসনের ভার পুত্র কেশবসেন ও ব্রাহ্মণদিগের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ হলায়ুধ তাঁহার প্রাড়্বিবাক, পশুপতি মন্ত্রী, বটুদাস প্রধান সেনাপতি এবং শ্রীধরদাস প্রধান কর-সংগ্রাহক ছিলেন। এইরূপে রাজ্য শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া মহারাজ লক্ষ্মণসেন বিদ্যাচর্চ্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময় রাঢ়ীয় কুলীন-সমাজে একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়। মহারাজ বল্লালসেন রাঢ়ীদিগের মধ্যে গুণানুসারে ১৯ জনকে কুলমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কে প্রধান কেবা অপ্রধান সে সম্বন্ধে তিনি কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে এই পদমর্য্যাদা লইয়া বিষম গোলযোগ বাধে। সকলেই আপনাকে প্রধান বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন; সুতরাং অন্যকে হীন বিবেচনায় বিবাহার্থ কন্যাদান বন্ধ হইয়া গেল। কুলীন-সমাজে মহান্ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এই সকল দেখিয়া, কুলীনদিগের গোলযোগের সুমীমাংসার জন্য মহারাজ লক্ষ্মণসেন এক সভার আহ্বান করিলেন, এবং সেই সভায় কুলমর্য্যাদায় সকলেই সমান বলিয়া স্থির হইল। ইহাতে

কুলীনদিগের মধ্যে সাম্য রক্ষিত হওয়ায়, লক্ষ্মণসেনের এই কার্য্য 'সমীকরণ' নামে প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বল্লালসেন শেষ বয়সে 'অদ্ভুতসাগর' নামে একখানি গ্রন্থ আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহা সমাপ্ত করিতে না পারিয়া নিজ পুত্রকে অভ্যর্থনা করিয়া যান।

"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ভূপতিরতিশ্লাঘ্যো যদুদ্যোগতো
নিষ্পন্নোঽদ্ভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমিভুজঃ।"

অর্থাৎ, যাঁহার উদ্‌যোগে বল্লালের 'অদ্ভুতসাগর' নামক গ্রন্থ নিষ্পন্ন হইল সেই ভূপতি শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেন অতি প্রশংসনীয়।

অদ্ভুতসাগর জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। ইহাতে গর্গ, পরাশর, বসিষ্ঠ, দেবল, কশ্যপ, নারদ, বিষ্ণুগুপ্ত, বরাহমিহিরাচার্য্য, স্কান্দ ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের নাম, এবং সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যবনেশ্বর নামক একজন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে বৃদ্ধ যবনাচার্য্যকৃত 'জাতক' নামে একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় পুস্তক বর্ত্তমান আছে। যবনেশ্বর জ্যোতিষ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। অদ্ভুতসাগর অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে ও বোম্বাই নগরে দুইখানি হস্তলিখিত অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ আছে। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার 'জ্যোতিস্তত্ত্বে' এই অদ্ভুতসাগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক জ্যোতিষীর গৃহে ইহার কোন কোন খণ্ড অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। নানা পণ্ডিতে তাঁহার রাজসভা পূর্ণ ছিল। তাঁহার সভামণ্ডপের দ্বারে প্রস্তর ফলকে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী লিখিত ছিল।

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥" (কবিরাজপ্রতিষ্ঠা)

গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি ও কবিরাজ (ধোয়ী) এই পাঁচ জন লক্ষ্মণসেনের সভায় রত্ন ছিলেন। এই সকল কবি ব্যতীত শূলপাণি, হলায়ুধ, ঈশান এবং পশুপতি তাঁহার সভায় প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা বা স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সেনাপতি-পুত্র শ্রীধরদাসও পণ্ডিত ও কবি মধ্যে গণ্য।

এই লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষ সময়ে রাজ্যতন্ত্রে এক মহান্ পরিবর্ত্তনের কথা শুনিতে পাই। শুনিতে পাই যে, মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার খিলিজি ১৮ জন মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হিজিরা ৬০০ বা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র লাক্ষ্মণেয় সেনের সময়ে নবদ্বীপ—নবদ্বীপ কেন বঙ্গদেশ জয় করেন। মার্শম্যান, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মুখে আমরা প্রথম এই কথা শুনি। তৎপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীই এই কথা অবগত ছিলেন না। তাঁহাদের পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা মুসলমানী "তবকাৎ-ই-নাসিরী" নামক পার্শী গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা জয়ের উক্ত কথা লিখিয়াছেন। আবু-ওমার মিন্হাজ্-উদ্দিন গীর্জানী উক্ত পুস্তকের রচয়িতা। তবকাৎ-ই-নাসিরী হিজিরা ৬৫৮ বা ১২৬০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে। উহাতে বাঙ্গালা জয়ের কাল হিজিরা ৬০০ (১২০৩ খৃঃ অঃ) লিখিত আছে। সুতরাং বাঙ্গালা জয়ের ৫৮ বৎসর পরে ঐ পুস্তক লিখিত হইয়াছে। মিন্হাজ্-উদ্দিন লিখিয়াছেন যে সেই সময়ে যাঁহারা বাঙ্গালা জয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন এমন ব্যক্তির (সাম্সাম্-উদ্দিন) মুখে শুনিয়া তিনি ঐ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার সার-মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল :—

"বিহার জয়ের পর বৎসর মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তখন নদীয়ায় রায় লখ্মনিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। রাজধানীর অদূরে গোপনে দলবল রাখিয়া আঠার জন[১২] মাত্র অশ্বারোহী লইয়া নদীয়া নগরে উপস্থিত হইয়া-

ছিলেন। নগরবাসিগণ প্রথমে তাঁহাকে অশ্ববিক্রেতা বণিক্ মনে করিয়া তাহাদের গতিরোধ করিল না। বখ্‌তিয়ার অবাধে রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া অতর্কিত ভাবে প্রহরিগণকে আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে রায় লখ্‌মনিয়া আহার করিতেছিলেন। হঠাৎ আক্রমণ-সংবাদ পাইয়া কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি পুরমহিলাগণ, ধনরত্নসম্পদ্, দাস-দাসী পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া বঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের বিপুল সৈন্যদল আসিয়া নদীয়া রাজধানী লুণ্ঠন ও অধিকার করিয়া বসিল।"[১৩]

মিন্‌হাজ্‌-উদ্দিন রায় লখ্‌মনিয়ার জন্ম সম্বন্ধে এক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। তাহা এই রূপ—"রাজা লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুকালে তৎপুত্র লাক্ষ্মণেয় মাতৃগর্ভে ছিলেন। আসন্নপ্রসবা হইলে রাণী দৈবজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ-দিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গর্ভস্থ সন্তানের অদৃষ্টলিপি কি রূপ?' দৈবজ্ঞগণ গ্রহনক্ষত্রের অবস্থিতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বলিলেন,—'যদি সন্তান এক নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তাহার ভাগ্যে কষ্টের একশেষ ঘটিবে, কিন্তু সেই নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তের পর ভূমিষ্ঠ হইলে সে দীর্ঘ কাল রাজ্যসুখ ভোগ করিবে।' রাণী তাঁহার অনুচরগণকে আদেশ করিলেন,—'তাঁহার সন্তান-প্রসবে যাহাতে বিলম্ব ঘটে, তাহারা যেন সর্ব্ব-প্রযত্নে সেই উপায় অবলম্বন করে। ইহাতে যেন তাহারা তাঁহার জীবনের প্রতি দৃষ্টি না করে।' তাহাদের অবলম্বিত উপায় নিতান্ত রূঢ় ও নৃশংস হইয়াছিল। তাহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রসূতির তাহাতে জীবন শেষ হইল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে সিংহাসনে বসান হইল।"[১৪]

---

(১২) ষ্টুয়ার্ট সাহেব সতের জন অশ্বারোহীর কথা লিখিয়াছেন।
Stewart's History of Bengal (Bangabasi Edition), p. 47-48.

(১৩) Tabaqat-i-Nasiri (Translated by Raverty), p. 557-58.

(১৪) Ibid—p. 554.

পাঠকগণ, এখন উক্ত বিবরণ আলোচনা করিয়া দেখুন। মিন্‌হাজ-উদ্দিন নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি লোকমুখে শুনিয়া বঙ্গবিজয়ের বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি কোন পুস্তক বা চিঠি-পত্রের উল্লেখ করেন নাই। তিনি যাহাদের মুখে শুনিয়াছিলেন, তাহারা যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিল কিনা সন্দেহ। কারণ, সেই সময়ে যোদ্ধগণ সকলেই পরস্পর কলহে ব্যাপৃত ছিলেন, সর্ব্বদাই তাহাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি হইত।[১৫] ইহাতে কোন যোদ্ধা যে মিন্‌হাজের সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা বোঝা যায় না। সুতরাং মিন্‌হাজ্‌-উদ্দিন যে প্রকৃত লোকের মুখে শুনিতে পান নাই তাহাও বুঝিতে পারা যায়। তিনি নিজেও কখন নবদ্বীপে আসেন নাই। তিনি ঘটনার ৫৮ বৎসর পরে শুনা-কথার উপর নির্ভর করিয়া যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভ্রান্তিমূলক, সুতরাং অবিশ্বাস্য।

মিন্‌হাজ্‌-উদ্দিনের উক্তি যে সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত ও মিথ্যা তাহা দেখাইতেছি—

প্রথমতঃ, সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই যে লক্ষ্মণসেন ১১২৭ শক (১২০৫ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। অতএব ১২০৩ খৃঃ অব্দে নবদ্বীপ জয়ের কথা যাহা মিন্‌হাজ্‌-উদ্দিন লিখিয়াছেন তাহার সত্যতা রক্ষিত হয় না। সদুক্তিকর্ণামৃত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জীবিতকালে রচিত হইয়াছিল, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, মিন্‌হাজ্‌-উদ্দিন লাক্ষ্মণেয় সেনের জন্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অলীক। ১২০৩ খৃঃ অব্দে বখ্‌তিয়ার লাক্ষ্মণেয় সেনকে পরাজিত করেন; কিন্তু ১২০৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার পিতা লক্ষ্মণসেন জীবিত। সুতরাং লাক্ষ্মণেয় সেনের জন্ম সম্বন্ধে যে বিবরণ

(১৫) Ibid—p. 573-76.

লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রকৃত।

তৃতীয়তঃ, মিন্‌হাজ্‌-উদ্দিন লিখিয়াছেন যে, বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণসেনের পুত্র লাক্ষ্মণেয় সেনকে[১৬] পরাজিত করেন। লাক্ষ্মণেয় (লাচ্‌মানিয়া) বলিলে লক্ষ্মণের পুত্রকে বুঝায় বটে, কিন্তু নামকরণ কালে কখন ঐ নাম রক্ষিত হয় না। লাক্ষ্মণেয় বলিলে লক্ষ্মণসেনের সকল পুত্রকেই বুঝাইবে। বাস্তবিক লক্ষ্মণসেনের কোন পুত্রের নাম লাক্ষ্মণেয় ছিল না—তাঁহার দুই পুত্র কেশবসেন ও মাধবসেন। লক্ষ্মণসেনের পুত্রের সময়েই গৌড় মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। মিন্‌হাজ্‌-উদ্দিন যাহাদের মুখে শুনিয়াছিলেন, তাহারা রাজার নাম ভুলিয়া গিয়া লক্ষ্মণসেনের পুত্র এই পর্য্যন্ত মনে করিয়া রাখিয়াছিল বুঝিতে পারা যায়। যাহারা রাজার নামটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহারা যে অন্য বিষয়ে যথেচ্ছ কাল্পনিক উক্তি করিয়াছিল—সন্দেহ কি!

চতুর্থতঃ, মিন্‌হাজ্‌-উদ্দিন ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজির বঙ্গজয়ের কথা যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অপ্রকৃত। মিন্‌হাজের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি দূতচ্ছলে[১৭] রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন মাত্র। পরে বন হইতে অবশিষ্ট মুসলমান সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া নগর আক্রমণ করিল; তাহারা মুসলমানবিরোধী বহুসংখ্যক হিন্দুর প্রাণবিনাশ করিয়া নগর ও রাজপুরী অধিকার করিল। এখানে 'মুসলমানবিরোধী' এই কথা থাকায়, হিন্দু-মুসলমানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, ১৮ জনে নবদ্বীপ নগর অধিকার করিতে পারে নাই, তাহা সুস্পষ্টই

---

(১৬) Tabaqat-i-Nasiri—p. 554 (foot-note); Ayeen Akbery, Pt. I, The Soobah of Bengal, p. 310; Stewart's History of Bengal, p. 45.

(১৭) On passing the guards, he (Bakhtyar) informed them that he was an envoy, going to pay his respects of their master. (Stewart's History of Bengal, p. 47.)

প্রকাশিত আছে। অতএব, ১৮ জন মাত্র সৈন্যে নদীয়া নগর অধিকারের কথা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কত দূর সত্য তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

একটু ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বখ্‌তিয়ার খিলিজির নদীয়া (নবদ্বীপ) আগমনের বিবরণ যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা বুঝিতে পারা যায়। লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় নগর তৎকালে বঙ্গদেশের প্রধান রাজধানী ছিল। এই নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবান্বিত ছিল। বিজেতৃগণ এই নগরের অধিপতি হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই লোলুপ থাকিতেন। লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় অধিকার করিয়া গৌড়েশ্বর এই সম্মানিত উপাধিভূষণে মণ্ডিত হইবার জন্য সকলেই উৎসুক হইতেন। এমন কি, মহারাজ আকবর শাহাও ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইয়া গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন। গৌড় জয় হইলেই বঙ্গ-বিজয় হয়—এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিন্‌হাজের প্রবন্ধে দেখিতে পাই যে, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বিহার জয় করিয়া বঙ্গবিজয়ের জন্য অনুসন্ধান লইতেছিলেন, এবং বাঙ্গালার অরক্ষিত অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন।[১৮] বাস্তবিক এই সময়ে লক্ষ্মণাবতী নগরী অরক্ষিত অবস্থাতেই ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লক্ষ্মণসেন শেষ সময়ে নবদ্বীপে বাস করিতেন, এবং তাঁহার পুত্র কেশবসেন গৌড় ও বিক্রমপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যে সময়ে বখ্‌তিয়ার খিলিজি বিহার আক্রমণ করেন, সেই সময়ে কেশবসেন বিক্রম-পুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুতরাং নবদ্বীপ ও বিক্রমপুর অরক্ষিত নহে। তখন বঙ্গদেশের সেই শ্রেষ্ঠ রাজধানী লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে রাজা বা রাজপুত্রের অবস্থান দেখা যায় না। বখ্‌তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতীর এই রূপ অরক্ষিত অবস্থা জানিতে পারিয়াও সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর অগ্রে আক্রমণ না করিয়া অতি দূরস্থিত দুর্গম ও কুটিল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক নবদ্বীপ-জয়ে

(১৮) Tataqat-i-Nasiri (Raverty)—p. 557.

গমন করিয়াছিলেন, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। তিনি আদৌ নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন কিনা তাহাতে সম্পূর্ণ সন্দেহ বর্ত্তমান। বখ্‌তিয়ার যেরূপ হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন, তাহাতে নবদ্বীপে আসিয়া তিনি কেবল হস্তী কয়েকটি লইয়া গেলেন, অথচ নবদ্বীপে দেবমন্দিরাদির প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলেন না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। বখ্‌তিয়ার কোন পথে নদীয়া আসিয়াছিলেন মিন্‌হাজ্‌ তাহারও কোন বিবরণ দেন নাই।

মুসলমানদিগের ভারত-আক্রমণ কালের যুদ্ধপ্রণালী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা সর্ব্বত্র ছলনা ও চাতুর্য্যের আবরণে যুদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ যুদ্ধপ্রণালী ভারতীয়দের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে হিন্দুদের পরাজয়ের ইহাও একটী কারণ। বখ্‌-তিয়ার গৌড়ের অরক্ষিত অবস্থা জানিতে পারিয়া, বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন। গৌড়ে নগর-রক্ষার্থে যে কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি আক্রমণকারীদিগকে বিশেষ কোন বাধা দেন নাই। সুতরাং নামমাত্র যুদ্ধে বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন, এবং সেই স্থানের দেবমন্দিরাদি ভগ্ন করিয়া হিন্দুবিদ্বেষের পরিচয় দিয়া লক্ষ্মণা-বতীর অন্তর্গত দেবকোটে আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশেই তাঁহার অধিকার ও আধিপত্যের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিলে, বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপ জয়ের বিবরণ যে সব অলীক তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

আমরা সম্বন্ধনির্ণয়ধৃত হরিমিশ্রের কারিকায় দেখিতে পাই—

"বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূৎ মহাশয়ঃ।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ॥
মতিং নাপ্যকরোৎ দ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াৎ ততঃ।
ন শক্‌বন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং তদা পুনঃ॥"

উক্ত কারিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশব

সেন যবনভয়ে গৌড় (লক্ষ্মণাবতী) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং, বখ্‌তিয়ার খিলিজি যখন বিহারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন গৌড় নগর অরক্ষিত ছিল। অতএব, মুসলমানগণের আক্রমণ লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের সময়ে হইয়াছিল। কেশবসেন গৌড়েই রাজত্ব করিতে-ছিলেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতীই জয় করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপে আসেন নাই—ইহাই প্রতীতি হয়।

লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের আট বৎসর পরে বখ্‌তিয়ারের স্থলাভিষিক্ত হুসাম্‌-উদ্দিন বা গিয়াস-উদ্দিন ইউজের অধিকার-কালে গঙ্গার উত্তরে দেব-কোট ও দক্ষিণে লখনোর (বীরভূমে) পর্য্যন্ত ভূভাগ, মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।[১৯] তখনও নবদ্বীপ পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হয় নাই। লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ তখনও পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন।[২০]

বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয়ের (১২০৩ খৃঃ) পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ পরে নবদ্বীপ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, এবং এই বিজয়-কাহিনীর স্মরণার্থ বাঙ্গালার তদানীন্তন স্বাধীন সুলতান মুগীস্‌-উদ্দিন য়ুজবক্‌ বিজিত নবদ্বীপ ও বর্দ্ধনকোটের নাম সম্বলিত নূতন মুদ্রা অঙ্কিত করাইয়াছিলেন।[২১]

১২০৩ খৃষ্টাব্দে যদি গৌড় মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়া থাকে, তখন মহারাজ লক্ষ্মণসেন বর্ত্তমান। তিনি তাহা উদ্ধার করিবার কোন উপায় করিতে পারেন নাই। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ১০০ বৎসর হইয়াছিল। এই অতি বার্দ্ধক্যে যুদ্ধকার্য্য তাঁহার পক্ষে একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বহুদিবসাবধি কোন যুদ্ধাদি না ঘটায় তাঁহার সৈন্যদেরও বিলক্ষণ অলস ও বিলাসী হওয়া সম্ভব। ইহার অল্প দিন পরেই লক্ষ্মণসেন

(১৯) Ibid, p. 584-86.

(২০) Ibid, p. 558.

(২১) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, p. 146, No. 6.

দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র কেশবসেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের তিরোধান হইতে নবদ্বীপের রাজাসন চিরকালের জন্য শূন্য হইয়া পড়িল।[২২]

(২২) ইতিহাসবিদ্ আবুল ফাজল বর্ত্তমান নদীয়াকেই লক্ষ্মণসেণের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [**At that time (Luckmen's time) Nudcea (Nadiya) was the capital of Bengal, when it abounded with wisdom ; but now it is thinly inhabited, although it be still conspicuous for learning.—Ayeen Akbery Pt. I. The Soobah of Bengal, p. 310.**] কিন্তু গৌড়রাজমালা লেখক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এই নদীয়াকে 'রায় লখ্মনিয়ার' রাজধানী বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। গৌড়রাজমালা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, মিন্হাজ উদ্দিন বখ্তিয়ার কর্ত্তৃক পরাজিত গৌড়েশ্বরকে রায় লখ্মনিয়া এবং তাঁহার রাজধানীর নাম 'সহর নোদিয়া' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজমালালেখক 'রায় লখমনিয়া' নামের অপভ্রংশে লক্ষ্মণসেনের নাম বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রাজধানী 'সহর নোদিয়া' নগরটীকে এই নদীয়া বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পরন্তু নদীয়া শব্দটীকে কখন 'নোদিয়া' কখন বা 'নোদিয়াহ্'রূপে অনুবাদ করিয়া এই নদীয়া নগর হইতে পৃথক্ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যাহাই বলুন, বর্ত্তমান নবদ্বীপই ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের মানচিত্রেও 'সহর নদিয়া'রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রাজমালালেখক বলেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে লক্ষ্মণসেনের দুইটী রাজধানীর কথা উল্লেখ আছে। একটী বিজয়পুর ও অপরটী লক্ষ্মণাবতী। সংস্কৃত সাহিত্যে নদীয়ার নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং নদীয়া লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল না। গৌড়ের নাম লক্ষ্মণাবতী ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। এখন বিজয়পুর কোথায়? পবনদূত গ্রন্থে ধোয়ীকবি সুহ্ম বা রাঢ়দেশের বর্ণনা করিয়া "ভাগীরথী তপনতনয়া যত্র নির্য্যাতি দেবী" (৩৩) সেই মুক্তবেণী ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়া "স্কন্ধাবারং বিজয়পুর মিত্যুন্নতাং রাজধানীং" (৩৬) বলিয়াছেন। পবনদূতে রাঢ়দেশের বর্ণনায় ত্রিবেণীর পর বিজয়পুরের উল্লেখ করায়, বিজয়পুর যে রাঢ়দেশে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজমালালেখক নদীয়াকে বিজয়পুরের সহিত অভিন্ন স্বীকার করিয়া রাজসাহী জেলার অন্তর্গত 'বিজয় নগরকে' 'বিজয়পুর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব রাজমালার উল্লিখিত বরেন্দ্রভূমের 'বিজয়নগর' পবনদূতের উল্লিখিত বিজয়পুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

বর্ত্তমান নদীয়াই বিজয়পুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। মহারাজ বিজয়সেনের রাজধানী ছিল বলিয়া এই নগরই বিজয়পুর নামে অভিহিত হইত। (৪৮ পৃষ্ঠা পাদটীকা দ্রষ্টব্য) এই নদীয়ায় বেজপাড়া নামে একটী স্থান ছিল। ঐ স্থান গঙ্গার ভাঙ্গনে বহুদিন নদীগর্ভগত হইয়া গিয়াছে। গৌরাঙ্গদেবের কড়চা লেখক মুরারী গুপ্তের নিবাস এই বেজপাড়াতেই

নবদ্বীপে বৌদ্ধ প্রভাব

বুদ্ধদেবের সাম্য মৈত্রী ও করুণাপূর্ণ ধর্ম্মমতের মহাপ্লাবন যখন ভারত ছাড়াইয়া সুদূর চীন জাপান প্রভৃতি প্লাবিত করিয়াছিল, তখন নবদ্বীপে কি আর তাহা স্পর্শ করে নাই? বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই সে প্লাবন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা নিজ কৃতকার্য্যতার যে চিহ্নগুলি রাখিয়া গিয়াছে, ধরণী আজিও সেগুলি সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। সেগুলি বর্ত্তমানে সাধারণ চক্ষে সামান্য হইলেও ঐতিহাসিকের চক্ষে যথেষ্ট মূল্যবান। তাহারা এখনও বহু শতাব্দী পূর্ব্বের বিস্মৃত কাহিনী বলিয়া দিতেছে।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগরের মধ্যেও সেই মহাপ্লাবনের পরিচয় পাওয়া যায়। রাঢ়েও ইহার অভাব নাই। আমরা একে একে এই বৌদ্ধপ্রভাবযুক্ত স্থানগুলির আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান কালে নবদ্বীপ নগর ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি হিন্দু-প্রধান। ইহা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। এখানে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে; কিন্তু নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দেখিলে এই সকল দেবমূর্ত্তির অনেকগুলিকেই বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এখানকার অনেক ষষ্ঠী, শীতলা, শিব, মনসা ও মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবী বৌদ্ধ স্তূপ-চৈত্যাদির নামান্তর মাত্র।

ছিল। দেওয়ান মহাশয় লিখিত ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে ২১৮ পৃষ্ঠায় বামনপুখরিয়া ও নবদ্বীপের মধ্যে এক বেজপাড়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিজয়সেনের রাজপুরী নদীয়ার যে স্থানে ছিল তাহাই 'বিজয়পুর' বলিয়া উল্লিখিত হইত এবং তাহারই অপভ্রংশে 'বেজপাড়া' হইয়াছে বলিতে পারা যায়। অতএব এই নদীয়াই পবনদূতের উল্লিখিত 'বিজয়পুর' সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[পবনদূতের বিজয়পুর যে নদীয়া হইতে অভিন্ন তাহা প্রতিপাদনপূর্ব্বক নিখিলনাথ রায় মহাশয় "পবনদূতের বিজয়পুর কোথায়?" নামক যে সুবিস্তৃত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ ১৩৩০ সালের ১ম সংখ্যা সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য। ঐ প্রবন্ধে রাজমালা লেখকের মত খণ্ডিত হইয়া নদীয়াই যে বিজয়পুর তাহা সুচারুরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।]

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মহারাজ অশোকের সময় হইতে পাল-রাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত (খৃঃ পূঃ ২৫০—৯০০ খৃঃ অঃ) বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। পরে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নানা কারণে এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের খর্ব্বতা হইতে থাকে। ঐ সময় হইতেই নবদ্বীপে শূর ও সেনবংশীয় নরপতিদিগের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তাহা হইলে এস্থানে যে সকল বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেগুলি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল।

এই সকল মূর্ত্তি কোথায়, কি ভাবে, কি নামে স্থাপিত ছিল তাহা এখন ঠিক জানা যায় না। এগুলি মহারাজ অশোক বা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে তাঁহাদিগের দ্বারা বা অপর কাহারও দ্বারা কোন বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান কালে, কালপ্রভাবে এই বিহারগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পরিত্যক্ত হইলে, নবভাবাপন্ন লোকে বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহারের ভগ্ন প্রস্তরাদিতে হিন্দু আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক পূজা ও সমাদর করিয়া আসিতেছেন। এইরূপে কোন অতীত যুগে এক ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়া, ইতিহাসের উপরও এক মহান্ পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

নবদ্বীপে প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্ত্তিগুলির মধ্যে, পাড়ডাঙ্গার শিব, যুগনাথ, মালোদের শিবের নিকটস্থ ষষ্ঠীঠাকুরাণী, জয়দুর্গা ও দণ্ডপাণি বৌদ্ধভাবাপন্ন। আমরা একে একে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলিকে প্রধানতঃ এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা :— ১। পদমুখহীন কচ্ছপাকৃতি, ২। কচ্ছপাকৃতি, ৩। চৈত্যাকৃতি, ৪। লোড়াকৃতি, ৫। মুখত্রয়বিশিষ্ট চতুষ্কোণ বেদিকাকৃতি প্রভৃতি। সারনাথ, গৌড় প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলি কলিকাতার যাদুঘরে (Indian Museum) রক্ষিত আছে। তাহাদের তুলনায় নবদ্বীপে প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলির আকৃতিই তাহাদের বৌদ্ধত্বের পরিচয় দিয়া থাকে।

পাড়ডাঙ্গার শিব।—ইহা এক হস্তপদহীন কূর্ম্মাকৃতি প্রস্তর-খণ্ড। এই শ্রেণীর মূর্ত্তিগুলি শূন্য-জ্ঞাপক ও অতি প্রাচীন। এই প্রকারের মূর্ত্তি মহারাজ অশোকের সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণের মত। এই প্রস্তরখণ্ড নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পাড়ডাঙ্গা বা পাহাড়পুরে বারুজীবিগণ অন্যূন ২০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাপ্ত হন। পাড়ডাঙ্গার নামানুসারে শিবটীকে 'পাড়ডাঙ্গার শিব' বলা হয়। ইঁহাকে যুগনাথ শিবমন্দিরে রাখা হইয়াছে এবং এখানেই তিনি পূজা প্রাপ্ত হন।

যুগনাথ।—এক প্রকাণ্ড লোডাকৃতি প্রস্তরখণ্ড। এই শ্রেণীর মূর্ত্তিগুলিও অতি প্রাচীন কালে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ এগুলি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্ত্তি।—যুগনাথ শিবের মন্দিরে একটী ধাতুনির্ম্মিত পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্ত্তি পূজিত হইতেছিলেন। এই শ্রেণীর মূর্ত্তি বঙ্গদেশে ৫০টীর অধিক পাওয়া যায় নাই। ১৯৩০ খৃঃ ২২শে মার্চ্চ তারিখে বঙ্গদেশীয় আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কে, এন্, দীক্ষিত মহাশয় এই বুদ্ধমূর্ত্তিটি পরীক্ষার্থ লইয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠীঠাকুরাণী।—একখানি বৃহৎ উপলখণ্ডে ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি স্পষ্ট খোদিত আছে। করদ্বয় জানূপরি সংস্থাপিত। পদদ্বয়ের নিম্নভাগ হইতে কিছু অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটী সিংহ-মুখের ন্যায় অঙ্কিত আছে। এই দুইটী পঞ্জর চিহ্ন। এই প্রস্তরখণ্ডের অনুরূপ আর একখানি প্রস্তর দণ্ডপাণির মন্দির মধ্যে জয়দুর্গা নামে পূজিত হইতেছেন। জয়দুর্গা নামে আর একটী দেবী মিউনিসিপাল রোডের পার্শ্বে এক অশ্বত্থ তরুতলে অবস্থিত আছেন। তাহা একটী ভগ্ন প্রস্তর-স্তম্ভ মাত্র। সম্ভবতঃ এই স্তম্ভটী পাহাড়পুরের ভগ্ন বিহার হইতে আনীত।

দণ্ডপাণি।—একখানি বৃহৎপ্রস্তর-গাত্রে একটী হেটমুণ্ড দণ্ডধারী পুরুষ বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

দেখিলে বৌদ্ধশ্রমণমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। মহাদেবের নামের পর্য্যায়ে দণ্ডপাণি নাম দেখা যায় না। কাশীধামে দণ্ডপাণি নামে একটী শিব আছেন। তাঁহার আকৃতিও এইরূপ। কাশীধামে মহাদেবের দণ্ডপাণি নাম ধারণ সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে এক উপাখ্যান আছে। কিন্তু কাশীখণ্ড বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিকালে রচিত বলিয়া পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস। দণ্ডপাণি শব্দের প্রধান অর্থ যম বা ধর্ম্মরাজ অর্থাৎ বুদ্ধ। এই সকল কারণে ইহাকেও বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া আমাদের ধারণা।[১]

এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপে যে সকল প্রাচীন শিবমূর্ত্তি আছেন, তাঁহাদের কোনটীই লিঙ্গমূর্ত্তি নহেন। অধিকাংশই লোড়াকৃতি প্রস্তর মাত্র। সেই প্রস্তরগাত্রে লাক্ষাদ্বারা চক্ষু-মুখাদি অঙ্কিত করা হইয়াছে। এগুলিও হয় কোন বৌদ্ধমূর্ত্তি বা বিহারের ভগ্নাবশিষ্ট প্রস্তর খণ্ড। বৌদ্ধদিগের সময়েই আমাদের দেশে প্রস্তর-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়, এবং বৌদ্ধেরা প্রায়শঃ প্রস্তর-সাহায্যে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিতেন। এই জন্য ভগ্ন প্রস্তর-স্তম্ভাদি যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি ধ্বংসীভূত বিহার হইতে প্রাপ্ত বলিয়া আমাদের ধারণা।

এই সকল শিবের প্রধান পর্ব্ব "গাজন" চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বে সম্পন্ন হয়। "গাজন" পর্ব্বের উল্লেখ শাস্ত্রাদিতে নাই, এবং অন্য কোন শৈব-প্রধান স্থানেও ইহা সম্পন্ন হয় না। কেবল মালদহের "গম্ভীরা" ইহার অনুরূপ। 'গাজন' শব্দ ধর্ম্মগর্জ্জনের অপভ্রংশ। এই সকল শিবকে বৌদ্ধ মূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিবার ইহাও একটী কারণ।

পাড়ডাঙ্গা।—পাড়ডাঙ্গা নামে বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে এক অতিশয় উচ্চ ও ইষ্টকময় ভূমি আছে। নবদ্বীপ বন্যাজল-নিমজ্জিত হওয়ার প্রসিদ্ধি আছে, এবং সেইরূপ উচ্চ করিয়া রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে।

(১) এই মূর্ত্তিটী ১৩৩৮ সনের চৈত্র মাসে গাজনের সময় অঙ্গহীন হওয়ায় তদনুরূপ অন্য একটি মূর্ত্তি পূজিত হইতেছে।

কিন্তু এই স্থান এত উচ্চ যে, ইহাকে রেলপথের সহিত সমতল করিতে ইহার মাটী ৪।৫ হাত পরিমাণ কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। সমতল ভূমি অপেক্ষা ইহা ১৫ হইতে ২০ হাত উচ্চ। কিম্বদন্তী আছে, পাড়ডাঙ্গায় বৌদ্ধস্তূপ বা পাহাড় ছিল। বিহার শব্দের অপভ্রংশে পাহাড় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা চৈতন্যভাগবতাদি প্রাচীন গ্রন্থে নবদ্বীপের নিকটে পাড়ডাঙ্গা অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারি। আবার কোন কোন গ্রন্থে পাড়ডাঙ্গা পাহাড়পুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে।[২] পাহাড়পুর নামে দিনাজপুর ও রাজসাহী জিলাতেও দুইটী প্রাচীন স্থান আছে। সেই স্থানদ্বয়েও বৌদ্ধস্তূপ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বৌদ্ধস্তূপ বা পাহাড় থাকিবার জন্য ঐ স্থানগুলির পাহাড়পুর নাম-করণ হইয়াছে। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের সহর-নদীয়ার সর্ভে ম্যাপেও (Survey map) পাড়ডাঙ্গার অবস্থান চিহ্নিত আছে। অতএব উহার স্থান-নির্ণয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

নবদ্বীপে যে সকল বৌদ্ধপ্রভাব-বিশিষ্ট মূর্ত্তি ও ভগ্ন প্রস্তর-স্তম্ভাদি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি এই পাহাড়পুর বা পাড়ডাঙ্গার বিহার মধ্যে বিরাজিত ছিল। কালের বিধ্বংসী প্রভাববশে সেগুলি স্থানচ্যুত ও বিক্ষিপ্ত হইলে, লোকে আনিয়া তাহাদিগকে ইতস্ততঃ স্থাপিত করিয়াছে।

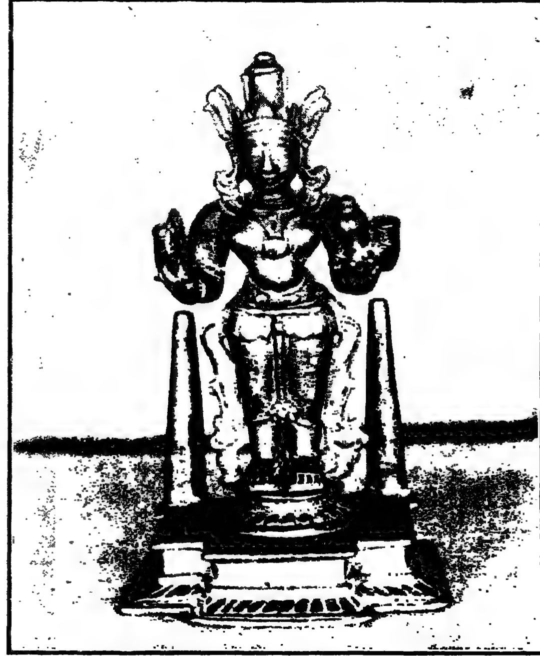
এই পাড়ডাঙ্গার প্রায় দুই মাইল দূরে, প্রাচীন গঙ্গাখাতের পশ্চিম-তীরে, কোবলা গ্রামে দুই খণ্ড প্রস্তর বাগ্দেবী নামে পূজিত হইয়া থাকে; এবং প্রতি বৎসর অম্বুবাচীতে সেই স্থানে একটী মেলা হয়। উহাদের

---

(২) সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে নবদ্বীপ রায়।
গাদিগাছা পাড়ডাঙ্গা আদি দিয়া যায়॥" চৈ, ভা।
"নবদ্বীপ মধ্যে স্থান যত।
এক মুখে তাহা বা কহিবে কেবা কত॥
তার মধ্যে কহি যে প্রধান।
চিনাডাঙ্গা পাটডাঙ্গা আদি রম্য স্থান।" পরিক্রমা পদ্ধতি।
"পাহাড়পুর নবদ্বীপ ত্বরিত বাহিয়া।
মৃজাপুরের ঘাটে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥" কবিকঙ্কণ।



পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্ত্তি।



বিষ্ণুমূর্ত্তি।

মধ্যে ক্ষুদ্রতর প্রস্তরখানি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ—তাহার শিরোদেশে সামান্য কারু-খচিত, অপর খানি পিঙ্গলাভ ভগ্ন স্তম্ভখণ্ড মাত্র। বোধ হয়, এই উপলখণ্ডদ্বয় পাড়ডাঙ্গার ভগ্ন বিহার হইতে নীত হইয়া থাকিবে।

সুবর্ণ-বিহার।—এই বৌদ্ধপ্রভাব কেবল নবদ্বীপেই আবদ্ধ নহে। নবদ্বীপ-মণ্ডলান্তর্গত অনেক স্থানেই এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগর হইতে স্বরূপগঞ্জ পর্য্যন্ত যে রাজপথ গিয়াছে, তাহার উত্তর ধারে স্বরূপগঞ্জ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে সুবর্ণ-বিহার অবস্থিত। ইহা একটী ধ্বংসীভূত স্তূপ। এই স্তূপ প্রায় ২ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত, এবং উচ্চতায় প্রায় ১০ হাত হইবে। ইহা ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডময়। ইহার উত্তর দিকের ভূমি বহু দূর পর্য্যন্ত প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। এই স্তূপের মধ্যস্থানে পুষ্করিণীর ন্যায় একটী প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। তাহার পরিমাণ প্রায় ৩ কাঠা হইবে, ও গভীরতাও ৮।৯ হাত হইবে। এই গহ্বরের চারি দিকে উচ্চ জঙ্গলাবৃত ভূমি ইহাকে বাঁধের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শুনিলাম যে, অতি বর্ষাতেও ইহার মধ্যে বৃষ্টিজল জমিয়া থাকে না—অল্পকাল মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায়।

এই গহ্বরের কেন্দ্রস্থলে একখণ্ড গোলাকার প্রস্তর প্রোথিত আছে। তাহার অল্পাংশই মাটীর উপর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার শিরোদেশ শিল-কুটানর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র-বিশিষ্ট। সেই জন্য মনে হয়, ইহার উপর অন্য প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত ছিল। পালসাহেব বাবুদিগের সুযোগ্য নায়েব ৺পঞ্চানন রায় মহাশয় এই প্রস্তরের মূলদেশ খনন করাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকে তুলিতে পারেন নাই। এই সকল কারণে মনে হয়, প্রস্তরখণ্ডটী বহুদূর পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত আছে।

"বিহার" শব্দ যে বৌদ্ধত্বের পরিচায়ক, সে আলোচনা পূর্ব্বেই করা গিয়াছে; অতএব "সুবর্ণ-বিহার" যে বৌদ্ধ বিহার, সে সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সুবর্ণ-বিহারের প্রাচীন ইতিহাস—

তাহার গৌরবের দিনের ইতিহাস আলোচ্য ও তাহার স্থাপনকাল নির্ণেয়। ইহার বর্ত্তমান অতি শোচনীয়, তাহা হইতে ইতিবৃত্তের উদ্ধার দুঃসাধ্য। তথাপি আমরা প্রাচীন গ্রন্থাদি ও কাহিনী-সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই ক্রমে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

সুবর্ণ-বিহারের ধ্বংসাবশেষ-স্তূপে অসংখ্য ইষ্টকখণ্ড ও প্রস্তরখণ্ডের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। কালে যে ইহাও প্রস্তর-নির্ম্মিত এক বিশাল পুরী ছিল, এস্থান হইতে স্থানান্তরিত ও ইহার মধ্যে প্রোথিত প্রকাণ্ড প্রস্তর-গুলিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই স্তূপ হইতে ইষ্টক লইয়া গিয়া গভর্ণমেণ্ট কৃষ্ণনগর গোয়াড়ির (গোবিন্দসরক) কোন কোন কাযে লাগাইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে নদীয়ার মহারাজারা কতকগুলি প্রস্তর লইয়া যান ও এখানকার বহু ইষ্টক তাঁহাদের গঙ্গাবাসের প্রাসাদনির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। এই স্তূপের অদূরেই সুবর্ণ-বিহার পল্লী। সেখানকার বার-ইয়ারী তলায় এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। ইহার আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৪ হাত, বিস্তার ১৷৷৹ হাত ও বেধ ১ হাত পরিমাণ হইবে। এইরূপ আরও দুইখানি সুবৃহৎ উপলখণ্ড স্বরূপগঞ্জের নিকটবর্ত্তী ট্যাঙ্‌রার মসজিদের নিকট পতিত আছে। সেগুলিও সুবর্ণ-বিহার হইতে আনীত বলিয়া প্রকাশ।

আমরা গ্রামের প্রাচীনগণের নিকট শুনিলাম যে, তাঁহারা ঐ স্তূপের উপর ইষ্টকময় ভিত্তি দেখিয়াছেন, ও ভিত্তির উপর খিলানের পরিবর্ত্তে এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপিত ছিল, তাহাও দেখিয়াছেন। ইহা ৮০ বৎসরের অধিক কালের ঘটনা। স্তূপের উত্তরাংশে লাফালাফি করিলে পূর্ব্বে "গুম্‌গুম্" শব্দ পাওয়া যাইত—যেন তাহার তলদেশ ফাঁপা। এই শব্দে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কৃষকেরা লাঙ্গলফলকের দ্বারা ঐ স্থান খনন করে, ও উহার অভ্যন্তরে এক অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ দেখিতে পায়। তাহারা তিন চারিজন একত্র হইয়া, সাহসভরে, ক্ষেত্রে পরিচালিত

মই সাহায্যে নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক, তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি দ্রব্য লইয়া বাহিরে আসে; কয়েক পাত্র চাউলও তাহার সঙ্গে ছিল। চাউল-গুলির তখন প্রস্তরীভূত অবস্থা। পরে ঐ দিকের ভিত্তিগাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ঐ স্থান মৃত্তিকাবৃত ও উচ্চ হইয়াছে। সেজন্য এক্ষণে আর ঐরূপ শব্দ শ্রুত হয় না।

এখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সকল প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়, সেগুলি কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিন। ভগ্নাবস্থায় বহুদিন যাবৎ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়াও বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই। এগুলি বারাণসী প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নগরাদিতে ব্যবহৃত প্রস্তরের অনুরূপ নহে। ঐ সকল স্থানে ব্যবহৃত প্রস্তরগুলি প্রায়শঃ পিঙ্গলাভ ও চুনার হইতে প্রাপ্ত বলিয়া উহা-দিগকে Chunar stone বলে। আমাদের অনুমান, এই স্তূপে প্রাপ্ত প্রস্তর-সকল রাজমহল হইতে আনীত হইয়াছিল। নবদ্বীপে প্রাপ্ত প্রস্তর-ময় দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলিও এই শ্রেণীর প্রস্তরনির্ম্মিত।

কিম্বদন্তী এই যে, সুবর্ণ নামে এক রাজা এই স্থানে বাস করিতেন। তিনি কুম্ভকার (কুমার) জাতীয় ছিলেন, এবং তাঁহার সহচরেরাও সকলেই স্বজাতীয় ছিলেন। তিনি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সপরিবারে পাতালস্থ নিরাপদ গৃহে প্রবেশ করেন, ও পাতালপথাভিজ্ঞ তাঁহার গুরু, জনৈক সন্ন্যাসী, এই আক্রমণের পরিণাম-প্রতীক্ষায় বৃক্ষতলে বসিয়া থাকেন। দুরদৃষ্টবশতঃ সন্ন্যাসী শত্রুহস্তে নিহত হন, ও সুবর্ণরাজাও চিরতরে অজ্ঞাতপথ পাতালগৃহেই বাস করিতে থাকেন। সেই সঙ্গে ইহার ঐতিহাসিক তথ্যও অজ্ঞাত ও ভূগর্ভস্থ হইয়া আছে। আজিও এই স্তূপ ইহার অতীত জীবনের ঘটনাগুলিকে বক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকে দেখিলে, মনে নানা ভাবের উদয় হয়। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ বিক্ষিপ্ত চূর্ণীভূত শিলারাশি, ইহার উপর কালের তাণ্ডবনৃত্যের জীবন্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। দুঃখের বিষয় কতকাল পূর্ব্বে কে এই ধর্ম্মমন্দির স্থাপিত

করিয়াছিলেন – কত ধর্ম্মপ্রাণ স্থবির শ্রমণ ইহাতে বাস করিয়া কত শিষ্যকে জ্ঞানামৃত দান করিতেন—ইহা অতীত যুগের সেই দেশের ও জাতির, কিরূপ গৌরব, সম্মান ও শ্রদ্ধার আগারস্বরূপ ছিল, তাহাদের উপযুক্ত প্রমাণ বা নিদর্শন এক্ষণে নাই।

পূর্ব্বপুরুষের গৌরবরক্ষা করিতে হইলে, তাঁহাদের কীর্ত্তির লুপ্তপ্রায় স্মৃতি জাগাইয়া রাখিতে হইলে, এই স্তূপ খনন করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার একান্ত আবশ্যক। যতদিন না এইরূপে সত্যের উদ্ধার হইবে, ততদিন আমাদিগকে 'ইতিহাসের অনুমান খণ্ড' লইয়াই আস্ফালন করিতে হইবে। স্থানীয় লোকে অমঙ্গল আশঙ্কায়, কুসংস্কারবশে এই স্থান খনন করিতে চাহে না। জানি না, কি কারণে ৺পঞ্চানন রায় মহাশয়, এই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিয়া, আরব্ধ কার্য্য শেষ না হইতেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন! এক্ষণে এতদঞ্চলের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাহিত্য পরিষদ্ যদি এই শুভানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠার পুনরুদ্ধার হইতে পারে।

বৌদ্ধ-সাহিত্যে লিখিত আছে, মহারাজ অশোক সিংহলে, সুবর্ণ-দ্বীপে, হিমবন্ত ও অপরান্ত প্রভৃতি দেশে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এই স্থানগুলি সমস্তই ভারতবর্ষে অবস্থিত; কিন্তু সুবর্ণদ্বীপ কোথায় ছিল. তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, বঙ্গদেশের এই অংশ মহারাজ অশোকের সময় প্রায় জলমগ্ন ও দ্বীপ-বহুল ছিল। মহাকবি কালিদাসের বর্ণনাতেও এ দেশ বহু-নদী-প্রবাহিত ও দ্বীপময় বলিয়া আভাস পাওয়া যায়। এমন কি সুসানের (Sausan) মানচিত্রেও এই-রূপ বহু দ্বীপ প্রদর্শিত হইয়াছে। (Sausan ১৬৫২ খ্রীঃ অব্দে এই মানচিত্র অঙ্কিত করেন।) দুই তিন শতাব্দী মধ্যে এ দেশের কত নদী যে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। নদীয়া রাজবাটীর দীঘি দিয়া যে খরস্রোতা অঞ্জনা প্রবাহিতা ছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে।

বর্ত্তমানে এই স্তূপের চারিপার্শ্বে অনেকগুলি খাত আছে। পূর্ব্বে এই সমস্ত খাতে নদী প্রবাহিতা হইয়া সুবর্ণ-বিহারকে একটি নদীবেষ্টিত দ্বীপে পরিণত করিয়াছিল। এ অঞ্চলে যে এইরূপ নদীবেষ্টিত দ্বীপ ছিল, তাহা স্থানগুলির নাম হইতেই প্রমাণিত হয়। যথা:—অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ (চাকদহ), কুশদ্বীপ (কুশদহ) ইত্যাদি। সুবর্ণদ্বীপ যে এই দ্বীপমালার অন্যতম নহে ও তাহাতে বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার 'সুবর্ণ-বিহার' আখ্যা হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, মহারাজ অশোক-প্রচারিত সুবর্ণ দ্বীপ এরূপ নদীবেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের পরিচায়ক নহে। এখনও নিম্নবঙ্গ—গঙ্গা, পদ্মা ও সাগর-বেষ্টিত একটী বৃহৎ দ্বীপ; নদীয়া জেলার অধিকাংশ ভূভাগ গঙ্গা, জলঙ্গী, পদ্মা ও মাথাভাঙ্গা-বেষ্টিত একটী দ্বীপ। সুবর্ণবিহার এই ভূখণ্ড মধ্যে অবস্থিত। কে বলিতে পারে যে, মহারাজ অশোকের সময় এই দ্বীপ-সমুদায়ের কোন একটী সুবর্ণ দ্বীপ নামে অভিহিত হইত না! প্রসিদ্ধ কোষকার অমর সুবর্ণশব্দ পর্য্যায়ে 'গাঙ্গেয়' শব্দ লিখিয়াছেন। ভাবপ্রকাশ অভিধানেও সুবর্ণ-পর্য্যায়ে গাঙ্গেয় শব্দ পাওয়া যায়। অতএব সুবর্ণ দ্বীপ অর্থে গাঙ্গেয় দ্বীপ অর্থাৎ গঙ্গাগর্ভস্থ দ্বীপ—ইহাই যুক্তিসঙ্গত।

বিহারগুলি এদেশে শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। তখনকার দিনে, এইগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য করিত, এবং এই কার্য্য-সাধনোদ্দেশে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই এক একটী মহাবিহার স্থাপিত ছিল। মগধে নালন্দা, অঙ্গে বিক্রমশিলা, রাঢ় ও বঙ্গের সঙ্গমস্থলে সুবর্ণবিহার। নিম্ন-বঙ্গে ভারতভায়না, ও বরেন্দ্রে জগদ্দল বহুদিন ধরিয়া বৌদ্ধ জগতের উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। এই সুবর্ণ দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম এতদূর সুপ্রতি-ষ্ঠিত ছিল যে, বিক্রমশিলা বিহারের মঠাধ্যক্ষ, বাঙ্গালী জাতির গৌরব স্বনামধন্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে সুবর্ণ দ্বীপে অধ্যক্ষরূপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণ দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন ও তথা হইতে ফিরিয়া

বিক্রমশিলা বিহারের অধ্যক্ষ হন। বিক্রমশিলা হইতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পরিণত বয়সে ধর্ম্মসংস্কারার্থ তিব্বতে প্রেরিত হন। গুণমুগ্ধ তিব্বতবাসিগণ তাঁহাকে **অতীষ** উপাধি দিয়াছিলেন, এবং এখনও তিনি দ্বিতীয় বুদ্ধ-দেবের ন্যায় সেখানে পূজিত হইতেছেন। (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে অভিভাষণ, সন ১৩২১) এই বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের এখানে আসিবার পূর্ব্বেই এস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত ছিল।

অনেকের মতে এই সুগতালয় ধর্ম্মপ্রাণ, প্রজাপালক, দেশহিতৈষী পালরাজগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। পালরাজগণ এদেশে অনেক মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার মঠ ধর্ম্মপাল দ্বারাই স্থাপিত হয়। খৃঃ ৮ম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মহারাজ ধর্ম্মপাল বর্ত্তমান ছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও তাঁহার সমসাময়িক। (৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস)। এখন দেখা যাইতেছে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সুবর্ণ-বিহারের মঠাধ্যক্ষ পদের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে পরিণামে সুবিখ্যাত বিক্রম-শিলার মঠের অধ্যক্ষ পদপ্রাপ্তির উপযুক্ততা প্রদান করিয়াছিল।

কুম্ভকার জাতির প্রধান উপাধি পাল, এবং পাল বলিলে কুম্ভকার জাতিকেই বুঝায়। কিম্বদন্তীর কুমার রাজা পালরাজবংশের নির্দ্দেশক; এবং কুমার রাজার শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার কাহিনী—সম্ভবতঃ হিন্দু শূর বা সেনরাজগণ কর্ত্তৃক পালবংশের উৎসাদন ব্যাপার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কাহার কাহারও বিশ্বাস, সুবর্ণরাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার নাম 'সুবর্ণবিহার'। "সুবন্ন চন্দ রাজা তার ধাড়ী চন্দ পিতা" বলিয়া এক বৌদ্ধ নৃপতির উল্লেখ 'গোবিন্দচন্দ গীতে' আছে। আর এক বৌদ্ধ "সুবর্ণ চন্দ্র" চন্দ্রদ্বীপে সামন্ত রাজা ছিলেন। এই উভয় সুবর্ণচন্দ্রই পালরাজগণের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, অন্ততঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বেই এই মঠ স্থাপিত হইয়াছিল।

কয়েক ব্যক্তি এই স্থান হইতে টাকা পাইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি কোন ক্রমেই মুদ্রাপ্রাপ্তি স্বীকার করে না, ও কোন রূপেই তাহা দেখাইতে চাহে না। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইয়াছি।

যাহা হউক, 'সুবর্ণবিহার' নামের যদি কোন ঐতিহাসিক সার্থকতা থাকে, তাহা হইলে হয় উহা স্থানের নামানুসারে, নতুবা স্থাপয়িতার নামানুসারে আখ্যাত হইতেছে। আশা করা যায়, স্থান খনন করিলে সকল সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে।

পানশিলা ও ভালুকা।—বর্ত্তমান নবদ্বীপ হইতে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ভালুকা নামে একটি গণ্ড গ্রাম আছে। ইহার উত্তর প্রান্তে পানশিলা পল্লী সংলগ্ন। উভয় গ্রামই এক বিশাল বিলের তীরে অবস্থিত। বর্ত্তমানে ঐ বিলটীকে ভালুকার বিল বলে।

পানশিলায় একটি উচ্চ টীবি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিকটে পতিত এক খণ্ড প্রস্তরে অতি প্রাচীন বঙ্গীয় অক্ষরে একটি লিপি খোদিত আছে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই শিলালিপির একটি প্রতিলিপি আনিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত পাঠ এইরূপ—

"খলেতা অয়গ্ শ্রীমতী সিব
খলেতা অয়গ্ শ্রীমতী মঞ্জঘোষ
খলেতা অয়গ্ শ্রীমতী যোগেশ"

ন্যায়রত্ন মহাশয় 'খলেতা' ও 'যলেতা' উভয়বিধ পাঠই সম্ভব মনে করিতেন। এই নাম কয়টি শিলার উপর উৎকীর্ণ থাকায়, এবং এই নাম কয়টীতে বৌদ্ধ-ভাবপূর্ণ ভাষার ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাওয়ায় আমাদের মনে হয়, পানশিলায় কোন বৌদ্ধ মঠ বা মন্দির স্থাপিত ছিল। এইরূপ মনে করিবার আর একটি কারণ, 'পানশিলা' এই নামটি। ইহাও বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র

স্থান তক্ষশিলা ও বিক্রমশিলার অনুরূপ। হইতে পারে এই মঠ বা মন্দির তক্ষশিলা বা বিক্রমশিলার ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর ছিল না। কিন্তু তাহাতে সম-শ্রেণীর নাম রাখিবার কোন বাধা দেখা যায় না। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বৌদ্ধ-প্রভাবের আরও পরিচয় অনুমান করা যায়।

এক্ষণে উক্ত শিলালিপির পাঠসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। এই তিন ছত্রের সম্যক্ অর্থ কি তাহা আমরা জানি না। কিন্তু প্রতি ছত্রের শেষে একটি করিয়া দেবতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে—শিব, মঞ্জুঘোষ ও যোগেশ। শিব—মহাদেব, শিবপূজাপদ্ধতি হর্ষবর্দ্ধনের সময় হইতেই প্রাধান্য লাভ করে। মঞ্জুঘোষ—বোধিসত্ব, পরে তিনি তান্ত্রিক দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। যোগেশ—বুদ্ধ বা ধর্ম্ম। আমাদের মনে হয় বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন—'বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ'—শিব মঞ্জুঘোষ ও যোগেশে পরিণত হইয়াছে।

পালবংশীয় নৃপতিদিগের শাসনের পরে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হইতে থাকে। শূর ও সেন বংশের শাসনকালে হিন্দুধর্ম্ম যাগযজ্ঞ ও পূজাবিধি লইয়া প্রবল হইয়া উঠে। বৌদ্ধ-দার্শনিক ভাব-প্রবণ জাতির হৃদয়ে এই পূজার্চ্চনার জাঁকজমক প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তাহার ফলে, কতকগুলি অভিনব ধর্ম্মমত ও পূজার আবির্ভাব হইল। এগুলিকে ঠিক হিন্দু বা বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্মত বলা যায় না—উহারা উভয়ের মিশ্রণ-সম্ভূত। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ হিন্দু সাকারবাদের আশ্রয়ে, পূজার নৈবেদ্য ধূপ-দীপাদি উপচারের মধ্য দিয়া ধর্ম্মপূজারূপে প্রকাশমান হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ-প্রথা না থাকায় এবং বাঙ্গালাদেশ বহুদিন যাবৎ বৌদ্ধরাজাদিগের দ্বারা শাসিত হওয়ায়, এদেশে জাতিভেদপ্রথা লোপ পাইয়াছিল। যে সামান্য দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারাও ব্রাহ্মণো-চিত ক্রিয়াকর্ম্ম-জ্ঞানহীন হইয়াছিলেন। এই কারণেই আদিশূরকে যজ্ঞার্থ কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা আসিলে,



মহিষমর্দিনী মূর্তি।



উগ্রতারা মূর্ত্তি : চামুণ্ডা।

জাতিভেদমূলক হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল। তখন ব্রাহ্মণেতর সকলেই শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইলেন। এই কারণেই বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রকাশ নাই। ধর্ম্মরাজের সেবকেরা প্রায়শঃই শূদ্র জাতীয়। তাহারা পণ্ডিত বা দেয়াশীন্ (দেবাংশী) নামে অভিহিত হইতেন। ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইলে ধর্ম্মপূজার পৌরোহিত্য অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেলডাঙ্গার কালাচাঁদ ও জামালপুরের ধর্ম্মরাজ বা বুড়োরাজ লোড়াকৃতি বৌদ্ধমূর্ত্তি। এক সময়ে ধর্ম্মপূজা বাঙ্গালীদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইত। ইহার প্রমাণ, রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' ও 'ধর্ম্মপূজাবিধান'।

এই ধর্ম্মপূজার প্রথম প্রকাশ বল্লুকার তীরে।

"বাড়ী মোর বল্লুকার। পূজি শ্রীনৈরাকার॥"

"শনিবার ব্রত করিল বল্লুকার তীরে।
ব্রহ্মা হরিহর আছেন গোসাঞির বরাবরে॥"

(রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাবিধান—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)

এই বল্লুকা শব্দটী কালে ভালুকায় পরিণত হইয়াছে, এবং বল্লুকাতীর বলিতে ভালুকার বিলের তীরকেই বুঝাইতেছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে গাদিগাছা, মাজিদহ হইতে আরম্ভ করিয়া পানশিলা, ভালুকার মধ্য দিয়া একটী নদী সাতকুলিয়ার দক্ষিণে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে দেখা যায়। বল্লুকাপল্লীর পাদপ্রবাহিত এই নদীও বোধ হয় বল্লুকা নামে খ্যাত ছিল। নদী নষ্ট হওয়ার পর, তাহার গর্ভে যে বিল উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অদ্যাপি ভালুকার (বল্লুকার) বিল নামে অভিহিত হইতেছে। পানশিলার যে মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বল্লুকা তীরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ ইহাই ধর্ম্মপূজার প্রকাশভূমি।

'ধর্ম্মপূজাবিধানে' আরও দেখা যায় যে, নিরঞ্জন হংসরথে বল্লুকা-তীরে উপস্থিত হন।

"ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
হংসরথে বিজয় ঠাকুর নিরঞ্জন॥
তপস্থলে আছেন রাউ বোল্লুকার তিরে।
আমি ত কেষোরি হোঞা আছি হরের মন্দিরে॥" ২১৬ পৃঃ

পানশিলার প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মাজিদা গ্রামে পূর্ব্ববর্ণিত বল্লুকা নদীর গর্ভস্থ হংসবাহনের বিলে 'হংসবাহন' বা 'হংসবদন' নামে এক শিব আছেন। ইহা প্রস্তরময় হংসের উপর শায়িত পঞ্জরচিহ্নযুক্ত বুদ্ধমূর্ত্তি। বর্ত্তমানকালে ইনি শিব বলিয়া পূজিত হইতেছেন। গ্রামবাসীরা এই দেবতাকে অত্যন্ত জাগ্রত বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই শিব সমস্ত বৎসর বিলের জলমধ্যে বাস করেন, চৈত্র মাসের ২৭ বা ২৮ তারিখে গাজনের পূর্ব্বে তাঁহাকে জল হইতে উঠান হয়। যে কয়দিন তিনি স্থলে বাস করেন, সে কয়দিনই তাঁহার উপর অনবরত জল ঢালা হয়, এবং পাছে তিনি জলে পলাইয়া যান এই আশঙ্কায় একজন গাজনের ব্রতধারী সন্ন্যাসী তাহাকে সর্ব্বদাই স্পর্শ করিয়া থাকে। এমন কি পথে চলিবার সময়েও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয় না।

এই শিব গাজনের সময়ে নবদ্বীপে আসেন ও মাত্র ব্রাহ্মণ বাটীতেই পূজা ও বৃত্তি গ্রহণ করেন। শিবের এই ব্রাহ্মণ-প্রীতিও রামাই পণ্ডিতের "মোর নাম করি শূদ্র জত সব খায়। পিতৃমাতৃ শ্বশুর তার ঘোর নরক পায়॥" ইত্যাদি কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আমাদের মনে হয় এই মূর্ত্তি পানশিলা হইতে আনীত হইয়াছে। এই শিলা ঐ ভাবে জল মধ্যে বাস করায় সম্ভবতঃ ঐ স্থানের নাম 'পানিশিলা' হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের চরম সীমায় ধর্ম্মপূজার সহিত বিশালাক্ষী, বাশুলী, চামুণ্ডা, ইন্দ্রাণী, শিব, ব্রহ্মাণী, ভৈরবগণ প্রভৃতি আবরণ দেবতার পূজা প্রচলিত হয়। এই সময়ে বৌদ্ধতন্ত্র আত্ম-প্রকাশ করে। এই তন্ত্রের আশ্রয়ে ঐ সকল দেবী পূজার উপকরণ-স্বরূপ পবিত্র অহিংস বৌদ্ধ-

ধর্ম্মের স্থানে হিংসামূলক বলিদান প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। এইরূপে ধর্ম্মরাজগণের পূজায় পশুবলি আজিও চলিয়া আসিতেছে। জামালপুরের ধর্ম্মরাজের প্রধান উৎসব বৈশাখী পূর্ণিমায় (বুদ্ধ পূর্ণিমায়) অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় ধর্ম্মরাজ সমক্ষে অজস্র পশুবলি হইয়া থাকে।*

দেবপল্লী।—নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগর হইতে যে পথ ভালুকা গিয়াছে, তাহার ধারে কৃষ্ণনগর হইতে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দেপাড়া বা দেবপল্লী অবস্থিত। ইহার ন্যায় বৃহৎ মৌজা নিকটে আর নাই; ইহা দেপাড়ার বিলের তীরে অবস্থিত। ভালুকাও এস্থান হইতে দুই মাইল দক্ষিণে। এই স্থানে নৃসিংহদেবের বিগ্রহ সেবিত ও পূজিত হইতেছেন। এতদঞ্চলের নবজাত শিশুর অন্নপ্রাশন এই নৃসিংহদেবের প্রসাদ-অন্নে হইয়া থাকে।

এই বিগ্রহ কতদিনের প্রাচীন তাহার কোন ইতিহাস নাই। দেশ-বাসীর প্রতি এই দেবতার প্রভাব দেখিয়া মনে হয়, এই বিগ্রহ অতি প্রাচীন। নদীয়ার রাজসরকার হইতে এই বিগ্রহের সেবার বৃত্তি-ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান সেবাইত দেপাড়ার নিকটবর্ত্তী বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মুখে শুনিলাম তাঁহার ঊর্দ্ধতন ১৯ পুরুষ হইতে তাঁহারা এই বিগ্রহের সেবা করিতেছেন।

কৃষ্ণনগর হইতে যে পথ ভালুকা গিয়াছে, তাহা দেপাড়া পর্য্যন্ত বরাবর একটি লুপ্ত নদীগর্ভের ধারে ধারে আসিয়াছে। যে সকল স্থানে এখনও গভীরতা আছে, সে সকল স্থান বিলে পরিণত হইয়াছে। এই পথের উপর হইতে একটি উচ্চ স্থান দেখা যায়। এই সমগ্র স্থান বর্ত্তমান কালে বনবেষ্টিত অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং তাহার এক অংশে নৃসিংহ-দেবের মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির অতি প্রাচীন—৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহা সংস্কৃত হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এই দেবতার

* ১৩২৫ সালের ফাল্গুন মাসের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' দ্রষ্টব্য।

বিশাল মন্দির ছিল, সেটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দেবমন্দির বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। প্রাঙ্গণটি প্রায় ২০ বিঘা পরিমিত হইবে। প্রাঙ্গণের সর্ব্বত্র কুচা পাথর ও ভগ্ন ইঁট পরিপূর্ণ। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাঙ্গণ মধ্যে ১ কাঠা পরিমিত স্থান সমতল করিবার প্রয়োজন হওয়ায়, সেই স্থান হইতে প্রায় ১০ গাড়ী খণ্ডিত প্রস্তর ও বহু ইষ্টক উত্তোলিত হইয়াছে। প্রস্তরখণ্ডগুলি একটি তমালবৃক্ষমূলে রক্ষিত আছে। বাঙ্গলাদেশে এত পাথর এক জায়গায় দেখা আশ্চর্য্যের বিষয়। এগুলি দেখিলে মনে হয় ইহাদের আকার অনেক বড় ছিল, খননকালে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ব্যবহারে খণ্ডিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণে কয়েকখণ্ড বৃহদাকার প্রস্তর (boulder) পড়িয়া আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ ও কতকগুলি পিঙ্গলবর্ণ sand stone—কয়েকটুক্‌রা কারুখচিত কোষ্ঠিপাথরও আছে। ইষ্টকের যে বৃহৎ স্তূপ আছে, তাহার মধ্যে নানাজাতীয় ইষ্টক দেখা যায়—কতকগুলি অতি প্রাচীন ও কারুখচিত। কতকগুলি ইটের গঠন বল্লাল ঢীবিতে প্রাপ্ত ইটের অনুরূপ।

এই প্রাঙ্গণের বিশালতা, স্থানের উচ্চতা, ইষ্টকের গঠন ও প্রস্তরের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনে হয়, ইহা অতীত যুগে—প্রস্তরের বাহুল্যই যখন অট্টালিকা-নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ ছিল—বঙ্গের সেই সৌভাগ্যের দিনে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জানিনা কোন রাজকুল-প্রহ্লাদকে আহ্লাদ দিবার জন্য শ্রীনৃসিংহদেব এখানে প্রকট হইয়া এই পল্লীর দেবপল্লী নাম সার্থক করিয়াছেন।

নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি এক বৃহৎ নিকষ-প্রস্তরে খোদিত আছে। ইহার উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট, পদতলে প্রহ্লাদ পতিত, ক্রোড়ে হিরণ্যকশিপু। মূর্ত্তির বহুস্থানে অঙ্গহানি হওয়ায় ইহার কারুনৈপুণ্য কিরূপ ছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। জনশ্রুতি যে, 'পরেশপাথরের' লোভে কোন সন্ন্যাসী ইহার অঙ্গহানি ঘটাইয়াছে, এবং অনাদি বিগ্রহ বলিয়া এই অঙ্গ-

হীন বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন।[৩] পায়সান্ন ভিন্ন অন্য কিছু এই দেবতার ভোগে লাগে না। সন্তানপ্রাপ্তির কামনা করিয়া লোকে ইহার কাছে মানসিক করে।

সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পর ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান কালে যখন বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি হিন্দু-দেবতায় রূপান্তরিত হইতেছিল, বৌদ্ধতান্ত্রিক মূর্ত্তি সকল হিন্দুতন্ত্রের আশ্রয়ে আসিতেছিল তখন, অর্থাৎ, শূর বা সেনরাজাদিগের রাজত্বকালে তাহাদিগের দ্বারা এই দেবসেবা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বল্লালঢীবি ও এই স্থানের ইটের গঠন-প্রণালী ও শিল্প-সাদৃশ্য আমাদের এইরূপ বিশ্বাসের কারণ।

দেপাড়ার বিলের একাংশের নাম **চামুটার** বিল। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বিলের গর্ভ হইতে পাঁক লইয়া কৃষকেরা ক্ষেত্রে দেয়। তাহার মধ্য হইতে একটি অতি সুন্দর ব্রোঞ্জধাতুনির্ম্মিত ৩৮ ইঞ্চি পরিমিত মূর্ত্তি পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটি উগ্রতারা-বিগ্রহ বলিয়া বুঝা যায়। এত ছোট মূর্ত্তির মধ্যে শিল্পের উৎকর্ষ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহার পরিধানের বস্ত্র, গলের মুণ্ডমালা, মাথার মুকুট, শিরোদেশের মহাদেব, চতুর্হস্তের অস্ত্ররাজি দেহের অলঙ্কার-সম্ভার এবং অঙ্গের ভঙ্গি এমন সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে যে তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। যখন ব্রোঞ্জধাতুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই এই মূর্ত্তিটি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাও সেন-রাজাদিগের সময়েই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। উগ্রতারা বৌদ্ধতান্ত্রিক মূর্ত্তি[৪]—নামান্তর চামুণ্ডা। দুঃখের বিষয় কৃষক কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তিটি অঙ্গহীন হইয়াছে।

(৩) এইরূপ কিম্বদন্তী 'পোড়ামহেশ্বর' সম্বন্ধেও আছে।

(৪) এই মূর্ত্তিটি নৃসিংহদেবের সেবাইত শ্রীহরিগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে।

'চামটা' বোধ হয় 'চামুণ্ডা' শব্দের অপভ্রংশে পরিণত হইয়াছে। এই বিলের তীরে কোথাও এই দেবীর মন্দির থাকা সম্ভব এবং দেবীর নামানুসারেই বিলের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শূর ও সেনরাজগণের সময় বিদ্যাচর্চ্চা।

শূর ও সেন বংশীয় রাজগণের সময়ে বঙ্গদেশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বঙ্গদেশের নানা স্থানে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই সময়েই দক্ষিণ রাঢ়ে ভূরশিট গ্রামে শ্রীধরভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়া ন্যায়শাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ নবদ্বীপ শূর ও সেন রাজাদিগের রাজধানী থাকায় বাণিজ্য ও বিদ্যাগৌরবে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। শূর ও সেন ভূপতিরা নবদ্বীপে বাস করায়, এবং নবদ্বীপ ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী পুণ্যভূমি হওয়ায়, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয়, হলায়ুধ, উদয়নাচার্য্য ঈশান ও পশুপতি সকলেই রাজমন্ত্রী ছিলেন। অদ্যাপি জমীদারগণের বাটীতে এক এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে সভাপণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। সেনবংশীয় রাজাদিগের সময় নবদ্বীপ একটী বিদ্বজ্জন-পরিপূর্ণ প্রসিদ্ধ নগর হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রত্যেক পল্লীতে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনেক চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছিল। জ্যোতিষিগণ কর্ত্তৃক এই সময় হইতেই পঞ্জিকার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে রচিত চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থের আদিখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥

ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে ॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥" চৈ, ভা,

শ্রীধর ভট্ট।—সেনরাজাদিগের প্রারম্ভে ভূরিসৃষ্টি গ্রামে শ্রীধর ভট্ট নামক এক দার্শনিক পণ্ডিতকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। বৃহস্পতির ন্যায় জগদানন্দন শ্রীধরের পিতামহ, বহুগুণসমন্বিত বিবিধকীর্ত্তি বলদেব তাঁহার জনক, এবং বিশুদ্ধকুলসম্ভবা অচ্ছোকাদেবী তাঁহার গর্ভধারিণী। দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত পুণ্যকর্ম্ম বহুদ্বিজ ও ধনশালী শ্রেষ্ঠিগণের বাসস্থান ভূরিসৃষ্টিগ্রাম শ্রীধরের জন্মভূমি। তিনি পাণ্ডুদাস শ্রেষ্ঠীর অনুরোধক্রমে, 'পদার্থ-প্রবেশ' বা 'পদার্থ ধর্ম্মসংগ্রহ' নামক বৈশেষিক দর্শনের 'ন্যায়কন্দলী' নামে টীকা ৯১৩ শকে (৯৯১ খৃঃ অঃ) প্রণয়ন করিয়া দার্শনিক জগতে বিশেষ পাণ্ডিত্য-প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক মৈথিল পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য এই ন্যায়কন্দলী অবলম্বন পূর্ব্বক 'গুণকিরণাবলী' লিখিয়া নৈয়ায়িক সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ন্যায়কন্দলীর শেষে শ্রীধরের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"সুবর্ণময় সংস্থানরম্যা সর্ব্বোত্তরস্থিতিঃ।
সুমেরোঃ শৃঙ্গবীথীব টীকেয়ং ন্যায়কন্দলী ॥
অক্ষীণনিজপক্ষেষু খ্যাপয়ন্তী গুণানসৌ।
পরপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তান্ দলতি ন্যায়কন্দলী।
আসীদ্ দক্ষিণ রাঢ়ায়াং দ্বিজানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
ভূরিঃসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ ॥
অম্ভোরাশেরিবৈ তস্মাদ্ বভূব ক্ষিতিচন্দ্রমাঃ।

জগদানন্দনাদ্ বন্দ্যো বৃহস্পতিরিব দ্বিজঃ॥
তস্মাদ্ বিশুদ্ধ গুণরত্ন মহাসমুদ্রো বিদ্যালতা সমবলম্বনভূরুহোঽভূৎ।
স্বচ্ছাশয়ো বিবিধকীর্ত্তিনদীপ্রবাহ প্রস্যন্দনোত্তমবলো বলদেবনামা॥
তস্যাভূদ্ ভূরিযশসো বিশুদ্ধকুলসম্ভবা।
অচ্ছোকেত্যর্চ্চিতগুণা গুণিনো গৃহমেধিণী॥
সচ্ছায়ঃ স্থূলফলদো বহুশাখো দ্বিজাশ্রয়ঃ।
তস্মাৎ শ্রীধর ইত্যুচ্চৈরর্থিকল্পদ্রুমোঽভবৎ॥
অসৌ বিদ্যাবিদগ্ধানামস্তৃত শ্রবণোচিতাম্।
ষট্‌পদার্থীহিতামেতাং রুচিরাং ন্যায়কন্দলীম্॥
ত্র্যধিক দশোত্তরনবশত শাকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা।
শ্রীপাণ্ডুদাস যাচিত ভট্ট শ্রীশ্রীধরেণেয়ম্॥
সমাপ্তেয়ং পদার্থপ্রবেশ ন্যায়কন্দলী টীকা।"

এই ভূরিসৃষ্টি গ্রাম, বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামোদর তীরস্থ ভূর্‌শিট্ গ্রাম। শ্রীধরের বর্ণনায় দেখা যায় যে, তৎকালে এই গ্রাম বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং বহু সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ ও ধনবান্ বণিক্-সম্প্রদায়ে পূর্ণ ছিল। এখনও এই গ্রামের নামানুসারে একটী পরগণা দৃষ্ট হয়। খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজ এই ভূর্‌শিট্ পরগণার অন্তঃপাতী। মহাত্মা রামমোহন রায় খানাকুল কৃষ্ণনগরে এবং কবিকুলশেখর ভারতচন্দ্র রায় ভূর্‌শিটে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূর্‌শিট্ পরগণাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন।

উদয়নাচার্য্য।—মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময়ে নবদ্বীপে যে সকল প্রধান পণ্ডিত ছিলেন তন্মধ্যে হলায়ুধ, ঈশান, পশুপতি ও শূলপাণি প্রধান স্মার্ত্ত, এবং জয়দেব, উমাপতিধর, ধোয়ী প্রধান কবি ছিলেন। উদয়নাচার্য্যের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর প্রধান পণ্ডিত এবং লক্ষ্মণসেনের শেষ সময়ে ধর্ম্মাধিকারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' প্রণেতা এই উদয়নাচার্য্যকে কুসুমাঞ্জলি-রচয়িতা উল্লেখ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ উদয়নাচার্য্য খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। বর্দ্ধমান উপাধ্যায় কুসুমাঞ্জলির 'প্রকাশ' নামে একখানি টীকা রচনা করেন। প্রমাণ পাওয়া যায়, যে উক্ত বর্দ্ধমান উপাধ্যায় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচিত গ্রন্থের টীকা একাদশ শতাব্দীতে প্রণীত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

শূলপাণি।—শূলপাণি রাঢ়ী শ্রেণীর সাহুড়িয়ান গোত্রীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থ-সমুদায় 'স্মৃতিবিবেক' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক', 'ব্রতমালাবিবেক', 'দুর্গোৎসববিবেক', 'দত্তক-নির্ণয়' প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ-সকলে বিশেষ বিচারশক্তি পরিলক্ষিত হয়। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিগ্রন্থের 'দীপকলিকা' নামে এক টীকা রচনা করেন। ইহার পরবর্ত্তী মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শূলপাণির মত প্রামাণিক বলিয়া অনেক স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন।

হলায়ুধ।—হলায়ুধ ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তৎসমুদায়ের শেষে 'সর্ব্বস্ব' এই নাম সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব', 'স্মৃতিসর্ব্বস্ব', 'মীমাংসাসর্ব্বস্ব' এবং 'ন্যায়-সর্ব্বস্ব' ইত্যাদি বহুল গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"বংশে বাৎস্যমুনের্ম্মণেরিব সদাচারস্য বিশ্রামভূঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষধনঞ্জয়ঃ সমজনি জ্যায়ান্ পরজ্যোতি র্যঃ॥৪
বভূব তস্যাঃ প্রকৃতের্ম্মহানিব শ্রেয়ো বিলাসায়তনং হলায়ুধঃ।
যৎকীর্ত্তিরম্ভো নিধিবীচিদণ্ড-দোলাধিরোহণব্যসনং বিভর্ত্তে॥৯
লব্ধঃ জন্মধনঞ্জয়াদ্ গুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতেঃ
আবৃত্ত্যা সদৃশী নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহামাত্যতা।

শব্দব্রহ্মকরোদরামলকবত্তোগোত্তরাসৎক্রিয়ে
ত্যস্তি প্রার্থয়িতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকং ॥১০
বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল
চ্ছত্রোৎসিক্ত মহামহত্তমুপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষ যোগ্যমখিল ক্ষ্মাপাল নারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব নৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ ॥১২

অর্থাৎ, সদাচারের বিশ্রামভূমি বাৎস্যমুনির বংশে ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতি হইতে যেমন মহান্, সেইরূপ তাঁহার গৃহিণী হইতে ধনঞ্জয়ের পুত্র হলাবুধ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা লক্ষ্মণের যৌবনে তিনি মহামাত্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুল, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, ধনসম্পদ্ হলায়ুধের সংসারে প্রার্থনা করিবার কিছু ছিল না। শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব নৃপতি তাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনারম্ভে চন্দ্রবিম্ববৎ উজ্জ্বলছত্র (ধবল ছত্র) দ্বারা বর্দ্ধিত মহাতেজঃপুঞ্জ মন্ত্রীর পদ এবং বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।

ঈশান ও পশুপতি।—হলায়ুধের ভ্রাতা ঈশান ব্রাহ্মণদিগের 'আহ্নিকপদ্ধতি' নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি 'পশুপতি পদ্ধতি' (শ্রাদ্ধাধিকৃত্য) নামে এক পুস্তক রচনা করেন। এই পশুপতি লক্ষ্মণসেনের শেষাবস্থায় মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বরচিত 'দশকর্ম্মদীপিকার' আরম্ভে তিনি রাজপণ্ডিত বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"বিপ্রাণাং দশকর্ম্মপদ্ধতিমিমামুদ্ধৃত্য বেদাদসৌ।
চক্রে ভূপতি-পণ্ডিতঃ পশুপতিঃ স্বর্গাপবর্গপ্রদাং॥

শ্রীধরদাস।—মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সেনাপতি বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে ঐ পুস্তক রক্ষিত আছে। ঐ গ্রন্থে পাঁচটী প্রবাহ

আছে, এবং প্রত্যেক প্রবাহ নানা বীচিতে বিভক্ত হইয়াছে। উহাতে ৮১৮৫টী শ্লোক ৪৪৬ কবির কাব্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে গোবর্দ্ধন, হলায়ুধ, জয়দেব, ভট্টনারায়ণ, কেশবসেন, লক্ষ্মণসেন, উমাপতিধর প্রভৃতি কবিগণের এবং ভবদেবী, চণ্ডালবিদ্যা, বিদ্যা ও ব্যাসপাদা এই চারিটী স্ত্রী কবির কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে গ্রন্থ সংগ্রহের কাল এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ইতি পঞ্চভিঃ প্রবাহৈঃ সদুক্তিকর্ণামৃতং ক্রিয়তে॥
শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত দশশতে শরদাং।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশে (ত্রিংশে ?)॥
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুন বিংশেষু পরার্থহেতবে
কুতুকাৎ শ্রীধরদাসেনেদং সদুক্তিকর্ণামৃতং চক্রে।

উক্ত শ্লোকে দেখিতে পাই ১১২৭ শকে (খৃঃ ১২০৫) ও লক্ষ্মণসেন ভূপতির ২৭ বৎসর রাজত্বের সময় এই পুস্তক শেষ হয়। কিন্তু ১১২৭ শক লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ২৭ বৎসরের সমকালবর্ত্তী নহে। লক্ষ্মণসেন ১০৯০ শকে সিংহাসন আরোহণ করেন। অতএব, ১১২৭ শক তাঁহার রাজত্বের ৩৭ বৎসরের সমকালবর্ত্তী হয়। সুতরাং উক্ত শ্লোকে যে 'রসৈকবিংশে' পাঠ আছে তাহা ভ্রান্তিমূলক—উহা 'রসৈকত্রিংশে' হইবে।[১] তাহা হইলে আমরা মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে ১২০৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে দেখিতে পাই।

ধোয়ী।—ধোয়ী একজন শ্রুতিধর প্রধান কবি ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত দূতকাব্য 'পবনদূত' এই কবিরাজেরই লেখনী-প্রসূত। এই গ্রন্থেও মহারাজ লক্ষ্মণসেন 'গৌড়েন্দ্র' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"দন্তিব্যূহং কনকলতিকাং চামরং হৈমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী।

(১) Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. Vol. III. p. 134.

শ্রীধোয়ীকঃ সকলরসিকপ্রীতিহেতোর্মনস্বী
কাব্যং সারস্বতমিব (শুভং) মন্ত্রমেতজ্জগাদ ॥

(H. P. Sastri's N. S. Mss. No. 225.)

উমাপতিধর।—উমাপতিধর একজন বিবিধ-শাখাপল্লবসজ্জিত রচনায় সক্ষম সুকবি ছিলেন। গোদাগারী থানার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামে বিজয়সেনের যে প্রস্তর প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা এই উমাপতিধরের রচিত। উক্ত প্রশস্তি-রচনে উমাপতির বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উহার শেষে লিখিত আছে—

"নির্ণিক্তসেনকুলভূপতিমৌক্তিকানা-
মগ্রন্থিলগ্রথনপক্ষল স্থত্রবল্লিঃ।
এষা কবেঃ পদপদার্থবিচারশুদ্ধ
বুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তি ॥৩৫

(দেবপাড়া-প্রাপ্ত প্রস্তর ফলক)

জয়দেব গোস্বামী।—বীরভূম জেলার অন্তর্গত ভীমবেগ অজয় নদের তীরবর্ত্তী কেন্দুবিল্ব (কেন্দুলী) গ্রামে মহাকবি জয়দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা ভোজদেব তাঁহার জনক এবং বামাদেবী তাঁহার জননী। জয়দেব বাল্যকাল হইতেই সংসারবিরাগী পরমভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। পাণ্ডিত্যেও তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। পার্থিব বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ বীতরাগ ছিলেন, এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থিতি করেন। দশাবতার স্তোত্র নবদ্বীপে বসিয়া রচনা পূর্ব্বক হরিসেবক জয়দেব "জয় জগদীশ হরে" রবে সমস্ত বঙ্গ কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সময়ে নদীয়ার সিংহাসনে মহারাজ লক্ষ্মণসেন সমাসীন ছিলেন। জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্র পণ্ডিত গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মহারাজ লক্ষ্মণসেনের হস্তগত হয়। লক্ষ্মণসেন ঐ স্তোত্র পাঠ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া, কবিবর জয়দেবের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন; এবং তাঁহাকে আনিয়া নিজ সভা অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তাব করায় গোবর্দ্ধন কহিলেন, "মহারাজ, জয়দেব বিষয়ী লোকের সহিত আলাপ করেন না।" লক্ষ্মণসেনের হৃদয় এতই ব্যাকুল হইয়াছিল যে, তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বৈষ্ণববেশে অতি দীনভাবে জয়দেবের কুটীরদেশে উপস্থিত হইলেন। পরস্পরের আলাপে জয়দেব বুঝিতে পারিলেন যে, ইনিই মহারাজ লক্ষ্মণসেন। অতঃপর লক্ষ্মণসেন জয়দেবকে নিজ সভাসদ্‌রূপে পাইবার প্রার্থনা করায়, বিষয়বিরোধী জয়দেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন—"মহারাজ, বিষয়কে আমি বড় ঘৃণা করি, বিষয়ীর নিকট থাকিলে পার্থিব বিষয়ে লোভবশতঃ সাধনার ব্যাঘাত জন্মে। যদিও আমি এখানে দিনকয়েক থাকিতাম, কিন্তু মহাশয়ের প্রস্তাব শুনিয়া আর তিলার্দ্ধও এ রাজ্যে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না।" মহারাজ লক্ষ্মণসেন জয়দেবের অলোকসামান্য গুণ ও ভক্তি দর্শনে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মহাত্মা জয়দেব রাজ্যত্যাগ করিয়া যাইবেন শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে অসহনীয় ক্লেশের উদয় হইয়াছিল। তখন মহারাজ কহিলেন—"দেব, আমি রাজধানীর অনতিদূরে এই নবদ্বীপের পশ্চিমপ্রবাহিত পুণ্যপ্রবাহিণী সুরধুনীর পরপারে চম্পকহট্ট গ্রামে আপনার আশ্রম করিয়া দিতেছি। আপনি সেই স্থানে থাকিয়া সাধনধন গোবিন্দচরণ ভজনা করুন। তাহা হইলেই আমি অনেক তৃপ্তিলাভ করিব।" এই কথায় জয়দেব স্বীকৃত হইলে, চম্পকহট্টে তাঁহার আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ চম্পকহট্ট মহাসাধক জয়দেবের স্থান বলিয়া, আজিও বৈষ্ণববৃন্দ ভক্তিভরে দর্শন করিয়া থাকেন।

এই স্থানে কিছুদিন বাস করিয়া ভক্তপ্রবর জয়দেব পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাত্রা করেন। পুরীবাসী ভক্ত ও পণ্ডিতমণ্ডলী জয়দেবের পাণ্ডিত্য, ভক্তিপ্রবণতা ও নিরহঙ্কার সদয় ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন। এই স্থানে সংসারত্যাগী জয়দেব বিবাহ করিতে বাধ্য হন।

সেই ঘটনা এইরূপ—কোন ব্রাহ্মণের সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি জগন্নাথ-দেবের নিকট সন্তান-কামনা করেন। জগন্নাথদেবের কৃপায় ঐ ব্রাহ্মণ এক কন্যা সন্তান লাভ করেন—তাহার নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতী জগন্নাথদেবের সেবাদাসী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে জগন্নাথ-দেবের আদেশক্রমে জয়দেব ভগবৎ-সেবাপরায়ণা ভক্তিমতী পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন।

অতঃপর জয়দেব সস্ত্রীক বৃন্দাবনাদি পরিভ্রমণ করতঃ কেন্দুবিল্বে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মাধুর্য্যময় কান্ত পদাবলী 'গীতগোবিন্দ' কেন্দুবিল্বে বসিয়াই তিনি রচনা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিকার রসরাসলীলা লইয়াই এই মহাকাব্য লিখিত হইয়াছে। ইহার রচনা অতীব মধুর ও এরূপ প্রসাদগুণবিশিষ্ট যে কুত্রাপি সেরূপ দেখা যায় না। এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত সাহিত্য-সংসারে অতীব আদরণীয়।

জয়দেব শ্রীমতী রাধার মানভঞ্জন সময়ে—

"স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই আর লিখিতে পারেন নাই। উহার পর কোন পদ বসিলে ঐ শ্লোকের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, তাহা বুঝিয়াও তিনি লিখিতে পারেন নাই। কথিত আছে, তিনি গঙ্গাস্নানে গমন করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া

"দেহি পদপল্লব মুদারম্॥"

এই চরণ বসাইয়া দেন। পদ্মাবতীবল্লভ জয়দেব স্নান করিয়া আসিলে এই রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। বাস্তবিক 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' ঐ সকল শ্লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছে। উহা এত মধুর ও এত ভাবোদ্দীপক যে উহা ভগবানের লেখা বলিয়াই মনে হয়।

গীতগোবিন্দ একখানি গীতিকাব্য। ভারতবর্ষে বাল্মীকি, কালি-দাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ আদি বহু মহাকবি প্রাদুর্ভূত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্য-

গগন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই গীতিকাব্য রচনা করেন নাই। সুতরাং গীতিকাব্য সম্বন্ধে এতদিন ভারতীয় সাহিত্যসমাজে অভাবই পরিলক্ষিত হইতেছিল। বঙ্গদেশীয় ভক্তকবি জয়দেব গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করিয়া ভারতীয় সংস্কৃত-সাহিত্যকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। কবি জয়দেবই গীতিকাব্যের প্রথম প্রবর্ত্তক,—এই জন্যই তিনি মহাকবি।

জয়দেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য রাধামাধব মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাঁহার অর্চ্চনা করিতে করিতে কেন্দুলীতেই ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্রাদি হয় নাই। অদ্যাপি কেন্দুলীতে পৌষ সংক্রান্তির দিবস ভক্তগণ সমবেত হইয়া মহামহোৎসবে জয়দেবকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

মহাকবি জয়দেব মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বিদ্বৎসভার কৌস্তুভমণি ছিলেন। গীতগোবিন্দে লিখিত আছে—

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎ-প্রমেয় রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন
স্পর্দ্ধী কোপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥"

অর্থাৎ, উমাপতিধর শাখাপ্রশাখায় সজ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতে পারেন। জয়দেব পরিশুদ্ধ ভাষায় রচনা করিতে ক্ষমবান্। শরণ কবি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিয়াও শীঘ্র রচনা করিতে সমর্থ বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি। আচার্য্য গোবর্দ্ধন গর্হিতরুচি বিষয়ের রচনাতেও সুরুচিসঙ্গত শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন বলিয়াই প্রসিদ্ধ, এবং কবিরাজ ধোয়ী বিখ্যাত শ্রুতিধর।

হিন্দু রাজত্বে বাঙ্গলার অবস্থা।

পাল শূর ও সেন বংশের রাজত্বকালে, এদেশে সভ্যতা ও জ্ঞান চর্চ্চার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল দেখা যায়। ইহাদের সময়ে রাজ্যশাসনে বিশেষ শৃঙ্খলা থাকায় দেশে শান্তি বিরাজিত ছিল, এবং তজ্জন্য লোকের চিন্তাশীলতা ও কার্য্যপটুতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

শাসন প্রণালী —রাজ্যশাসনপ্রণালী আলোচনা করিলে দেখা যায়, পালরাজারা প্রজাদিগের বিশেষ হিতকামী ছিলেন। তাঁহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। শূর ও সেন বংশীয় নরপতিরাও শাসন বিষয়ে পালরাজাদিগের অনুবর্ত্তী ছিলেন। মনে হয়, ইহাদের বিচার-প্রণালী পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইহারা অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন—বহু গুণী ব্যক্তি ইহাদের রাজসভার অলঙ্কার-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা রাজ্যশাসন-সৌকর্য্যার্থে বহু বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য—প্রাড়্‌বিবাক্, মহামাত্য, অমাত্য, রাজপণ্ডিত, ধর্ম্মাধিকার, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, নগরপাল প্রভৃতি বিশিষ্ট পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ভাষা।—তৎকালের রাজারা অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত হইত। কথ্য ভাষা কিরূপ ছিল জানিবার উপায় নাই। তখন গ্রন্থাদি প্রধানতঃ তালপত্রে লিখিত হইত—ভূর্জ্জপত্র এবং তেরেট্ট ছালও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন বঙ্গীয় অক্ষরেই গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ হইত। লিখিবার কালী ঘরে ঘরে প্রস্তুত হইত এবং কলমের সাহায্যে পুঁথি লিখিত হইত।

শিল্প।—পালদিগের সময়ে বহু মঠ এবং শূর ও সেনদিগের সময় রাজপ্রাসাদ, দেবালয় ও সেনানিবাস গঠিত হইয়াছিল। সেই সকল হর্ম্ম্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে বোঝা যায় যে তাহাদের নির্ম্মাণ প্রণালী অতি

উচ্চ শ্রেণীর ছিল। তাহা নির্ম্মাণের জন্য বর্ত্তমানকালের ইঞ্জিনিয়ারদিগের ন্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নৈপুণ্য ব্যতীত সম্ভব নহে। এই সকল গৃহাদি ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইত। তাহাতে বহুলরূপে প্রস্তরের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালাদেশে পাহাড় নাই, সম্ভবতঃ এই সকল প্রস্তর বৃহদ্বঙ্গের অন্তর্গত রাজমহলের পাহাড় হইতে আনীত হইয়াছিল। ইঁহারা ইষ্টক নির্ম্মাণে বিশেষ পটু ছিলেন—ইষ্টকেও শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইষ্টক ও পাথর গাঁথিবার জন্য তৎকালে যে মশলা (mortar) ব্যবহৃত হইত তাহাও সুদৃঢ়। পালযুগে ভাস্কর্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সেকালে বাঙ্গালী ভাস্কর ধীমান ও বীতপাল বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।[১]

এই সময়ে প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য বহু দীঘি খনিত হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যে এখনও অনেকগুলি বর্ত্তমান আছে।

এই কালের নির্ম্মিত প্রস্তর ও ধাতুময় দেবদেবীর মূর্ত্তি ও অট্টালিকার অংশবিশেষ হইতে চারুশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ লোক সম্ভবতঃ কুটীরে বাস করিত, সেগুলি এখনকার মত প্রস্তুত হইত।

তৎকালে প্রধানতঃ চারি প্রকার বস্ত্রের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ১। পত্রোর্ণ—ইহা নাগকেশর বৃক্ষজাত কীটের অংশু হইতে প্রস্তুত। নানা বর্ণের রেশমী কাপড় পাওয়া যাইত। এই সকল কাপড় রাজকোষে অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইত। ২। বাকলের কাপড়—শণ, পাট, ধঞ্চে প্রভৃতি গাছের ত্বক্ হইতে সূতা বাহির করিয়া বস্ত্র নির্ম্মিত হইত। এই বস্ত্রের নাম 'ক্ষৌম'। ৩। কার্পাস—বঙ্গদেশে কার্পাস বস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং এস্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্রের প্রসিদ্ধি আছে। ৪। ধনিগণের মধ্যে শালের ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়।

---

(১) ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস।

রাজারা হস্তী ও ঘোটক দুই-ই রাখিতেন। বাঙ্গলা দেশ হাতীর জন্মস্থান। তাহারা হাতী ধরিতে ও পালন করিতে জানিতেন। যুদ্ধের সময় হস্তী ও অশ্ব উভয়ই ব্যবহৃত হইত। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে নৌকার প্রচলন ছিল একথা বলাই বাহুল্য। বহু আকারের নৌকা এদেশে প্রস্তুত হইত, এবং বঙ্গের অধিবাসিগণ নৌচালন ও নৌগঠন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সমুদ্রগামী জাহাজও এদেশে প্রস্তুত হইত। পাল ও সেনরাজাদিগের অধীনে রীতিমত নৌবাহিনী থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধাতু ব্যবহার।—তৎকালে স্বর্ণের ব্যবহার ছিল। সুবর্ণ মুদ্রার সংখ্যা অতি অল্প ছিল রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন অধিক ছিল বলিয়াই মনে হয়। দ্রব্যসমুদায় বিনিময় দ্বারা পাওয়া যাইত।

অলঙ্কার।—তৎকালে প্রচলিত বিবিধ অঙ্গে ব্যবহৃত নানাবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অলঙ্কার স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুতেই প্রস্তুত হইত এবং অঙ্গশোভার জন্য প্রবাল, মুক্তা স্ফাটিক হীরকাদির ব্যবহার ছিল। চন্দন, অগুরু, সরল, দেবদারু, আমলকী, পরাগ, গোরোচনা, কস্তূরী, কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য অনুলেপন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

এই সময়ে প্রস্তুত যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত।

অধিবাসী।—নবদ্বীপে নানা জাতি লোকের বাস ছিল, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ভাগই অধিক। ব্রাহ্মণেরা তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন —রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক। বৈদিকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল বৈদিকেরা কান্যকুব্জাগত তথাকথিত আদিশূরানীত ব্রাহ্মণদিগের বংশধর নহেন। ইহাঁরা পরে আসিয়াছেন ও বেদাবহিত কার্য্য করিয়া বৈদিক সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। অন্যান্য জাতির বাস প্রচুর পরিমাণে ছিল।

ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অপর কোন বর্ণের সংস্কৃত শিক্ষা করিবার

অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণেরাও বৈদ্য ব্যতীত অপর কোন বর্ণকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া পাতক মনে করিতেন। সুতরাং বৈদ্য ব্যতীত অপর সকল বর্ণই সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। বৈদ্যের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। অন্যান্য জাতিরা প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ব্যবসায়।—তৎকালে শংখকার ও তন্তুবায়ের ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক ছিল। নবদ্বীপের প্রায় সমস্ত লোকেই ইহার অন্যতর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তৎকালে বিলাতী সূতার আমদানী হয় নাই। এদেশেই তাকু বা চরকাতে সূতা কাটা হইত। এই সূতাকাটা ব্যবসায় প্রায়ই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ছিল। এই ব্যবসায় দ্বারা অনেক নিঃস্ব পরিবারের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের আনুকূল্য হইত। পাঠকগণ যে "কাটনা কাটা" ধনের কথা শুনিয়াছেন এই সূতাকাটা ব্যবসায়কেই কাটনা কাটা কহিত।

গ্রাম্য দেবতা।—লক্ষ্মণসেনের স্বর্গারোহণের কিঞ্চিৎ পরেই বঙ্গে তান্ত্রিক মত প্রবলরূপে প্রচারিত হয়। এই নবদ্বীপ হইতেই উক্ত মত সম্প্রসারিত হইয়াছিল। মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্যগুলির তন্ত্রে বিশেষ প্রশংসা থাকায়, অনেকেই তন্ত্র মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন শ্যামা, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি তান্ত্রিক দেবমূর্ত্তি সকল প্রকাশিত ছিল না। তান্ত্রিক সন্ন্যাসিগণ স্থানে স্থানে ঘটস্থাপন করিয়া স্বীয় স্বীয় ইষ্টমন্ত্র সাধন করিতেন, কেহ কেহ বা মন্ত্রসিদ্ধ ও সিদ্ধ পুরুষরূপে সম্মানিত হইয়া, অলৌকিক কার্য্য দ্বারা সাধারণের নিকট দেবসম্মানে সম্মানিত হইতেন। তাহাদিগের আরাধনার স্থান "পীঠস্থান" বলিয়া উল্লিখিত হইত। নবদ্বীপে যে "পোড়ামাতা" দেবীর পীঠস্থান দৃষ্ট হয়, উহা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির প্রায় শত বৎসর পর একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর দ্বারা এইরূপে স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সন্ন্যাসী দক্ষিণা কালিকা

মন্ত্রে সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তজ্জন্য নানাস্থানের লোকেরা আসিয়া ঐ সন্ন্যাসীর ও দেবীর অর্চ্চনা করিতেন।

নবদ্বীপের অধিবাসিগণ অনেকেই উহার মানসিক পূজা দিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে উক্ত সন্ন্যাসী নবদ্বীপের কোন ব্রাহ্মণ কুমারের পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। বরদান-কালে ভ্রমবশতঃ সন্ন্যাসী স্বীয় সিদ্ধমন্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন। সিদ্ধমন্ত্র বহিস্ফুট হওয়ায় সন্ন্যাসী অতিশয় দুঃখিত হন এবং ঐ ব্রাহ্মণ কুমারকে ঐ ঘটে দক্ষিণাকালিকা দেবীর পূজা করিতে উপদেশ দিয়া নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঘট সেই স্থানেই রহিল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ-কুমার ও নবদ্বীপের অধিবাসী অনেকেই ঐ ঘটে পূর্ব্ববৎ পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঐ দেবী "গ্রাম্য দেবী"রূপে পরিণত হইলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে ন্যায় দর্শনের প্রথম চতুষ্পাঠী করেন, তৎকালে তিনি ঐ দেবীর ঘট গ্রামের প্রান্ত হইতে আনয়ন পূর্ব্বক গ্রামের মধ্যস্থানে এক বটবৃক্ষ মূলে স্থাপিত করেন। তদবধি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও ছাত্রবর্গ ঐ দেবীর পূজায় বিশেষ মনোযোগী হইলেন। কিছুদিন পরে গৃহদাহে উক্ত বটবৃক্ষ দগ্ধ হইলে ঐ স্থান 'পোড়াবটতলা' বলিয়া এবং ঐ দেবী 'পোড়ামা' অথবা 'বিদগ্ধজননী' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

"এই নবদ্বীপে নব দ্বীপাখ্যা এথায়।
প্রভুপ্রিয় শিবশক্ত্যাদি শোভে সদায়॥
তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্ —
শিবপঞ্চস্থিতং শক্তিসহিতং ভক্তিভূষিতং॥"

ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই নবদ্বীপে শক্তিসহিত পাঁচটী শিব বর্ত্তমান ছিলেন। বুড়াশিব, যুগনাথ, মালোদের

শিব, এলানে (আলোকনাথ) ও দণ্ডপাণি—সম্ভবতঃ উল্লিখিত শিবপঞ্চক। নরহরি-রচিত একটি পদে বুড়াশিবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"যা সবারে সদা শাশুড়ী ননদ পতি আদি সব পাড়য়ে গালি।
প্রতিদিন বুড়াশিবে পূজে কত আদরে কলঙ্ক হইব বলি॥"

(গৌরচরিত্র চিন্তামণি—বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫৩৬ পৃ)

এই বর্ণনায় দেখা যায় গৌরাঙ্গের সময়েও বুড়াশিব যথেষ্ট প্রভাবশালী। মালোদের শিব বুড়াশিবের বন্ধু বলিয়া পরিচিত, এবং ফলের দিন তিনি সর্ব্বপ্রথম বন্ধুর বাড়ী ফল গ্রহণ করিয়া অন্যত্র গমন করেন। ইহাতে মনে হয় মালোদের শিব বুড়াশিবের সমান প্রাচীন এবং গৌরাঙ্গের বহু পূর্ব্ব হইতেই এখানে পূজিত হইতেছেন। যুগনাথ ও দণ্ডপাণি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

——:)*(:——

দ্বিতীয় খণ্ড।

বাঙ্গালীর গৌরব।

নবদ্বীপ বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল বলিয়া ইহার গৌরব নহে। কারণ নবদ্বীপ অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী রাজনগরী ভারতবর্ষে অনেক ছিল। পক্ষান্তরে যে মহারত্ন পাইলে সকলেই আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, নবদ্বীপ বাঙ্গালী জাতির সেই জাতীয় গৌরবের জন্মভূমি। ইহাতেই নবদ্বীপ প্রকৃত গৌরব-মণ্ডিত।

ভারতভূমির পুরাতত্ত্বের যতই অনুসন্ধান হইতেছে, ততই দেখা যাইতেছে যে, কি গণিত ও জ্যোতিষ, কি সাহিত্য ও দর্শন, কি ধর্ম্ম ও নীতি, কি শিল্প ও বাণিজ্য, কি শৌর্য্য ও বীর্য্য, সকল বিষয়েই ভারত-ভূমি ভূমণ্ডলের রাজ্ঞীস্বরূপা ছিলেন। যে বিজ্ঞানের বলে বর্ত্তমান সভ্য জাতির এত উন্নতি, সেই বিজ্ঞানের মূল গণিত এই ভারতবর্ষেই উদ্ভূত হইয়াছে। আর্য্যভট, পরাশর, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে এই ভারতবর্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষ সভ্যতায় আদি, জ্ঞানে আদি, দর্শনে আদি, শিল্পে আদি—সুতরাং হিন্দুগণ সকল বিষয়েই জগতের শিক্ষক। ধর্ম্মে হিন্দু শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মে হিন্দু শ্রেষ্ঠ, আচারে বিচারে হিন্দু শ্রেষ্ঠ। হিন্দু সমাজের ন্যায় সমাজ কাহার আছে? হিন্দু-শাস্ত্রের ন্যায় শাস্ত্র কাহার? খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে প্রেমপূর্ণ সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের প্রথম প্রচার করেন। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতের সভ্যতা ও বিদ্যা বিষয়ের প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া ভারতবাসীর পূর্ব্ব-গৌরবের লুপ্ত স্মৃতি উদ্‌ঘাটিত করিয়া তুলিতেছেন। এই সকলের সহিত বঙ্গদেশের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এক ন্যায়-দর্শনই বঙ্গদেশকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও জগৎ-বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে।

এই নবদ্বীপই সেই ন্যায়-দর্শনের লীলাভূমি। এই স্থানে ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, ভারতের কুত্রাপি তাহা পরিলক্ষিত হয় না। এই স্থানে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উৎপন্ন ও প্রাদুর্ভূত হইয়া ন্যায়ের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব আলোচনা-পূর্ব্বক, গভীর ভাব পরিপূর্ণ গ্রন্থ-সমূহ রচনা করিয়া বাঙ্গালীর নাম গৌরবমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাসুদেব সার্ব্বভৌম জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া তৎকালে নিবদ্ধপ্রায় গৌতম-শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপ-ভূমিকে অলঙ্কৃত করেন। এই স্থানে কুশাগ্রবুদ্ধি তার্কিক-চূড়ামণি রঘুনাথ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করতঃ নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়-তত্ত্বে কয়জন মনুষ্য পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? এই স্থানেই মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রামভদ্র সার্ব্বভৌম, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য এবং বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উৎপন্ন হইয়া ন্যায়ের বহুবিধ পুস্তক-রত্নে নবদ্বীপ-ন্যায়ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই স্থানেই স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক স্মৃতিশাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া, বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল ও এই নবদ্বীপভূমিকে সরস্বতীর "পীঠরূপে" পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন। এই স্থানেই ধর্ম্মবীর প্রেমিক-চূড়ামণি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শরীর পরিগ্রহ করিয়া পরমার্থ-ধর্ম্ম-তত্ত্বের চরম উন্নতি ও বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সার্ব্বজনীন উদার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং অসাধারণ চরিত্রের কয়জন মনুষ্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন? অতএব এই নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার নাম সমুজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া বঙ্গভূমিকে জগৎ-বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে—এই নিমিত্ত নবদ্বীপ ভূমি বাঙ্গালী মাত্রেরই তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং এই নিমিত্তই নবদ্বীপ "শ্রীধাম" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্ব।

পাঠান শাসন।—মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলিজির গৌড় অধিকার হইতে বঙ্গের ইতিহাসে মুসলমান রাজত্বের আরম্ভকাল গণনা হইয়া থাকে। কিন্তু বখ্‌তিয়ার সমস্ত বাঙ্গালা অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি গৌড়নগর ও তৎসন্নিহিত কিয়দংশ স্থান জয় করিয়া দেবকোটে আপন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বখ্‌তিয়ার হইতে বাহাদুর শাহের রাজত্বকাল ১৩৩৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত, যে কয়জন পাঠান নবাব হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সময়েও কিছুমাত্র রাজ্যবৃদ্ধি হয় নাই। ইঁহারা সকলেই দীল্লির অধীনতা স্বীকার করিতেন। বীরভূম, দক্ষিণ রাঢ় ও বগড়ি প্রদেশ তৎকালে স্বাধীন ছিল।

সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম তৎকালে দক্ষিণ বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। খৃষ্ট চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সপ্তগ্রাম মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়, এবং সে স্থানে ফৌজদার নামধেয় একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। রাজস্ব আদায়, প্রজাদিগের স্বত্বাস্বত্বের বিচার ভূম্যধিকারীদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। জমীদার ও ফৌজদার উভয়ে মিলিত হইয়া কার্য্য করায় পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হওয়ায় পরাধীনতা-জনিত কোন ক্লেশ বা অসুবিধা অনুভূত হইত না।

১৩৩৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে কয়জন পাঠান নবাব রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই দীল্লির অধীনতা স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা সকলেই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করায়, তৎকালীন বাঙ্গালাকে স্বাধীন পাঠান রাজ্য বলিতে পারা যায়। আবার মুসলমান নবাবেরাও প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্য শাসন করিতেন না। ভূস্বামিগণই শাসক ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র ও রীত্যনুসারে প্রজাদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারকার্য্য সংসাধিত হইত। রাজধানী ও তৎসন্নিহিত স্থান

ব্যতীত, প্রজাদিগের সহিত মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না।

এই পাঠানদিগের সময়ে সপ্তগ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামে দুই সহোদরকে রাজত্ব করিতে দেখিতে পাই। তাঁহারা বিদ্যার উৎসাহদাতা ও পণ্ডিতপাতা ছিলেন।

"হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।
সপ্তগ্রাম বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥" চৈ, চ

হরিহোড়।—পাঠানদিগের শাসন-সময়ে নবদ্বীপের উত্তর বড়গাছি গ্রামে হরিহোড় নামক জনৈক রাজাকে রাজত্ব করিতে দেখা যায়। এই বড়গাছি গ্রাম নদীয়া জেলার নকাসীপাড়া থানার অন্তর্গত, এবং জলাঙ্গী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। হরিহোড় কায়স্থ-কুলসম্ভব বিষ্ণুহোড়ের পুত্র।[১] হরিহোড়ের সময়ে বর্দ্ধমান, পাটলি, সমুদ্রগড় ও নদীয়ার কোন ভূস্বামীরই নাম শ্রুতিগোচর হয় নাই। তিনি ঐ সকল প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। নদীয়া, বাগোয়ান, পাটলি, অগ্রদ্বীপ, সাতসইকা, শান্তিপুর, প্রভৃতি বহু পরগণা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময়ে দীল্লির সম্রাট্‌গণ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বারানসী, যৌনপুর, মিথিলা ও বঙ্গদেশ দীল্লির অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গীয় নবাবগণও পরস্পর গৃহবিবাদে হীনবল হইয়া নবাবী পদ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। রাজ্যবৃদ্ধি বা রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহারা মনোযোগ করিতে অবসর পান নাই। সুতরাং হরিহোড় প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি এরূপ ক্ষমতাশালী ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন যে, রাজলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে অচলভাবে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি যে, স্বাধীন রাজা ছিলেন

(১) অন্নদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম লয়ে বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষ্ণুহোড় পায় সুখ পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল॥ (অন্নদা মঙ্গল)

তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। তৎকালে গৌড়েশ্বর উপাধিটি সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূস্বামিগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে গৌড়েশ্বর হউন আর নাই হউন, একটু ক্ষমতাশালী রাজা হইলেই গৌড়েশ্বর নামে উল্লিখিত হইতেন। আমরা হরিহোড়কে গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হইতে দেখিতে পাই।

গৌরাঙ্গদেবের সময়ে হরিহোড়ের পুত্র কৃষ্ণদাসকে বড়গাছিতে রাজত্ব করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"বড়গাছি নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস॥ চৈ, ভা অন্ত্য, ষষ্ঠ

আবার ভক্তিরত্নাকরে—

"কৃষ্ণদাস রাজা হরিহোড়ের নন্দন।
মহাবুদ্ধিমন্ত শীঘ্র কৈল আয়োজন॥" ১২শ তরঙ্গ

গৌরাঙ্গের সময়ে হরিহোড়ের পুত্র কৃষ্ণদাস বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে আমরা হরিহোড়কে গৌরাঙ্গদেবের এক পুরুষ পূর্ব্বে—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান দেখিতে পাই।

কৃত্তিবাস —বঙ্গের আদি কবি কৃত্তিবাস এই হরিহোড়ের রাজ-সভাতেই অমৃতগাথা রামায়ণ রচনা করেন। তিনি রামায়ণে যে আত্ম-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ বঙ্গবাসীর মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"রাজ পণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেওয়ালে পড়ে কাঠি।
শীঘ্র ধায়ি আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটী কৃত্তিবাস।

রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাঁহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আগে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজপাশে।
পাত্রমিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুমার॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিতে লাগে চমৎকার॥"

এই বর্ণনায় দেখিতে পাই, কবি কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভাবর্ণনে বুঝিতে পারা যায় যে, এই গৌড়েশ্বর গৌড়াধিপ মুসলমান নরপতি নহেন। তাঁহার বর্ণিত সভার পাত্রমিত্রগণ সকলেই হিন্দু। তৎকালে মুসলমান রাজসরকারে হিন্দু কর্ম্মচারী ছিলেন না, একথা বলি না। কিন্তু মুসলমান কর্ম্মচারী যে যথেষ্টই ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাস-বর্ণিত সভায় একটীও মুসলমান কর্ম্মচারীর নাম নাই। ইহাতে ঐ সভা যে মুসলমান গৌড়েশ্বরের সভা নহে, তাহা স্পষ্ট বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ কৃত্তিবাস-বর্ণিত এই গৌড়েশ্বরকে রাজা গণেশ বা কংস-নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় যে, রাজা গণেশ যদিও হিন্দুনৃপতি ছিলেন, তথাপি তিনি মুসলমানদিগের অধিকারে একেবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার রাজ্যগ্রহণের পর মুসলমানদিগের যাহার যে অধিকার ছিল, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাহা বজায় রাখিয়াছিলেন।[২] এমন কি রাজা গণেশের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা এই হিন্দু ভূপতিকে আপনাদের ধর্ম্মের লোক বলিয়া সমাধি দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।[৩] এমন অবস্থায় তাঁহার রাজসভায় যে মুসলমান কর্ম্মচারী ছিলেন না তাহা অসম্ভব। কিন্তু উক্ত বর্ণনায় একটীও মুসলমান কর্ম্ম-চারীর উল্লেখ না থাকায়, তাহা যে গণেশ বা কংশনারায়ণের সভা নহে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আরও সময় গণনায় রাজা গণেশকে কৃত্তি-বাসের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া জানা যায়। গণেশ ১৩৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন।[৪] কবি কৃত্তিবাস খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে।[৫] এই সময়েই মহারাজ হরিহোড় বড়গাছির রাজা ছিলেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কৃত্তিবাসের উল্লিখিত গৌড়েশ্বর হরি

(২) তারিখ ই-ফেরেস্তা, পারস্য মূল, নওলকিশোর প্রেস, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ২৯৭।

(৩) Stewart's History of Bengal p. 107.

(৪) মুদ্রাদি দেখিয়া রাজা গণেশের সময় খৃঃ ১৪০৯-১৪ স্থিরীকৃত হইয়াছে। রাজা গণেশের সময় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন।

(৫) দীনেশ বাবু সমসাময়িক সাহিত্য ও কুলপঞ্জিকার আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে কৃত্তিবাস ১৪৪০ খৃঃ অঃ বা তৎসন্নিহিতকালে জন্ম গ্রহণ করেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১০৭)

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার, চতুর্থ সংখ্যায় জ্যোতিষিক আলোচনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে কৃত্তিবাস ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে (১৩৫৪ শকে) ১১ই ফেব্রুয়ারি রবিবারের রাত্রিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় ১৩৪০ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কৃত্তিবাসের জন্ম শক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এবার তিনি 'পূর্ণ মাঘ মাস' স্থলে 'পুণ্য মাঘ মাস' এই পাঠ গ্রহণ

হোড়কেই নির্দ্দেশ করিতেছে। বিশেষতঃ, তৎকালে শান্তিপুর আদি প্রদেশ হরিহোড়ের রাজ্যান্তর্গত ছিল। আমরা অন্নদামঙ্গল পাঠে দেখিতে পাই, হরিহোড়ের গৃহ হইতে অন্নদাদেবী ভবানন্দমজুমদারের আলয়ে গিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, হরিহোড়ের রাজ্য ভবানন্দ পাইয়াছিলেন। তাহা হইলে, শান্তিপুর আদি প্রদেশ নিঃসন্দেহ হরিহোড়ের অধীন ছিল। কৃত্তিবাস এই স্বদেশীয় রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যে কোন দূরদেশীয় রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন তাহা সম্ভব নহে।

কৃত্তিবাসের স্বরচিত জীবনচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি একাদশ বর্ষ বয়সে উত্তরদেশে বড়গঙ্গাপার পড়িতে গিয়াছিলেন।

"এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারে উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার॥"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১৭ নং অযোধ্যাকাণ্ডের খণ্ডিত পুথির বর্ণনায় দেখা যায় যে, কৃত্তিবাসের অধ্যাপকের গৃহ রাঢ়দেশে এবং তাঁহার উপাধি আচার্য্যচূড়ামণি ছিল।—

"ছোটর বন্দো বড়র বন্দো বড় গঙ্গার পার।
জথা তথা করিয়া বেড়ান বির্দ্যার উদ্ধার॥

করিয়া কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩৯৯ খৃঃ (শক ১৩২০) ১২ই জানুয়ারী স্থির করিয়াছেন। যদি ১৩৯৯ খৃঃ অঃ কৃত্তিবাসের জন্মকাল এবং রাজা গণেশের রাজ্যকাল যদি ১৪১৪ খৃঃ অঃ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও মাত্র ১৫ বৎসরের বালক কৃত্তিবাসের পক্ষে গণেশের রাজসভায় উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই অল্প। পরন্তু 'পূর্ণ' শব্দকে 'পুণ্য' বলিয়া গ্রহণ করাও সমীচীন নহে। কারণ, 'পুণ্য' শব্দ প্রাচীন পুথিতে 'পূর্ণ' রূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ার যত সম্ভাবনা 'পূর্ণ' আকারে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা তাদৃশ বলবান্ নহে। রাজা গণেশের সময়ের সহিত কৃত্তিবাসের সময়ের ঐক্য রাখিবার জন্য দ্বিতীয় গণনার অবতারণা এবং পূর্ণ স্থানে পুণ্য পাঠের কষ্টকল্পনা। এরূপ অবস্থায়, যোগেশ বাবুর উল্লিখিত প্রথম গণনায় লব্ধ কালই গ্রহণ যোগ্য।

রাড়া মধৈ বন্দিপু আচার্য্যচূড়ামণি।
জার ঠাই কির্ত্তিবাস পড়িলা আপুনি॥"

পূর্ব্ব বিবরণ অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ বলেন কৃত্তিবাস বড়-গঙ্গাপারে যশোহরে বা পদ্মাপারে পড়িতে গিয়াছিলেন। ইহা সম্ভবপর নহে, কারণ উক্ত স্থান ফুলিয়ার উত্তরে নহে—পূর্ব্বে, এবং রাঢ়দেশের মধ্যেও নহে।

আমাদের মতে, ১১ বৎসরের শিশু কৃত্তিবাস দূরদেশে না যাইয়া, পাঠার্থ নিকটবর্ত্তী নবদ্বীপেই আসিয়াছিলেন। এরূপ মনে করিবার অনেকগুলি কারণ বর্ত্তমান আছে। কৃত্তিবাসের সময়েও নবদ্বীপ বিদ্যার আবাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, এবং নানা দূরদেশ হইতে পাঠার্থিগণ তখনও নবদ্বীপে আসিতেন।[৬] জগন্নাথ মিশ্র, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, চট্টগ্রামবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, দাক্ষিণাত্যবাসী আনন্দ ভট্ট, শ্রীবাস ইত্যাদি তৎকালীন বিদেশাগত অনেক পঢ়ুয়ার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। নবদ্বীপ রাঢ়দেশের অন্তর্গত এবং ফুলিয়ার উত্তর দিকে অবস্থিত। তখন নবদ্বীপে শ্রীকর আচার্য্যচূড়ামণি ও তৎপুত্র শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণি অধ্যাপকদ্বয় বর্ত্তমান ছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শ্রীনাথ আচার্য্য-চূড়ামণির ছাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃত্তিবাস শ্রীকর আচার্য্যচূড়ামণির ছাত্র ছিলেন বলিয়াই প্রতীতি হয়। নবদ্বীপের পশ্চিম-প্রবাহিত গঙ্গার পর-পারে বিদ্যানগরে তখন চতুষ্পাঠীসমূহ অবস্থিত ছিল। কৃত্তিবাস ফুলিয়া ও গুপ্তিপাড়ার নিম্নস্থ গঙ্গা পার হইয়া বিদ্যানগরে উপনীত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানের গঙ্গা 'বুড়ীগঙ্গা' বা 'বড় গঙ্গা' নামেই অভিহিত হইত।[৭]

(৬) "নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥ চৈ, ভা

(৭) ডাহিনে শান্তিপুর বহে বামে গুপ্তিপাড়া॥
কোদালিয়া বায় সাধু ত্বরিত বাহিয়া।
বুড়িগঙ্গা ঘাটে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥ ক, ক, চ—গঙ্গার উৎপত্তি কথন।

নবদ্বীপই যে কৃত্তিবাসের পাঠগৃহ তাহা বলিবার আরও কারণ আছে। তিনি স্বরচিত রামায়ণ গ্রন্থে নবদ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন।

গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হইয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া॥
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
একরাত্রি গঙ্গা তথা করিল বিশ্রাম॥ আদিকাণ্ড

এই স্থানে তিনি নবদ্বীপকে তীর্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপ পুণ্যস্থান অর্থে তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কৃত্তিবাস গঙ্গাতীরে আরও দুইটী তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন—তাহা সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী ও সাগর-সঙ্গম মহাতীর্থ। ত্রিবেণী ও সাগর-সঙ্গম পূর্ব্বাপর তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তীর্থ শব্দে শিক্ষাগুরু ও পুণ্যস্থানকে বুঝায়। নবদ্বীপে কৃত্তিবাসের গুরুগৃহ থাকায়, তিনি এই স্থানকে তীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

বুদ্ধিমন্ত খান্।—পাঠান রাজত্বের শেষ ভাগে খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষ ও ১৬শ শতাব্দীর প্রথমে বুদ্ধিমন্ত খান্ নবদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতের বহুস্থানে তাঁহার নামের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থপাঠে ও তাঁহার উপাধি 'খান্' হইতে মনে হয় যে তিনি পাঠান নবাবের অধীনে নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, বহু পদাতিক সৈন্য তাঁহার রাজ্য-রক্ষার্থে সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিত। গৌরাঙ্গদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্র তাঁহার রাজসভার পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারই যত্নে গৌরাঙ্গদেবের বিবাহ রাজকুমারোচিত সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং এই বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বুদ্ধিমন্ত খান্ই বহন করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গদেবের লক্ষ্মীবেশে নৃত্যের সম্পূর্ণ আয়োজন তিনিই করেন। তিনি চৈতন্যদেবের একান্ত অনুগত ছিলেন এবং আমরণ তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছিলেন।

আনন্দ ভট্ট —দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড় বংশীয় অনন্ত ভট্টের কুলোদ্ভব আনন্দ ভট্ট নবদ্বীপপতি বুদ্ধিমন্ত খাঁর সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। তিনি ১৪৩২ শাকে (১৫১০ খৃঃ) 'বল্লালচরিতম্' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থে মহারাজ বল্লালসেনের চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকের শেষে লিখিত হইয়াছে—

"নবদ্বীপপতেঃ শ্রীমদ্বুদ্ধিমন্তস্য ভুভুজঃ।
সমাসীনস্য সদ্বুদ্ধেরগ্রে পঠনপূর্ব্বকম্॥
শাকে চতুর্দ্দশশতে মনুষ্যরদনাযুতে।
পৌষশুক্লদ্বিতীয়ায়াং তজ্জন্মতিথিবাসরে॥
আনন্দভট্ট বিদুষা বিদগ্ধকুলবেধসা।
বল্লালচরিতং তস্মৈ ময়া দত্তং সহাশিষা॥

ইতি—দাক্ষিণাত্যদ্রাবিড় শ্রীমদনন্ত ভট্টবংশোদ্ভব শ্রীমদানন্দ ভট্ট মহামহোপাধ্যায় কৃত খিল বল্লালচরিতং সমাপ্তমিতি।"

(এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বল্লালচরিতম্)

পাঠান শাসন সময়ে প্রজারাও সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিল। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন চিন্তা ছিল না। আহারীয় শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। তৎকালে বঙ্গদেশের শস্য বড় বাহিরে যাইত না। গাভীগণ প্রচুর দুগ্ধ দান করায়, দুগ্ধজাত পদার্থের অভাব ছিল না। সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত থাকিয়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। পূজা-হোমাদি ব্রতানুষ্ঠান ও নিত্যনৈমিত্তিক পুণ্যকার্য্য বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হইত। এই সকল কর্ম্মে দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান থাকায় ব্রাহ্মণদের সংসারযাত্রা অক্লেশে নির্ব্বাহিত হইত। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্তমনে শাস্ত্রালোচনা, বিদ্যাচর্চ্চা ও স্বধর্ম্মে নিরত থাকিবার অবসর পাইতেন।

পাঠান শাসনকালে বঙ্গভূমি এক প্রকার স্বাধীন ছিল বলিতে পারা

যায়। সেই স্বাধীনতায় বঙ্গবাসিগণ আবার স্বাধীন চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় সাদরে অমৃতময়ী কবিতা-সকল রচনা করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ, রঘুনন্দন, চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন। চৈতন্যের সময় নবদ্বীপ প্রকৃষ্টরূপে প্রাধান্য-লাভ করিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হয়। তাঁহার রজতরশ্মিপাতে বঙ্গবাসী ধর্ম্মপথ চিনিল, তাহার নৈতিক জীবন গঠিত হইতে চলিল। সেই সুধাসেকে বঙ্গভাষা নবজীবন লাভ করিল। চন্দ্রোদয়ে জলধির উচ্ছ্বাসের ন্যায় হরিনাম উচ্ছ্বাসে সমস্ত ভারতভূমি প্লাবিত হইল। এই নবদ্বীপ হইতে ন্যায়, স্মৃতি ও ধর্ম্ম—তিন বিষয়ের তিনটি অভিনব শ্রোত ত্রিধারায় নিঃসৃত হইয়া, সমস্ত ভারতভূমি ভাসাইয়া দিল। ক্রমান্বয়ে উক্ত তিন বিষয়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

মোগল-শাসন।—মোগলদিগের সময়ে বঙ্গদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে পরাধীন হইয়াছিল। মোগল বাদসাহ আক্‌বরের রাজত্বকালে রাজা তোডরমল কর্ত্তৃক সমস্ত বাঙ্গালার পরিমাপ স্থিরীকৃত হইয়া রাজস্ব অবধারিত হয়; সুতরাং এই সময় হইতেই প্রত্যেক প্রজা রাজশক্তি অনুভব করিতে থাকে। মোগল-সম্রাট্‌গণ শাসনের সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত সমস্ত সাম্রাজ্যকে বঙ্গাদি কয়েক সুবায় বিভক্ত করেন। ঐ সকল সুবার শাসন-কর্ত্তারা সুবাদার বা নবাব নামে অভিহিত হইতেন। প্রত্যেক সুবা কতকগুলি সরকারে ও প্রত্যেক সরকার কতিপয় মহাল বা পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক পরগণার উপর কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মোগলদিগের সময়ে নদীয়া, সরকার সাতগাঁর অধীন একটী পরগণা, এবং ইহার বার্ষিক কর ১৫০৮৮২০ দাম বা ৩৭৭২০৷৹ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল।[৬]

---

(৬) আইন্-ই-আকবরী দ্রষ্টব্য।

তৎকালে প্রজারাই ভূমির প্রকৃত স্বামী ছিল। প্রজার নিকট খাজনা আদায় জন্য কানন্‌গো, তহশীলদার, জমীদার প্রভৃতি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের সংগৃহীত রাজস্বের উদ্বৃত্ত অর্থরাশি সম্রাট্‌সদনে দীল্লিতে নীত হইত। তখন চারুশিল্প ও হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণের চরম উন্নতি হইয়াছিল। মোগল-সাম্রাজ্যের গৌরব ম রাসন ও জগতের অদ্বিতীয় মর্ম্মর-হর্ম্ম্য আগরার তাজমহল ইহার নিদর্শণ-স্বরূপ ভারত-বক্ষে বর্ত্তমান আছে। এই সকল নির্ম্মাণে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যে ব্যয় হইয়াছিল, বঙ্গদেশ তাহার উপযুক্ত অংশ বহন করিয়াছিল। এই সময়েই বঙ্গদেশে কতকগুলি প্রতাপশালী হিন্দু জমীদারের অভ্যুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। তখন হইতেই বর্দ্ধমান, পাটলি, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, সমুদ্রগড় ও কৃষ্ণনগরের রাজগণের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইতে আরম্ভ হয়।

১৫৭৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে কয়জন মোগল শাসনকর্ত্তা বঙ্গদেশে ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মুর্শিদকুলী খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই রাজধানী ঢাকা হইতে মুকৃশুদাবাদে স্থানান্তরিত করিয়া স্বীয় নামানুসারে রাজধানীর নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তিনি অনেক নিয়মের পরিবর্ত্তন করেন। আক্‌বরের সময় হইতে আয় ব্যয় স্থির ও রাজস্ব সংগ্রহ করা দেওয়ানের কার্য্য ছিল; এবং রাজ্যরক্ষা ও বিচারাদি কার্য্যের ভার নাজিমের হস্তে ছিল। জমীদারবর্গ রাজস্ব আদায় দিতে না পারিলে, তাঁহাদের হস্ত হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত বা অনুগৃহীত ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইত। মুর্শিদকুলী খাঁ সম্রাট্‌কে সন্তুষ্ট করিয়া দেওয়ানী ও নাজিমী উভয়বিধ কার্য্যই স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার সময়ে প্রজাগণ বিশেষ অত্যাচার-পীড়িত হইয়াছিল। তিনি প্রথমতঃ জমীদারগণের হস্ত হইতে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া তৎস্থলে আমিন নিযুক্ত করিতে লাগিলেন।

তাহাতে রাজস্ব আদায়ের সুবিধা না হওয়ায় কোন কোন স্থানে কার্য্যভার জমীদারের উপরও অর্পিত হইয়াছিল। তিনি জমীদারগণের নিকট রাজস্ব আদায়ের কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কোন জমীদার যথা-সময়ে করদান করিতে না পারিলে, মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাকে রাজধানীতে আনাইয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিতেন। সেই কারাগারে বন্দীকৃত জমীদারবর্গের শাস্তিবিবরণ শুনিলে, স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহাদিগের অদৃষ্টক্রমে, কেহ পূতিগন্ধ বিষ্ঠাহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইতেন। নবাব এই বিষ্ঠা-কুণ্ডের নাম বৈকুণ্ঠ রাখিয়া হিন্দু-বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। কাহাকেও বা আহারের জন্য ধান্য প্রদত্ত হইত; দুর্ভাগ্য বন্দী ধান্য চিবাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির বিফল প্রয়াস করিত। তৃষ্ণানিবারণার্থ কেহ বা লবণমিশ্রিত দুগ্ধ পাইতেন; সৌভাগ্যবলে সেই অমৃত পানে অচিরেই উদরাময়ে তাঁহার বন্দিজীবনের সমস্ত সুখদুঃখের পরিসমাপ্তি হইত। কাহাকেও বা বলপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, তাঁহার উজ্জ্বল কুলগৌরবে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা লেপিত হইত।— অবশ্য, এইসকল দণ্ড অসংযতচিত্ত নবাবের অনুগ্রহ নিগ্রহের উপর নির্ভর করিত। সুতরাং মোগলদিগের সময়ে রাজস্ব আদায় ও শাসনবিষয়ে বঙ্গদেশ প্রকৃতপ্রস্তাবে পরাধীনতার ক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিতে হইবে।

মোগল-শাসনে বিদ্যাবিষয়ের বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে, পাঠান-সময়ে নদীয়ায় ত্রিধারামিলিত যে প্রবল বিদ্যাস্রোত বহিয়াছিল তাহাই ইহাদের শেষ সময় পর্য্যন্ত ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হইতেছিল। মোগল সময়ে, গদাধর ভট্টাচার্য্য, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি মনীষিমণ্ডল জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ-ভূমিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মিথিলা বিদ্যালয়

নবদ্বীপে ন্যায়চর্চ্চার পূর্ব্বে মিথিলা বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল। কি দর্শন, কি স্মৃতি, কি সাহিত্য—সকল বিষয়েই মিথিলা প্রাধান্য-লাভ করিয়াছিল। এই স্থানেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ রাজর্ষি জনক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই স্থানেই লক্ষ্মীর আদর্শ-স্বরূপা সীতাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রদেশেই মহাযোগী বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানেই মহামুনি গৌতম প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি-বলে ন্যায়-দর্শনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। প্রায় সহস্র বৎসর গত হইল এই মিথিলাতেই বাচস্পতিমিশ্র শরীর-পরিগ্রহ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। ন্যায়সূচীনিবন্ধ টীকার শেষে তাহার সমাপ্তিকাল এইরূপ লিখিত আছে—

> "ন্যায়সূচী নিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে।
> শ্রীবাচস্পতি-মিশ্রেণ বস্বঙ্কবসুবৎসরে॥

অর্থাৎ, উক্ত গ্রন্থ ৮৯৮ সংবতে (৮৪১ খৃঃ অঃ) সমাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বাচস্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকর রচিত 'ন্যায়বার্ত্তিক' অবলম্বনে 'ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

আবার, এই মিথিলা-প্রদেশেই মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া গৌতমসূত্রকে মূল অবলম্বন করতঃ প্রমাণ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই প্রমাণ চতুষ্টয় নিরূপণ করিয়া 'চিন্তামণি' নামক নব্য-ন্যায়ের সূত্রপাত এবং গৌতমের মতকে প্রবল ও দৃঢ়ীভূত করিয়া ভারতে ন্যায়বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানেই সুপ্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া 'কুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লক্ষণাবলী গ্রন্থের শেষভাগে তাহার সমাপ্তি-কাল এইরূপ আছে—

"তর্কাম্বরাঙ্ক প্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্॥"

অতএব, আমরা ৯০৬ শকাব্দে (৯৮৪ খৃঃ অঃ) উদয়নাচার্য্যকে বর্ত্তমান দেখিতে পাই। তিনি কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে গৌড়মীমাংসক নামে এক নৈয়ায়িকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ে ভূরিস্থষ্টি গ্রামে শ্রীধরভট্টকে প্রধান নৈয়ায়িকের পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। উদয়নাচার্য্য এতদ্ব্যতীত 'আত্মতত্ত্ববিবেক' বা 'বৌদ্ধাধিকার', বাচস্পতি-মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য অবলম্বনে 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি', রাঢ়দেশীয় শ্রীধরভট্টের ন্যায়কন্দলী গ্রন্থের 'গুণকিরণাবলী' নামক ভাষ্য ও 'বোধসিদ্ধি' নামক একখানি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন।

আবার সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর এই মিথিলা প্রদেশেই বিসফি-নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া কবিত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই স্থানেই বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায়, মুরারি মিশ্র, পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি উপাধ্যায়গণ শরীর-পরিগ্রহ করিয়া ন্যায়ের উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়া, মিথিলা ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে ন্যায় বিদ্যার উন্নতির পূর্ব্বে মিথিলায় যে সকল পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের যত্নে প্রায় তিন শত বৎসর ন্যায়-শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। খৃষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে[১] এই শেষোক্ত ব্যক্তি

(১) পক্ষধর মিশ্রের প্রত্যক্ষালোক নামক টীকার একখানি প্রতিলিপির তারিখ "শুভমস্তু শ্রীরস্তু শকাব্দা॥ লসং ১৫০৯ তেং শ্রাবণস্য ৬॥" এইরূপ লিখিত দেখিয়া, ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত তারিখ লক্ষ্মণ সংবৎ বলিয়া মনে করিয়াছেন। এবং ১৫০৯ সংখ্যা লক্ষ্মণ সংবৎ হওয়া অসম্ভব হেতু, উহাকে ১৫৯ সংখ্যা গ্রহণ করিয়া পক্ষধরের সময় খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগ স্থির করিয়াছেন। (Notices of Sanskrit Mss. 5th part, p. 299, No. 1976) এখন আর এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। "পক্ষধর মিশ্র কর্ত্তৃক তালপত্রে লিখিত বিষ্ণুপুরাণের এক পুথি মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুথি এক্ষণে দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত যোগিয়াড়া গ্রামে কেশব ঝা নৈয়ায়িকের বাটিতে আছে। উক্ত বিষ্ণুপুরাণের হস্তলিপির শেষভাগে এইরূপ লিখিত আছে—

পক্ষধর মিশ্র জীবিত ছিলেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম জয়দেব মিশ্র তর্কালঙ্কার। ইনি প্রসিদ্ধ যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র এবং হরি মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র[২] বলিয়া স্বরচিত গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ পক্ষধর নামের বিভিন্ন অর্থ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন তিনি এক পক্ষ মধ্যে কেবল একদিন অধ্যয়ন করিতেন। কেহ বলেন, তিনি একদিন পঞ্জিকা দেখিয়া এক পক্ষের বিবরণ বলিতে পারিতেন এবং কেহ বলেন তিনি একদিন পড়িয়া এক পক্ষ মনে রাখিতে পারিতেন। ইহা অসম্ভব কেননা যিনি পনর দিন কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে পারিতেন, তিনি যে ষোল দিন হইলে তাহা ভুলিয়া যাইবেন ইহা অস্বাভাবাবিক। কেহ কেহ বলেন যে তিনি তর্ককালে দুর্ব্বল পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তিবলে স্বমত সমর্থন করিতে পারিতেন বলিয়া, স্বীয় নাম ও চতুষ্পাঠীর নাম অপেক্ষা, "পক্ষধর" নামে বিশেষ বিখ্যাত হন।

মিথিলার ঐ সকল ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগের দ্বারা ন্যায়ের অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থাদি মিথিলা ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যাইত না। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। কেহ একখানি পুস্তক রচনা করিলে

বাণৈর্ব্বেদযুতৈঃ সশম্ভুনয়নৈঃ সংখ্যাং গতে হায়নে
শ্রীমদ্‌গৌড়ভূমিভুজো গুরুদিনে মার্গো পক্ষে সিতে।
ষষ্ঠ্যাস্তামমরাবতি নধিবসন্ যা ভূমি দেবালয়া
শ্রীমৎ পক্ষধরঃ সুপুস্তকমিদং শ্রদ্ধং ব্যলেখীদ্ দ্রুতম্॥"

(ভারতবর্ষ ১৩৩০ আশ্বিন পৃঃ ৫২৭-২৮)

অর্থাৎ গৌড় মহীভুজের (লক্ষ্মণ সেনের) ৩৪৫ অব্দে অগ্রহায়ণ মাসে বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীমৎ পক্ষধর অমরাবতী নগরে বাস করিবার সময়ে উক্ত পুস্তকের লিখন শুদ্ধরূপে দ্রুত সমাপন করেন। এই লিপি অনুযায়ী আমরা পক্ষধরকে ৩৪৫ লসং বা ১৪৫৪ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান দেখিতে পাই। এক্ষণে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় নির্দ্দিষ্ট লিপির ১৫০৯ সংখ্যাকে শকাব্দ গ্রহণ করিলে আর কোন মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় না।

(২) অধীত্য জয়দেবেন হরিমিশ্রাৎ পিতৃব্যতঃ।
তত্ত্বচিন্তামণেরিত্থমালোকোঽয়ং প্রকাশ্যতে॥

(India Office পুস্তক তালিকা, ৬২৮ পৃ, ১৯২৭ সং)

তৎকালে হস্তে লিখিয়া লইতে হইত। ইহাতে শিক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিত। পুস্তক অভাবে অনেকেরই অধ্যয়ন হইত না। তৎকালে কেহ কোন পুস্তক রচনা করিলে, তিনি তাহা গোপনে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। অদ্যাপি জ্যোতিষাদি কোন কোন বিদ্যাকে গোপনে রাখিতে দেখা যায়। ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থাদি গোপনে রাখা রীতি ছিল। এই কারণে ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থ মিথিলা ব্যতীত আর কুত্রাপি পাওয়া যাইত না। মৈথিল অধ্যাপকগণ ঐ সকল গ্রন্থ অতি যত্ন-সহকারে গোপনে রাখিতেন। তখন ভারতে মিথিলার অধ্যাপক ব্যতীত আর কাহারও উপাধি দিবার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং ন্যায়শিক্ষার্থী ছাত্রগণ মিথিলায় গিয়া মৈথিল উপাধ্যায়গণের নিকট শিক্ষা-লাভ করিতেন ও উপাধি প্রাপ্ত হইতেন।

যখন কোন ছাত্র শিক্ষার্থী হইয়া মিথিলায় গমন করিতেন, তখন অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে অধ্যয়নার্থ গ্রন্থাদি প্রদান করিতেন, এবং পাঠ শেষ হইলেই ঐ সকল গ্রন্থ পুনর্গ্রহণ করিয়া আপন অধিকারে রাখিতেন। যখন কোন ছাত্র স্থানান্তরে বা পাঠ সমাপনান্তে স্বদেশে যাইতে উদ্যত হইতেন তখন পাছে কোন গ্রন্থ বা টীকা বা গ্রন্থের কোন অংশ তৎকর্তৃক অপহৃত হয়, এবং তদ্দারা স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়, এই ভয়ে তাহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইত। মিথিলা এই রূপে প্রায় তিন শত বৎসর আপন অনন্যসাধারণতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে তৎকালে ব্রাহ্মণগণ স্বীয় স্বীয় বিদ্যাবিশেষকে গোপনে রাখিতেন। এখনও তাঁহাদিগকে বিদ্যা-বিশেষের শিক্ষা দিতে সঙ্কুচিত দেখা যায়। শুদ্ধ যে ব্রাহ্মণেরাই স্বীয় বিদ্যা-বিশেষকে গোপন করিতেন তাহা নহে, ইউরোপীয় কোন কোন পণ্ডিতের মধ্যেও এরূপে আপন আপন বিদ্যাকে গোপন রাখিতে দেখা যায়।

পাঠকগণ, দেখুন তখন বিদ্যাশিক্ষা করা কতই আয়াস-সাধ্য ছিল।

এইরূপ বিষম অসুবিধা সত্ত্বেও, তৎকালের অধ্যাপকগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে পাঠোপযোগী গ্রন্থাদি বহুতর হইলেও, এবং পাঠের যৎপরোনাস্তি সুবিধা থাকিলেও, তাহার শতাংশের একাংশ শিক্ষা হইতেছে না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

যে সকল ছাত্র মিথিলা হইতে উপাধি পাইয়া মহোৎসাহে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, তাঁহারা প্রায়ই কোন জমীদার বা রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া, চতুষ্পাঠী স্থাপন করতঃ শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ দুরূহ, তাহাতে গ্রন্থের অভাবে সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল; এবং বুদ্ধিমান্ ছাত্রগণও সেই শিক্ষায় সন্তুষ্ট হইতেন না। বহু দিবসাবধি ন্যায়-শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ গুরুতর অসুবিধা ছিল। পরিশেষে একজন বাঙ্গালীর অসাধারণ মেধা ও স্মারকতা-শক্তি, সেই অন্তরায়ের মূলে কুঠারাঘাত করিল। এই নবদ্বীপই তাঁহার জন্মভূমি। সেই স্বদেশহিতৈষী মহাত্মার নাম **বাসুদেব সার্ব্বভৌম**।

——:)*(:——

নবদ্বীপ ন্যায়-বিদ্যালয়

বাসুদেব সার্ব্বভৌম।—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৪৪৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে) বাসুদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর বন্দ্যবংশীয় আখণ্ডলের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ নরহরি বিশারদের পুত্র। চৈতন্যভাগবতে ইঁহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ লিখিত আছে।[১]

---

(১) ভট্টাচার্য্য-বিশারদো নরহরিঃ খ্যাতো নবদ্বীপকে
জ্যায়ান্ সর্ব্বগুণান্বিতো বিজয়তে লোকান্তরস্থো হ্যসৌ॥
জাতৌ শ্রীলবিশারদস্য তনয়ৌ শ্রীবাসুদেবাহ্বয়-
শ্রীরত্নাকরনামকৌ গুণনিধী শ্রীসার্ব্বভৌমো মহান্।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, তাঁহার পিতা নরহরি ও মহেশ্বর উভয় নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বাসুদেবের পিতা তৎকালে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বহুল ছাত্রে তাঁহার টোল পরিপূর্ণ ছিল। এই সময়ে এতদ্দেশে ভট্টাচার্য্য-বিদায়-প্রণালী প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল। দেশের জমীদার ও ধনিগণ ভট্টাচার্য্যদিগকে বার্ষিক প্রদান করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিমাত্রেই ভট্টাচার্য্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায়-স্বরূপ যথেষ্ট অর্থসাহায্যও করিতেন। দেশের মধ্যে পালি-পার্ব্বণে ব্রাহ্মণদিগকে সিধা দিবার প্রথাও সুপ্রচলিত ছিল। এই সকল উপায়ে ভট্টাচার্য্যদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের অশেষ সুবিধা হইত, এবং তাঁহারাও নিশ্চিন্তভাবে শাস্ত্রালোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন। অধ্যাপকেরা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বিদেশে যাইলে, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বা প্রধান ছাত্র টোলের অধ্যাপনা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

নরহরির দুই পুত্র বাসুদেব ও রত্নাকর। বাসুদেব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। যৌবনাবস্থাতেও তিনি কিছু লেখাপড়া শিখেন নাই। ইহাতে নরহরি অতিশয় দুঃখিত ও পুত্রের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন।

একদা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে নরহরির কোন দূরদেশে যাইবার প্রয়োজন হয়। তখন বাসুদেব উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলেও তাদৃশ লেখাপড়া

খ্যাতঃ সৎকবিপণ্ডিতেষু সহসা দেদীপ্যমানঃ ক্ষিতৌ
শিষ্যা যস্য শিরোমণিপ্রভৃতয়ঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং ধীষণঃ ॥
(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ম ভাগ ধৃত কুলপঞ্জিকা-বচন, ২৯৫ পৃঃ)
"সার্ব্বভৌমপিতা—বিশারদ মহেশ্বর"। (চৈ, ভা, মধ্য, ২১ অ)

ঢাকা তরা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতৃবংশীয় বলিয়া আপনার পরিচয় দান করেন। তিনি একখানি বিস্তৃত মুদ্রিত বংশলতা দিয়াছেন। ইহার সহিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে প্রকাশিত বংশ-পত্রিকার কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না।

শিখেন নাই। পরন্তু তখন নরহরির টোলে কোন উপযুক্ত ছাত্রও উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে টোলে কে পড়াইবে এই বিষয়ে তাঁহার বিষম চিন্তা উপস্থিত হইল। যদি বাসুদেব ভাল লেখাপড়া শিখিতেন তাহা হইলে, তাঁহাকে আর চিন্তিত হইতে হইত না। তিনি মনঃক্লেশে বাসুদেবকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অমন ছেলের মুখে ছাই দিতে হয়।" অতঃপর বাসুদেবের পিতা নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে বিদেশে চলিয়া গেলেন। এদিকে পতিরতা ব্রাহ্মণী স্বামিবাক্য লঙ্ঘন করা অধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, পুত্রের ভোজন-পাত্রের এক পার্শ্বে এক মুষ্টি ভস্ম প্রদান করিয়া তাহাকে আহার করিতে দিলেন। বাসুদেব আহারে বসিয়া, জননীর ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ কি মা?" জননী আনতমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাসু, তুমি ভাল লেখাপড়া শিখিলে না বলিয়া, তোমার পিতা তোমাকে ছাই খাইতে দিতে বলিয়াছেন, আমি মা হইয়া কিরূপে তাহা দিব? এদিকে স্বামিবাক্য লঙ্ঘন করিলেও পাপে পতিত হইব, এই ভাবিয়া আমি ঐরূপ করিয়াছি।" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বাসুদেবের মনে ভীষণ দুঃখ ও ক্ষোভের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। বাস্তবিক শত-সহস্র উপদেশে ও গ্রন্থপাঠে যে ফল না হয়, সময়-বিশেষে সামান্য ঘটনায় তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণ ফললাভ হইয়া থাকে।

তিনি আহার না করিয়াই গৃহত্যাগ করিলেন এবং চিন্তাকুল চিত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া নির্জন দগ্ধ বনভূমি মধ্যে ভাবনামগ্নচিত্তে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চিন্তার কূল নাই কিনারা নাই, তাঁহার আত্ম-সম্মানবোধে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, দুঃখ-অনুশোচনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কি করিবেন—বিদ্যা বিনা জীবন বৃথা। যদি বিদ্যালাভই না হইল, সম্মুখে বিরাজিতা ভাগীরথীর শীতল জলে জীবন দান করিয়া সকল জ্বালার নিবারণ করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প-বিকল্প করিতে-

ছেন ; এমন সময় দৈববাণী হইল, "বৎস, বাসুদেব প্রাণ বিসর্জ্জন করিও না, যে দুঃখে তুমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহিতেছ, আমার বরে তোমার সে দুঃখ দূর হইবে। তুমি সরস্বতীর বরপুত্র ও শ্রুতিধর হইবে। আমি এই দগ্ধ বনে প্রস্তররূপে বিরাজ করিতেছি, তুমি গ্রাম মধ্যে লইয়া আমার পূজার ব্যবস্থা কর।"

বাসুদেব এই নির্জন বনপ্রদেশে এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং বহু চিন্তার পর ঐরূপ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়া, গ্রাম মধ্যে এক বটবৃক্ষমূলে ঐ প্রস্তর খণ্ডের উপর ঘটস্থাপন করিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিলেন। ইনিই নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "পোড়ামাতা"।

প্রায়ই যাঁহার অসাধারণ গুণ বা কীর্ত্তি দেখা যায়, পরে তাঁহাকে দেবরূপী বা দেবানুগৃহীত বলিয়া লোকে বর্ণনা করিয়া থাকে। মহাকবি কালিদাস ভারতীর বরপুত্র এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শিবাবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যখন বাসুদেবের অসাধারণ স্মারকতা-শক্তি-প্রভাবে ন্যায়দর্শনের চতুষ্পাঠী সর্ব্বপ্রথম মিথিলার বাহিরে—এই নবদ্বীপে—স্থাপিত হইল, তখন জনসাধারণ তাঁহার এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া বর্ণনা করিবে—আশ্চর্য্য কি!

বরপ্রভাবে বাসুদেবের দিব্যজ্ঞান হইল। তিনি ন্যায়শিক্ষার্থ মিথিলায় যাত্রা করিলেন। বাসুদেব যখন মিথিলা গমন করেন তখন তাঁহার বয়স আনুমানিক পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর। মিথিলায় তৎকালে পক্ষধর মিশ্রই প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। বাসুদেব তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে তিনি নিত্য নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রকে—যে ন্যায়ের গ্রন্থাদি মিথিলা ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না, যে ন্যায়ের নিমিত্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ-বাসী বিদ্যার্থীদিগকে মিথিলার মুখাপেক্ষা করিতে হয়—সেই ন্যায়শাস্ত্রকে মিথিলা হইতে

কোন প্রকারে সংগ্রহ করিয়া জন্মভূমি অলঙ্কৃত করিবেন। কিন্তু মৈথিল আচার্য্যদিগের যত্ন-রক্ষিত ন্যায়শাস্ত্র আত্মসাৎ করা তিনি একেবারেই দুঃসাধ্য বিবেচনা করিলেন। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। তদনন্তর তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে ন্যায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন, এবং কএক বৎসর দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া ন্যায় শাস্ত্রকে বিশেষতঃ গাঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত চারি খণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত একেবারে কণ্ঠস্থ করিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে উক্ত শাস্ত্র সম্যক্ কণ্ঠস্থ হইয়াছে—তখন তিনি কুসুমাঞ্জলি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পূর্ব্ববৎ মনোযোগের সহিত কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অচিরে তাঁহার উদ্দেশ্য ছাত্রমণ্ডলির মধ্যে প্রচার হইয়া, অবিলম্বে ঐ কথা পক্ষধরের কর্ণগোচর হইল। সুতরাং আর তাঁহার কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করা হইল না। তখন তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনের বাসনা করিলেন। তদন্তর তাঁহার আচার্য্য পক্ষাধরমিশ্র কর্ত্তৃক তাঁহার পরীক্ষা গৃহীত হইল। তিনি যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাহার নাম শলাকা পরীক্ষা।

শলাকা পরীক্ষা এইরূপ—একটী সূচ্যগ্র লৌহ-শলাকা পুঁথির পত্রের উপর নিঃক্ষেপ করিলে শেষে যে পত্রখানি বিদ্ধ হয় সেই পত্রখানি ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়। তাহার ব্যাখ্যা শেষ হইলে পুনরায় উক্ত শলাকা কখন সহজে কখন বা সবলে পুনঃপুনঃ নিক্ষিপ্ত হয় ও প্রত্যেক বারেই নূতন পত্র ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়। বাসুদেবকে এইরূপে শতবারে শতখানি পত্রের ব্যাখ্যা করিতে হয়। তিনি তৎসমুদয় অতি সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহার পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "সার্ব্বভৌম" এই উপাধি প্রদান করিলেন।

অনন্তর বাসুদেব স্বদেশ প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। তিনি

পাছে, গ্রন্থ বা গ্রন্থের কোন অংশ, সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সেই আশঙ্কায় মৈথিল অধ্যাপকগণ-কর্তৃক তাঁহার অঙ্গবস্ত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তখন বাসুদেব বলিয়াছিলেন যে "আমার স্মৃতিপটে সমুদয় গ্রন্থ অঙ্কিত রহিয়াছে আমার কোন গ্রন্থ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।" তাঁহার এই কথায় মৈথিল অধ্যাপকগণ বিশেষ ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। বাসুদেবও তাহা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, "যদি নবদ্বীপের পথে যাই তাহা হইলে পথিমধ্যে তাঁহার জীবনের উপর কোন অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবনা।" এই ভয়ে তিনি নবদ্বীপ যাত্রাচ্ছলে কাশীধাম যাত্রা করিলেন। কাশী যাইবার তাঁহার উদ্দেশ্যও ছিল। মিথিলায় তিনি কেবল ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বেদান্ত শাস্ত্রেও তাঁহার জ্ঞানলাভ করা অভিপ্রায় ছিল। তিনি কাশীধামে উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন তথায় বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করতঃ, ঐ শাস্ত্রেও বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া খৃষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেই নবদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হন।

তিনি নবদ্বীপ আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। কুসুমাঞ্জলির কেবল শ্লোকাংশই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। সুতরাং নবদ্বীপে কুসুমাঞ্জলির কেবল শ্লোকাংশই দেখা যায়।

বাসুদেব নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের টোল সংস্থাপন পূর্ব্বক অতি যত্ন ও উৎসাহ সহকারে অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। মিথিলার বাহিরে এই সর্ব্বপ্রথম ন্যায়দর্শনের টোল স্থাপিত হইল। ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই পুস্তক লিখিয়া লইতেছেন এই নূতন সংবাদে ভারতের নানা স্থানের ছাত্রগণ বাসুদেবের টোলে সমাগত হইতে লাগিলেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্বন্ধে যে ভয়ঙ্কর অসুবিধা ছিল, তাহা বাসুদেব হইতেই তিরোহিত হইল। এইরূপে বাসুদেব স্বীয় জন্মভূমির উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, এবং প্রত্যেক বঙ্গবাসীর যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া রহিয়াছেন।

বাসুদেব নবদ্বীপের পশ্চিম-প্রবাহিত গঙ্গার পরপারে বিদ্যানগর গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সকল ছাত্র ন্যায় অধ্যয়ন করিতে আসিতেন, তাঁহারা স্বদেশে ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ শেষ করিয়া পূর্ণ যৌবনেই নবদ্বীপে আসিতেন। চতুষ্পাঠীতেই ছাত্রগণের আবাস স্থান দেওয়া হইত। নগরের মধ্যে এরূপ বহু-সংখ্যক ছাত্রের একত্র অবস্থিতি হইলে, গৃহস্থ অধিবাসিগণের অসুবিধা, এবং ছাত্রদের পাঠেরও ব্যাঘাত হইবার জন্যই বিদ্যানগরে চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছিল। বিদ্যানগরেই সকল পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী ছিল; এবং ঐ স্থানে বিদ্যাভ্যাস হইত বলিয়া উহার নাম বিদ্যানগর হইয়াছিল।

বাসুদেব কেবল গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত চিন্তামণি ও কুসুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়াছিলেন, এবং তাহারই অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ন্যায়-দর্শন শাস্ত্রের অন্যান্য অংশ তৎকালে নবদ্বীপে অধীত হইত না। সুতরাং দূরদেশীয় ছাত্রগণ তখনও মিথিলায় গিয়া দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাহারা জানিতেন যে মৈথিল-পণ্ডিতগণ ব্যতীত উপাধি দিবার আর কাহারও অধিকার নাই। পরিশেষে বাসুদেবের জনৈক ছাত্রের বুদ্ধি-কৌশলে নবদ্বীপ-বিদ্যালয় উপাধিদানের ক্ষমতা পাইয়া ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইল। সেই অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির নাম **রঘুনাথ শিরোমণি।** পর পরিচ্ছেদে তদীয় বিবরণ লিখিত হইল।

বাসুদেব দীর্ঘজীবী ছিলেন। রঘুনাথ তাঁহার প্রধান ছাত্র ছিলেন। কথিত আছে চৈতন্য, রঘুনন্দন ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাসুদেব, কি স্মৃতি, কি দর্শন, কি বেদান্ত সকল বিষয়েই সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি "সার্ব্বভৌমনিরুক্ত" নামে ন্যায়ের এক গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। তাঁহার আর কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পারুলিয়া গ্রাম নবদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। তৎকালে পারুলিয়া একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম ছিল। এই সময়ে মুসলমান-অধিকার অনেকটা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই পারুলিয়া গ্রামে অনেক মুসলমানের বাস ছিল। বাসুদেব ন্যায়শাস্ত্র আনয়ন করায়, নবদ্বীপ বিদ্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চায় বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বিদ্যাচর্চ্চা ও ধর্ম্মসংরক্ষণে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। পারু-লিয়াবাসী মুসলমানগণ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মরক্ষণে তৎপরতা দেখিয়া বিশেষ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। বাসুদেবকেই ইহার কারণ বিবেচনা করিয়া মুসলমানেরা তাঁহার জাতি নষ্ট করিয়া দিবে এইরূপ প্রচার করিয়া দেওয়ায় বাসুদেব নবদ্বীপ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে দেখিতে পাই—

"পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধর্ম্মময় প্রজা॥
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে জাগিল।
নদীয়া উচ্ছেদ কর রাজা আজ্ঞা দিল॥
অতঃপর নবদ্বীপে হইল রাজ-ভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়॥
বিশারদ-সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
সবংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥"

(জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল)

এই সময়ে উড়িষ্যা স্বাধীন ছিল। সে স্থানে গঙ্গাবংশীয় প্রতাপ-রুদ্রদেব স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং তাহাদের রাজত্ব ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রতাপরুদ্র একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা এবং বিদ্যাবিষয়ের নিরতিশয় উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন। এই প্রতাপরুদ্র বাসু-দেবকে যারপরনাই ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। বাসুদেব মুসলমান নবাবের ভয়ে ভীত হইয়া সপরিবারে উড়িষ্যা যাত্রা করেন। উড়িষ্যাপতি প্রতাপ-রুদ্র তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পুরীতে তাঁহার বাসস্থান নির্ণয় করিয়া দেন। বাসুদেব জীবনের অবশিষ্ট ভাগ পুরীতেই বাস করেন।

বাসুদেব কোন সময়ে শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া যান তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না; কিন্তু তিনি যে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের (১৫১০ খৃঃ অঃ) বহু পূর্ব্বে গিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। অনেকে বলেন যে, চৈতন্যদেব বাসুদেবের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। চৈতন্য-চরিতামৃতে চৈতন্যদেব যে বাসুদেবের নিকট পাঠ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। পরন্তু তাহার বিপরীত ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার, চৈতন্যভাগবত পাঠে দেখিতে পাই—শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনে প্রেম-উল্লসিত হইয়া জগন্নাথ আলিঙ্গনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার কালে বাসুদেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিতেছেন—

"এই জন হেন বুঝি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এই মত চিন্তে সার্ব্বভৌম অতি ধন্য॥" চৈ, ভা, অন্ত্য ২য় অ

ইহাতে জানা যায়, সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণ ও তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এ কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চৈতন্যকে দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই। অতএব, চৈতন্যের সহিত তাঁহার পূর্ব্বে দেখা-শুনা ছিল না বুঝিতে পারা যায়। একথা চৈতন্যচরিতামৃতে আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

"গোপীনাথ আঁচার্য্যেরে কহিলা সার্ব্বভৌম।
গোঁসাইর জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম॥
গোপীনাথ আচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথমিশ্র পদবী মিশ্র পুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইহার তার ইহ পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র॥
সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তার খ্যাতি॥
নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা।
প্রীত হইয়া গৌরাঙ্গেরে কহিতে লাগিলা॥" চৈ, চ, ৬ষ্ঠ খণ্ড

উক্ত বর্ণনায় সার্ব্বভৌমের সহিত যে গৌরাঙ্গের আদৌ পরিচয় ছিল না তাহা জানা যাইতেছে। এমন অবস্থায় গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়াছিলেন জানা যায়।

অসাধারণ স্মরণশক্তিই বাসুদেবকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। চিন্তামণির ন্যায় অতি প্রকাণ্ড তর্কশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া ও বহুকাল পরে তাহা নির্ভুল লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি অসামান্য ধীশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বাসুদেবের ন্যায় স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন লোক পৃথিবীর অন্য কোন দেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ! যতদিন জগতে স্মৃতিশক্তির আদর থাকিবে, যতদিন বঙ্গভূমিতে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন বাসুদেবের নাম কখনই বিলুপ্ত হইবে না। ন্যায়দর্শন কথাটী মনে হইলেই তৎসহ বাসুদেবের নাম মনে আসিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত করিবে। যে স্মৃতিশক্তি বিদ্যাশিক্ষার প্রধান সাধন, সেই স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন পুরুষরত্নের নাম স্মরণেও পাঠকগণের হৃদয়ে অভিনব উৎসাহের উদ্রেক হইবে।

রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি।—বাসুদেব উড়িষ্যা গমন করিলে,

তাঁহার ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি নবদ্বীপেই বাস করিতে লাগিলেন।

সার্ব্বভৌমভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম।
শান্তদান্ত ধর্ম্মশীল মহাভাগ্যবান্॥ (চৈ, ভা, অন্ত্য ৩য়),

তিনিও একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন। সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবতোষিণী টীকার নমস্কার বচনে 'বিদ্যাবাচস্পতিম্ গুরুন্' লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি এই বিদ্যাবাচস্পতিরই ছাত্র ছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীক্ষেত্র হইতে নবদ্বীপে পুনরাগমন করিলে এই বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেই অবস্থান করিয়াছিলেন।

"নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হইল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আইলেন ন্যাসীমণি॥ (চৈ, ভা-অন্ত্য ৩য় অ)

——:)*(:——

নবদ্বীপ-ন্যায়ের প্রাধান্য-স্থাপন।

রঘুনাথ শিরোমণি।—খৃষ্টীয় শাকের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৪৮০ খৃষ্টাব্দের সমকালে) রঘুনাথ নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন।[১] কি দুঃখের বিষয় উক্ত মহোদয়ের কোন জীবনী নাই। তিনি স্বীয় গ্রন্থেও নিজের কোন পরিচয় দেন নাই। তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহাই অবলম্বনে উক্ত মহামহোপাধ্যায়ের কথঞ্চিৎ, সুতরাং অসম্পূর্ণ, জীবন-চরিত লিখিত হইল।

(১) 'বৈদিক সম্বাদিনী' নামক কুলগ্রন্থে রঘুনাথ ও তাহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ আছে। উক্ত গ্রন্থমতে রঘুনাথের অষ্টাবিংশতম পূর্ব্বপুরুষ শ্রীধরাচার্য্য ৫১ ত্রিপুরাব্দে (৬৪১ খৃঃ) শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে শ্রীহট্টের রাজা আদিধর্ম্মপা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য মিথিলা হইতে নিমন্ত্রিত হন। আমরা যদি ৬৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীধরাচার্য্যের বয়স ৫০ বৎসর ধরি, তাহা হইলে তাঁহার জন্মকাল ৫৯১ খৃষ্টাব্দ হয়। গড়ে প্রতিপুরুষের বয়স ৩২ বৎসর হইলে রঘুনাথের জন্মকাল ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের সমকাল ধরা যাইতে পারে। ইহার প্রমাণ একটি দানপত্র যথা,—"ত্রিপুরা পার্ব্বতীশা শ্রীশ্রীযুক্তাদিধর্ম্মপা। সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্বিষু॥ * * * ত্রিপুরা-বাণাব্দে প্রদত্তা দত্তপত্রিকা॥" ইত্যাদি (সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩১১ সাল)।

রঘুনাথ তৃতীয় কি চতুর্থ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। সুতরাং তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার, তদীয় দুঃখিনী জননীর হস্তে বর্ত্তে। রঘুনাথের পিতা অতিশয় দুঃখী ছিলেন। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাঁহার এমন কোন সঙ্গতি ছিল না। স্বামি-বিয়োগে রঘুনাথের মাতা বড়ই দুঃখে পড়িলেন। অবশেষে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ ভিক্ষা করাও সহজ ব্যাপার নহে, সুতরাং তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলের কোন কোন ছাত্রের গৃহকার্য্য করিয়া স্বীয় ও পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে লাগিলেন।

জন্মাবধি রঘুনাথ এক চক্ষু-হীন ছিলেন। তজ্জন্য তিনি পরে কাণভট্ট-শিরোমণি বলিয়া বিখ্যাত হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার যে সকল ধীশক্তির কথা শুনা যায়, বর্ণনা দ্বারা তাহার সহস্রাংশের একাংশ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

যখন রঘুনাথের বয়স চারি পাঁচ বৎসর সেই সময়ে তিনি এক দিন, মাতার নিদেশানুসারে বাসুদেবের টোলের কোন ছাত্রের নিকট হইতে অগ্নি আনিতে গিয়াছিলেন। আগুনের জন্য উক্ত ছাত্রকে বারম্বার বিরক্ত করায় ছাত্র উত্যক্ত হইয়া, শীঘ্র-হস্তে এক হাতা জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া, রঘুনাথকে লইতে কহিলেন। রঘুনাথ আগুন আনয়ন জন্য কোন পাত্র লইয়া যান নাই। তিনি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-গুণে লঘু-হস্ততা সহকারে তৎক্ষণাৎ এক অঞ্জলি বালি লইয়া অগ্নি লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে বাসুদেব স্বীয় চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পঞ্চমবর্ষীয় বালকের এতাদৃশ উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। এবং রঘুনাথের মাতাকে ডাকিয়া কহিলেন "তোমার পুত্রটী আমাকে দাও, আমি ইহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ বালক আর দেখি নাই; বোধহয় ইহার দ্বারা কোন অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।" তখন রঘুনাথের দুঃখিনী জননী কহিলেন "প্রভু, এটীত আপনারই সন্তান

তবে আবার আমার অনুমতির অপেক্ষা কি! আপনি উহার পঠনের ভার লইলেন ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি আছে।"

অনন্তর বাসুদেব শুভদিনে শুভক্ষণে পঞ্চম বৎসর বয়সে রঘুনাথের হাতে খড়ি দিলেন। কথিত আছে যখন রঘুনাথকে ক, খ, শিখাইতে আরম্ভ করা হয় তখনই রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন 'ক' আগে না বলিয়া 'খ' আগে বলিলে কি দোষ হয়। বাসুদেব মহাবিপদে পড়িলেন তাঁহাকে বর্ণের উচ্চারণ বিধি শিখাইতে হইল। ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা স্বাভাবিক স্বর-সম্ভূত বলিয়া অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত বলিয়া বাসুদেব রঘুনাথকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তদনন্তর রঘুনাথ ব্যঞ্জন-বর্ণের মধ্যে দুইটী 'জ' দুইটী, 'ন' দুইটী 'ব' এবং তিনটী 'স' এর প্রয়োজনীয়তা কি বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করতঃ একাধিক বর্ণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। বাসুদেব দেখিলেন যে, এ সামান্য বালক নহে। তখন তিনি উচ্চারণ বিধি, ণত্ব ও ষত্ব বিধি প্রভৃতি ব্যাকরণ পড়াইয়া 'জ' আদি বর্ণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সুতরাং রঘুনাথকে বর্ণমালা শিখাইতে গিয়াই সমস্ত ব্যাকরণ পড়াইতে হইয়াছিল। ফলতঃ এরূপ অল্প বয়সে এরূপ অসাধারণ তর্ক ও বিচার-শক্তি আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

রঘুনাথ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ, কাব্য ও অভিধানাদি পাঠ শেষ করিলেন, এবং কিছুদিন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বাসুদেবের নিকট ন্যায় অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাসুদেব অতি যত্ন সহকারে রঘুনাথকে শিখাইতে লাগিলেন। রঘুনাথও সর্ব্বদা অতিশয় মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। বাসুদেব যাহা শিক্ষা দিতেন, রঘুনাথ রাত্রিতে তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন এবং তাঁহার মতের মধ্যে কোন মতের বিসম্বাদিতা দেখিলে তাহা খণ্ডন করিয়া পরদিন বাসুদেবকে স্বীয় মত শুনাইতেন। এইরূপে

তর্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিল। বাসুদেব শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, এই বালককে শিক্ষা দেওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার এবং প্রমাণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। রঘুনাথও অল্প সময়ে তাহার অধ্যাপকের সমস্ত ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ও তর্কের উৎকর্ষে গুরুকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বাসুদেব "সার্ব্বভৌমনিরুক্ত" নামে এক খানি টীকা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ স্বীয় অচিন্তিতপূর্ব্ব তর্ক-শক্তি প্রভাবে ঐ পুস্তকের নানা দোষ বাহির করিয়া, উক্ত পুস্তকের অসারতা প্রতিপন্ন করিলেন। এমন কি তাহার পাঠ্যগ্রন্থ চিন্তামণিও যে ভ্রমমূলক পঠদ্দশাতেই তদ্‌বিষয়ে নানা প্রকার প্রবন্ধ লিখিয়া স্বমত সমর্থন-পূর্ব্বক তৎসমুদয় প্রচার করিতে লাগিলেন। এখন নবদ্বীপের টোলে কি মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল! এখন তাহার মস্তকোপরি কি ভয়ানক ঝড় প্রবাহিত হইতে লাগিল!

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে মহাত্মা চৈতন্য দেবের দ্বারা রঘুনাথের মত অনেক স্থলে সুপরিষ্কৃত হইয়াছিল। রঘুনাথ অনেক চিন্তার পর যে তর্কের মীমাংসা করিতেন, চৈতন্যদেবকে জিজ্ঞাসা মাত্রেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমাধান করিয়া দিতেন। একদিন রঘুনাথ কোন কঠিন-তর তর্কের মীমাংসার জন্য নবদ্বীপের পার্শ্বস্থ পর্ণক্ষেত্রে ঔড়ম্বর বৃক্ষতলে নিভৃতে, একাগ্রমনে, গভীর ন্যায়-চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। চিন্তায় এরূপ গাঢ় মনঃসংযোগ হইয়াছিল যে পক্ষিগণ তাঁহার গাত্রে মলত্যাগ করাতেও তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হয় নাই। ঐ দিবস দিবারজনী এইরূপে অতিবাহিত হয়, তথাপি তাহার চিন্তা ভঙ্গ হয় নাই। পর দিবস প্রাতঃকালে চৈতন্য-দেব প্রাতঃস্নানান্তে নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়া কোথাও তাঁহার দর্শন না পাইয়া অবশেষে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং রঘুনাথকে তথাবিধ চিন্তারত ও তদবস্থ দেখিয়া হস্তস্থিত কমণ্ডলুর জল তদীয় মস্তকোপরি

নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "বনে বসিয়া মাথামুণ্ড কি ভাবিতেছ ?" রঘুনাথ ধ্যানভঙ্গে উত্তর করিলেন, "তুমি তাহার কি বুঝিবে।" ইহাতে চৈতন্য অতিশয় আগ্রহ সহকারে কহিলেন, "ভাই, তুমি কি ভাবিতেছিলে তাহা আমাকে বলিতেই হইবে।" তখন রঘুনাথ অগত্যা তাহার চিন্তিত বিষয় প্রকাশ করিলেন। তীক্ষ্ণধী চৈতন্যদেব যেন চিরাভ্যস্তের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। এই মীমাংসা রঘুনাথের মনের সহিত ঐক্য হইল। তখন রঘুনাথ কহিলেন, "ভাই, আমি যাহা ৩।৪ দিন চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না তাহা তুমি অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করিলে। অতএব ভাই তুমি মানুষ নও।" কিন্তু সেই মহাপুরুষ অবিলম্বে অন্য পথের পথিক হইলেন। পরে তাঁহার জীবনবৃত্ত লিখিত হইল। তাঁহার পবিত্র জীবনচরিত পাঠে নানাবিধ মহোপকার লাভ করা যায়। আর বঙ্গভূমিতে যে প্রকৃত মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ অসম্ভব ব্যাপার নহে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

যাহা হউক রঘুনাথের মতের সহিত চৈতন্যের মতের মিলন হইলেই রঘুনাথ তৎসমুদয় স্থিরসিদ্ধান্ত মনে করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন। কিন্তু বাসুদেব সরলমনে ঐ সকল মত গ্রহণ করিতেন না। তাহাতে রঘুনাথ সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত ও বিমনা থাকিতেন। এক দিবস বাসুদেব রঘুনাথকে নিতান্ত বিমনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'তোমাকে এখন সর্ব্বদাই ম্লান দেখি, বোধ হয় আমার শিক্ষায় তোমার মনস্তুষ্টি হয় না।' রঘুনাথ কহিলেন, 'প্রভু! সত্যই অনুভব করিয়াছেন। আপনি যে কি কারণে আমার মীমাংসায় অনুমোদন করেন না, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তজ্জন্য মনে মনে বাসনা করিয়াছি যে একবার মিথিলা যাত্রা করিব।' বাসুদেব শুনিয়া কহিলেন, 'উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। আমারও ইচ্ছা তুমি মিথিলা যাত্রা কর। কিন্তু তথায় আমা অপেক্ষা অধিক উত্তর পাইবে এমন ভরসা নাই।'

এইরূপে তিনি গুরুর নিকট অনুমতি পাইয়া মিথিলা যাত্রা করিলেন। মিথিলা যাইবার তাঁহার আরও কারণ ছিল। তৎকালে মিথিলা ব্যতীত উপাধি দিবার আর কাহারও ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে না পারিলে নবদ্বীপ চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি দানের সম্ভাবনা নাই। নবদ্বীপ চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি দানের ক্ষমতা স্থাপিত হয় ইহাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমেই মিথিলায় পৌঁছিলেন। তখন তাহার বয়স বিংশ বৎসর মাত্র হইবে।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন অধ্যাপক পক্ষধরমিশ্র জীবিত ও তিনিই তৎকালে মিথিলায় প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। নানা দিগ্‌দেশীয় ছাত্রমণ্ডলীতে তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ ছিল। রঘুনাথ তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইলেন।

তখন ছাত্রগণ রঘুনাথকে এক চক্ষুহীন দেখিয়া ব্যঙ্গ-স্বরে কহিলেন—

"আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ॥"

অর্থ—ইন্দ্র সহস্রলোচন, মহাদেব ত্রিলোচন, অন্য সকলেই দ্বিলোচন এক লোচন আপনি কে?

রঘুনাথ এই ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে সদর্পে উত্তর করিলেন—

"নলদ্বীপ-কুশদ্বীপ-নবদ্বীপ-নিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মনীষিণঃ॥[২]

অর্থ, আমরা নলদ্বীপ, কুশদ্বীপ ও নবদ্বীপের অধিবাসী তর্কসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত ও শিরোমণি উপাধিধারী পণ্ডিত।

---

(২) এই শ্লোকের পাঠান্তর,—
কুশদ্বীপ মহাদ্বীপ নবদ্বীপনিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত শিরোমণি মনীষিণঃ॥

রঘুনাথের এই উত্তর প্রাসঙ্গিক হয় নাই। কারণ কেবলমাত্র রঘুনাথের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি তিন জনের পরিচয় দিয়াছেন ফলে ঐ বিষয় যেমন শ্রুত হইয়াছি তাহাই লিখিত হইল। তাঁহার সহিত তর্কসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত উপাধিধারী যে দুই ব্যক্তি গিয়াছিলেন, তাঁহারা কে, তাহা জানিবার উপায় নাই।

সেই সময়ে উক্ত চতুষ্পাঠীতে ছাত্র শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে ঐ প্রথা প্রচলিত আছে। রঘুনাথ নিম্নতর শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। নিম্ন শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন ঐ শ্রেণীতে থাকিতে হয় নাই। তিনি স্বীয় অলোক-সামান্য-প্রতিভাগুণে অল্পকালের মধ্যেই পক্ষধরের টোলে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথ নবদ্বীপ হইতে বাসুদেবের নিকট উত্তমরূপে চিন্তামণি অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে তৎসম্বন্ধীয় নানা প্রকার তর্ক ও প্রতিবাদ উপস্থিত করিতে লাগিলেন এইরূপ করাতে তিনি শীঘ্রই উচ্চ শ্রেণীতে উঠিলেন। পক্ষধরের কএকজন সুতার্কিক ছাত্র ছিলেন। এ পর্য্যন্ত তাহাদের সকলকেই পরাজিত করা, কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু রঘুনাথ অনায়াসেই একে একে তাঁহাদিগের সকলকেই পরাজিত করিলেন।

ছাত্রগণকে পরাজিত করিয়া রঘুনাথ পক্ষধরের পশ্চাদ্ভাগে উপনীত হইলেন। কারণ পক্ষধরের নিয়ম ছিল যে, তিনি চতুষ্পাঠীর উচ্চ স্থানে বিমুখ হইয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন ও পুস্তক লিপিবদ্ধ করিতেন। যে ছাত্র তাঁহাকে তর্কে সন্তুষ্ট বা লেখনী বন্ধ করিতে পারিতেন তিনি তাহারই প্রতি সম্মুখ হইয়া বিচার করিতেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার

অর্থ—কুশদ্বীপের ন্যায় প্রধান দ্বীপ নবদ্বীপ আমার জন্মভূমি, আমি তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে প্রসিদ্ধ শিরোমণি পণ্ডিত। রঘুনাথ পূর্ব্বশ্লোকে অনাদৃত হওয়ায়, এইরূপ গৌরবের সহিত পরিচয় দিয়াছিলেন।

ভাগ্যে এরূপ ছাত্র ঘটিয়া উঠে নাই। আজ রঘুনাথের তর্কে তাঁহাকে মুখ ফিরাইতে হইল।

এই সময়ে পক্ষধর মিশ্র 'সামান্য-লক্ষণা' নামক পুস্তক লিখিতেছিলেন। রঘুনাথ তাহারই দোষ ধরিতে লাগিলেন। তিনি সামান্য-লক্ষণা একেবারেই অস্বীকার করিলেন। তখন পক্ষধর কহিলেন—

বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥

অর্থ, হে দুগ্ধপোষ্য কাণা বালক, যখন সম্পূর্ণরূপে সংশয় বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন সামান্য লক্ষণা কিরূপে লোপ করিবে?

রঘুনাথ কহিলেন—

যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ॥

অর্থ, যিনি অন্ধকে চক্ষু দান করিতে পারেন, যিনি বালককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত, অন্য সকলে নামধারী মাত্র।

এইরূপে পক্ষধরের সহিত ঘোরতর তর্ক আরম্ভ হইল। রঘুনাথ, চিন্তামণি সম্বন্ধে নানাবিধ তর্ক উপস্থিত করিলেন। পক্ষধর রঘুনাথের এই অসাধারণ তর্কশক্তি ও স্থিরবুদ্ধি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন এই বালককে শুদ্ধ কথায়, বা সহজে বুঝাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন। তখন তিনি অধ্যাপকদিগের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে চাতুর্য্য ও বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রঘুনাথ সে ধাতুর লোক ছিলেন না, তিনি যতক্ষণ বুঝিতে না পারিলেন, ততক্ষণ নিরস্ত না হইয়া, পুনঃ পুনঃ তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ করাতে তাঁহাকে শীঘ্রই অপদস্থ হইতে হইল।

অল্প দিনের মধ্যেই মিথিলার সর্ব্বত্র রঘুনাথের কথা প্রচারিত হইল। দিন দিন পক্ষধরের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সমারোহ হইতে

লাগিল। এইরূপে এক দিবস বহুতর অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সমবেত হইয়াছেন; এমন সময়ে পক্ষধরের সহিত রঘুনাথের তর্কারম্ভ হইল। অনেকক্ষণ বিচারের পর, রঘুনাথ পক্ষধরের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পক্ষধর নিজমত রক্ষণে অসমর্থ ও শিরোমণির মত অকাট্য, মনে মনে বুঝিতে পারিয়াও লোক-লজ্জা-ভয়ে প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করিলেন না; প্রত্যুতঃ নির্ব্বোধ ব্যল্লিক ইত্যাদি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া রঘুনাথের বিলক্ষণ অবমাননা করিলেন। অন্যান্য ছাত্রগণ ও অধ্যাপকেরা নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। তিনি যার-পর-নাই দুঃখিত হইয়া পক্ষধরের চতুষ্পাঠী হইতে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

তিনি বাসায় আসিয়া নির্জ্জনে ভাবিয়া দেখিলেন, যে তর্ককালে এমন কোন কুতর্ক করেন নাই যাহাতে ঐরূপে ব্যবহৃত বা অবমানিত হইতে পারেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার ন্যায়-বিষয়ক মত অবশ্যই মিথিলার দিগন্তব্যাপী কীর্ত্তিশালী দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে, কিন্তু এক্ষণে তিনি নিরাশ হইলেন। ভাবিলেন নিজ মত লইয়া স্বদেশে ফিরিলেও কেহই তাঁহার মতে বিশ্বাস করিবে না। অতএব স্বদেশের ও নিজের নিমিত্ত যে গৌরব উপার্জ্জন করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, তাহাতে নিরাশ হইলেন। মিথিলায় তাঁহার মুখ দেখান ভার হইল। তাঁহাকে একেবারে নবদ্বীপও ত্যাগ করিতে হইল। অবশেষে এক আশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা তাঁহার উভয় কামনাই সিদ্ধ হয়।

রঘুনাথ পক্ষধরের এরূপ ব্যবহারে যার-পর-নাই দুঃখিত ও ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যেরূপে পারি পক্ষধরকে হয় আমার মত গ্রহণ করাইব, নতুবা তাঁহার প্রাণ সংহার করিব। তদনুসারে রাত্রিযোগে একখানি তরবারি হস্তে করিয়া, গুপ্তভাবে পক্ষধরের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। এ-দিক ও-দিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, পক্ষধর সস্ত্রীক ছাদের উপর উপবিষ্ট আছেন ও স্ত্রীর সহিত

কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন। রঘুনাথ অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের কথা-বার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। এই দিন শরৎকালের অন্যতর পূর্ণিমা তিথি। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, আকাশ পরিষ্কার ও নির্ম্মল, পৃথিবী নিস্তব্ধ। ঐ সময়ে পূর্ণ চন্দ্রের নির্ম্মল রশ্মিজালে চতুর্দ্দিক্ ধবলিত ও লোক মাত্রেরই অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! এই দুই দাশর্নিকই অসুখী, একজন অকারণ অপমানজনিত ভীষণ মনের ক্লেশে ক্লিষ্ট ও প্রতিবিধান জন্য হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়া খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান। দ্বিতীয়, নিজ মত রক্ষণে অসমর্থ হেতু বিষম অনুতাপে অনুতপ্ত। এই সময়ে পক্ষধরগেহিনী জ্যোৎস্নার নির্ম্মলতায় প্রফুল্ল হইয়া কৌতূহলক্রমে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! এই শরচ্চন্দ্র-মরীচি অপেক্ষা নির্ম্মল বস্তু পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি?" পক্ষধর তখন গাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, ব্রাহ্মণীর কথা কএকবার তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। অবশেষে তিনি উত্তর করিলেন, "নবদ্বীপ হইতে একটী নবীন নৈয়ায়িক আসিয়াছে, তাহার বুদ্ধি ইহা অপেক্ষা নির্ম্মল।" রঘুনাথ অন্তরালে দাঁড়াইয়া শ্রবণমাত্র তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। পক্ষধরও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় মনের তৃপ্তি-সাধন করিলেন, এবং পর দিন প্রাতঃকালেই এক মহতী সভা করিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে রঘুনাথের মত অভ্রান্ত বলিয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। পাঠকগণ! এখন দেখুন, অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষীয় মহামান্য যে সকল উপাধ্যায়, তার্কিক-প্রধান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিল, আমাদের বঙ্গভূমির কল্পনাধিনাথ রঘুনাথের অসাধারণ তর্কবলে সে সকল সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল। রঘুনাথ শিরোমণি এখন যথার্থই ভারতবর্ষের শিরোমণি হইয়া উঠিলেন।

পক্ষধর রঘুনাথের তর্কে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কাব্য ও

ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় শিক্ষার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, রঘুনাথ উত্তর করিলেন—

তর্কেষু কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে
কাব্যেষু কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেষু যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেষু সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে॥

তর্কশাস্ত্রে আমার ন্যায় কর্কশবুদ্ধি কেহ নাই, কাব্যেও আমার ন্যায় সুকোমল-মতি কেহ নাই, তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনায় আমার ন্যায় যন্ত্রিতধী এবং কৃষ্ণবিষয়ক আলোচনায় আমার ন্যায় সংযতচিত্ত কেহ নাই।

কবিত্বং কিঞ্চিদৌন্নত্যং চিন্তামণিমনীষিণঃ।
নিপীত-কালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনং॥

কালকূটবিষপায়ী হরের সর্পক্রীড়া যেমন গৌরবজনক নহে, সেইরূপ যিনি চিন্তামণিশাস্ত্রে পণ্ডিত কবিত্ব তাঁহার অধিক উন্নতির পরিচায়ক নহে।

আপনি জানিবেন—

অনাসাদ্য গৌড়ীমনারাধ্য গৌরীং
বিনা তন্ত্রমন্ত্রৈর্বিনা শব্দচৌর্য্যাৎ।
প্রবুদ্ধ-প্রসিদ্ধ-প্রবন্ধ-প্রবক্তা
বিরিঞ্চি-প্রপঞ্চে মদন্যঃ কবিঃ কঃ॥

সুরাপান, গৌরী-আরাধনা, তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ এবং পরকীয় শব্দগ্রহণ ব্যতীত ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আমা ভিন্ন শুদ্ধার্থসম্পন্ন গ্রন্থকার কবি আর কে আছে?

পক্ষধর মদ্যপায়ী শক্তি-উপাসক ছিলেন, এবং আপনাকে প্রধান নৈয়ায়িক মনে করিতেন বলিয়া, রঘুনাথ এইরূপ শ্লেষব্যঞ্জক কথা কহিয়াছিলেন।

তদনন্তর তৎক্ষণাৎ রঘুনাথ এই শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ করিলেন—

সাহিত্যে সুকুমারবস্তুনি দৃষন্ন্যায়-গ্রহ-গ্রন্থিলে
তর্কে বা ভৃশকর্কশে মম সমং লীলায়তে ভারতী।
শয্যা বাস্প মৃদূত্তরচ্ছদবতী দর্ভাঙ্কুরৈরাবৃতা
ভূমি র্বা হৃদয়ঙ্গমো যদি পতি স্তুল্যারতির্যোষিতাম্॥

কি সুকুমার বস্তু সাহিত্য, কি প্রস্তর-সদৃশ কঠিন অতি কর্কশ জটিল তর্কশাস্ত্র, এই পরস্পর-বিরোধী উভয় শাস্ত্রে আমার বাক্য সমভাবে স্ফূর্ত্তি পায়। অথবা ইহা আর বিচিত্র কি! নারীগণ মনোনীত প্রিয়তমের সমাগমে সুকোমল আস্তরণবতী শয্যা বা কুশাঙ্কুর সমাকীর্ণ ভূমি, এ উভয় স্থানেই তুল্য রতি অনুভব করে।

পঠন্তি কতিচিদ্ধঠাৎ খ-ফ-ছ-ঠেতি বাচং শঠাঃ
ঘটঃ পট ইতীতরে পটু রটন্তি নৈয়ায়িকাঃ।
বয়ং বকুলমঞ্জরী গলদপার মাধ্বীকধূ
র্ধূর্ব্বীণপদরীতিভি র্যুবতিভি র্বিনোদামহে॥

কোন কোন শঠ পণ্ডিত খ, ফ, ছ, ঠ ইত্যাদি বাক্য লইয়াই আড়ম্বর করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন নৈয়ায়িক ঘট পট আবৃত্তি করিয়াই আপনাকে নৈয়ায়িকম্মন্য বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তদনুরূপ নহি; আমরা বকুল-মঞ্জরি-গলিত মধুবর্ষী পদ, ও রীতি-স্বরূপ যে যুবতী, তদ্দারা মনোরঞ্জন করিয়া থাকি।

রঘুনাথের উপরোক্ত দুই শ্লোকে তাঁহার কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যদি তিনি কবি বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবির আসন গ্রহণ করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। পক্ষধর এই কবিতা শ্রবণ করিয়া রঘুনাথের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রঘুনাথ মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া সগৌরবে খৃষ্ট ষোড়শ

শতাব্দীর প্রথমেই স্বীয় বাসভূমি নবদ্বীপে আগমন করিলেন। তদবধি মিথিলার গৌরবলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইয়া, নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াই সর্ব্ব প্রথমে গুরু বাসুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ভক্তিসহকারে প্রণত হইলেন। বাসুদেব পূর্ব্বেই তাঁহার মিথিলা জয়ের কথা শুনিয়াছিলেন, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন—

অয়ি দিবসমনৈষীঃ পদ্মিনীসদ্মনি ত্বং
রজনিষু নিরতোঽভূঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্যাং।
কথয় কথয় ভৃঙ্গ স্বচ্ছভাবেন তাবৎ
কিমধিকসুখমাপ্সীরত্রবা তত্রবেতি॥

হে ভৃঙ্গ! তুমি দিবসে পদ্মিনীর নিকেতনে এবং রাত্রিতে কুমুদিনী-রূপ রমণীতে আসক্ত ছিলে। এখন সরল ভাবে বল দেখি কোথায় অধিক সুখ লাভ করিয়াছ।

তদুত্তরে রঘুনাথ কহিলেন—

ত্বং পীযূষ দিবোপি ভূষণমপি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কো
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতোপি বিদিতং সাধ্বীচ মাধ্বীকতা॥
কিন্ত্বেকস্ত্বপরস্তরুন্তুদ মহো ব্রূমো নচেৎ কুপ্যসে
যঃ কান্তাধরপল্লবে মধুরিমা নান্যত্র কুত্রাপি সঃ॥

হে পীযূষ! তুমি স্বর্গেরই ভূষণ। হে দ্রাক্ষে! তোমায় কে পরীক্ষা করিতে পারে? তোমার মাধুর্য্য সকল-জন-বিদিত এবং অপরিচ্ছিন্ন। কিন্তু যদি আমার অরুন্তুদ বাক্যে ভবদীয় অন্তঃকরণ সন্তাপিত না হয়, তবে একান্ত সরলান্তঃকরণে বলিতে পারি যে, কান্তাধরপল্লবে যে মধুরিমা আছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

এই উত্তরে রঘুনাথ পক্ষধরের গৌরব প্রকাশ করায় বাসুদেব অতিশয় দুঃখিত হইয়া আক্ষেপ সহকারে বলিলেন—

যস্যা জন্মান্যবংশে বসতিরপি সদাদূরদেশে পুরাসীৎ,
সৈষা ভূত্বা বধূটী প্রকটিতবিনয়া বেশ্মমধ্যে প্রবিশ্য।
আজন্মপ্রাণ-তুল্যান্ গুরুজনজননী-সোদরানন্তরঙ্গান্,
দূরং কৃত্বা স্বগেহাৎ পতিমভিরমতে ধিক্ গৃহস্থাশ্রমস্থান্॥

যিনি ভিন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরন্তর দূরদেশে বাস করিতেন, তিনিই এখন নববধূ হইয়া বিনীত বেশে পতিগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক আজন্ম প্রাণসম গুরুজন, জননী, সহোদর, এবং অন্তরঙ্গ-মণ্ডলীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কেবল আপনিই পতির অনুরাগের অদ্বিতীয় আস্পদ হইতেছেন। হায়! এতাদৃশী পত্নীসম্পন্ন গৃহাস্থাশ্রমীকে ধিক্।

গুরুর সহিত আলাপের পর রঘুনাথ চতুষ্পাঠী করিতে বাসনা করিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রঘুনাথ অতি দুঃখীর সন্তান ছিলেন। অর্থাভাবে তিনি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে পারিলেন না। এই সময়ে নবদ্বীপে হরি ঘোষ নামে গোপজাতীয় একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। বহু-সংখ্যক গোধনই তাহার সম্পত্তি ছিল। ঐ সকল গাভী থাকিবার জন্য তাহার বিস্তীর্ণ গোশালা ছিল। প্রায় সকল লোকের গাভীগণ ঐ হরি ঘোষের গোশালায় আশ্রয় লইত। এনিমিত্ত সচরাচর যে স্থানে অনেক লোক জমা হইয়া সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ করে সেই স্থানকে হরি ঘোষের গোয়াল বলা প্রসিদ্ধি আছে। এই হরিঘোষ রঘুনাথের বিদ্যা-বুদ্ধির কথা জানিতে পারিয়া, দয়াপরবশ হইয়া স্বীয় অর্থ সাহায্যে তাঁহার চতুষ্পাঠী করিয়া দিলেন। রঘুনাথ চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পক্ষধরের পরাজয়ের পর হইতেই মিথিলাপ্রবাসী নানা দিগ্দেশীয় ছাত্র-গণের দ্বারা তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি টোল করিয়াছেন শুনিয়া নানা দেশীয় ছাত্রে তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ হইয়া গেল, এবং নবদ্বীপ প্রকৃত প্রস্তাবে সারস্বত মন্দির হইয়া উঠিল।

শিরোমণির প্রধান গ্রন্থের নাম 'চিন্তামণি দীধিতি'। গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত 'চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে ঐ দীধিতি রচিত হইয়াছে। যদিও দীধিতি চিন্তামণি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে, তথাপি উহাতে ন্যায় সম্বন্ধীয় তর্ক-সকল এত নিগূঢ় ও পরিষ্কৃতরূপে বিচারিত হইয়াছে যে উহা একখানি নূতন ন্যায়গ্রন্থরূপে অঙ্গীকৃত হইয়া 'নব্যন্যায়' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি বৈশেষিকশাস্ত্রীয় "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" নামক পুস্তক অবলম্বনে 'পদার্থ খণ্ডন' নামে এক গ্রন্থ এবং "আত্মতত্ত্ব বিবেক" বা "বৌদ্ধাধিকারের" টীকা রচনা করেন। সুবিখ্যাত মৈথিল-নৈয়ায়িক বর্দ্ধমান উপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য প্রণীত 'গুণকিরণাবলী' ও বল্লভাচার্য্য প্রণীত 'ন্যায়-লীলাবতীর' 'প্রকাশ' নামে যে টীকা করেন, রঘুনাথ উক্ত গ্রন্থ-দ্বয়ের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শিরোমণির রচিত 'নঞর্থবাদ,' 'প্রামাণ্যবাদ', 'নানার্থবাদ', 'ক্ষণভঙ্গুরবাদ', 'আখ্যাতবাদ' নামে কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ এইসকল গ্রন্থে তিনি কি অলৌকিক প্রতিভা, কি অচিন্তিতপূর্ব্ব তর্কশক্তি ও কি নিগূঢ় ন্যায়তত্ত্বেরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমি, কেবল বঙ্গভূমি কেন, সমস্ত ভারতভূমি অলঙ্কৃত হইয়াছে বলিলে কখনই অতিবর্ণন দোষে দূষিত হইতে হইবে না। যত দিন সংসারে তর্কশাস্ত্রের আলোচনা থাকিবে, যত দিন লোকে অনুধ্যান ও ধীশক্তির সমাদর করিবে—ততদিন শিরোমণির নাম কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। ধন্য রঘুনাথ! তুমিই ধন্য! তুমি জন্ম পরিগ্রহ দ্বারা জন্মভূমির কতই গৌরবের বৃদ্ধি করিলে এবং বঙ্গজগণের বুদ্ধিমত্তার কতদূরই না পরিচয় প্রদান করিলে!

দীধিতি গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পর, নবদ্বীপ তর্কশাস্ত্রালোচনার প্রধান স্থান হইয়া উঠিল, এবং ন্যায় জিজ্ঞাসু ব্যক্তিবর্গের নবদ্বীপ ভিন্ন, আর কোন স্থানই তৃপ্তিপ্রদ রহিল না। সেই অবধি নবদ্বীপ ভারতবর্ষের

মধ্যে ন্যায় আলোচনার প্রধান স্থান হইয়া উঠিল। সেই অবধিই নবদ্বীপ-চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি দানের ক্ষমতা স্থাপিত হইল এবং সেই অবধিই নবদ্বীপ সরস্বতীর বিশ্রাম বা পীঠস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইল। তদবধিই কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, ত্রৈলঙ্গ ও পঞ্জাব প্রভৃতি নানা দিকের নানা স্থানের ছাত্রগণ এই সরস্বতীপীঠ—নবদ্বীপ-ভূমি সমাগমন পূর্ব্বক ন্যায় শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ যেন সর্ব্বজ্ঞানীর ন্যায় অবস্থিত হইয়া সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন করিলেন।

রঘুনাথ মহাতেজস্বী ও দৃঢ়ব্রত ছিলেন। এই গুণ ছিল বলিয়া তিনি ভারতে চিরকীর্ত্তি স্থাপনে ক্ষমবান্ হইয়াছিলেন। পক্ষধর তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অবমানিত করিয়া চতুষ্পাঠী হইতে বিদায় করিয়া দেন; কিন্তু রঘুনাথ স্বীয় দৃঢ়-অধ্যবসায় গুণে ভীত না হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন ও অবশেষে তাঁহাকে পরাজিত করেন। তিনি 'আত্মতত্ত্ব-বিবেক-দীধিতি'তে আপনাকে তার্কিক-শিরোমণি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"নির্ণীয় সারং শাস্ত্রাণাং তার্কিকানাং শিরোমণিঃ।
আত্মতত্ত্ববিবেকস্য ভাবমুদ্ভাবয়ত্যসৌ॥"

অন্য স্থানে,

"বিদুষাং নিবহৈর্য্যদৈকমত্যান্নিরটঙ্কি যদ্দুষ্টং যচ্চাদুষ্টং।
ময়ি জল্পতি কল্পনাধিনাথে রঘুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব॥"

প্রাচীন পণ্ডিতবর্গে একমত হইয়া যাহা দুষ্ট ও যাহা অদুষ্ট স্থির করিয়া গিয়াছেন, কল্পনাধিনাথ রঘুনাথ বলিতে আরম্ভ করিলে সে সকল অন্যরূপ জানিবে। অর্থাৎ প্রাচীন পণ্ডিতেরা যাহা যাহা দুষ্ট স্থির করিয়া গিয়াছেন সে সকল অদুষ্ট এবং যাহা যাহা অদুষ্ট স্থির করিয়া গিয়াছেন সে সকল দুষ্টরূপে উপপন্ন হইল। ফলতঃ তিনি দীধিতি গ্রন্থে যেরূপ গর্ব্ব করিয়া গিয়াছেন কার্য্যেও সেইরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

রঘুনাথ যেমন অহঙ্কারের পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার বিনয়েরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শিরোমণি 'অনুমিতি' গ্রন্থের প্রথমেই লিখিয়াছেন,—

মান্যান্ প্রণম্য বিহিতাঞ্জলি রেষ ভূয়ো
ভূয়ো বিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি।
দূষ্যং বচো মম পরং নিপুণং বিভাব্য
ভাবাববোধবিহিতো ন হ্যনোতি দোষঃ॥

অর্থাৎ, মান্য ব্যক্তিবর্গকে কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক বিনয়সহকারে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা নিপুণভাবে চিন্তা করিয়া যেন আমার বাক্যে দোষ দেন। বুঝিয়া দোষারোপ করিলে আমি তাহাতে দুঃখিত নহি।

ইউরোপীয় দার্শনিক ডাক্তার ব্যালেণ্টাইন বলিয়াছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সর্ উইলিয়ম হ্যামিণ্টন যেরূপ করিয়া ন্যায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গৌতম, তদপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্মরূপে ন্যায়ের অবয়ব বিচার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি শিরোমণির গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। শিরোমণির গ্রন্থ পাঠ করিলে, বোধ হয় আমাদের ন্যায়ের প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারিতেন না।

রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রীয় পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ভিন্ন, স্মৃতিশাস্ত্রীয় "মলিম্লুচ-(মলমাস) বিবেক" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ পূর্ব্ব-স্থলী নিবাসী অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকটে ছিল। ঐ গ্রন্থের শেষে, উহা রঘুনাথ শিরোমণির কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। রঘুনাথ দীধিতি গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে যে শ্লোক ব্যবহার করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের প্রথমেও সেই শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা—

ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দ বোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে।

রঘুনাথের ছাত্রগণের মধ্যে মথুরানাথ ও রামভদ্র প্রধান। দ্বারবঙ্গের রাজার পূর্ব্বপুরুষ মহেশ পণ্ডিতও তাঁহার ছাত্র ছিলেন। কেহ কেহ রামভদ্রকে রঘুনাথের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে রঘুনাথ আদৌ বিবাহ করেন নাই, তাঁহাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিতেন, "পুত্র কন্যার জন্যই বিবাহের প্রয়োজন, ব্যাপ্তিবাদ ও জ্ঞানকাণ্ড আমার পুত্র এবং লীলাবতী আমার কন্যা, অতএব বিনা বিবাহেই আমার বিবাহের আশা ফলবতী হইয়াছে। আবার বিবাহে প্রয়োজন কি?" যাহা হউক রঘুনাথ আজীবন শাস্ত্রোলোচনাতেই কাটাইয়া খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

——:)*(:——

অন্যান্য গ্রন্থকারগণ।

হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার।—হরিদাস বাসুদেবের ছাত্র; সুতরাং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

হরিদাসের কোন জীবনী নাই। নবদ্বীপে তাঁহার বংশধর কেহ থাকিলেও তাহা নিরাকরণ করিবার কোন উপায় নাই। তিনিও স্বীয় গ্রন্থে নিজের কোনরূপ পরিচয় দেন নাই। তৎপ্রণীত পুস্তক কয়েকখানি না থাকিলে এত দিন সংসার হইতে তাঁহার নাম বিলুপ্ত হইত। হরিদাস অনেকগুলি টীকা করেন। তৎসমুদয় "হরিদাসী টীকা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেব, উদয়নাচার্য্য প্রণীত কুসুমাঞ্জলির পদ্যাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আনয়ন করেন। রঘুনাথ কুসুমাঞ্জলির কোন টীকা প্রণয়ন করেন নাই। হরিদাস ঐ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের "কুসুমাঞ্জলিকারিকা ব্যাখ্যা" নামে একখানি টীকা রচনা করিয়া, স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। হরিদাস কুসুমাঞ্জলির কেবল পদ্যাংশেরই টীকা করিয়া-

ছিলেন—গন্থভাগের টীকা করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় তৎকালে নবদ্বীপে ঐ অংশ আসে নাই। কুসুমাঞ্জলির যে কএকখানি টীকা আছে—তন্মধ্যে হরিদাসী টীকা অতিশয় প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধানাধ্যক্ষ ডাক্তার কাউএল (Dr. E. B. Cowel) সাহেব, পণ্ডিত-প্রবর মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাহায্যে, হরিদাসী টীকা সহ সমগ্র কুসুমাঞ্জলি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

হরিদাস, কুসুমাঞ্জলির টীকা ব্যতীত, পক্ষধরমিশ্রকৃত চিন্তামণির আলোকনামক পুস্তকের টীকা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। পুরীর শঙ্কর-মঠে হরিদাস ন্যায়ালঙ্কারকৃত অনুমানালোক, শব্দালোক এবং প্রত্যক্ষালোক নামে তিনখানি হস্তলিখিত পুস্তক বিদ্যমান আছে। ঐ সকল পুস্তক কন্দর্পরায় নামক কোন লেখক কর্ত্তৃক যথাক্রমে ১৫২১, ১৫২২, ১৫২৩, শকাব্দে লিখিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষমণ্যালোকের শেষে এই অস্পষ্ট শ্লোকটী লিখিত আছে—

শাকে ত্রিযুগ্ম-বিশিখ-ক্ষণদাধিনাথে (১৫২৩)
মাসে * * সুরধুনী সরিধে চতুর্থ্যয়ং।
শ্রীসার্ব্বভৌম-প্রসি (?) প্রণয়েন লব্ধ
কন্দর্পরায়পদবীক ইদং লিলেখ ॥

জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি।—জানকীনাথ নবদ্বীপ নিবাসী ছিলেন। নবদ্বীপের নন্দীপাড়ায় অদ্যাপি তাঁহার ভিটা বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বংশীয় আর কেহই বিদ্যমান নাই। তিনি রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র ছিলেন, এবং ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। জানকীনাথ 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী' নামে ন্যায়শাস্ত্রীয় এক মূল গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রীয় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামভদ্র সার্ব্বভৌম এই জানকীনাথ তর্কচূড়ামণির পুত্র এবং কণাদ তর্কবাগীশ তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

জানকীনাথ ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর প্রথমে লিখিয়াছেন—

প্রণম্য পরমাত্মানং জানকীনাথ শর্ম্মণা।
ক্রিয়তে যুক্তিযুক্তাভির্ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।[১]

মথুরানাথ তর্কবাগীশ।—মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি রঘুনাথের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই মথুরানাথ, অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও শান্ত-স্বভাব ছিলেন। তিনি প্রথমে পাঠশালায় ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া পিতার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পিতার নিকট ন্যায় পড়িয়া তাঁহার তৃপ্তি-সাধন হইল না। বিশেষতঃ তৎকালে যিনি সর্ব্ববাদী-সম্মতিমতে বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রতিভায় নৈয়ায়িক-সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন রঘুনাথ-শিরোমণি জীবিত থাকিতে মথুরানাথের অন্যত্র ন্যায় অধ্যয়নে তৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়!

মথুরানাথ, পিতার নিকট কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া, রঘুনাথের টোলে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে শিরোমণি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি মথুরানাথের যত্নাতিশয় দেখিয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে তাঁহাকে পড়াইতে লাগিলেন। মথুরানাথ, পরিশ্রম ও সুশীলতাগুণে অধ্যাপকের অনুগৃহীত ও সহপাঠিগণের প্রণয়-ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি পঠদ্দশাতেই দেখিলেন যে, দীধিতি গ্রন্থ যেরূপ জটিল, তাহাতে টীকা ব্যতীত তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। তজ্জন্য তিনি দীধিতির টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন। এক দিন টোলের কোন ছাত্র দীধিতির ঐ টীকা কৌতূহল বশতঃ তাঁহার পিতা শ্রীরামের হস্তে অর্পণ করেন। শ্রীরাম টীকা দেখিয়া সাতিশয় হর্ষলাভ করিলেন, এবং পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে,

(১) নবদ্বীপ এ্যাংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী পুঁথি নং ১১০ (ক)।

'বৎস্য! তোমার এই টীকা সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। তুমি যে টীকা লিখিতে সমর্থ হইবে, তাহাও আমার বিলক্ষণ আশা হইতেছে। অতএব দীধিতির টীকা না করিয়া মূল চিন্তামণি শাস্ত্রের টীকা করিতে সযত্ন হও; ঐ টীকা এরূপ ভাবে করিবে যে সকলেই যেন সহজে বিনা উপদেশে উক্ত চিন্তামণি শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।' কথিত আছে—মথুরানাথের পিতা শ্রীরাম যৎকালে রঘুনাথের নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তৎকালে দীধিতি ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তজ্জন্য তিনি এক দিন রঘুনাথের নিকট তিরস্কৃত হন, এবং পুত্রকে এরূপ টীকা করিতে উপদেশ দেন। যাহা হউক, মথুরানাথ এই অবধি দীধিতির টীকা করিতে ক্ষান্ত হইয়া পিতৃ-নিদেশানুসারে মূল চিন্তামণি শাস্ত্রের টীকা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই মথুরানাথের পিতা কালগ্রাসে পতিত হন। এই সময়ে মথুরানাথের পাঠ-সমাপন হইয়াছিল। পিতৃবিয়োগে মথুরানাথ পিতৃ-চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তিনি অতি যত্নসহকারে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সুশিক্ষার গুণে তাঁহার টোলে অনেক ছাত্র সমাগত হইল। তিনি অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু কোন প্রকারে পিতৃ-আদেশ বিস্মৃত হইলেন না। তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামণি গ্রন্থের টীকা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শিরোমণি যে সকল গ্রন্থের ভাষ্য ও বিবৃতি রচনা করিয়া, স্বীয় অসাধারণ-তর্ক-শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মথুরানাথ তৎসমুদয় গ্রন্থের টীকা করিয়া শিরোমণির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইতে চেষ্টা পাইলেন। শিরোমণি গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দ এই চারি খণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের এবং অনুমান খণ্ডের দীধিতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

মথুরানাথ গঙ্গেশোপাধ্যায়প্রণীত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি খণ্ড চিন্তামণির টীকা এবং পক্ষধর মিশ্রের মণ্যালোক, এবং

বর্দ্ধমান-উপাধ্যায়ের গুণকিরণাবলী এবং বল্লভাচার্য্যের ন্যায়লীলাবতী প্রকাশের "ভাষ্য" রচনা করিয়া স্বকীয় বিদ্যাবত্তার এবং অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লীলাবতীর মূলের টীকা, লীলাবতী দীধিতির টীকা, বৌদ্ধাধিকারের টীকা, দ্রব্যরহস্য, গুণরহস্য, কর্ম্মরহস্য, বিধিমীমাংসার টীকা প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মথুরানাথ, রঘুনাথের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্ব্বাংশেই ন্যূন ছিলেন। সুতরাং মথুরানাথের টীকা, রঘুনাথের টীকা অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই নিকৃষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই।

মথুরানাথের টীকা অতিশয় প্রাঞ্জল। গুরূপদেশ ব্যতীত কেবল এই টীকা পড়িয়া সকলেই শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে পারে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিয়দংশে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। কথিত আছে—মথুরানাথের পুত্রের পাঠ শেষ না হইতেই, মথুরানাথের মৃত্যু হয়। মথুরানাথের পুত্র অন্যের নিকট পাঠ স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হন। তখন তাঁহার মাতা কহিলেন—'আমি তোমার পিতার মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি যে সকল পুথি করিয়াছেন তাহা পড়িলে অন্য কাহার নিকট আর পড়িতে হয় না। সেই সকল পুথি পড়িয়াই পণ্ডিত হওয়া যায়।' মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি পিতৃকৃত টীকাই অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, এবং অন্যের বিনা সাহায্যে ঐ টীকা উত্তম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মথুরানাথের টীকা নৈয়ায়িকসমাজে 'মাথুরী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ সকল টীকার সাধারণ নাম 'রহস্য'। তিনি শব্দপ্রামাণ্য-রহস্যের আরম্ভে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যথা—

"ন্যায়াম্বুধিকৃতসেতুং হেতুং শ্রীরামমখিল-সম্পত্তেঃ
তাতং ত্রিভুবনগীতং তর্কালঙ্কারমাদরান্নত্বা।
শ্রীমতা মথুরানাথ তর্কবাগীশ-ধীমতা
বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে তুরীয় মণিফক্কিকা॥"

তিনি অনুমিতি রহস্যের প্রারম্ভেও লিখিয়াছেন—

জগদ্‌গুরোঃ শ্রীরামস্য চরণৌ মূর্দ্ধ্নি ধারয়ন্।
তৎসুতো মথুরানাথ রহস্যং স্ফুটয়ত্যমুং॥

তিনি বৌদ্ধাধিকারবিবৃতির প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

কুঞ্চিতাধরপুটেন পূরয়ন্ বংশিকাং প্রচলদঙ্গুলিপংক্তিঃ।
মোহয়ন্ নিখিলবামলোচনাঃ পাতু কোপি নবনীরদচ্ছবিঃ॥
শ্রীমতা মথুরানাথ তর্কবাগীশধীমতা।
বৌদ্ধাধিকারবিবৃতি বিশদীকৃত্য বক্ষ্যতে॥

মথুরানাথ কোন স্থানে শিরোমণির ছাত্র বলিয়া পরিচয় দেন নাই। কিন্তু তিনি শিরোমণির পাঠ বা মত 'ভট্টাচার্য্যাস্তু' বলিয়া উদ্ধৃত করায় তাঁহাকে শিরোমণির ছাত্র বলিয়া জানা যায়।

নবদ্বীপে মথুরানাথের বংশাবলী নাই। তাঁহার প্রধান ছাত্রের নাম ভবানন্দ-সিদ্ধান্তবাগীশ।

রামভদ্র সার্ব্বভৌম।* —রামভদ্র পিতা ও রঘুনাথ উভয়ের নিকটই অধ্যয়ন করেন। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেহ রামভদ্রকে রঘুনাথের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং তিনি স্বকৃত পদার্থখণ্ডনের টীকার প্রথম শ্লোকে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাই প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করেন। ঐ শ্লোকটী এই—

"তাতস্য তর্ক-সরসীরুহ-কাননেষু
চূড়ামণে র্দিনমণেশ্চরণে প্রণম্য
শ্রীরামভদ্রকৃতী কৃতিনাং হিতায়
লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুক মাতনোতি।"

---

* রামভদ্র দুই জন। রামভদ্র সার্ব্বভৌম ও রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ। দ্বিতীয় রামভদ্র সুপ্রসিদ্ধ জগদীশের পৌত্র। এই উভয় রামভদ্রের গ্রন্থ সাধারণতঃ 'রামভদ্রী টীকা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং উক্ত উভয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন করা অতীব দুরূহ।

এই শ্লোকে তাঁহার পিতাকে যেরূপ বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাতে কেবল রঘুনাথকেই বুঝায়। কিন্তু ইহাতে তাঁহার পিতার উপাধি 'চূড়ামণি' ছিল জানা যাইতেছে। 'চূড়ামণি' ও 'শিরোমণি' একার্থ-বোধক শব্দ হইলেও কেবল ছন্দঃ পতন ভয়ে 'শিরোমণিকে' 'চূড়ামণি' বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ নৈয়ায়িক-সমাজে 'শিরোমণি' শব্দটী যোগরূঢ়ীরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। শিরোমণি বলিলে যেমন রঘুনাথকে বুঝায়, 'চূড়ামণি' বলিলে তাহা কখনই বুঝায় না। অতএব এই শ্লোকের দ্বারা কখন রামভদ্রকে শিরোমণির পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। এই শ্লোকে রামভদ্র যে চূড়ামণি-উপাধিক জানকীনাথের পুত্র ছিলেন তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

রামভদ্র কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতেও তিনি বলিয়াছেন—

"ভবানীভবনাথাভ্যাং পিতৃভ্যাং প্রণমাম্যহং
যৎ প্রসাদাদিদং শাস্ত্রং করক্ষীরোপমীকৃতং।
মকরন্দে প্রকাশে বা ব্যাখ্যা পরিমলেঽথবা
ততোধিকং পিতুর্ব্যাখ্যা মাখ্যাতুময়মুদ্যমঃ॥"

ইহাতে অনেকে তাঁহার পিতার নাম ভবনাথ ও মাতার নাম ভবানী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা দুই অর্থেই লওয়া যাইতে পারে। এমন হইতেও পারে যে গ্রন্থকার স্বীয় ইষ্টদেব ভবানী ও ভবনাথকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন। যাহা হউক উভয় শ্লোকের দ্বারাই তাঁহার পিতা যে একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন এবং তিনি যে কুসুমাঞ্জলির উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাই বুঝায়।

রামভদ্র কুসুমাঞ্জলির তিনখানি ব্যাখ্যা-পুস্তকের নাম করিয়াছেন। বর্দ্ধমান উপাধ্যায় কৃত 'প্রকাশ', রুচিদত্তকৃত 'মকরন্দ' এবং শঙ্কর মিশ্র কৃত 'পরিমল'। তিনি হরিদাসী বা অন্য কোন টীকার উল্লেখ করেন

নাই। ইহাতে বোধ হয় তৎকালে ঐ টীকা প্রচলিত না হওয়ায় তাহার নাম গৃহীত হয় নাই। হরিদাসী টীকা ঐ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কারণ হরিদাস কুসুমাঞ্জলির কেবল শ্লোকেরই টীকা করিয়াছিলেন। গদ্যাংশ তৎকালে নবদ্বীপে প্রচলিত থাকিলে তিনি নিঃসন্দেহ তাহার টীকা করিতেন। রামভদ্র সমগ্র কুসুমাঞ্জলির অর্থাৎ গদ্য ও পদ্য উভয় অংশেরই টীকা করিয়াছেন। রামভদ্রের সময়ে কুসুমাঞ্জলির সকল অংশই নবদ্বীপ আসিয়াছিল ও অধীত হইত। অতএব রামভদ্রের টীকা হরিদাসের পরবর্ত্তী কালের বলিতে হইবে।

রামভদ্র, শিরোমণিকৃত পদার্থখণ্ডন গ্রন্থের "পদার্থতত্ত্ব বিবেচন-প্রকাশ" ও উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলির "কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা" ও গুণকিরণাবলীর "গুণকিরণাবলীরহস্য," এবং অন্নংভট্টের তর্কসংগ্রহের "তর্কদীপিকা-প্রকাশ" এবং গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রণীত চিন্তামণির "ভাষ্য" এবং 'সমাসবাদ' ইত্যাদি কএকখানি গ্রন্থ লিখিয়া স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তৎকৃত কুসুমাঞ্জলির ও খণ্ডনের টীকাই অতিশয় প্রসিদ্ধ। এক্ষণে নবদ্বীপে রামভদ্রের বংশ নাই।

সমাসবাদ গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—

বিচার্য্য আর্য্যৈঃ সততং নবীনৈঃ
তর্কাটবী সঞ্চরণ প্রবীণৈঃ।
শ্রীসার্ব্বভৌম বহুবাদ বিজ্ঞৈঃ
কৃতঃ সমাসেন সমাসবাদঃ॥

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ।—ভবানন্দ খৃষ্ট ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জানিবার উপায় নাই। তিনি রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে তাঁহার বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন। ভবানন্দ হইতে এখনও কোন শাখায় ৮ পুরুষ, ও কোন

শাখায় ৯।১০ পুরুষ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ভবানন্দ, মথুরানাথ তর্ক-বাগীশের ছাত্র ছিলেন। এই সকল বিবেচনা করিলে, আমরা ভবানন্দকে খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে দেখিতে পাই।

ভবানন্দ যে সমস্ত টীকা করিয়া গিয়াছেন তৎসমুদয় "ভবানন্দী" টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎপ্রণীত পক্ষধরমিশ্রকৃত মণ্যালোকের "সারমঞ্জরী" নামক টীকা এবং "কারকচক্র" প্রধান। কারকচক্রে তাঁহার অসাধারণ তর্কশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি 'লটার্থ-বাদ', 'কারণতাবাদ-বিচার', 'শব্দার্থসার-মঞ্জরি' এবং রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির 'ভাষ্য' ও 'মণিদীধিতি-গূঢ়ার্থ-প্রকাশিকা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল টীকা ন্যায়-সংসারে অতি আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। তিনি মণিদীধিতির টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

নমস্কৃত্য গুরূন্ সারং নিগূঢ়ং মণিদীধিতৌ।
শ্রীভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশ্যতে॥

ভবানন্দ শব্দমণ্যালোকের টীকার প্রথমে লিখিয়াছেন—

লোলালক মতিবালং চরণরণৎ কিঙ্কিনীজালং
হৈয়ঙ্গবীনচৌরং কমপি কিশোরং নমস্যাম।
নমস্কৃত্য গুরূন্ মূর্দ্ধ্না শব্দালোকস্য ফক্কিকা
শ্রীভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশ্যতে॥

শব্দার্থসারমঞ্জরী টীকার প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে—

নত্বা শ্রীকৃষ্ণচরণং কারকাদ্যর্থ নির্ণয়ঃ।
শ্রীভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশেন বিতন্যতে॥

নবদ্বীপে তেঘড়ি যাইতে নন্দীপাড়ায় 'সিদ্ধান্তের ভিটা' নামে যে পতিত ভূমি আছে, তাহাই ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের আদি বাসস্থান।

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে এককালে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বড়ই আদর হইয়াছিল। মহাদেব পুন্তামকর ভবানন্দের টীকারই টীকা

লিখিয়াছেন ও সেই টীকা এখনও দুই চারি স্থানে চলিত আছে।

মধুসূদন বাচস্পতি।—মধুসূদন ভবানন্দের পুত্র। ইঁহার পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভবানন্দ কালকবলে পতিত হন। সেই সময়ে নবদ্বীপে জগদীশ, গদাধর, গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ, হরিরাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা করিতেছিলেন। মধুসূদন ইঁহাদের কাহারও নিকট পাঠ স্বীকার না করিয়া মিথিলায় গমন পূর্ব্বক ন্যায় অধ্যয়ন করেন। ন্যায়দর্শনে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন, কথিত আছে—

"মিথিলাতঃ সমায়াতে বাক্‌পতৌ মধুসূদনে।
চকম্পে ন্যায়বাগীশঃ কাতরোঽভূদ্ গদাধরঃ॥"

অকালে মধুসূদন বাচস্পতি দেহত্যাগ করায়, তাঁহার পাণ্ডিত্যের কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

রুদ্ররাম তর্কবাগীশ।*—রুদ্ররাম ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র ছিলেন। তিনি ভবানন্দকৃত কারকচক্রের যে টিপ্পনী লিখিয়াছেন তাহাতে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"প্রণম্য পরমানন্দং গোবিন্দং গোপরূপিণম্।
রুদ্রেণ তন্যতে রৌদ্রী কারকার্থবিনির্ণয়ে॥
ইতি ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি শ্রীরুদ্রতর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য বিরচিতা পিতামহকৃত কারকাদ্যর্থনির্ণয় টিপ্পনী সমাপ্তা॥"

এতদ্ভিন্ন তিনি বৈশেষিক শাস্ত্রীয় 'পদার্থনিরূপণ', মীমাংসা শাস্ত্রীয় 'অধিকরণচন্দ্রিকা', 'কারকব্যূহ', 'বাদপরিচ্ছেদ' এবং 'চিত্ররূপ পদার্থ'

---

* রুদ্র নামধারী দুই জন গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম রুদ্রনাথ বিদ্যানিবাস নামক কোন অধ্যাপকের পুত্র। দ্বিতীয় রুদ্ররাম ভবানন্দের পৌত্র। উভয় রুদ্রই গ্রন্থকার এবং তাঁহাদের টীকাসকল সাধারণতঃ 'রৌদ্রী' বলিয়া বিখ্যাত। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের পুস্তক নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। যতদূর সম্ভব এই উভয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন করা গেল।

প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তা প্রকাশ ও পিতৃগৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম।—নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামে আর এক জন অধ্যাপক ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহারও বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। নামের একতা-নিবন্ধন ন্যায়শাস্ত্র আনয়নকারী বাসুদেব ব্যতীত দ্বিতীয় বাসুদেবের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় নাই। এই দ্বিতীয় বাসুদেব লক্ষ্মীধর-বিরচিত 'অদ্বৈত মকরন্দ' নামক বেদান্ত গ্রন্থের একখানি টীকা ১৫৫১ শকে (১৬২৯ খৃঃ অব্দে) রচনা করেন। উহাতে লিখিত আছে—

"গৌড়াচার্য্যবরেণ তেন রচিতা লক্ষ্মীধরোক্তেরিয়ং
শুদ্ধিঃ কাচন বাসুদেব কৃতিনা বিদ্বজ্জনপ্রীতয়ে॥"

অতএব এই বাসুদেবকে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে দেখিতে পাই, কিন্তু ন্যায়দর্শন আনয়নকারী বাসুদেব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং শেষ বয়সে তিনি উড়িষ্যায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বাসুদেব গাঙ্গ্য বংশীয়, এবং প্রথম বাসুদেব বন্দ্য বংশীয় ছিলেন।[২]

---

(২) নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাজিদা রেলবাজার হাইস্কুলের গণিত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গঙ্গোপাধ্যায়) মহাশয় এই বাসুদেবের বংশধর। ইহাঁরা এখন মাজিদার নিকট গোয়াড়ি গ্রামে বাস করিতেছেন। তিনি ৩।৪।৩৬ তারিখে এক পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, "স্বর্গীয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম আমার উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ। ইনি শ্রীচৈতন্য-দেবের সমকালীন সার্ব্বভৌম নহেন। চৈতন্যের জন্ম ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে। ইনি অন্ততঃ তাঁহার ১৫০ বৎসর পরবর্ত্তী। * * * ইহাঁর পিতৃপিতামহগণ এবং পুত্রদ্বয় দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ ও যাবদেন্দু বিদ্যানিধি বিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর সন্তানসন্ততিগণের কেহ এই গ্রামে (গোয়াড়ি) আসেন নাই। তাঁহারা, বোধ হয়, নবদ্বীপ বা চাঁড়ুলিয়াতে বাস করিতেন, এবং তাঁহাদের বংশও ক্রমশঃ লোপ পাইয়া থাকিবে, কারণ নবদ্বীপ বা চাঁড়ুলিয়াতে বাসুদেবের যে সকল ভূসম্পত্তি ছিল, উত্তরাধিকারসূত্রে তাহা আমরাই পাইয়া-ছিলাম।" ইহাঁরা আমাটের গাঙ্গুলী এবং নীলকণ্ঠের সন্তান। কালীকিঙ্কর বাবু বাসুদেবের অধস্তন বংশীয়দের একটী তালিকাও পাঠাইয়াছেন, তাহার কোন শাখায় ৮ পুরুষ কোন

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ।—দুর্গাদাস. দ্বিতীয় বাসুদেবের পুত্র ছিলেন। তিনি কবিকল্পদ্রুমের টীকার শেষে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

'গাঙ্গোলীয়জসর্ব্বদেশবিদিতঃ শ্রীসার্ব্বভৌমাত্মজো
দুর্গাদাস ইমাং চকার বিশদাং টীকাং স্ববোধাবধি।
টীকেয়ং বিমলাত্মানং প্রতিপদং সম্পাদয়ন্তীমুদং
শিষ্যাণাং বিদধাতু ধাতুগহন শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং॥'

এই স্থলে দুর্গাদাস গাঙ্গোলীয় বংশীয় সার্ব্বভৌমের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আবার কবিকল্পদ্রুমের দুর্গাদাসকৃত 'ধাতুদীপিকা' নামক টীকা 'শাকে সোমরসেষু ভূমিগণিতে শ্রীসার্ব্বভৌমাত্মজো দুর্গাদাস ইমাঞ্চকার বিশদাং টীকাং স্ববোধাবধি' লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ, উক্ত টীকা ১৫৬১ শকে (১৬৩৯ খৃঃ অঃ) রচিত হয়। তিনি পরে বলিয়াছেন--

'ইতি বাসুদেব সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীদুর্গাদাস শর্ম্মঃ বিরচিত ধাতুদীপিকা নাম কবিকল্পদ্রুম টীকা সমাপ্তা।'

অতএব দুর্গাদাস নিঃসংশয় দ্বিতীয় বাসুদেবের পুত্র, এবং তিনি পিতার নিকটই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

দুর্গাদাস বোপদেবকৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের এক টীকা রচনা করেন। ঐ টীকার প্রথমেই লিখিত আছে—

শ্রীমদ্ বিদ্যানিবাসাদৈরাদ্যৈর্গন্থপি সূরিভিঃ।
ভূরিভির্বিহিতা ব্যাখ্যা তথাপ্যাখ্যাপয়তে ময়া॥

হরিরাম-তর্কবাগীশ।—ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পর আমরা হরিরাম তর্কবাগীশের উল্লেখ করিতে পারি। হরিরাম খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে তিনি তৎকালে ন্যায়ের সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, এবং প্রধান বিদায় পাইতেন। তাঁহার পূর্ব্ব

শাখায় ৯ পুরুষ দেখা যায়। প্রত্যেক পুরুষের বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর ধরিলে, ৯ পুরুষে প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বাসুদেবকে পাওয়া যায়। ইহাও আমাদের প্রদর্শিত সময়ের সমকালবর্ত্তী।

৫।৬ পুরুষ ঐরূপ প্রধান বিদায় পাইয়া আসিয়াছিলেন। এই প্রবাদ সত্য হইলে, আমরা হরিরামকে রঘুনাথের বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

হরিরামের বহু গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তিনি গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত, অনুমিতিচিন্তামণি অবলম্বনে "অনুমিতি বিচার," শিবাদিত্যকৃত বৈশেষিক-শাস্ত্রীয় 'সপ্তপদার্থ নিরূপণ' নামক গ্রন্থের 'ব্যাখ্যা' এবং 'রত্নকোষ' নামে অপর একখানি গ্রন্থের 'ব্যাখ্যা' ও উদয়নাচার্য্য-রচিত প্রাচীন ন্যায়ানুযায়ী 'আচার্য্য-মত-রহস্য' ও নব্য ন্যায়ানুযায়ী 'নব্যমত-রহস্য' নামে অনুমিতি বিষয়ক গ্রন্থ ইত্যাদি ন্যায়শাস্ত্রীয় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'মঙ্গলবাদ' 'বিষয়তাবাদ' 'নবীনমতবিচার' 'অনুমিতি পরামর্শবাদবুদ্ধি" "প্রতিবন্ধকতাবিচার," 'বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবিচার' 'নব্যধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতা' ও "প্রত্যাসত্তিবিচার" নামে অনেকগুলি ন্যায়-শাস্ত্রীয় পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

হরিরাম দীর্ঘজীবী ছিলেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কেহই উপযুক্ত ছিলেন না। তজ্জন্য তিনি ঐ সময়ের প্রধান ছাত্র গদাধর ভট্টাচার্য্যকে স্বীয় টোলের ছাত্রদিগের অধ্যাপনা জন্য মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু কেহই তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন নাই। তদ্বিবরণ পরে লিখিত হইতেছে। হরিরামের মৃত্যুর পর জগদীশ প্রধান হইয়া উঠেন।

ভারতভূমির নানা প্রদেশের ছাত্রগণ এই সকল অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ও তাহাদিগের গ্রন্থাদি লিখিয়া লইয়া স্বীয় স্বীয় দেশে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ভারতের নানা প্রদেশে ন্যায় দর্শনের আলোচনা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বিদ্যানিবাস।—কুলপঞ্জী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বংশীয় রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র কাশীশ্বর বিদ্যানিবাস

এবং তৎপুত্র রুদ্রনাথ বাচস্পতি ও বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন।[৩] এই বিদ্যানিবাসও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সম্ভবতঃ এই বিদ্যানিবাসই দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ উল্লিখিত মুগ্ধবোধের টীকাকার। বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যের রচিত লক্ষ্মীধরের কৃত্যকল্পতরুর অন্তর্গত দানকাণ্ডাখ্য পুস্তকের একখানি প্রতিলিপি ইণ্ডিয়া অফিসে আছে। উক্ত পুস্তকের শেষে লিখিত হইয়াছে—

সর্ব্বেষাং মৌলিরত্নানাং ভট্টাচার্য্য মহাত্মনাম্।
এতদ্বিদ্যানিবাসানাং দানকাণ্ডাখ্য পুস্তকম্॥
ব্যোমেন্দুশরশীতাংশু মিতশাকে বিশেষতঃ।
শূদ্রেণ কবিচন্দ্রেন বিলিখ্য পরিশোধিতম্॥

অর্থাৎ, ১৫১০ শকে (১৫৮৮ খৃঃ অঃ) বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যের দানকাণ্ডাখ্য পুস্তক শূদ্র কবিচন্দ্র দ্বারা পরিশোধিত হইয়া লিখিত হইল। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন এই বিদ্যানিবাসেরই পুত্র।[৪]

রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি।—ইনি বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পাণ্ডিত্যে কোন অংশেই ইনি ভ্রাতার ন্যূন ছিলেন না। রুদ্রনাথ ন্যায়শাস্ত্রীয় কয়েকখানি ভাষ্য রচনা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তৎপ্রণীত টীকাসকল 'রৌদ্রী' বলিয়া বিখ্যাত। শিরোমণিকৃত বৈশেষিকশাস্ত্রীয় গুণপ্রকাশদীধিতির 'ভাবপ্রকাশিকা' ও মণিদীধিতির 'ভাষ্য' এবং উদয়নাচার্য্যকৃত কুসুমাঞ্জলির 'ব্যাখ্যা' এবং স্বীয় ভ্রাতার রচিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর 'ভাষ্য' ইত্যাদি পুস্তকে তাঁহার বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 'ভ্রমরদূত' নামক একখানি খণ্ডকাব্যের রচয়িতা। তাহাতে তিনি আপনাকে বিদ্যানিবাসের পুত্র ও বিদ্যাবাচস্পতির পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষমণি-দীধিতির

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রহ্মণকাণ্ড ১ম ভাগ—২৯৫ পৃঃ।
(৪) J. A. S. B., Vol. VI, (New Series) No. 7, 1910.

'ব্যাখ্যা বিবেচন' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

বিদ্যানিবাস-পুত্রস্য ন্যায়বাচস্পতেরিয়ং।
নির্ম্মিতং নির্ম্মলং ধিয়া আনন্দয়তু মানসং॥

ইহাতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার উপাধি বিদ্যানিবাস ছিল।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন।—বিশ্বনাথ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি রুদ্র বাচস্পতির ন্যায় বিদ্যানিবাস নামক কোন পণ্ডিতের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

বিশ্বনাথ গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত ন্যায়শাস্ত্রীয় অনুমান, উপমান প্রভৃতি চারিখণ্ড চিন্তামণিশাস্ত্র অবলম্বনে 'ভাষাপরিচ্ছেদ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই ভাষাপরিচ্ছেদে তিনি এরূপ সারগ্রাহিতা ও বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন যে, এই গ্রন্থখানি ন্যায়শাস্ত্রীয় মূল গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিম্বদন্তী যে, তিনি যে সময়ে এই ভাষাপরিচ্ছেদ তাঁহার ছাত্র রাজীবকে (কেহ কেহ রাজীবকে পৌত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন) শিক্ষা দেন, রাজীব তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায়, তিনি এই ভাষাপরিচ্ছেদের টীকা 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' রচনা করেন। উক্ত সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর প্রথমেই লিখিত আছে—

নিজনির্ম্মিতকারিকাবলীমতিসংক্ষিপ্তচিরন্তনোক্তিভিঃ।
বিশদীকরবাণি কৌতুকান্নন্নু রাজীবদয়াবশংবদঃ॥
সদ্রব্যা গুণগুম্ফিতা সুকৃতিনাং সৎকর্ম্মণাং জ্ঞাপিকা
সৎসামান্যবিশেষনিত্যমিলিতাঽভাবপ্রকর্ষোজ্জ্বলা।
বিষ্ণোর্বক্ষসি বিশ্বনাথকৃতিনা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী
বিন্যস্তা মনসো মুদং বিতনুতাং সদ্‌যুক্তিরেষা চিরং॥

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর শেষে লিখিত হইয়াছে—

"ইতি মহামহোপাধ্যায় বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য পুত্র শ্রীযুত বিশ্বনাথ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বিরচিতা ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সম্পূর্ণা।"

বাঙ্গালাদেশে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর কোন টীকাকার জন্মে নাই—তাহার টীকাকার দিনকর ভট্ট একজন মহারাষ্ট্রীয়। তাঁহার টীকার নাম 'গুণনিরূপণ'। আবার রামরুদ্র ভট্টাচার্য্য দিনকরীর 'তরঙ্গিণী' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বিশ্বনাথ মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায়সূত্রের 'ন্যায়সূত্র-বৃত্তি' ও শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্বের 'অবলোক' নামে ভাষ্য রচনা করেন। তিনি অবলোক গ্রন্থে বিভক্তি ও কারকাদির অর্থ বিশদরূপে নিরূপিত করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তদীয় গ্রন্থসকল অস্মদ্দেশীয় চতুষ্পাঠীতে ও কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে অতি আদরে অধীত হইয়া থাকে।

বিশ্বনাথ পিঙ্গলাচার্য্যকৃত ছন্দঃসূত্রের 'পিঙ্গলপ্রকাশিকা' নামে এক টীকা করেন। ঐ পুস্তকে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

বিদ্যানিবাসসূনোঃ কৃতিরেষা বিশ্বনাথস্য।
বিদুষামতিসূক্ষ্মধিয়মমৎসরাণাং মুদে ভবিতা॥

বিশ্বনাথ শেষ বয়সে বৃন্দাবনে বাস করেন। তাঁহার 'ন্যায়সূত্র-বৃত্তি' টীকা বৃন্দাবনে শেষ হয়। ঐ গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে—

"এষা মুনিপ্রবরগৌতমসূত্রবৃত্তিঃ
শ্রীবিশ্বনাথকৃতিনা সুগমাল্পবর্ণা।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণাম্বুজচঞ্চরীকঃ
শ্রীমচ্ছিরোমণিবচঃ প্রচয়ৈরকারি॥

*　　*　　*

রসবাণতিথৌ[৫] শকেন্দ্রকালে
বহুলে কামতিথৌ শুচৌ সিতাহে।

(৫) বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদের পুস্তকে, এবং নবদ্বীপ-নিবাসী গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ১৭৭৪ শকে স্বহস্ত-লিখিত পুস্তকে উক্ত শ্লোকগুলি আছে এবং 'রসবাণতিথৌ' স্থলে 'রসবাররতিথৌ' (১৫৭৬ শক) পাঠ দেখা যায়।

অকরোন্মুনিসূত্রবৃত্তিমেতাং
নন্থ বৃন্দাবিপিনে স বিশ্বনাথঃ॥"

[J. A. S. Bengal, Vol. VI, (New Series) No 7. 1910.]

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মের ভ্রমর, গ্রন্থকার বিশ্বনাথ মুনিপ্রবর গৌতম-রচিত সূত্রের বৃত্তি শ্রীমচ্ছিরোমণির (শ্রীরঘুনাথ শিরোমণির) বাক্যাবলম্বনে সুগম ভাষায় সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। * * * এই সেই বিশ্বনাথ শকনরপতির ১৫৫৬ অব্দে (১৬৩৪ খৃঃ অব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে শুক্রবারে বৃন্দাবনে এই মুনিসূত্রবৃত্তি প্রণয়ন করেন।

কেহ কেহ বিশ্বনাথকে রঘুনাথ শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই সন্দেহ কতদূর সঙ্গত বুঝিতে পারা যায় না। কারণ, বিশ্বনাথ নিজ বৃত্তি-গ্রন্থমধ্যে একত্রিংশ সূত্রের বৃত্তিতে "ইতি ব্যাখ্যাতং দীধিতিকৃতা" এবং গ্রন্থশেষে যে "শ্রীমচ্ছিরোমণিবচঃ প্রচয়ৈরকারি" বলিয়াছেন, তাহার অন্যথা সাধন অসম্ভব। দীধিতি গ্রন্থ শিরোমণিরই রচিত।

জগদীশ তর্কালঙ্কার।—জগদীশ গৌরাঙ্গদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। এই হিসাবে আমরা ইহাঁকে চৈতন্যের প্রায় ৭৫ বৎসরের পরবর্ত্তী কালের লোক বলিতে পারি। অদ্যাপি নবদ্বীপে জগদীশের বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন। পুরুষ গণনায় জগদীশ হইতে এক্ষণে ১০ বা ১১ পুরুষ পাওয়া যায়। তাহা হইলে, আমরা জগদীশকে প্রায় ৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে দেখিতে পাই। খৃষ্ট ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশে চৈতন্যের অন্তর্ধান হয়। অতএব আমরা জগদীশকে খৃষ্ট ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশের প্রথম ভাগে দেখিতে পাই।

জগদীশ সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্টপ্রণীত 'কাব্য প্রকাশ' নামক পুস্তকের "কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ" নামে এক খানি টীকা

করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত ৺হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নিকট জগদীশ-প্রণীত ঐ "কাব্য-প্রকাশ-রহস্য-প্রকাশের" একখানি হস্ত-লিখিত পুস্তক ছিল। ঐ পুস্তক, জগদীশের ন্যায়ালঙ্কার-উপাধিক কোন ছাত্র ১৫৭৯ শকের (১৬৫৭ খৃষ্টীয় অব্দে) মাঘ মাসের কৃষ্ণা নবমী রবিবারে লিখিয়া শেষ করেন। যথা—

শাকে রন্ধ্রাদ্রিবাণক্ষিতিপরিগণিতে মাঘমাসে নবম্যাং
পক্ষেচৈবাবলক্ষে গ্রহপতিদিবসে জীবযুগ্ যুগ্মলগ্নে।
ন্যায়ালঙ্কারধীরো নিজগুরুরচিতম্ পুস্তমেতৎ সমস্তং
স্বীয়ং স্বীয়াঙ্গনস্থো ব্যলিখদনলসোঽধ্যাপনার্থং সুখেন॥

এই শ্লোকের দ্বারাও জগদীশ ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন প্রতিপন্ন হইতেছে।

জগদীশ বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের সমসাময়িক অথবা অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে বর্ত্তমান ছিলেন। কারণ, জগদীশ শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় বিশ্বনাথকৃত সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন।—সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—"এবং প্রসিদ্ধপদসান্নিধ্যাদপি শক্তিগ্রহঃ। যথা ইহ সহকারতরৌ মধুরং রৌতি পিক ইত্যাদৌ পিকপদস্য শক্তিগ্রহঃ।" শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় জগদীশ এই মতে দোষ দিয়া লিখিয়াছেন,—"সহকারতরৌ মধুরং রৌতি পিক ইত্যাদিকন্তু ন যুক্তমুক্তক্রমেণ শক্তি-গ্রহস্যোদাহরণঃ তিঙর্থে ধর্ম্মিণ্যভেদেন নামার্থান্বয়স্যাব্যুৎপন্নত্বাদিত্যাদি।" ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় জগদীশের শব্দশক্তিপ্রকাশিকা সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর পরে রচিত হইয়াছিল।

জগদীশের পিতা যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। যাদবের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সকলেই তাঁহাদের মৈথিল উপাধি 'মিশ্র' নামে খ্যাত ছিলেন। যাদব হইতেই এই বংশের 'মিশ্র' নাম লুপ্ত হয়।

যাদবের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে জগদীশ তৃতীয়। যখন জগদীশের বয়স ৫।৭ বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং জগদীশের রক্ষণাবেক্ষণ-ভার, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ষষ্ঠীদাসের উপর বর্ত্তে। যাদবের অবস্থা ভাল না থাকায়, পিতৃবিয়োগে ষষ্ঠীদাস বড়ই দুঃখে পড়িলেন। তিনি চৈতন্যের সেবার দ্বারা যাহা কিছু পাইতেন তাহাতেই কথঞ্চিৎ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

জগদীশ বাল্যকালে অত্যন্ত দুষ্ট ছিলেন, পিতৃবিয়োগে আরও অবাধ্য হইয়া উঠিলেন। তজ্জন্য ষষ্ঠীদাস জগদীশকে মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করিতেন। জগদীশ তিরস্কৃত হইয়া আরও অনাবিষ্ট হইয়া উঠেন, ও পথে পথে ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার অসদাচরণ করিতে থাকেন। এইরূপে অষ্টাদশ বৎসরকাল অতিবাহিত হয়। অবশেষে এমন একটী ঘটনা ঘটিল যে, তদবধি তিনি সমস্ত অসদ্বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎপথের পথিক হইলেন।

এক দিন তিনি পক্ষিশাবক পাড়িবার মানসে এক প্রকাণ্ড তাল বৃক্ষে উঠেন। দৈববশতঃ একটী বিষধর সর্প কুলায়স্থ শাবকগণকে গ্রাস করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিল। জগদীশ যেমন শাবক-গ্রহণার্থ হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, সর্প অমনি বিষম ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে দংশনোদ্যত হইলে, প্রত্যুৎপন্নমতি জগদীশ, কোন উপায় না দেখিয়া অমনি দৃঢ়-মুষ্টিতে সর্পের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। ধরিবামাত্রেই সর্প পুচ্ছ দিয়া তাঁহার হস্তখানি জড়াইয়া ধরিল। জগদীশ তাহাতে ভীত না হইয়া তালবৃক্ষের ধারাল প্রান্তে ঘর্ষণ করতঃ সর্পের গলদেশ কর্ত্তন করিয়া মুখ-ভাগ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। গলা কাটিয়া নিক্ষেপ করিলেন বটে, কিন্তু সর্প পূর্ব্ববৎ পুচ্ছ দিয়া জড়াইয়া রহিল। তখন ক্রমে ক্রমে সর্পের সকল অংশ কাটিয়া ফেলিয়া তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন।

নিকটে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি জগদীশের এই অসাধারণ

সাহস ও তীক্ষ্ণধীর পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। এই ঘটনাতেই জগদীশ মনে করিয়াছিলেন যে, এ যাত্রা রক্ষা পাইলে এমন কার্য্য আর কখন করিবেন না। এক্ষণে সন্ন্যাসীর কথায় সম্মত হইয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়নে কৃতসংকল্প হইলেন।

যখন তিনি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। তখনও তাঁহার বর্ণপরিচয় হয় নাই বলিলেই হয়। সুতরাং তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রম-সহকারে দিবারাত্রি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এমন কি তিনি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন না; পাছে নিদ্রা আসে তজ্জন্য মস্তকের শিখার সহিত চালের বাতায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিতেন। কখন শ্রমাধিক্য হেতু নিদ্রাকর্ষণ হইলে যেমন ঢুলিয়া পড়িতেন অমনি মস্তকের শিখায় টান পড়িত, নিদ্রাও ভাঙ্গিয়া যাইত। এইরূপে দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া তিনি অতি ত্বরায় ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ শেষ করিলেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে জগদীশের পিতা যাদব, অতিশয় দুঃখী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জগদীশ আরও দুঃখে পড়িলেন। তাঁহার দুঃখের কথা কি বলিব, রাত্রিতে তৈল অভাবে তাঁহার পাঠ হইত না। তজ্জন্য তিনি বংশ-পত্র কুড়াইয়া তাহাই প্রজ্বলিত করিয়া তাহারই আলোকে রাত্রিতে পাঠ করিতেন। কোন দিন তৈল পাইলে সে তৈল পাঠের নিমিত্ত রাখিয়া দিয়া বাঁশ-পাতার আলোকে আহার করিতেন। এইরূপ দুঃখে পড়িয়াও তিনি লিখন-পঠন পরিত্যাগ করেন নাই। বরঞ্চ অবিচলিত অধ্যবসায়-প্রভাবে নানা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা মনুষ্য-সমাজের অগ্রগণ্য হইয়া গিয়াছেন।

জগদীশ এইরূপে গাঢ় অনুরাগ ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, এবং কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়-শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট

হইলেন। সিদ্ধান্তবাগীশের টোলে অনেক ছাত্র ছিল। তিনি সকল ছাত্রকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পড়াইতে পারিতেন না। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। সুতরাং জগদীশ, টোলে প্রবিষ্ট হইলেও সিদ্ধান্তবাগীশ তাহাকে চিনিতেন না। অবশেষে জগদীশের তর্কশক্তিই তাহাকে চিনাইয়া দিল।

একদিন সিদ্ধান্তবাগীশ বাটীর ভিতর সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিলেন। সেই সময়ে টোলের কোন ছাত্রের সহিত জগদীশের তর্কারম্ভ হয়। জগদীশ পূর্ব্বপক্ষ করিতেছিলেন। ঐ ছাত্র তাহার প্রশ্নের যে উত্তর দিতেছিলেন, তাহা সমধিক ঠিক হইতেছিল না। সিদ্ধান্তবাগীশ বাটীর ভিতর বসিয়া উহাদিগের তর্ক-বিতর্ক শুনিতেছিলেন। তিনি জগদীশের পূর্ব্বপক্ষ শুনিয়া মনে মনে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগদীশকে চিনিতে না পারিয়া তিনি ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছে ঐ ছাত্রটী কে?" ব্রাহ্মণী কহিলেন, "উটী বৈদিকদের ছেলে।" তখন ভবানন্দ কহিলেন, "কে, জগা?" বলিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তদবধি তিনি জগদীশকে অতি যত্নসহকারে পড়াইতে লাগিলেন। অল্পকাল পরেই জগদীশ ভবানন্দের টোলে প্রধান হইয়া উঠিলেন।[৬]

এদেশে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবল কিম্বদন্তী যে, জগদীশ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র। কিন্তু জগদীশের বংশীয় নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট যে সকল প্রাচীন পুথি সংগৃহীত আছে তাহার মধ্যে জগদীশ-লিখিত কয়েকখানি প্রাচীন পুথির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, জগদীশ সার্ব্বভৌম-

---

(৬) দুষ্টমতি জগদীশ অধ্যবসায়-বলে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হওয়ায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি এদেশে প্রচলিত আছে।

আদৌ জগা জগুঃ পশ্চাৎ জগাজগোরনন্তরম্।
অধুনা জ্ঞানসম্পত্ত্যা জগদীশায়তে জগা॥

উপাধিক কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন। জগদীশ প্রত্যক্ষ খণ্ডের 'মঙ্গলবাদ' নামে যে টীকা করেন, তাহার দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত আছে—

"শ্রীসার্ব্বভ�ৌমস্থ গুরোঃ পদাব্জং
বিদ্যার্থিনাং কল্পতরোঃ প্রণম্য।
বিনির্ম্মিতঃ শ্রীজগদীশবিজ্ঞে
বিদ্যোততামাদ্যমণের্ম্ময়ূখঃ ॥"[৭]

উপরি উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জগদীশ সার্ব্বভৌম-উপাধিক কোন অধ্যাপকের ছাত্র ছিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সার্ব্বভৌম মহাশয় বঙ্গদেশীয় নৈয়ায়িক সমাজের গুরু-স্থানীয় বলিয়াই জগদীশ গুরুবুদ্ধিতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন। কিন্তু জগদীশ স্বকীয় "ন্যায়াদর্শ" গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

"যন্মাদৃশৈঃ সমুপদিষ্টমজুষ্ট যত্নৈঃ
শ্রীসার্ব্বভৌমগুরুণা করুণাময়েন।
সিদ্ধান্তসারমিদমাদরতস্তদদ্য
বিদ্যার্থিণাং গুণকৃতে প্রকৃতে বদাম ॥"[৮]

এই স্থানে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, "মৎসদৃশ অন্য কর্ত্তৃক যাহা অসেবিত, সেই সিদ্ধান্তসার করুণাময় শ্রীসার্ব্বভৌম গুরু কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে উপদিষ্ট হইয়া, আমি অদ্য তাহা বিদ্যার্থীদিগের প্রকৃষ্টরূপ উপকারের জন্য আদরের সহিত বলিতেছি।" সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি সার্ব্বভৌম-উপাধিক কোন অধ্যাপকের ছাত্র ছিলেন। এই

---

(৭) নবদ্বীপ এ্যাংলো সংস্কৃত লাইব্রেরীর ১০৭ সংখ্যক পুথি—জগদীশকৃত মণিময়ূখ গ্রন্থ। তাহার প্রথমেও উক্ত শ্লোকটী দেখা যায়, কিন্তু তাহার শেষ দুই চরণে এইরূপ পাঠান্তর আছে—'মণের্ময়ূখোয়মতি প্রযত্নাদ্বিনির্মিতো বিজ্ঞমুদং তনোতু ॥'

(৮) নবদ্বীপ-নিবাসী পণ্ডিত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত রামরুদ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক লিখিত ১৬২৭ শকের প্রতিলিপি হইতে গৃহীত।

সময়ে নবদ্বীপে দ্বিতীয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম বর্ত্তমান ছিলেন। সম্ভবতঃ জগদীশ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ও এই বাসুদেব সার্ব্বভৌম উভয়ের নিকট পাঠ স্বীকার করিয়াছিলেন।

জগদীশ পাঠ শেষ করিয়া তর্কালঙ্কার উপাধি পাইলেন, এবং নবদ্বীপেই টোল করিয়া অধ্যাপনা করিতে বাসনা করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে কিছু দিন তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। পরে গ্রামস্থ লোকের সাহায্য লইয়া তাঁহার চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়।

জগদীশের পঠদ্দশাতেই অনেকে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষপাতী হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি চতুষ্পাঠী করায় অনেকেই তাঁহার টোলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে বঙ্গভূমির নানা স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে ন্যায়ের অনেক চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সেই প্রদেশের ছাত্রগণ তথায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া পাঠ সমাপন পূর্ব্বক উপাধি লইতেন। ঐ সকল ছাত্রের মধ্যে পূর্ব্বদেশীয় ছাত্রেরা ভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা শিখিয়া আসিতেন। বিশেষতঃ দীধিতি-গ্রন্থ সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হইতেন না। জগদীশ এই সকল কারণে দীধিতি-গ্রন্থের টীকা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি অনুমান-দীধিতির টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন—

> প্রাচ্যৈরনুচিতবিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতোঽপ্যধুনা।
> দীধিতিযুতমণিরেষ শ্রীজগদীশ প্রকাশিতঃ স্ফুরতু॥

তিনি টীকা লিখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় ছিল না। নিশ্চিন্ত ভাবে চিন্তা করিতে না পারিলে টীকা লেখা সম্পন্ন হয় না। অবশেষে তিনি এমন উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন যে, তাঁহার সংসার-যাত্রা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তিনি শূদ্র শিষ্য করিতে বাসনা করিলেম। জগদীশের ন্যায় মহামহোপাধ্যায়কে গুরুরূপে বরণ করিতে কাহার অনিচ্ছা হয়? অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার

রাশি রাশি শিষ্য হইল। এইরূপে তিনি ৩৬০ ঘর শিষ্য করিলেন। শিষ্য-দিগের প্রতি নিয়ম হইল যে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে বৎসর মধ্যে এক এক দিন তাঁহার সংসার-যাত্রা চালাইয়া দিবে। তৎকালে দ্রব্য সামগ্রী অতিশয় সুলভ থাকায় শিষ্যেরাও আহ্লাদ-সহকারে তাহা স্বীকার করিলেন।

জগদীশ এইরূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রমে রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত —অনুমানদীধিতি, তর্ক, সামান্যভাব, ব্যাপ্ত্যনুগম, সিংহব্যাঘ্র, পক্ষতা, উপাধিবাদ টিপ্পনী এবং ব্যাপ্ত্যনুমানদীধিতি, অনুমিতি, ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিংহ-ব্যাঘ্রী, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্তলক্ষণ, ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, অবচ্ছেদক-নিরুক্তি, বিশেষ-নিরুক্তি বা ব্যাপ্তি, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়, অতএব-চতুষ্টয়ী, সামান্যলক্ষণা, সামান্যাভাব, পক্ষতা, পরামর্শ, কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী, অন্বয়ব্যতিরেকী, বাধ, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষ, ব্যাপ্ত্যনুগম, অনুপসংহারী, অবয়ব, হেত্বাভাস, সাধারণ, সব্যভিচারী প্রভৃতি দীধিতি প্রকাশিকা টিপ্পনী এবং গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত অনুমানময়ূখ গ্রন্থের ভাষ্য ও প্রশস্তপাদ আচার্য্য কৃত বৈশেষিকশাস্ত্রীয় দ্রব্যভাষ্যের টিপ্পনী এবং শিরোমণি-প্রণীত ন্যায়-লীলাবতী-প্রকাশ-দীধিতি গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া অদ্ভুত বিচারশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি শঙ্করাচার্য্য-কৃত আনন্দলহরী স্তোত্রের এক টীকা রচনা করিয়া-ছিলেন।[১] তিনি লীলাবতীদীধিতি টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন—

কণভক্ষমুনেঃ পক্ষরক্ষা বিন্যস্তবাসনা।
বচাংসি জগদীশস্য চিন্তয়ন্তু বিচক্ষণাঃ॥

জগদীশ রচিত 'মুক্তিবিচার' গ্রন্থের একখানি পুথি তদীয় বংশধর নবদ্বীপ-নিবাসী পণ্ডিত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট আছে।

(১) এই পুস্তকখানি তাঁহার বংশধর যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট আছে।

পুথিখানি জগদীশের প্রপৌত্র ভবানন্দ বিদ্যাবাগীশের হস্তলিখিত। তাহার শেষে লিখিত হইয়াছে—

"ইতি গৌড়ান্তর্গত নবদ্বীপ নিবাসী বৈদিকতার্কিকচূড়ামণি শ্রীযুক্ত জগদ্‌গুরু জগদীশ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় বিরচিতো মত-ভেদেন মুক্তিবিচারঃ সমাপ্তঃ॥"

জগদীশ কেবল টীকা লিখিয়াই স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। তিনি 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' ও 'তর্কামৃত' নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বীয় মৌলিকতা ও বিচারশক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকাই' জগদীশের সার গ্রন্থ। জগদীশ যদি আর কোন পুস্তক না করিতেন, তাহা হইলে এক শব্দশক্তিপ্রকাশ করাতেই তিনি নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয় হইতেন সন্দেহ নাই।[১০] তদীয় গ্রন্থসকল 'জাগদীশী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকে বলেন, জগদীশের টীকা শিরোমণি ও অন্যান্য টীকাকারের রচিত ভাষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আসন অধিকার করিয়াছে। জগদীশের শব্দশক্তি-প্রকাশিকা পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তর্কামৃত অনেক বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সংস্কৃতে এম্‌-এ পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

জগদীশের দুই পুত্র—**রঘুনাথ** ও **রুদ্রেশ্বর**। ইঁহারা উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন। রঘুনাথ 'সাংখ্যতত্ত্ববিলাস' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বাচস্পতি মিশ্র, ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার 'কৌমুদী' নামে যে টীকা করেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত 'সাংখ্যতত্ত্ববিলাস' লিখিত হয়। এতদ্ব্যতীত রঘুনাথ অনুমানচিন্তামণির 'পরামর্শ' নামে এক টীকা লিখিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের প্রথমেই তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

---

(১০) কথিত আছে—"জগদীশস্য সর্ব্বস্বং শব্দশক্তিপ্রকাশিকা"

শ্রীমতা রঘুনাথেন তর্কালঙ্কারসূনুনা।
পক্ষতাপরমূলস্য নিগূঢ়ার্থঃ প্রকাশ্যতে॥

রুদ্রেশ্বরের পুত্র রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি বহু পণ্ডিত এই বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে নবদ্বীপে জগদীশের বংশধরেরা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। জগদ্বন্ধু ও নবকুমার ভট্টাচার্য্যের পুত্রগণ, রামদাস ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র শ্রীযতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ এবং পণ্ডিত দ্বারকানাথ শিরোরত্নের পুত্রগণ এই বংশ সম্ভূত। কিন্তু কেহই আর পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত হন নাই।

জগদীশ অধ্যাপক হইয়া চৈতন্যদেবের সেবার অংশ সহোদরদিগকে দান করেন। তজ্জন্য জগদীশের বংশধরেরা চৈতন্যদেবের সেবাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ।—ইনি রামরাম ন্যায়পঞ্চাননের পুত্র ও জগদীশের ছাত্র ছিলেন। তিনি শব্দশক্তিপ্রকাশিকার 'সুবোধিনী' নাম্নী এক টীকা রচনা করেন, তাহাতে তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। যথা— "গুরুমিব গুরুমিহ নত্বা তৎকৃত শব্দশক্তিপ্রকাশিকাসু
শ্রীরামভদ্রকৃতী কুরুতে টীকাং মুদে সুধিয়ঃ।"

মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশের বংশধর ছিলেন। এখনও তদ্বংশীয়গণ নবদ্বীপে বাস করিতেছেন।[১]

গদাধর ভট্টাচার্য্য।—জগদীশের শেষাবস্থায় গদাধরের অভ্যুদয়।

---

(১১) নদিয়ার রামভদ্র সিদ্ধান্তের পৌত্র শ্রীরামসুন্দর ভট্টাচার্য্যের সহিত উখুৎপুরের রতিকান্ত মুহুরির সোনদহ খাঁপুরের বহালবৃত্তির ভুমি লইয়া যে বিবাদ উপস্থিত হয়, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর কর্ত্তৃক সন ১১৮৬ (খৃঃ ১৭৮০) ৬ই জ্যৈষ্ঠ তাহার নিষ্পত্তি হয়। (দেওয়ান মহাশয়ের ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত, পৃ ২২৫) সম্ভবতঃ উক্ত রামভদ্র সিদ্ধান্তই জগদীশের ছাত্র।

১৫২ পৃষ্ঠার পাদটীয় ভ্রমক্রমে লিখিত হইয়াছে যে, রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ জগদীশের পৌত্র ছিলেন।

গদাধর বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জীবদেবাচার্য্যের পুত্র। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত (বর্ত্তমান বগুড়া) লক্ষ্মীচাপড় নামক ক্ষুদ্র পল্লী তাঁহার আদি নিবাস।

গদাধরের পিতা জনৈক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল। এক সময়ে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক অধ্যাপক হরিরাম তর্কবাগীশ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে লক্ষ্মীচাপড় গ্রামে উপস্থিত হন, এবং গদাধরের পিতা জীবদেবাচার্য্যের আতিথ্য স্বীকার করেন। গদাধর তখন নয় দশ বৎসরের বালক মাত্র। তাঁহার পিতা গদাধরকে তর্কবাগীশ মহাশয়ের পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে বলেন। তিনি পিতার আদেশক্রমে পুষ্প চয়ন করিয়া আনেন। হরিরাম গদাধরকে পাত্রব্যতিরেকে ফুলগুলি আনিতে দেখিয়া কহিলেন, "বাপু, তুমি জান না, বিনা পাত্রে ফুল আনিলে সে ফুল অশুদ্ধ হয়। তোমার আনীত ফুলগুলি অপবিত্র হইয়াছে, উহাতে ভগবানের পূজা হইবে না।" এই কথা শুনিয়া চিন্তান্তর গদাধর উত্তর করিলেন, "মহাশয়, পুষ্পই পুষ্পের আধার। হস্তসংলগ্ন ফুলগুলিই না হয় অপবিত্র হইয়াছে, উপরের ফুলগুলি হস্তসংলগ্ন নহে। তলস্থ পুষ্পগুলিকে আধার মানিয়া লইলে, উপরের ফুলগুলি আর অপবিত্র হয় না।" হরিরাম গদাধরের এই প্রতিভাময় উত্তরে বিশেষ সন্তুষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই বালক তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত হইবে। তিনি গদাধরকে ন্যায়শাস্ত্র পড়াইবার জন্য জীবদেবকে উপদেশ দিলেন, জীবদেবও তাহাতে সম্মত হইলেন।

গদাধর বাল্যকালেই নবদ্বীপে বিদ্যাভ্যাস করিতে আগমন করেন। সুপ্রসিদ্ধ হরিরাম তর্কবাগীশ তৎকালে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। গদাধর তাঁহারই টোলে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি অতি যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্প কাল

মধ্যেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় নবদ্বীপস্থ পণ্ডিত-সমাজে অস্ফুটরূপে প্রচারিত হইল। কিন্তু গদাধরের পাঠ শেষ হইতে না হইতেই হরিরামের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল।

হরিরামের মৃত্যু সময়ে, টোলে অধ্যাপনা করিতে পারেন এমন উপযুক্ত পুত্র ছিল না। গদাধরের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যদিও এই বালকের শিক্ষা পরিসমাপ্ত হয় নাই, তথাপি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই বালক সকল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যান যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে এই গদাধরকে যেন টোলের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। স্বামীর পরলোকের পর ব্রাহ্মণী স্বামিবাক্যানুসারে গদাধরকেই টোলের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহা অপেক্ষা গদাধরের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? তিনি সাগ্রহে ঐ কার্য্য স্বীকার করিলেন। পাঠশেষ না হওয়ায় গদাধর কোন উপাধি পান নাই। সুতরাং তিনি নিজ বংশের উপাধি 'ভট্টাচার্য্য' নামেই খ্যাত হন। কিন্তু পরে তিনি তর্কাচার্য্য নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হর্ষে বিষাদ হইল। তিনি অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইবা মাত্র, টোলের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিল না। অনেকে তাঁহার টোল ত্যাগ করিয়া কেহ জগদীশ তর্কালঙ্কারের কেহ বা অন্য টোলে চলিয়া গেল।

তৎকালে এই নিয়ম ছিল যে, অধ্যাপক বা গ্রন্থকারের বংশীয় না হইলে, কেহই কোন অধ্যাপকের নিকট পাঠ স্বীকার করিতেন না। তৎকালে পুস্তকের বিরল প্রচার ছিল। অধ্যাপক বা গ্রন্থকারের গৃহ ব্যতীত অন্যের নিকট পুস্তক পাওয়া যাইত না। সুতরাং অন্য অধ্যাপকের নিকট পুস্তক অভাবে পাঠের বড়ই অসুবিধা হইত।

গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেই যে কয়েক জন ছাত্র ছিল

তাহারাও চলিয়া গেল। এই দিনেই গদাধরের ভাবী উন্নতির বীজ রোপিত হইল। তিনি অতিশয় তেজস্বী ও দৃঢ়ব্রত ছিলেন ; তিনি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া স্বদেশ হইতে ছাত্র আনাইয়া পড়াইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, "যে কোন উপায়ে হউক আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না পাইলে, কেহই আমার নিকট পাঠে স্বীকৃত হইবে না।" তখন তিনি হরিরামের টোল পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নানের পথি-পার্শ্বে চতুষ্পাঠী ও তৎসংলগ্ন একটী ফুলের বাগান করিলেন। ফুলের বাগান করিবার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পূজার জন্য স্বয়ং পুষ্প চয়ন করিতেন। সুতরাং তাঁহার বাগানে পুষ্প চয়ন জন্য অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সর্ব্বদা সমাগম হইবে, ও তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালাপও হইবে। গদাধরের এই কৌশল বিফল হয় নাই।

যে পর্য্যন্ত দেশ হইতে ছাত্রগণ না আসিলেন, গদাধর সে পর্য্যন্ত পুষ্প-বৃক্ষের মূলে বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া পড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রাতে ও স্নানের সময় যে সকল অধ্যাপক ও ছাত্র পুষ্প চয়ন করিতে আসিতেন ও গঙ্গাস্নানে যাইতেন তাঁহারা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ঐ সকল ব্যাখ্যা শুনিতেন। ঐ সময়ে গদাধর ন্যায়ের কঠিনতর অংশসকল অতি বিশদ ও প্রাঞ্জল করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন ও তৎসমুদয় লিখিয়া রাখিতেন। ছাত্রগণের ঐ সকল ব্যাখ্যা নূতন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা মনে মনে গদাধরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ছাত্র বা গোপনে তাঁহার নিকট নিজ নিজ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা ঐ পুস্তকের পত্র আনিয়া লিখিয়াও লইতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকে তাঁহার নিকট গোপনে পাঠ স্বীকার করিলেন। অবশেষে এমন একটী ঘটনা উপস্থিত হইল যে, আর কাহারও তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিতে বাধা রহিল না।

গদাধর এই সময়ে রঘুনাথ-কৃত বৌদ্ধাধিকার-দীধিতির টীকা রচনা

করেন। লিপিকরের ভ্রম বশতঃ 'শিব্যন্তে' পাঠের পরিবর্ত্তে 'শিচ্যন্তে' পাঠ লেখা হয়। ঐ পুথির পত্র জগদীশের টোলের কোন ছাত্রের হাতে পতিত হয়। তাহাতে ঐ ভুল দৃষ্ট হওয়ায়, পত্রখানি একটী কুকুরের গল-দেশে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই সংবাদ গদাধরের কর্ণগোচর হইলে, অবিলম্বে ঐ কুকুরকে ধরিয়া তাহার গলদেশ হইতে ঐ পত্র খুলিয়া লইয়া, স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তি ও প্রতিভা বলে তিনি 'শিচ্যন্তে' পাঠই বজায় রাখিয়া নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর ঐ টীকা জগদীশের নিকট প্রেরিত হইলে, তিনি তাহা পাঠ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন. 'গদাধরের টীকা পড়িয়া এখন আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, যে কোন পাঠ প্রকৃত।' জগদীশের ন্যায়, নৈয়ায়িকপ্রধানের বুদ্ধিকে, ভ্রমে পাতিত করা, সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে।

এই ব্যাপারের পর হইতেই গদাধরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমস্ত নবদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তদবধি ছাত্র-মণ্ডলীতে তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনিও একজন নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। এইরূপে গদাধর স্বীয় অধ্যবসায়, দৃঢ়তা এবং অবিচলিত উৎসাহগুণে নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জগদীশের ন্যায় গদাধরও বহু টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ সকল টীকা সাধারণতঃ 'গাদাধরী টীকা' ও গাদাধারী 'পাতড়া' বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে অনেকেই গদাধরের টীকা পড়িয়াই পড়াশুনা শেষ করেন।

গদাধর অনুমিতি দীধিতির টীকায় বলিয়াছেন—

গিরীন্দ্রদুহিতুর্নমৎ সুরবরাবতংসীভবৎ
পদাম্বুজ রজঃকণা কলিততীক্ষ্ণধীসম্পদা।
গদাধরবিনির্ম্মিতা কঠিনতর্কদুর্গাটবী
নবীনপদবীমুদং বিতনুতাং সতাং ধীমতাং॥

গদাধরের পুস্তকের মধ্যে পক্ষধরকৃত 'চিন্তামণ্যালোকের টীকা'

এবং শিরোমণিকৃত দীধিতি গ্রন্থের অনুমিতি, 'প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যবাদ', 'বৌদ্ধাধিকার', 'নানার্থবাদ', 'ক্ষণভঙ্গুরবাদ' ও 'নঞ্‌বাদ' প্রভৃতি দীধিতির টীকা এবং বাদার্থ বিষয়ে 'প্রথমাব্যুৎপত্তিবাদ', 'দ্বিতীয়াদিব্যুৎপত্তিবাদ', 'অনুমিতিমানসবাদার্থ', 'নব্যমতবাদার্থ', 'ব্যাপ্ত্যনুগমবাদার্থ', 'রত্নকোষবাদার্থ', 'কারণতাবাদার্থ' এবং 'উপসর্গবিচার', 'বিষয়তাবাদার্থবিচার', 'অনুকরণবিচার', 'নানার্থবিচার', 'তদাদিসর্ব্বনামবিচার', 'সন্দিগ্ধার্থবিচার', 'ত্বতলাদি ভাব্যপ্রত্যয়বিচার', 'বিধিস্বরূপ বাদার্থবিচার', ও 'সাদৃশ্যবাদ', 'শক্তিবাদ', 'মুক্তিবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল পুস্তক অদ্য পর্য্যন্ত নৈয়ায়িক-সমাজে সাদরে অধীত হইয়া থাকে। বাদার্থ-বিষয়ে তিনি চতুঃষষ্টি-সংখ্যক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর কোন গ্রন্থের নাম পাই নাই। তিনি নঞ্‌বাদ-দীধিতির টীকায় লিখিয়াছেন—

রাধামুখাব্জ-মধুমত্ত-মধুব্রত শ্রী-
কৃষ্ণস্য পাদযুগলং শিরসা প্রণম্য।
নঞ্‌বাদ-সঙ্গত-শিরোমণি-গূঢ়ভাবং
শ্রীমান্ গদাধর-সুধীঃ প্রকটী করোতু॥

গদাধর অনুমান খণ্ডে দীধিতির টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ পদপঙ্কজযুগং পুরদ্বিষঃ।
বিবৃণোতি গদাধরঃ সুধীরতিদুর্ব্বোধগিরঃ শিরোমণেঃ॥

তিনি ক্ষণভঙ্গুরবাদের দীধিতিপ্রকাশ টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,

কাত্যায়নখনিজমণেঃ ক্ষণভঙ্গুররহস্য শিরোমণেঃ।
প্রকাশমণিদীধিতি স্তনুতে সুধীবর শ্রীলগদাধরঃ॥

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত গদাধর চণ্ডীর এক টীকা রচনা করেন। ঐ টীকা তদ্বংশীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট ছিল। এখনও নবদ্বীপবাসী যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের নিকট এক খণ্ড এবং নবদ্বীপের লাইব্রেরী

গৃহে এক খণ্ড[১২] আছে। উহার প্রথমে গদাধর লিখিয়াছেন—

প্রণম্য পদ্মাপতি-পাদপদ্মং প্রকর্ষদং বিঘ্নবিঘাতদক্ষং।
বিতন্যতে শ্রীলগদাধরেণ বিপ্রেণ টীকেয়মনল্পযত্নাৎ॥

ঐ পুস্তকের সমাপ্তিবাক্য এইরূপ আছে—

"গদাধর তর্কাচার্য্যবিরচিতা চণ্ডীটীকা সমাপ্তা।"

এখানে গদাধর আপনাকে 'তর্কাচার্য্য' নামে পরিচিত করিয়াছেন।

গদাধর শিরোমণিকৃত 'প্রত্যক্ষচিন্তামণিদীধিতির' যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে।

নত্বা নন্দতনুজ-সুন্দর-পদদ্বন্দ্বং গুরোরাদরাৎ
উর্ব্বীমণ্ডলমণ্ডনায়িত লসংকীর্ত্তে র্বিদিত্বা গুরুং।
সংক্ষিপ্তোক্ত্যতিদক্ষ দীধিতিকৃতঃ প্রত্যক্ষচিন্তামণে
র্ব্যাখ্যাং ব্যাকুরুতে গদাধরবুধো মোদায় বিদ্যাবতাং॥

এই শ্লোকের দ্বারা কেহ কেহ তাঁহাকে শিরোমণির ছাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শিরোমণি গদাধরের অন্ততঃ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। শিরোমণি নৈয়ায়িক সমাজের গুরু-স্থানীয় হওয়ায়, উক্ত শ্লোকে গদাধর গুরুজ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন। পুরুষ গণনায় এক্ষণে গদাধর হইতে আট জন পাওয়া যায়। তৎকালে কৃষ্ণনগরে মহারাজ রাঘব রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি গদাধরের অসামান্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া, তাঁহাকে মালিপোতা গ্রামে ৩৬০ বিঘা ভূমি দান করেন। ঐ দানপত্র ১০৬৮ বঙ্গাব্দের (১৬৬১ খৃঃ অঃ) ২২এ আষাঢ় সম্পাদিত হয়। অদ্যাবধি গদাধরের বংশীয়েরা উহা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতএব গদাধর 'শিরোমণির' ছাত্র নহেন। তিনি যে শিরোমণির ছাত্র নহেন তাহা নিশ্চিত। কথায় বলে —

(১২) নবদ্বীপ এ্যাংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরীর ২২০ সংখ্যক পুথিখানি গদাধর রচিত চণ্ডী টীকা। ঐ গ্রন্থখানি ১৭১২ শকে সদানন্দ শর্ম্মা ও রমানাথ শর্ম্মা কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল

"হরের গদা, গদার জয়।
জয়ার বিশু, লোকে কয়॥"

অর্থাৎ, হরিরামের ছাত্র গদাধর, গদাধরের ছাত্র জয়রাম এবং জয়রামের ছাত্র বিশ্বনাথ প্রধান ছিলেন।

গদাধরের চারি পুত্র—রামচন্দ্র, রামদেব, মহাদেব ও কৃষ্ণদেব। তাঁহারা সকলেই পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়ে পাটলির জমীদার মনোহর রায় বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি রামদেব তর্কবাগীশকে গোপালবাটী গ্রামে বহু ভূমি ব্রহ্মত্র দান করিয়াছিলেন।

এক্ষণে নবদ্বীপে গদাধরের বংশধরেরা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন এই বংশ সম্ভূত ছিলেন।

গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ।*—গোবিন্দ সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বংশীয় ছিলেন। কিন্তু বাসুদেব হইতে কয় পুরুষ পরে তিনি প্রাদুর্ভূত হন, তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতির পুত্র ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান থাকিয়া নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে গোবিন্দের টোল নানাদেশীয় ছাত্রে পরিশোভিত ছিল।

গোবিন্দ পদার্থখণ্ডনের এক টীকা করেন, তাহার প্রথমে তিনি এইরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন—

প্রণম্য জগতামীশং স্থিতিপ্রলয়কারিণং।
পদার্থখণ্ডনব্যাখ্যাং গোবিন্দঃ কুরুতে সুধীঃ॥

গৌতমের ন্যায়সূত্রে লিখিত ষোড়শ পদার্থের পরিচয় দিয়া ১৭২টী শ্লোকে গোবিন্দ 'ন্যায়রহস্য' নামক পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থের

* গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ বংশের দৌহিত্র বৃন্দাবনচন্দ্র তর্কালঙ্কার নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ১১৫৭ সালের (১৭৫০ খৃঃ) ১৪ই বৈশাখ বাসের জন্য নবদ্বীপে ২/০ বিঘা ভূমির সনন্দ পান। বৃন্দাবনের পুত্র শ্যামসুন্দর, তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের দৌহিত্র লালমোহন বিদ্যাবাগীশের বংশধরগণ ঐ ভিটায় বাস করিতেছেন।

শেষে লিখিত হইয়াছে—

"ভবন্তি নিগ্রহস্থানান্যেবং নৈয়ায়িকেন যে।
পদার্থাঃ ষোড়শত্বেবং প্রমাণাত্মা নিরূপিতা॥
এতাবন্ ন্যায়রহস্যং রহস্যসিদ্ধান্তসংবন্ধ(দ্ধ)ম্।
গোবিন্দশর্মনির্মিত মমৎসরাণাং মুদে ভবতু॥

ইতি গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য বিরচিতং ন্যায়রহস্যং সম্পূর্ণম্।"[১৩]

গোবিন্দ স্বরচিত ন্যায়রহস্যের 'ন্যায়রহস্যব্যাখ্যা' নামে এক টীকা রচনা করেন। উহার প্রথমে তিনি ন্যায়বাচস্পতির পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—

ভূয়ো ভূধরতনয়াং বিনয়েন যাচমানস্য।
কৃত্যানি কেলিকালে ভবস্য ভব্যায় ভূয়াসুঃ॥
ঈষদ্ গূঢ়ার্থানাং বিবরণমল্পাক্ষরৈরেব।
কুতুকেন কারিকাণাং স্বয়ং কৃতানাং বয়ং তনুমঃ॥
ন্যায়বাচস্পতেঃ সূনোরিয়ং গোবিন্দশর্মণঃ।
কৃতিঃ কৃতধিয়াং ভূয়াদমন্দানন্দদায়িনী॥[১৩]

এই সময়ে মহারাজ রাঘব, রেউই (কৃষ্ণনগর) রাজধানী স্থাপন করেন। রাঘবের পিতামহ ভবানন্দ মজুমদার প্রথমে নদীয়ার জমীদারী প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি মাটীয়ারীতেই বাস করিতেন। মহারাজ রাঘব প্রজারঞ্জক ও ধার্ম্মিক ছিলেন, এবং বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। কৃষ্ণনগরে বাস করায় তিনি সর্ব্বদাই নবদ্বীপে আগমন ও অধ্যাপক-দিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিয়া আনন্দানুভব করিতেন। মহারাজ রাঘব রায় ১০৬৭ সালে (১৬৬১ খৃঃ অঃ) ১১ই ফাল্গুন তারিখে গোবিন্দ ন্যায়বাগীশকে আড়বান্দী গ্রামে ৭০০ বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি দান করিয়া বিদ্যোৎ-

(১৩) A Triennial Catalogue of MSS. Govt. Oriental MSS. Library. Madras,—R. No. 1693 (a) & (b).

সাহিত্যার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। উক্ত ব্রহ্মত্র ভূমি এখন বর্দ্ধমান ৮১৭০ নং তায়দাদ্ ভুক্ত হইয়াছে।

এই সময় হইতেই কৃষ্ণনগরের রাজবংশের সহিত নবদ্বীপের সম্বন্ধ সংঘটিত দেখা যায়, এবং কৃষ্ণনগরের রাজন্যবর্গ নদীয়ার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-দিগকে ভূমি ও অর্থাদির দ্বারা সাহায্য করিতে থাকেন।

রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার।—রঘুদেব গদাধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের পুত্র ছিলেন। তিনি শিরোমণিকৃত নঞ্‌বাদের যে 'নঞ্‌-বাদ বিবেচন' নামে টীকা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ টীকার প্রথমে লিখিত হইয়াছে—

শিবং প্রণম্য তৎপশ্চাত্তর্কবাগীশ্বরং গুরুং।
ক্রিয়তে রঘুদেবেন নঞর্থস্য বিবেচনং॥

এই শ্লোকে তাঁহার গুরুর উপাধি তর্কবাগীশ জানা যাইতেছে। কিন্তু তিনি আবার ঐ গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন—

অত্র স্মৃক্তং দুরুক্তং বা যৎকিঞ্চিজ্জল্পিতং ময়া
তৎসর্ব্বং জগদীশস্য প্রীত্যর্থমিত্যানিন্দিতং।
রঘুদেবকৃত-গ্রন্থালোকনেন মনীষিণঃ
অধ্যাপয়ন্তু সন্তোষৈ র্নঞ্‌বাদ মবিবাদতঃ॥

এই শ্লোকে তিনি জগদীশের প্রীতির জন্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন স্পষ্টা-ভিধানে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

রঘুদেব গঙ্গেশোপাধ্যায়ের চিন্তামণির 'গূঢ়ার্থতত্ত্বদীপিকা' নামে ভাষ্য, মহর্ষি কণাদের বৈশেষিকসূত্রের ব্যাখ্যা, শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যা, নানার্থবাদ ও আখ্যাতবাদদীধিতির টিপ্পনী, অতিযোগিজ্ঞানের 'হেতুত্বখণ্ডন', 'ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক', 'প্রত্যয়াসত্তিনিরূপণ', 'ঈশ্বরবাদ', 'সামগ্রী বাদ', 'নিরুক্তিপ্রকাশ', 'বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবিচার', 'অনুমিতিপরামর্শবাদ-বিচার' নামে বহুবিধ টীকা প্রণয়ন করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ঐ

সকল টীকা ন্যায়-সংসারে 'রঘুদেবী' নামে প্রসিদ্ধ।

রঘুদেব শিরোমণিকৃত 'পদার্থতত্ত্বের' যে ব্যাখ্যা করেন তাহা ১৬৪১ শকে (১৭১৯ খৃঃ অঃ) রচিত হয়। ঐ পুস্তকের শেষে লিখিত আছে,[১৪]

নন্দসূনুপদদ্বন্দ্বং নিধায় হৃদি চিন্তয়া।
তনোতি কৌতুকং কিঞ্চিৎ রঘুদেব সমাসতঃ॥
পদার্থখণ্ডনাকুত পুরুহুত পুরোহিতং।
শিরোমণিমহং বন্দে শিরোমণিমিবাদ্ভুতং॥

নবদ্বীপে রঘুদেবের বংশধর কাহাকেও দেখা যায় না। তিনি তাহেরপুর ও চোগাঁর রাজগুরু-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজসাহির আগ্দিঘা গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ ঐ গ্রামেই বাস করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার।—ইনি গোবিন্দের পুত্র ও এক জন পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জানকীনাথ তর্কচূড়ামণিকৃত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী পুস্তকের 'ভাবদীপিকা' নামে একখানি উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

প্রণম্য শিবয়োঃ পাদৌ ধীমতা কৃষ্ণশর্ম্মণা।
সিদ্ধান্তমঞ্জরীব্যাখ্যা ক্রিয়তে ভাবদীপিকা॥

জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন।—জয়রাম নামে দুই জন অধ্যাপকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একের নাম জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, দ্বিতীয় জয়রাম তর্কালঙ্কার। গদাধরের জয়রাম নামে এক ছাত্র ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রথমোক্ত জয়রাম গদাধরের ছাত্র কিনা তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই, কিন্তু জয়রাম তর্কালঙ্কার গদাধরের ছাত্র ছিলেন ও এক সময়ে উভয়েই বর্ত্তমান ছিলেন।

জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের বংশ নাই, থাকিলেও তাহা নির্ণয় করিবার

(১৪) নবদ্বীপস্থ লাইব্রেরী গৃহে রক্ষিত ১১৩ নং তিথিতত্ত্ব ও ১৩৭ নং তন্ত্রসার পুথি দুইখানি রঘুদেব শর্ম্মার স্বহস্ত লিখিত। পুথি দুইখানি যথাক্রমে ১৬০৪ ও ১৬০৯ শকে লিখিত হয়।

উপায় নাই। তিনি শিরোমণিকৃত মণিদীধিতির 'ব্যাখ্যাসুধা', নানার্থবাদের 'বিবৃতি', সামান্যলক্ষণাদীধিতির টিপ্পনী, পদার্থতত্ত্বের 'পদার্থমণিমালা ভাষ্য', গুণপ্রকাশদীধিতি ও হেত্বাভাসদীধিতির টিপ্পনী, পক্ষধর মিশ্রকৃত মণ্যালোকের 'আলোকবিবেক' এবং রুদ্ররাম তর্কবাগীশকৃত কারকব্যূহের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্রের 'ন্যায়সিদ্ধান্তমালা' নামে এক ভাষ্য রচনা করতঃ চতুর্ব্বিধ প্রমাণের বিচার করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায়সিদ্ধান্তমালা ১৭৫০ সংবতে (১৬৯৩ খৃঃ অঃ) রচিত হয়। জয়রাম আখ্যাতবাদ টিপ্পনীর 'ব্যাখ্যাসুধায়' এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

ন্যায়পঞ্চাননঃ শ্রীমান্ জয়রামঃ সমাসতঃ।
আখ্যাতবাদ-ব্যাখ্যান মাতনোতি মনোরমং॥
ধীর-শ্রীজয়রামেণ রমেণৈব মহোদধেঃ।
ন্যায়সিন্ধোঃ পরং পারং গন্তমধ্বা নিবধ্যতে॥

এই সময়ে মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় কৃষ্ণনগরের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বিদ্যার উন্নতি সাধন সঙ্কল্পে পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহী ছিলেন ও নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকদিগের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত বহু নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিদেশীয় পাঠার্থীদিগের ব্যয়ের জন্য বহু টাকার সম্পত্তিও নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে নবদ্বীপস্থ টোলের ছাত্রেরা যে বৃত্তি পাইয়া থাকেন, তাহা রামকৃষ্ণের প্রদত্ত ভূমির আয় হইতেই দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ এইরূপে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের সাহায্য করায় নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'নবদ্বীপাধিপতি'[১৫] উপাধি প্রদান

(১৫) নবদ্বীপাধিপতিং রামকৃষ্ণ রায়মপি স্ববশমানেতুং বহূন্ সেনাপতীন্ প্রেষয়ামাস। (ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতম্, পৃঃ ৩৫) এবং, দেওয়ান মহাশয় লিখিত ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত পৃঃ ৬৮ ও ৯১ দ্রষ্টব্য।

করেন। তদবধি কৃষ্ণনগরের রাজবংশ 'নবদ্বীপাধিপতি' নাম সাদরে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

জয়রাম তর্কালঙ্কার।—জয়রামের আদি নিবাস পাবনা জেলায় ছিল। তাঁহার পিতা জয়দেব একজন অতি প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি পুটিয়া রাজবংশের সভাপণ্ডিত থাকিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন, এবং বৃদ্ধাবস্থায় নবদ্বীপে বাস করেন। জয়রাম বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন। নবদ্বীপের আম্পুলিয়াপাড়া নিবাসী ৺কৃষ্ণকুমার সান্যাল তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ছিলেন। কিন্তু ইহাঁরা আর কেহই সংস্কৃত-শাস্ত্র ব্যবসায়ী নহেন। কৃষ্ণ কুমার ও তদীয় পুত্রগণ সকলেই ইংরাজী শিক্ষা করিয়া চাকরী করিতেছেন। কৃষ্ণকুমার হইতেই সংস্কৃত অধ্যয়ন লোপ পাইয়াছে। জয়রাম গদাধরের ছাত্র ছিলেন। তিনি গদাধর-প্রণীত শক্তিবাদ গ্রন্থের টীকা করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণকুমার সান্যাল মহাশয়ের নিকট তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের যে সকল দলিল পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে নিম্নের ঘটনাগুলি জানা যায়।

১০৮২ সালে (১৬৭৫ খৃঃ অঃ) জয়রাম তর্কালঙ্কার মনোহরসাহিতে অজ্ঞাতনামা কোন দাতার নিকট ১৮৲ টাকা বৃত্তি পান। ১৮৮৭ সালে তিনি রাজা জয়গোপাল শর্ম্মার নিকট মুর্শিদাবাদ জেলায় আমদরুণ স্নুবর্ণ-মৃগী গ্রামে ৩০৲ টাকা বৃত্তি পান। ১১০৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১১৫৮ সালের (১৭৫১ খৃঃ অঃ) ২রা কার্ত্তিক তারিখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জয়রাম তর্কালঙ্কারকে প্রদত্ত ৮৫।১ বিঘা জমীর ছাড়পত্র দান করেন। তাঁহার বসত ভিটা আজ পর্য্যন্ত আম্পুলিয়া পাড়ায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

১১৯৮ সালে স্নুবর্ণমৃগী মৌজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ ক্রয় করিলে, ১২০১ সালে জয়রামের বংশীয় রামচন্দ্র শর্ম্মা উক্ত বৃত্তির জন্য মুর্শিদাবাদের জজের নিকট দরখাস্ত করেন।

বিশ্বনাথ নামে জয়রামের এক প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তাঁহার বংশীয় শ্রীযুক্ত ননীভূষণ ভট্টাচার্য্য ও অমলেন্দু ভট্টাচার্য্যেরা বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

শিবরাম বাচস্পতি।—শিবরাম একজন ষড়্দর্শনবেত্তা প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গদাধর ভট্টাচার্য্য-প্রণীত মুক্তিবাদের একখানি টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত টীকা ১৬৬৪ শকে (১৭৪২ খৃঃ অঃ) রচিত হয়। যথা,

শাকে চতুঃষষ্ঠ রসেন্দু মানে স্থানে প্রণম্যেশ পদে বিমুক্তেঃ।
গদাধরোক্তে নবমুক্তিবাদে চকার টীকাং শিবরাম নামা॥[১৬]

শিবরামকৃত গৌতমসূত্রের একখানি বৃত্তিও পাওয়া যায়।

শিবরামের পুত্র হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত তৎকালে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। এই সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র

ধর্ম্মশাস্ত্রসকল ঋষি-প্রণীত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গ্রন্থ, আধুনিক ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল। ঐ সকল গ্রন্থ স্মৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্মৃতি-শাস্ত্র কত আছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় ঊনবিংশ জন স্মৃতিকার ঋষির উল্লেখ আছে—

"মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী॥

---

(১৬) গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের হস্তলিখিত পুথি হইতে উদ্ধৃত। নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের গৃহে শিবরামের স্বহস্ত লিখিত একখানি শ্রাদ্ধতত্ত্বের পুথি আছে। উক্ত পুথিখানির লিপি ১৬২৬ শকের ভীষ্মাষ্টমী দিবসে সমাপ্ত হয়।

পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
সাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥

অর্থাৎ—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খলিখিত, দক্ষ, গৌতম, সাতাতপ ও বশিষ্ঠ।

এই সকল স্মৃতিকার ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পর ভিন্ন সম্প্রদায় ও মত-ভেদ ছিল। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থেও বিরুদ্ধ মত লক্ষিত হয়। ঐ সকল স্মৃতি পাঠ করিলে কোন্ মত ভ্রান্ত ও কোন্ মত অভ্রান্ত তাহা জানা যায় না। বিশেষতঃ হিন্দুগণ ঐ সকল স্মৃতি বেদ-মূলক বলিয়া বিশ্বাস করেন। স্মৃতিকর্ত্তাদিগের মধ্যে যতই কেন মতদ্বৈধ থাকুক না, হিন্দুরা সকল মতই প্রামাণিক ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং ব্যাখ্যার ইতর বিশেষ করিয়া বিরোধ ভঙ্গ পূর্ব্বক একবাক্যতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণেই মীমাংসা গ্রন্থের সৃষ্টি। মীমাংসকদিগের মধ্যে মেধাতিথি, বিজ্ঞানেশ্বর, কুল্লুকভট্ট, বাচস্পতি মিশ্র ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রধান।

মেধাতিথি।—মেধাতিথি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মিথিলায় প্রাদুর্ভূত হন। মনুসংহিতার টীকাই তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। তিনি কেবল মনু-সংহিতার টীকা করিয়াছেন এমন নহে, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া পরস্পর বিরোধও নিরাস করিয়াছেন।

বিজ্ঞানেশ্বর।—খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত কল্যাণ নামক নগরের রাজা বিক্রমের মন্ত্রী ছিলেন। তৎসংগৃহীত মিতাক্ষরার মত এক্ষণে বঙ্গদেশ ব্যতীত সমস্ত ভারতে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। মিতাক্ষরার ন্যায় কোন গ্রন্থ ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও প্রচলিত হয় নাই। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের অন্যতম বিচারক কোলব্রুক সাহেব মিতাক্ষরা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

কুল্লুকভট্ট।—ইনি বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। গৌড়নগরের নিকট নন্দনপুর ইহাঁর নিবাসভূমি। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দিবাকর ভট্টের পুত্র ছিলেন। কুল্লুকভট্ট কাশীতে অধ্যয়ন করেন, এবং 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামে মনুসংহিতার এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন। ইনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তৎকৃত মনুসংহিতার টীকায় তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে—

গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যেবরেন্দ্র্যাং কুলে।
শ্রীমদ্ভট্ট দিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুকভট্টোভবৎ॥

বাচস্পতি মিশ্র।—তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিথিলা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপ্রণীত 'বিবাদ-চিন্তামণি' অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা আদৃত। বঙ্গদেশেও বাচস্পতি মিশ্রের মত কিয়দংশে প্রচলিত ছিল। এক্ষণে মিথিলা প্রদেশে শিমুল-নামক স্থানে বাচস্পতি মিশ্রের বংশাবলী বর্ত্তমান আছেন। ইনি নৈয়ায়িক বাচস্পতি মিশ্র হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

জীমূতবাহন।—খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীমূতবাহন বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি যেরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে অনেকে তাঁহাকে রাঢ়ী শ্রেণীয় শ্রোত্রিয় কুলোদ্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তৎসংগৃহীত স্মৃতি সংগ্রহের নাম 'ধর্ম্মরত্ন'। কিন্তু দায়ভাগ সম্বন্ধেই জীমূতবাহনের মত বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত। আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে তিনি তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কুলকারিকায় জীমূতবাহনের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

পারিভদ্রকুলোদ্ভূতঃ শ্রীমান্ জীমূতবাহনঃ।
দায়ভাগং চকারেমং বিদুষাং সংশয়চ্ছিদে॥ (এড়ুমিশ্র)

শ্রীনাথ আচার্য্য-চূড়ামণি।—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীকরাচার্য্য। পিতা ও

পুত্র উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীনাথ মীমাংসা সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থের সাধারণ নাম 'তত্ত্বার্ণব'। তিনি জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের 'দায়তত্ত্বার্ণব' নামে টীকা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। তদ্‌ভিন্ন 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' 'উদ্‌বাহ তত্ত্বার্ণব' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

তৎকালে কুলীনদিগের কুলরক্ষার হেতু অনেক সময়ে কুলীন কন্যাদের বিবাহ হইত না। বর অপেক্ষা অধিক-বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্তকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলেও, কুলরক্ষার জন্য কুলীনপুত্র তদপেক্ষা অধিক-বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে বয়স্থা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও, শ্রীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইঙ্গিতে তাহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

কৃত্যতত্ত্বার্ণবের মঙ্গলাচরণে শ্রীনাথ আচার্য্য লিখিয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দপদাম্ভোজদ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব-সাধনং।
বন্দে বৃন্দারকধুনী মকরন্দ মনোহরং॥
শ্রীকরাচার্য্যপুত্রেণ শ্রীমতা শ্রীনাথ শর্ম্মণা।
প্রীতয়ে বিদুষাঞ্চক্রে কৃত্যকালবিনির্ণয়ঃ॥

(নবদ্বীপ লাইব্রেরী—১৩৩ নং পুথি)

স্মৃতির প্রাধান্য স্থাপন

রঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য।—রঘুনন্দন খৃষ্টীয় শাকের ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তৎসংগৃহীত জ্যোতিস্তত্ত্ব নামক গ্রন্থের রবিসংক্রান্তি গণনায় উল্লিখিত আছে—

"নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতা"

অর্থাৎ শকাব্দাঙ্ক হইতে ১৪৮৯ বিয়োগ করিয়া, তদ্দ্বারা পূরণ করিবে।

এতদ্দ্বারা ১৪৮৯ শকে তাঁহার জ্যোতিস্তত্ত্ব গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জ্যোতিস্তত্ত্ব তাঁহার শেষ সময়ের গ্রন্থ বলিয়া সকলে অনুমান করেন। এক্ষণে ঐ-খানি যদি আমরা তাঁহার ৬০ বৎসর বয়সের গ্রন্থ অনুমান করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার জন্মকাল ১৪২৯ শকে (১৫০৭ খৃঃ অঃ) বলিতে পারি। অতএব চৈতন্যদেবের জন্মের প্রায় ২০।২২ বৎসর পরে রঘুনন্দনের জন্ম অনুমিত হয়।

রঘুনন্দনের সময়নিরূপণ সম্বন্ধে তদীয় গ্রন্থ হইতে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। রঘুনন্দন একাদশীতত্ত্বের অন্তর্গত বিষ্ণুপূজা-পদ্ধতিতে এবং আহ্নিকতত্ত্বে[১] 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব রঘুনন্দনের উক্ত সংগৃহীত গ্রন্থ, যে হরিভক্তি গ্রন্থের পরে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ঐ হরিভক্তি গ্রন্থের কাল নিরূপণ করিতে পারিলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের কাল নিরূপণ করা সহজ হইবে। সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্‌ ভাগবত গ্রন্থের দশম স্কন্দের বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষিণী নামে এক টীকা রচনা করেন। ঐ টীকা ১৪৭৬ শকে (১৫৫৪ খৃঃ অঃ) সমাপ্ত হয়, তাহা তদ্‌গ্রন্থেই বিবৃত আছে—

(১) দেবোপরিধৃতং মস্তকোপরিধৃতম্‌ অধোবস্ত্রধৃতমন্তর্জল প্রক্ষালিতঞ্চ পুষ্পং দুষ্টম্‌ ইতি হরিভক্তিনামকে গ্রন্থে। (একাদশীতত্ত্বে বিষ্ণুপূজা পদ্ধতি এবং আহ্নিকতত্ত্বে দেবপূজা)

'শাকে ষট্ সপ্ততি মনৌ পূর্ণেয়া টিপ্পনীশুভা।'

আবার সনাতন গোস্বামিকৃত ঐ বৃহদ্বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের টীকায় তিনি বলিয়াছেন—"অন্যদ্ভগবদ্ভক্তিবিলাসটীকায়াং কথামাহাত্ম্যে বিস্তারিত মেবাস্তি"। অর্থাৎ—এতদ্ব্যতীত বিশেষ-ব্যাখ্যা ভগবদ্ভক্তিবিলাসের টীকায় বিশেষরূপে করা হইয়াছে ইত্যাদি। অতএব স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, যে গ্রন্থে হরিভক্তি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সেই গ্রন্থ তাহার পরে, অর্থাৎ ১৪৭৬ শকের পরে হইয়াছে বলিতে হয়। তাহা হইলে স্মার্ত্ত সম্বন্ধে উপরে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাই প্রকৃত সময় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রঘুনন্দনের পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য। তিনিও নবদ্বীপে একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার স্মৃতির টোল ছিল। 'সময়প্রদীপ'[২] নামক স্মৃতি গ্রন্থ ইহাঁরই প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। হরিহরের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম রঘুনন্দন, কনিষ্ঠের নাম যদুনন্দন। যদুনন্দন বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হন।

রঘুনন্দন অতি শান্তস্বভাব ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন। কথিত আছে, হরিহরকে তাঁহার পুত্রের অসদাচরণ জন্য কখন কোন অভিযোগ শ্রবণ করিতে হয় নাই। রঘুনন্দন যেমন শান্ত ছিলেন, লেখাপড়াতেও তাঁহার তেমনি মনোযোগ ছিল। তিনি পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া, ব্যাকরণ অভিধান ও কাব্যাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিল। তিনি পঠদ্দশাতেই নব

---

(২) সময়-প্রদীপের আরম্ভে লিখিত হইয়াছে—

অনায়াসেন সময়ং কর্ম্মণাং যো বিবিৎসতি।
তদর্থং জ্যোতিষঃ শ্লোকান্ সঞ্চিনোমি যথামতিঃ॥
জ্যোতির্গ্রন্থকলাপাদ্বচনান্যাকৃষ্য শিষ্যবোধায়।
সময়প্রদীপমেতং কুরুতে শ্রীহরিহরাচার্য্যঃ॥

(নবদ্বীপ লাইব্রেরী ২৪০নং পুথি)

নব ভাবপূর্ণ কবিতা লিখিয়া সহাধ্যায়ীদিগের নিকট এবং অধ্যাপকের নিকট বিশেষ আদৃত হইতে লাগিলেন। তিনি যে ভবিষ্যতে একজন প্রধান লোক হইবেন, তাহা এই সময় হইতেই অনেকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

হরিহর কুলীন ছিলেন। কুলীনদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ তৎকালে অতিশয় প্রবল ছিল। কিন্তু হরিহর এই উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। তিনি পুত্রের কাব্যাদি পাঠ শেষ হইলে, অন্ততঃ ২০ বৎসর বয়সে নবদ্বীপেই পুত্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহের পরই রঘুনন্দন পিতার নিকট স্মৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। পিতার নিকট কিছুদিন পড়িয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণির নিকট অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে তিনি বাসুদেবের নিকটও পড়িয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের সময় বঙ্গের সমৃদ্ধির সময়। মহাত্মা চৈতন্যদেব এই সময়ে ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া সনাতন সত্যধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া সর্ব্ববর্ণের লোকদিগকে ধর্ম্মপথের পথিক করিতেছেন। এবং তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তি-প্রভাবে মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ন্যায়ের নূতনরূপ ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বোচ্চ আসনে আসীন হইয়াছেন। সুতরাং রঘুনন্দন স্বীয় প্রাধান্য লাভের আশায় ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাস্তবিক সহাধ্যায়ী বা সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকেও কোন বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিতে দেখিলে বুদ্ধিমান্ ও উচ্চাভিলাষী ছাত্রগণের মনে ঈর্ষা জন্মে এবং অন্য বিষয়ে প্রাধান্যলাভের চেষ্টা তাঁহাদিগের মনে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে।

এই সময়ে বঙ্গের সিংহাসনে মুসলমান ভূপতি সয়াদ হোসেন সা উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দীল্লির অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তখন মুসলমানদিগের রাজ্যকাল প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইয়াছে। তাঁহাদের এই দীর্ঘ অধিকারকালে হিন্দুদিগের

আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মের জ্যোতিঃ দিন দিন মলিন হইয়া আসিতেছে। যবনদিগের সংসর্গে জাতি-ভেদের বন্ধন অনেক শিথিল হইয়া পড়িতেছে। আহার সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তাহারও অনেক হ্রাস হইয়াছে। অনেক হিন্দু, প্রকাশ্যে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। এই মুসলমানদিগের শাসনে—হিন্দুসমাজ নিতান্ত ক্ষুণ্ণবল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই সময়ে হিন্দুসমাজের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। সূক্ষ্মদর্শী রঘুনন্দন তাহা বুঝিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন পাঠদ্দশাতেই দেখিলেন যে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত, এবং নব্য স্মৃতিসংগ্রাহকগণও তাহার প্রকৃত সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। ঐ সকল প্রাচীন ও নব্য স্মৃতিকারদিগের মতের সামঞ্জস্য করিয়া সময়োপযোগী করিতে না পারিলে ধর্ম্মাচরণ করা নিতান্তই কঠিন হইবে। আরও, তৎকালে সমাজেও ধর্ম্মাচরণের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। তিনি দেখিলেন হিন্দুসমাজের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ধর্ম্মশাসনে শাসিত করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। তিনি সমাজবন্ধন শিথিলকরণ জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন টীকা করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন।

রঘুনন্দন স্মৃতি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই মলসামতত্ত্ব সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থের প্রথমেই তিনি যে যে গ্রন্থ করিয়াছেন তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

> "মলিম্লুচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধিনির্ণয়ে।
> প্রায়শ্চিত্তে বিবাহেচ তিথৌ জন্মাষ্টমীব্রতে॥
> দুর্গোৎসবে ব্যবহৃতাবেকাদশ্যাদি নির্ণয়ে।
> তড়াগ ভবনোৎসর্গে বৃষোৎসর্গ ত্রয়েব্রতে॥

প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তুযজ্ঞকে।
দীক্ষায়ামাহ্নিকে কৃত্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥
সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্যবিচারণে।
ইত্যষ্টাবিংশতি স্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥

অর্থাৎ মলমাস (মলিম্লুচ), দায়, সংস্কার, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, উদ্‌বাহ, তিথি, জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব, ব্যবহার, একাদশী, জলাশয়োৎসর্গ, ঋগ্‌বেদীয়, সামবেদীয়, যজুর্ব্বেদীয় বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধ, ব্রত, দেবপ্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা, জ্যোতিষ্, বাস্তুযাগ, দীক্ষা, আহ্নিককৃত্য, শ্রীপুরুষোত্তম, শূদ্রকৃত্য মঠ-প্রতিষ্ঠা, সমস্ত স্মৃতিকে এই অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে তিনি বিভক্ত করেন। এই অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব সমাপ্ত করিতে তাঁহার ন্যূনাধিক ২৫ বৎসর কাল পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কেবল গ্রন্থ পড়িয়াই স্বীয় মত স্থাপন করেন নাই। তিনি মিথিলা কাশী প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ ও তদ্দেশীয় আচার ব্যবহার, রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তদ্দেশবাসী অধ্যাপকদিগের সহিত বিচার করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

এই অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেরই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে তাহা উত্তমরূপে লিখিত হইয়াছে। তিনি ঐ সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ মতের একবাক্যতা করিবার জন্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র আদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি-সমুদয় নিরূপণ করিয়াছেন এবং কোন স্থলে বা প্রাচীন গ্রন্থের মত খণ্ডন করিয়া, কোথাও বা গ্রন্থ বিশেষের মত উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের সাধন দিয়াছেন, এবং কোথাও বা শ্রুতি ও স্মৃতির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে তিনি অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, মীমাংসকতা, সারগ্রাহিতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ফলে ভিন্ন ভিন্ন

মুনিমতের বিরোধ সামঞ্জস্য করিতে হইলে, যে এক অসাধারণ ক্ষমতা ও বিচারশক্তির আবশ্যকতা হয়, এই সকল গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

জীমূতবাহন দায়ভাগ সম্বন্ধে যেরূপ ভূয়োদর্শন ও ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন, রঘুনন্দনও আচার সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গ্রন্থে অধিকারী না হইলে আর কেহই স্মার্ত্ত নামের অধিকারী হইতে পারেন না। কিরূপে সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে হয়, কিরূপেই বা বিচার করিতে হয়, এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরই বা কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ব্যবহারতত্ত্বে তৎসমুদয় সূক্ষ্মরূপে আলোচিত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের ঐ সকল গ্রন্থ সংগ্রহে তৎকাল-প্রচলিত আচার ব্যবহার কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এইরূপে পরিবর্ত্তন হওয়ায় নবদ্বীপের ও অন্যান্য স্থানের অধ্যাপকগণ তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়া বিচারার্থী হন, কিন্তু রঘুনন্দন এমন দৃঢ়তা-সহকারে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন যে পরিশেষে তাঁহার বিরোধিগণ সকলেই তাঁহার মতাবলম্বী হইলেন। ইহাতে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, এবং দিন দিন তাঁহার টোলে ছাত্র প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সুশিক্ষার গুণে ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইতে লাগিলেন। অধ্যাপকের প্রতি ভক্তি বশতঃ ছাত্রগণ যখন অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন তখন গুরুর গ্রন্থ হইতে আপন আপন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর দ্বারা বঙ্গভূমির চারিদিকে তাঁহার মত প্রচারিত হইয়া পড়িল। এইরূপে রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব, প্রাচীন স্মার্ত্তগণের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়া, তাহাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিলুপ্ত করিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বঙ্গদেশে এমন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নাই, যাঁহার গৃহে দুই চারিখানি স্মৃতিতত্ত্ব না পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচারিত হইলে হিন্দুসমাজের প্রাচীন রীতিনীতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণদিগের সিদ্ধ চাউল, মৎস্য এবং মসূর ডাউল ইত্যাদি আহার করা নিষেধ আছে। কিন্তু এই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ গোপনে সিদ্ধ চাউল ও মসূর ডাউল ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন। রঘুনন্দন ইহা দেখিয়া উহা ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করিতে পারেন, এমন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সিদ্ধ চাউল ও মসূর ডাউল ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি এমন ব্রাহ্মণও আছেন যাঁহারা সিদ্ধ চাউল, মৎস্য ও মসূর ডাউল স্পর্শও করেন না।

হিন্দুগণ অতিশয় ধর্ম্মভীত। তজ্জন্য প্রাচীন ঋষিগণ কি সাংসারিক কি ব্যবহারিক সকল বিষয়ই ধর্ম্মের সহিত বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে আহার পরিবর্ত্তন ও উপবাস স্বাস্থ্যরক্ষার একটী প্রধান নিয়ম। তজ্জন্য আর্য্য ঋষিগণ তিথি বিশেষে, বস্তু বিশেষের আহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ বিষয় স্বতন্ত্র আলোচিত না থাকায় ঐ নিয়ম প্রচারিত ছিল না। রঘুনন্দন তৎসমুদয় তিথিতত্ত্ব নামক গ্রন্থে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলেন। তদবধি ঐ নিয়ম সমাজে বহুলরূপে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

প্রাচীনমতে, যতক্ষণ একাদশী তিথি থাকিত ততক্ষণ উপবাস করিলেই একাদশীপালন করা হইত। রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব প্রচারিত হইলে এই প্রথা রহিত হইয়া যায়। তিনি একাদশী সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, সকলকেই একদিন উপবাস করিতে হইবে।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে বিধবাগণ অত্যন্ত অসুস্থ, রুগ্ন বা শৈশবাবস্থা হেতু একাদশীর উপবাস করিতে অসমর্থ হইলে তাহারা অনুকল্প করিতে পারিতেন। রঘুনন্দন হইতে এই প্রথা রহিত হইয়া যায়। রঘুনন্দন নানা শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিধবারা কোন

প্রকারেই অনুকল্প করিতে পারেন না। একাদশী সম্বন্ধে সকল নিষেধই বিধবাদিগের প্রতিপাল্য। অনেকে বলেন যে রঘুনন্দন হইতেই বিধবা-দিগের একাদশীর অনুকল্প রহিত হইয়াছে। কিন্তু বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুঝা যায় যে তাহা নহে। তিনি নিজে কোন মত প্রচলিত করেন নাই। শাস্ত্রকারদিগের যাহা অভিপ্রায় তাহাই তিনি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বরঞ্চ বিধবাদিগের মধ্যে যে অশাস্ত্রীয় ব্যবহার ছিল তাহাই রহিত করিয়াছেন।

রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব প্রকাশের পরেই তিনি পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য গয়াক্ষেত্রে যাত্রা করেন। তিনি গয়ায় উপস্থিত হইয়া পিণ্ডদান করিবার জন্য মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে উদ্যত হইলে, মন্দিরাধ্যক্ষ পাণ্ডারা তাঁহার নিকট অসঙ্গত কর চাহেন। রঘুনন্দন তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া যান, এবং এক ক্রোশ পরিমিত গয়াক্ষেত্রের পরিমাণ বলিয়া, তিনি প্রান্তরে গিয়া পিণ্ড দান করিতে উদ্যত হইলেন। এদিকে পাণ্ডারা যখন শুনিলেন যে তিনি নবদ্বীপের 'স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য', তখন তাঁহারা চমকিত ও মহাভীত হইয়া তাঁহাকে পুনরানয়ন জন্য তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা বুঝিয়া-ছিলেন যে, যদি রঘুনন্দন ঐরূপ স্থানে পিণ্ড দিয়া যান, তাহা হইলে আর কেহই মন্দিরে আসিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবে না। অনন্তর তাঁহারা রঘুনন্দনকে অনেক স্তব ও স্তুতি করিয়া আনিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রাদ্ধাদি করাইলেন। পাঠকগণ দেখুন, এখন রঘুনন্দনের মত কি প্রবলরূপে প্রচারিত হইয়াছে। পাণ্ডারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে রঘুনন্দন যাহা করিবেন তাহাই প্রচলিত হইবে। ইহা সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নহে।

রঘুনন্দনের এই স্মৃতিতত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ায় সংস্কৃত সাহিত্য-জগতে আর এক মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে।

হিন্দুদিগের অধিকারকালে ব্রাহ্মণেরাই কেবল শাস্ত্র-প্রণেতা

ছিলেন। তাঁহারা ঐহিক ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, আজীবন শাস্ত্রালোচনা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুরাজগণ তাঁহাদের আবশ্যকীয় ব্যয়-ভার বহন করিয়া আসিতেন। তাঁহারাও নিশ্চিন্ত থাকিয়া মানব-সমাজের উপকারক নানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক এই প্রথা ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণেরা সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের সময়ে আর ব্রাহ্মণদিগের রাজ্য নাই। হিন্দু-বিরোধী যবনেরা তখন রাজ্যের অধিপতি। ব্রাহ্মণদিগকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক বরং যাহাতে তাঁহাদের অবনতি হয় তাঁহারা তাহারই চেষ্টা করিতেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা দিন দিন ন্যূন হইয়া আসিয়াছিল; এবং অনেকেই অর্থকরী বিদ্যা, পার্শী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচারিত হওয়ায় সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের আয়ের কিছু সংস্থান হইয়াছিল।

রঘুনন্দনের সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছে; কেবল সংস্কারতত্ত্বের মধ্যে উপনয়ন বিধি প্রচলিত হয় নাই। তৎসম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে, রঘুনন্দন আপন পুত্রের উপনয়ন স্বমতে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ উপনয়নের পর তাঁহার পুত্র কোন কার্য্য উপলক্ষে রঘুনাথ শিরোমণিকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া প্রথানুসারে তাঁহাকে নমস্কার করেন। কিন্তু শিরোমণি একটু চিন্তা করিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন না। বালক দুঃখিতমনে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, 'আমি জ্যেঠা মহাশয়কে নমস্কার করিলাম, কিন্তু তিনি প্রতিনমস্কার করিলেন না।' রঘুনন্দন শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। যথাসময়ে শিরোমণি উপস্থিত হইলে, রঘুনন্দন তাঁহাকে প্রতি-নমস্কার না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শিরোমণি কহিলেন— 'ভাই হে, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তুমি যে মতে পুত্রের

উপনয়ন দিয়াছ তাহাই যদি শাস্ত্রের প্রকৃত মত হয়, তাহা হইলে তোমার তদনুসারে উপনয়ন না হওয়ায়, তুমি নিজে অব্রাহ্মণ রহিয়াছ। সুতরাং অব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তানকে যদি শতগাছি যজ্ঞসূত্র দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সে কোন মতেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। আর যদি তোমার মত যথার্থ শাস্ত্রসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে তোমার পুত্রও এক্ষণে ব্রাহ্মণ হয়েন নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমি তোমার পুত্রকে প্রতিনমস্কার করি নাই।' তদবধি রঘুনন্দনের সংস্কার-তত্ত্বের উপনয়ন প্রথা অপ্রচলিত হইল। এক্ষণে উপনয়ন প্রাচীন মতেই হইয়া থাকে।

রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব ভিন্ন 'রাসযাত্রাপদ্ধতি', 'সংকল্প চন্দ্রিকা', ত্রিপুষ্করাশান্তিতত্ত্ব',' দ্বাদশযাত্রা প্রমাণতত্ত্ব' ও 'হরিস্মৃতি-সুধাকর' নামে কএকখানি স্মৃতি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রঘুনন্দন ঐ সকল পুস্তকে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচার-শক্তির এবং প্রগাঢ় যুক্তি ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি কি শুভক্ষণেই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! তাঁহার জন্ম-গ্রহণে হিন্দু-সমাজে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। যতদিন পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত থাকিবে, যতদিন পৃথিবীতে সংস্কৃত সাহিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন রঘুনন্দনের নাম কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। তিনি "স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য" এই আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তিরূপ শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি এইরূপ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও কখন অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই। মালমাসতত্ত্ব ও তিথিতত্ত্বের শেষে তিনি বলিয়াছেন—

বিরুদ্ধং গুরুবাক্যস্য যদত্র ভাষিতং ময়া।
তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরেব স্মৃতিতত্ত্ববুভুৎসয়া॥

স্মৃতিতত্ত্বে প্রমাদাদ্ যদ্ বিরুদ্ধং বহুভাষিতং।
গুণলেশানুরাগেণ তচ্ছোধ্যং ধর্ম্মদর্শিভিঃ॥

এইরূপে রঘুনন্দন আজীবন শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমকালে কালকবলে পতিত হন। এক্ষণে নবদ্বীপে রঘুনন্দনের বংশ নাই।

কাশীরাম বাচস্পতি ও শান্তিপুর-নিবাসী অদ্বৈতের বংশীয় রাধামোহন গোস্বামী, এই অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বের দুইখানি টীকা করিয়াছেন। কাশীরাম আপনাকে সর্ব্বশাস্ত্র-নিপুণ রামকৃষ্ণের পৌত্র ও সঙ্গীতচূড়ামণি রাধাবল্লভের পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

অন্যান্য স্মৃতি গ্রন্থকারগণ

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার।—রামভদ্র শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির পুত্র। তিনি রঘুনন্দনের সমসাময়িক ছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগের 'দায়ভাগটীকা' ও 'সিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা' নামে দুইখানি টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল টীকার সাধারণ নাম 'চন্দ্রিকা'। তিনি দায়ভাগের টীকায় লিখিয়াছেন—

আলোচ্য তাতনির্ম্মিত নিবন্ধমারাধ্য বিশ্বেশ্বরং।
আচার্য্যাচার্য্যস্তনুতে বিবৃতিমিমাং দায়ভাগস্য॥

এতদ্ব্যতীত তিনি মহাকবি কালিদাসকৃত রঘুবংশ মহাকাব্যের 'বিদ্বন্মোদিনী' নাম্নী এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের "শকুন্তলা বিবৃতি" নামে টীকা রচনা করিয়া পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

রামভদ্রের অনেকগুলি পুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র **রামেশ্বর তান্ত্রিক** দীক্ষাহোমাদি বিষয়ে "তন্ত্রপ্রমোদন", এবং তাঁহার

ষষ্ঠ পুত্র **রঘুমণি** "আগমসার" ও "দত্তকচন্দ্রিকা" নামে গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়া স্বীয় বংশের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। রঘুমণির পিতা রাম-ভদ্র যে সমুদায় স্মৃতিচন্দ্রিকা রচনা করেন, তাহাতে দত্তকগ্রহণের ব্যবস্থা বিশেষরূপে বিবৃত হয় নাই। এইজন্য রঘুমণি 'দত্তকচন্দ্রিকা' নামক পুস্তক সংগ্রহ করেন। উক্ত পুস্তকের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে—

চন্দ্রিকানুক্ত সঞ্জাত সংশয়ধ্বান্ত চন্দ্রিকা।
চন্দ্রিকালাম্নুভাবেন কৃতা দত্তকচন্দ্রিকা॥

তৎকালে ঋষি বা ক্ষমতাশালী লেখকের গ্রন্থ ভিন্ন কোন গ্রন্থই পণ্ডিত-সমাজে আদৃত হইত না। এইজন্য রঘুমণি স্বীয় গ্রন্থের প্রচার উদ্দেশ্যে দত্তকচন্দ্রিকার শেষে অজ্ঞাতনামা "মহামহোপাধ্যায় শ্রীকুবেরকৃতা দত্তকচন্দ্রিকা সমাপ্তা" লিখিয়াছেন। বাস্তবিক এই গ্রন্থ যে রঘুমণির রচিত তাহা উক্ত গ্রন্থের শেষ শ্লোকে চিত্রপদ দ্বারা প্রকাশিত আছে। যথা—

রম্যৈষা চন্দ্রিকা দত্তপদ্ধতের্দর্শিকা লঘু।
মনোরমা সন্নিবেশৈরঙ্গিনাং ধর্ম্মতারণিঃ॥

এই চিত্রপদের শ্লোকার্দ্ধদ্বয়ের প্রথম ও শেষ অক্ষর লইলেই "রঘুমণি" শব্দ পাওয়া যায়।

রঘুমণির পরে এই বংশে আর কোন গ্রন্থকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ডাক্তার শ্রীপতি ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হওয়ায়, নবদ্বীপে রামভদ্রের বংশ লোপ পাইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম।—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। শান্তিপুর তাঁহার আদি নিবাস ছিল, পরে তিনি নবদ্বীপে আসিয়া টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের চৈতল চট্টোপাধ্যায় বংশীয় ৺চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের গোষ্ঠিবর্গ তাঁহার জ্ঞাতি বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে

একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন. কাব্যশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁহার সময়ে কৃষ্ণনগরে মহারাজ রামজীবন রায় ও তৎপুত্র মহারাজ রঘুরাম রায় বর্ত্তমান ছিলেন—তিনি উভয়েরই সভাসদ্ ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ১৬৩৩ শকে (১৭১১ খৃঃ অঃ) 'কৃষ্ণপদামৃত' এবং ১৬৪৫ শকে (১৭২৩ খৃঃ অঃ) 'পদাঙ্কদূত' নামে দুইখানি অতি সুন্দর কাব্য রচনা করেন। এই উভয় গ্রন্থে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাতে তাঁহার কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পদাঙ্কদূতে তিনি এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

শাকে শায়কবেদষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মার্পয়
ন্নানন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতমতুল-প্রীতিপ্রদং শৃণ্বতাং
ধীরশ্রীরঘুরামরায়-নৃপতেরাজ্ঞাং গৃহীত্বাদরাৎ॥

ইতি কৃষ্ণ-সার্ব্বভৌম বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপদাঙ্কদূতঃ সমাপ্তঃ।[১]

অর্থাৎ, ১৬৪৫ শকে শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা রাজা রঘুরাম রায়ের আজ্ঞা আদরে গ্রহণ করিয়া 'কৃষ্ণপদাঙ্কদূত' রচনা করিলেন। এক্ষণে নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের বংশধর নাই—তাঁহারা শান্তিপুরে বাস করিতেছেন।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি।—ইহার পর চন্দ্রশেখরবাচস্পতি প্রাদুর্ভূত হন। ইনি নবদ্বীপ-নিবাসী বারেন্দ্র-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতা বিদ্যাভূষণ মহাশয় একজন ষড়্দর্শনবেত্তা প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। চন্দ্রশেখর পিতার নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপে একজন প্রধান পণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্রীয় 'স্মৃতিপ্রদীপ',

(১) নবদ্বীপ লাইব্রেরীর গোলোকনাথ ন্যায়রত্নের হস্তলিখিত ৬৯ সংখ্যক পুথির 'পদাঙ্কদূত' হইতে উদ্ধৃত। শব্দকল্পদ্রুমে পদাঙ্কদূত শব্দেও উক্ত শ্লোক দৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমকে নাটোরাধিপতি মহারাজ রামজীবনের সভাসদ্‌রূপে উল্লেখ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত পদাঙ্কদূতের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

'স্মৃতিসারসংগ্রহ', 'সংকল্পদুর্গভঞ্জন' ও 'ধর্ম্মবিবেক' নামে চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থ-দ্বয়ে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

সদানন্দময়ীং স্মৃত্বা চন্দ্রশেখরশর্ম্মণা।
বরেন্দ্রান্বয়সম্ভূত-নবদ্বীপ-নিবাসিনা॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে গূঢ়শাস্ত্রার্থস্যাভিসন্দিতঃ।
স্মৃতিনাং ক্রিয়তে দুর্গভঞ্জনং বুধরঞ্জনং॥
বিদ্যাভূষণ-বিখ্যাতঃ ষড়্‌দর্শন মতে সুধীঃ।
তৎ সুতস্তাদৃশোধীমাং স্তুতোঽধীতি চ তৎসুতঃ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরো নাম্না খ্যাতো বাচস্পতিঃ ক্ষিতৌ।
স্মৃতিনাঞ্চ প্রকাশার্থং তনোতীমাং প্রদীপিকাং॥

চন্দ্রশেখরের বংশ কেহ নবদ্বীপে আছেন কি না তাহা জানিবার উপায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার।—ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবেত্তা কোলব্রুক সাহেব বলিয়াছেন যে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের প্রপৌত্র বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের আদি নিবাস মালদহ জেলায় ছিল। তিনি নবদ্বীপে স্মৃতি অধ্যয়নার্থ আগমন করেন এবং পূর্ব্বস্থলী নামক গ্রামে বিবাহ করিয়া এই নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী করতঃ অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি জীমূত-বাহনকৃত দায়ভাগের 'টীকা' এবং 'দায়ক্রমসংগ্রহ' নামে দায়ভাগ সম্বন্ধীয় দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দায়-ভাগের যতগুলি টীকা হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের টীকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। দায়াধিকারের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে এই গ্রন্থ দায়ভাগের নিম্নেই আসন পরিগ্রহ করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কোলব্রুক সাহেব এই দায়ক্রমসংগ্রহ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। দায়ভাগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মত

ধর্ম্মাধিকরণে অতি আদরে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাঁর পরবর্ত্তী অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ গোপাল ন্যায়পঞ্চাননের সময় হইতে নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের পুস্তক অধীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ন্যায়শাস্ত্রেও ইনি একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সাহিত্যের লক্ষণ ও অর্থাদি বিষয়ে 'সাহিত্যবিচার' নামে এক ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের আর বংশ নাই। অতি অল্প দিন হইল পূর্ব্বস্থলীতে তাঁহার বংশধর বর্ত্তমান ছিলেন।

আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র

তন্ত্র-সকল শিবের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার অপর নাম আগম। তন্ত্র-সমুদয়ে চতুঃষষ্টি-সংখ্যক। মহাবিশ্ব-সারতন্ত্রে লিখিত আছে—

চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি যামলাদীনি পার্ব্বতি।
সফলানীহ বারাহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু॥
কল্পভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ।
পাষণ্ডমোহনায়ৈব বিফলানীহ সুন্দরি॥

বৌদ্ধদিগের অবসানের পর হইতেই ভারতে তন্ত্রের মত প্রচারিত হইয়াছিল দেখা যায়। বৌদ্ধদিগের প্রভাবে বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম তিরোহিত হইয়াছিল। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম তৎকালে বাঙ্গালাদেশ ত্যাগ করিয়াছিল বলিলেই হয়। তখন তান্ত্রিকগণই ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উভয়ের ধর্ম্মকেই আশ্রয় দিলেন। ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকাণ্ড এবং বৌদ্ধদের জ্ঞানকাণ্ড মিলিত হইয়া তন্ত্রের মধ্যে নূতনরূপ ধারণ করিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী মধ্যে তান্ত্রিক মত প্রচারের সূত্রপাত হইয়াছিল। এবং সপ্তম শতাব্দীতে তাহার পূর্ণপ্রতাপ লক্ষিত হয়। বঙ্গ-ভূমিতে তন্ত্রের মত যেরূপ

প্রবলরূপে প্রচারিত হইয়াছে, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তাদৃশ হয় নাই। তন্ত্রে বহুতর অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান থাকায় এবং তৎসমুদয় বঙ্গ-সমাজের প্রিয় বোধ হওয়ায় বঙ্গবাসিগণ তান্ত্রিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গভূমির নানাস্থানে তান্ত্রিক অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক তন্ত্রের বিশেষ উন্নতি হয়। ঐ সকল অধ্যাপকের মধ্যে অনেকেই সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া লোক-সমাজে খ্যাত হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পূর্ণানন্দপরমহংস ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রধান।

পূর্ণানন্দগিরি পরমহংস।—পূর্ণানন্দের নিবাস কোথায় ছিল জানিতে পারি নাই। অনেকে তাঁহাকে পূর্ব্বদেশীয় পণ্ডিত বলিয়া অনুমান করেন। তিনি বেদ ও বেদান্ত, আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রে একজন বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তন্ত্রোক্ত মন্ত্র-সাধনে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তৎপ্রণীত 'ষট্‌চক্রভেদ' 'বামকেশ্বরতন্ত্র', 'শ্যামারহস্যতন্ত্র', 'শাক্ত-ক্রমতন্ত্র', 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী' প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্র এবং 'তত্ত্ব চিন্তামণি' নামক মুক্তি-বিষয়ক বৈদান্তিক গ্রন্থ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণি ১৪৯৯ শকে রচিত হয়।

পূর্ণানন্দেন গিরিণা কৃতং শ্রীপতিবাসরে।
ইষে কালাঙ্কবেদেন্দু শাকে মঙ্গলবাসরে॥

পূর্ণানন্দ ব্রহ্মানন্দের শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে, তিনি যে যে স্থানে বসিয়া জপ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানই 'সিদ্ধপীঠ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি গঙ্গার উভয় কূলের অনেক স্থানেই আসন করিয়াছিলেন সেই স্থান-সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।—পার্শ্বে যে মহাত্মার নাম লিখিত হইয়াছে ইনিই বঙ্গদেশে 'আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য' নামে প্রসিদ্ধ। এই নবদ্বীপই তাঁহার জন্মভূমি। তাঁহার পিতা মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য, গৌড়দেশ হইতে আসিয়া প্রথমে নবদ্বীপে বাস করেন বলিয়া 'গৌড়াচার্য্য' নামে

বিখ্যাত হন। মহেশ্বরের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ, কনিষ্ঠ মাধবানন্দ। কৃষ্ণানন্দ 'আগমবাগীশ' নামে বিখ্যাত হন, এবং মাধবানন্দের উপাধি 'সহস্রাক্ষ' ছিল। তাঁহারা মণ্ডলজানির মৈত্র।

কৃষ্ণানন্দ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও সহাধ্যায়ী ছিলেন।[১] এক্ষণে নবদ্বীপে উক্ত উভয় ভ্রাতার বংশাবলী বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুরুষ গণনায় কোন শাখায় ১৬ পুরুষ ও কোন শাখায় ১২।১৩ পুরুষ পাওয়া যায়।[২] যদি তৎকালের লোকদিগকে কিছু দীর্ঘজীবী মনে করিয়া প্রত্যেকের জীবনকাল গড়ে ২৫ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে উক্ত উভয় ভ্রাতাকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে দেখিতে পাই।

কথিত আছে কৃষ্ণানন্দ কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ; এবং শক্তি-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঘোর তান্ত্রিক হইয়া উঠেন। মাধবানন্দ স্বীয় কুলদেবতা গোপালদেবের উপাসক ছিলেন। সুতরাং উভয় ভ্রাতার মধ্যে নানারূপ বিবাদের কথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, কোন সময়ে বাটীতে এক কান্দি মর্ত্তমান কদলী হইয়াছিল। ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর মনে করিয়াছিলেন যে, রম্ভা সুপক্ক হইলে, স্বীয় ইষ্ট দেবদেবীকে অর্পণ করিবেন।

(১) যত পড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
সভারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে॥
শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥ (চৈ, ভা, আ, ৬ষ্ঠ অ)

(২) বর্ত্তমান সময়ে আগমবাগীশ হইতে ১২।১৩ পুরুষের ব্যবধান দেখিয়া, কেহ কেহ মনে করেন যে, আগমবাগীশ চৈতন্যদেবের বহু পরবর্ত্তীকালে বর্ত্তমান ছিলেন। শুধু পুরুষ গণনায় সময় নির্দ্দেশ কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বিবেচনার কথা। আবার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক অদ্বৈতাচার্য্যের বংশ গণনায় বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ১১ হইতে ১৪ পুরুষ পাওয়া যায়, এবং গৌরাঙ্গদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের বংশেও আজ পর্য্যন্ত ১২ পুরুষ পাওয়া যায়। অতএব আগমবাগীশের বংশে ১২।১৩ পুরুষের ব্যবধান দেখিয়া তাঁহাকে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী মনে করিবার কোন কারণ নাই।

একদিন কৃষ্ণানন্দ নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে ফিরিয়া সুপক্ক রম্ভা স্বীয় ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিয়া দিবেন বাসনা করিয়াছিলেন। এদিকে মাধবানন্দ ভ্রাতার অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া অগ্রেই স্বীয় ইষ্টদেব গোপালকে পক্ক রম্ভাগুলি নিবেদন করিয়া দিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণানন্দ বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রম্ভা দেখিতে না পাইয়া, ক্রোধে অন্ধ হইয়া—'উহা মাধবানন্দেরই কার্য্য' এইরূপ মনে করিয়া তাঁহার প্রাণসংহারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন ও গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখিলেন যে, গোপালের ঘর ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে, তখন তিনি কিঞ্চিৎ স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া গৃহের মধ্যস্থ ব্যাপার দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন। তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি দ্বারের অন্তরাল দিয়া দেখিলেন, যে ভগবতী কালিকাদেবী গোপালকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আপনি রম্ভা ভক্ষণ করিতেছেন ও গোপালকে খাওয়াইতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার সমস্ত ক্রোধ দূরীভূত হইল, এবং ভ্রাতাকে ধন্য ও আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে গোপাল ও কালী ভেদজ্ঞান করা বিড়ম্বনা মাত্র।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এই সময়ে দেশমধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা প্রবলরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ দেখিলেন যে তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের বিশুদ্ধ মত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, কেবল তন্ত্রের দোহাই দিয়া নিষ্ঠুরতা করিতে ও মদ্যপানে উন্মত্ত হইতে কুণ্ঠিত নহেন। তজ্জন্য তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের সার সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনিই তন্ত্রসার নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থে তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় মতাবলম্বীদিগের দেব ও দেবীর উপাসনা ও পূজাপদ্ধতি অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। বিশেষতঃ তন্ত্রমতে

স্বাত্ত্বিক পূজা কিরূপে করিতে হয় তাহাও তিনি উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে কার্ত্তিকী অমাবস্থায় যে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে, সেই শ্যামামূর্ত্তি ও তাহার পূজাপদ্ধতি এই আগমবাগীশেরই আবিষ্কৃত। আগমবাগীশের পূর্ব্বে ঐ পূজা প্রচলিত ছিল না। তৎকালে মূর্ত্তি প্রকাশিত না থাকায়, পূজাদি সমস্তই ঘটে হইত। এখন মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেও সেই ঘট একেবারে রহিত হইয়া যায় নাই। কৃষ্ণানন্দ প্রথমে ঘটস্থাপন করিয়াই পূজা করিতেন। অদ্যাপি তাঁহার বাটীতে ঐ ঘট আছে, এবং তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি তাহা পূজা করিয়া আসিতেছেন। যাহা হউক, কথিত আছে আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য ভগবতী কালিকা দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে বাসনা করিলেন। কিন্তু তন্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে 'বরাভয়' কর কিরূপে গঠিত হইবে, এবং ভ্রূদ্বয়ই বা কি রঙ্গে রঞ্জিত হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপ চিন্তাযুক্ত দেখিয়া দেবী প্রসন্ন হইয়া এই প্রত্যাদেশ দিলেন যে, 'তুমি কল্য প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া যে মূর্ত্তি দেখিবে, তাহাতেই আমার বরাভয়কর ও ভ্রূদ্বয়ের বিষয় জানিতে পারিবে।' পর দিবস কৃষ্ণানন্দ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যেমন বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, অমনি দেখিলেন যে, এক কৃষ্ণবর্ণা গোপরমণী দক্ষিণপদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া গৃহের ভিত্তি সন্নিকটে দণ্ডায়মানা হইয়া বামহস্তস্থিত গোময়-পিণ্ড হইতে দক্ষিণ হস্তে অল্পাংশ গোময় লইয়া ভিত্তি-গাত্রে প্রক্ষেপ করিতেছে। পরিশ্রমাধিক্যে তাহার মুখমণ্ডল হইতে নির্গত ঘর্ম্মরাশি উভয় হস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়া মোচন করায়, তাহার ললাটস্থ সিন্দুর-বিন্দু দ্বারা ভ্রূযুগল লোহিতরূপ ধারণ করিয়াছে; তাহার মস্তকের বস্ত্র পতিত ও কেশরাশি আলুলায়িত হইয়াছে। এমন সময়ে কৃষ্ণানন্দ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। গোপরমণী স্বভাব-সুলভ লজ্জাবশতঃ দন্তে জিহ্বা কাটিলেন।

কৃষ্ণানন্দ এই মূর্ত্তি দেখিয়া বরাভয় করাদির বিষয় স্থির করিয়া লইলেন, এবং তদবধি রাত্রিতে নিত্য ঐ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজান্তে রাত্রিতেই বিসর্জ্জন দিতেন। এইজন্য অস্মদ্দেশে যে সকল কার্য্য হঠাৎ হইয়া থাকে তাহাকে 'আগমবাগীশী কাণ্ড' বলে। কৃষ্ণানন্দের এই পূজায় কোনরূপ বলিদান বা মাদকতার সংশ্রব নাই। আগমবাগীশের এই মূর্ত্তি প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই এদেশে 'শ্যামাপূজা' পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্যাপি আগমবাগীশের বংশীয়েরা ঐ মূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে নবদ্বীপের মহারাজের ব্যয়ে ১০।১২ হাত উচ্চ এক প্রকাণ্ড শ্যামামূর্ত্তি প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পূজিত হইয়া থাকে।[৩] আগমবাগীশ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়ায় ঐ মূর্ত্তি 'আগমেশ্বরী' নামে বিখ্যাত। 'তন্ত্রসার' ব্যতীত কৃষ্ণানন্দ 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' নামে আর একখানি তন্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

আগমবাগীশের সাধনকার্য্যের সহকর্ম্মী ছিলেন—**জটিয়া যাদু**। কথিত আছে—জটিয়া যাদুর পরামর্শমত কৃষ্ণানন্দ আগমেশ্বরী দেবীর ভোগ দিতেন। ইহাঁর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শুনা যায়। তাঁহার মাথায় জটা ছিল—ন্যাস প্রাণায়ামের সময়ে সেই জটা উৰ্দ্ধদিকে উত্থিত হইত বলিয়া তাঁহার নাম জটিয়া যাদু হইয়াছিল। এই বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি ও যোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই বংশ-সম্ভূত ছিলেন।

কৃষ্ণানন্দের বংশধরেরা 'আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য' নামে বিখ্যাত। তাঁহার পুত্রের নাম হরিনাথ। হরিনাথের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ গোপাল ও কনিষ্ঠ মধুসূদন। গোপালের বংশধরেরা নবদ্বীপে বাস করিতেছেন। গোপালও তন্ত্রশাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি পিতামহের ন্যায় 'তন্ত্রদীপিকা' নামে তন্ত্রবিষয়ক এক সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন

(৩) সম্প্রতি নবদ্বীপের মহারাজ আর ব্যয়ভার বহন করেন না।

করেন। তাহাতে ১১৭১৫টী শ্লোক আছে। গোপাল ঐ গ্রন্থে এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন—

আগমবাগীশপৌত্রেণ হরিনাথস্য সূনুনা।
শ্রীগোপালেন বিজ্ঞেন কৃতেয়ং তন্ত্রদীপিকা॥

আগমবাগীশের দ্বিতীয় পুত্র মধুসূদনের বংশধরেরা এক্ষণে শান্তিপুরের সন্নিহিত হরিপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। মধুসূদনের বংশে রামতোষণ নামে একজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 'প্রাণতোষিণী' নামে একখানি তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। এই গ্রন্থও তন্ত্রসকলের সারসংগ্রহ মাত্র। ১৭৪৩ শকে (১৮২১ খৃঃ অঃ) এই গ্রন্থ সংগৃহীত হয় এবং খড়দহ-নিবাসী বিদ্যোৎসাহী জমীদার প্রাণকৃষ্ণ দত্তের অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে আগমবাগীশের বংশীয়েরা নবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে বর্ত্তমান আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণানন্দের কুলদেবতা ছিলেন, পরে তিনি শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করেন। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারের মঙ্গলাচরণে কৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন। যথা—

নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং ব্রহ্মাদি সুরবন্দিতং।
গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং কৃষ্ণানন্দেন ধীমতা॥
তত্তদ্‌গ্রন্থকৃতাদ্বাক্যান্নানার্থং প্রতিপদ্য চ।
সৌকর্য্যার্থঞ্চ সংক্ষেপাত্তন্ত্রসারং প্রতন্যতে॥

মাধবানন্দ।—কৃষ্ণানন্দের ভ্রাতা মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ গোপালের উপাসক ছিলেন। এই বংশীয় কোন ব্যক্তি কোন সময়ে রাধাবল্লভ নামে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করায় মাধবানন্দের বংশধরেরা 'রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য্য' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাবধি নবদ্বীপে বাস করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন এই বংশসম্ভূত ছিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে বহুতর গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। সুতরাং ইহাতে তাঁহার জীবনের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে তন্ত্রের মত প্রচারিত হয়। তান্ত্রিক আচারে বঙ্গবাসিগণ পশু-হনন, সোমরস পান, পঞ্চ-মকার সাধন ইত্যাদি কার্য্যে রত হইয়া নিষ্ঠুরের একশেষ হইয়া উঠেন। বঙ্গবাসীর মধ্যে এইরূপ নীরস ভক্তিহীন ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া দুই এক জনের মনে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত—ঈশ্বরে প্রেম-ভক্তি, জীবে দয়া সূক্ষ্মরূপে উদিত হয়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ ঐ মতের পক্ষপাতী হইয়া প্রেমভক্তি পরিপূর্ণ কবিতা-সকল রচনা করেন; এবং বঙ্গদেশের নানা স্থানের লোকের মনে প্রেমভক্তির উদয় হইতে আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীহট্টে চন্দ্রশেখরাদি, চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রাঢ়দেশে নিত্যানন্দ, বূঢ়নে যবন হরিদাস, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য ও নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়া বঙ্গভূমির নানা স্থান, বিশেষতঃ নবদ্বীপ ও শান্তিপুর, আলোকিত করিয়াছিলেন।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যখন কোন নূতন মত প্রচারিত হয়, প্রায়ই তাহার বহু পূর্ব্বে তৎ তৎ দেশে তাহার সূত্রপাত হইয়া থাকে। মহাত্মা যীশুর পূর্ব্বে জোহন প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ, মার্টিন লুথরের পূর্ব্বে উইক্লিফ্ এবং পার্কারের পূর্ব্বে রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকগণ, তেমনই শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্ত্রের

প্রভাবে এতদিন উক্ত মত ম্লান হইয়াছিল। পরিশেষে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধ মত পরিস্ফুট হইবার শুভ সময় উপস্থিত হইল। যে মহাত্মা বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশুদ্ধ মত সুপ্রচারিত করেন তাঁহার নাম **শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব**।

যে সময়ে রঘুনাথ শিরোমণি অসাধারণ তর্কশক্তি-বলে মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ন্যায় বিষয়ে নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করিতেছিলেন, যে সময়ে ইউরোপ খণ্ডে মহাত্মা লুথর যুক্তি ও বুদ্ধিবলে খৃষ্টধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া পোপের সিংহাসন কম্পমান ও তথাকার সমস্ত লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় সংস্থাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবও নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন সত্যধর্ম্ম প্রচারে তৎপর ছিলেন।

নবদ্বীপ যুগে যুগে জগৎকে বহু নূতন রত্ন উপহার দিয়াছে। তাহার নব্য ন্যায়, নব্য তন্ত্র ও নব্য স্মৃতি বিশ্বে এখনও আদৃত হইয়া রহিয়াছে। নবদ্বীপ যে নবীন প্রেমের ধর্ম্ম দিয়াছে তাহা নবীনতায় ও সরসতায় সকল রত্নের শ্রেষ্ঠ, তাহার অমল প্রভা আজিও দেদীপ্যমান। যিনি এই প্রেম-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, সেই নিমাই বাঙ্গালীর গৌরব ও গর্ব্ব, নবদ্বীপকে তিনি যেরূপ গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন, জন্মভূমিকে তেমন অক্ষয় কীর্ত্তি-কিরীট পরাইতে আর কেহই সক্ষম হন নাই। তিনি যে ভাবে বাঙ্গলীর হৃদয় অধিকার করিয়াছেন তেমন ভাবে আর কেহ কি করিতে পারিয়াছেন? তাঁহার কথা বাঙ্গালীর কথা, তাঁহার জীবন বাঙ্গালীর আদর্শ, তাঁহার উপদেশ বাঙ্গালীর অবলম্বন, তাঁহার নাম বাঙ্গালীর ভগবন্নাম।

বাঙ্গালা দেশে এই মহাপুরুষ ধর্ম্মে, কর্ম্মে, দর্শনে, সাহিত্যে, গানে ও জ্ঞানে যে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, তাহার ধারা আজিও অবিরল প্রবাহিত হইতেছে। সেই ধারাই বাঙ্গালীর জীবনধারায় পরিণত হইয়াছে। এতদিন বাঙ্গালার ধর্ম্মের ভিতর দিয়া যে নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসতা—পশু-

হত্যায়, শবসাধনায় ও পঞ্চ-মকারে ব্যাপ্ত হইয়া জাতির কোমল গুণ-রাশিকে হত্যা করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে হৃদয়হীন মৃতপ্রায় করিয়াছিল—এই শবসাধক সেই মৃতপ্রায় জাতিকে তাহার প্রেমের মন্ত্রের দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। নীরস তর্কে বাঙ্গালীর হৃদয় যে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তিনি সেই স্থানে করুণার বান ডাকাইলেন। তিনি কত অসাধুকে সাধু করিলেন, কত অসুরকে উদ্ধার করিলেন, কত পাষণ্ডীকে ধার্ম্মিক করিলেন। তিনি কোথাও রূঢ়তার লেশমাত্র অবলম্বন করেন নাই, তাঁহার জীবনে পরপীড়নের দৃষ্টান্ত নাই, অথচ সকলকেই তিনি অহিতুণ্ডিকের ন্যায় যেন মন্ত্রে বশীভূত করিয়াছেন। যে বঙ্গভাষা এতদিন উপেক্ষিত ছিল, তাঁহার আগমনে বসন্তের নবপল্লবের ন্যায় সেই বঙ্গভাষা বিকশিত হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীর সপ্তাবিষ্ট কর্ণে চণ্ডীদাসের গীতধ্বনি বসন্ত রাত্রের কোকিল-কূজনের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল—সে গানে কি মোহ, কি আনন্দ! সে গান যেন কোন ভুলে-যাওয়া জগতের স্মৃতিলেশ!

বাঙ্গালার জনসাধারণের জন্য তাঁহার হৃদয় যেমন কাঁদিয়াছিল, তেমন বোধ হয় আর কাহারও কাঁদে নাই—তাই তিনি বাঙ্গালীর হৃদয় মন্থন করিতে পারিয়াছিলেন। জনসাধারণের শিক্ষার জন্য তিনি বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের কথা শুনিবার সকলেরই অধিকার ছিল। তিনি গুণেরই আদর করিতেন—গুণবান্ শূদ্র, এমন কি যবনও তাঁহার আলিঙ্গনের পাত্র ছিলেন। এমন মহৎ দৃষ্টান্ত বিরল।

তিনি দেশকে এক অভিনব দর্শনশাস্ত্র দিলেন—যাহা গৌতমের তর্কে মিলে নাই, শঙ্করের জ্ঞানে জানা যায় নাই, এবং রামানুজও যাহার সন্ধান দিতে পারেন নাই—সেই অভিনব 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' তত্ত্ব তাঁহার অপূর্ব্ব দান।

বিষহরি চণ্ডীর গান ভুলাইয়া তিনিই বাঙ্গলীকে অমৃত-নিস্যন্দী

হরিনাম গান শিক্ষা দিলেন।* বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রতি সন্ধ্যায় করতালি সহযোগে 'হরি হরয়ে নমঃ' ধ্বনি উত্থিত হইল। বাঙ্গালী বুঝিল 'হরি-নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে'।

১৪০৭ শকে বাসন্তী সন্ধ্যায় ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে (১৪৮৬ খৃঃ অঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী পুরাতন পঞ্জিকা) গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র; পুরন্দর তাঁহার আর এক উপাধি ছিল। জগন্নাথ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থে বা গঙ্গাস্নানার্থে নবদ্বীপে আগমন করেন, এবং নবদ্বীপ-নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপেই বাস করিয়া-ছিলেন। শচীদেবীর গর্ভে বিশ্বম্ভরের জন্ম হয়। কথিত আছে তিনি ত্রয়োদশ মাস গর্ভবাস করেন। জগন্নাথ মিশ্র অতি শান্ত-প্রকৃতি ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন; দেবার্চ্চনা তপ জপাদি এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। শচীদেবীও পরম ধার্ম্মিকী ও পতিপরায়ণা ছিলেন।

এই শচীর গর্ভে জগন্নাথের একে একে আটটী কন্যা গতাসু হইলে, সৌভাগ্যক্রমে একটী পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম বিশ্বরূপ রাখা হয়। বিশ্বরূপ বয়োবৃদ্ধি-সহকারে উত্তম লেখাপড়া শিখিলেন। তিনি প্রায় যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, গৌরসুন্দর জন্মগ্রহণ করিলেন।

নিমাইয়ের জন্মগ্রহণকালে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। সুতরাং চির-প্রচলিত প্রথানুসারে সর্ব্বসাধারণে ভগবন্নাম কীর্ত্তন ও নানাপ্রকার দান-ধর্ম্মে রত ছিলেন। এই সকল শুভকার্য্য অন্য কারণে অনুষ্ঠিত হইলেও, অনেকের বিশ্বাস হইল, এরূপ শুভক্ষণে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, তিনি অবশ্যই কোন মহাপুরুষ হইবেন।

গৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেই অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ, দেশীয় প্রথানুসারে সিন্দুর হরিদ্রা প্রভৃতি সূতিকাগারে প্রেরণ করেন। অদ্বৈতের

সহধর্ম্মিণী সীতাদেবী সদ্যঃপ্রসূত শিশুর নাম নিমাই রাখেন। ডাকিনী শঙ্খিনীর হস্ত হইতে কোন ভয় না থাকে এই জন্য শিশুর প্রাণরক্ষার্থে ঐরূপ নাম রাখা হইয়াছিল। অদ্যাপি অস্মদ্দেশে মৃতবৎসার সন্তান হইলে ঐরূপ নাম রাখা প্রচলিত আছে। নামকরণকালে এই শিশুর নাম হইল "বিশ্বম্ভর"।

বয়োবৃদ্ধির সহিত কনককান্তি নিমাই-চরিত্রে চঞ্চলতার নিদর্শন প্রতিভাত হইতে লাগিল। গঙ্গাস্নানার্থিগণ নিমাইএর দৌরাত্ম্যে উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিমাই—কোন ধ্যানরতা রমণীর পুষ্পডালা হইতে মালা লইয়া আপন গলায় পড়িয়া নটবর বেশে নাচিতে নাচিতে পলাইয়া যান, কাহারও বা পাত্র হইতে চন্দনপঙ্ক লইয়া ধূলিমাখা শ্রীঅঙ্গ চন্দনতিলকে চর্চ্চিত করেন, পূজানিরত কোন ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ শিবলিঙ্গ লইয়া পলায়ন করেন, কখনও বা কোন ধ্যানমগ্নের স্কন্ধে উঠিয়া, 'কাহাকে ডাক, চাহিয়া দেখ' রবে তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দেন। কখনও বা সন্তরণপটু নিমাই সহস্র কনককমল বিকশিত করিয়া জাহ্নবীবক্ষে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেন—ডুবিতেন, উঠিতেন, ভাসিয়া বেড়াইতেন—কাহারও কথা শুনিতেন না; অথবা শ্রীকরকমলে সহস্রধারে বারিবিক্ষেপ পূর্ব্বক বয়স্যদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। এত দৌরাত্ম্যেও সকলেই তাঁহার দিব্য সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া, আদর করিয়া নিমাইএর চন্দ্রমুখ চুম্বন করিয়া শান্তিলাভ করিতেন। লীলাপটু ভগবান এইরূপে শৈশবেই অতি সঙ্গোপনে স্বপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শৈশবকাল হইতেই নিমাইএর তীক্ষ্ণধীর নানাপ্রকার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন নিমাই ক্রীড়া করিতে করিতে মাটী খাইতেছিলেন। শচীদেবী পুত্রকে মাটী খাইতে দেখিয়া তিরস্কার করিলে, নিমাই উত্তর করিলেন, "মা, আমায় তিরস্কার করেন কেন? সকলই মৃত্তিকার বিকার মাত্র, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুমিষ্ট দ্রব্যও এই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

তখন শচী কহিলেন, "বৎস, মাটী খাইলে পীড়া হয়, কিন্তু মাটীর বিকার মিষ্টান্নাদি খাইলে শরীরের পুষ্টি হয়।"

বাল্যে নিমাই যে শান্ত শিশু ছিলেন না তাহা বলাই বাহুল্য। এক দিন, আই তাঁহার দুরন্তপনায় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, নিমাই পলাইয়া পরম নিরাপদ স্থান আস্তাকুড়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। শচীদেবীর পুত্রকে আর শাসন করা হইল না—নিমাই এখন অস্পৃশ্য। তখন তিনি পুত্রকে স্নান করিয়া আসিবার জন্য আদর করিয়া বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন, তাহাতে পরম পণ্ডিতের মত নিমাই গম্ভীরবদনে কহিলেন, "মা এই আস্তাকুড় অপবিত্র নহে। পরন্তু মনুষ্য যাহাতে অপবিত্র হয় তাহা মনুষ্য হৃদয়েই আছে।"

কিছুদিন পরে জগন্নাথ পুত্রকে সুদর্শন পণ্ডিতের পাঠশালায় দিলেন।[১] বুদ্ধিমান্ নিমাই অল্পদিনের মধ্যেই পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া, সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কৃতবিদ্য, অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট গীতা ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে রত। জগন্নাথ মিশ্র সময় উপযুক্ত দেখিয়া, এই পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বরূপ সংসারের প্রতি বীতরাগ ছিলেন। এক্ষণে এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি রাত্রিযোগে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ পিতামাতার সাধে বিষাদ ঘটিল। আনন্দ-কোলাহলের স্থলে শোকের ক্রন্দন উঠিল। তখন বালক নিমাই হইলেন বৃদ্ধ বৃদ্ধার অবলম্বন। গৌরের

---

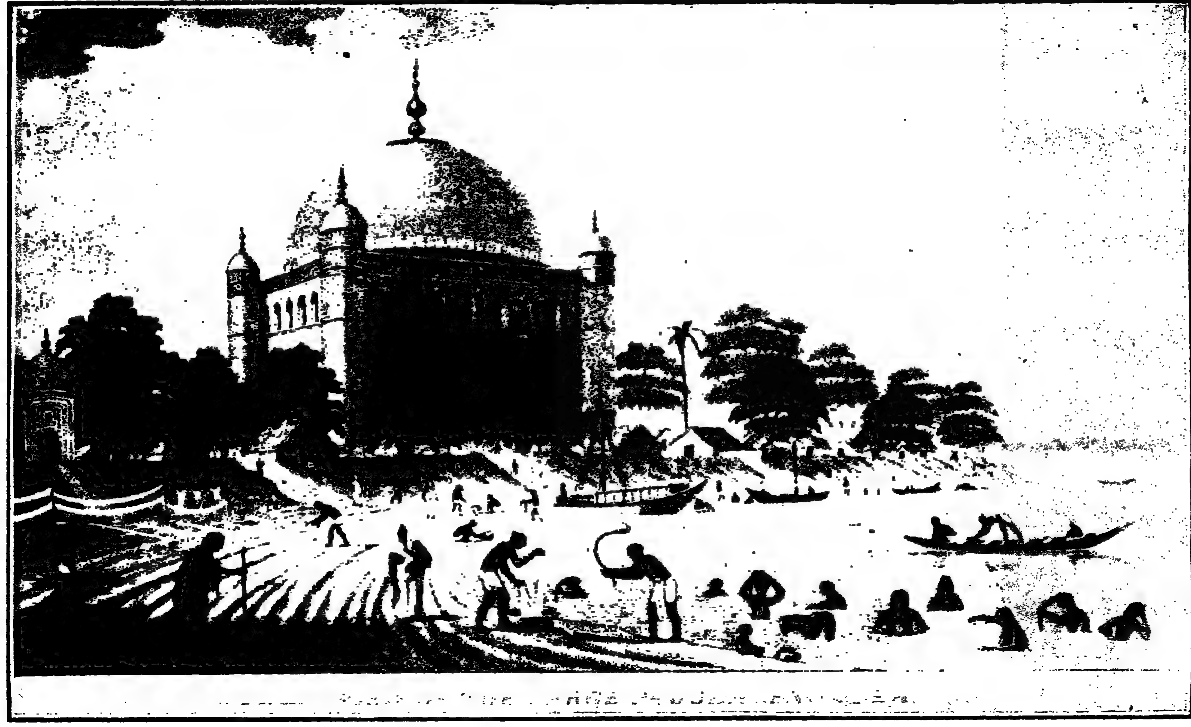
(১) আর দিন প্রভাতে বালক সব সঙ্গে।
সুদর্শন পণ্ডিতের বাড়ী গেলা রঙ্গে॥ ১৭ পৃঃ
অন্যত্র—সুদর্শন গঙ্গাদাস দুই বিদ্যাগুরু।
আশীর্ব্বাদ দিতে আইল রত্নমালা ছিরু॥ ২৪ পৃঃ
(জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত)

মুখচন্দ্র দেখিয়া ক্রমে তাঁহাদের বিশ্বরূপের বিরহ-ব্যথা কিয়দংশে প্রশমিত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর নিমাইয়ের যে কিছু চাঞ্চল্য ছিল, তাহা একেবারে তিরোহিত হইল। তিনি ধীর ও শান্তভাবে পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেবার গুণে তাঁহারা বিশ্বরূপের কথা ভুলিয়া গেলেন।

নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি একবার পড়িলেই সূত্রসকল কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। একবার ব্যাখ্যা শুনিলে আর ভুলিতেন না। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার সুখ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। জনক-জননী পুত্রের বিদ্যানুরাগের কথা শুনিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন।

১১।১২ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হইলে, বিশ্বম্ভর মহাদুঃখে পড়িলেন। দুঃখে পড়িলেন বটে, কিন্তু তিনি বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন, এবং দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া অচিরে গঙ্গাদাসের টোলে প্রধান ছাত্র হইয়া উঠিলেন।

গৌরসুন্দর অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার উন্নতদেহ, গৌরবর্ণ কমনীয় কান্তি, মনোহর মুখচ্ছবি, চাঁচর চিকুর এবং মোহিনী-শক্তিপূর্ণ আয়ত-লোচনদ্বয় দেখিলে লোকমাত্রেরই মন মোহিত হইত। নবযৌবন সমাগমে তাঁহার লাবণ্য যেন সারা দেহে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। পুত্রকে দেখিয়া শচীদেবীর সাধ হইল তাঁহার বিবাহ দেন। আবার বিশ্বরূপের কথা মনে উদয় হওয়ায় তাঁহার ভয়ও হইল। ভয়, পাছে নিমাই বিশ্বরূপের ন্যায় বিবাহের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে। কিন্তু মাতৃগতপ্রাণ নিমাই মাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া বিবাহে সম্মতি দিলেন। নবদ্বীপ-নিবাসী বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবী পাত্রী মনোনীতা হইলেন। শুভক্ষণে নিমাইয়ের বিবাহ হইল।



এই বিবাহের পরেই নিমাই মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইল। সেই সময়ে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নানাদেশের পণ্ডিতবর্গকে বিচারে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। যখন নিমাই সশিষ্য গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিলেন, তখন তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। নিমাই তাঁহার নাম ও বিদ্যাবত্তার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন।

এক্ষণে দিগ্বিজয়ীকে গঙ্গার একটী স্তব আবৃত্তি করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী নিজকৃত গঙ্গার স্তব পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিলে, নিমাই তাঁহার ব্যাখ্যায় নানাপ্রকার দোষারোপ করিলেন। দিগ্বিজয়ী বালকের নিকট এইরূপে পরাজিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে বিচারে পরাজিত ব্যক্তির দ্রব্য সামগ্রী কাড়িয়া লওয়া রীতি ছিল, কিন্তু নিমাই তাহা না লইয়াই তাঁহাকে বিদায় দিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে এই দিগ্বিজয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

নিমাই এতাদৃশ পণ্ডিত হইয়াও আপন বিদ্যার গৌরব করিতেন না। কথিত আছে, যে ন্যায়দর্শনে নবদ্বীপ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য, নিমাই সেই ন্যায়সম্বন্ধীয় গৌতমশাস্ত্রের টীকা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের অসাধারণ ঔদার্য্য-বশতঃ ঐ গ্রন্থ নষ্ট হয়। তিনি এক ব্রাহ্মণের সহিত এক দিন ঐ পুস্তক হস্তে গঙ্গা পার হইতেছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণও অনেক দিন হইতে ন্যায়-শাস্ত্রের একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, নিমাইয়ের টীকা প্রচলিত হইলে তাঁহার টীকার কেহই আদর করিবে না। তজ্জন্য তিনি নিমাইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নিমাই তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বকৃত টীকা-খানি নদীগর্ভে নিঃক্ষেপ করিলেন। এরূপ নিঃস্বার্থ বন্ধু-বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অতি বিরল। কিম্বদন্তী এই ব্রাহ্মণ রঘুনাথ শিরোমণি।

এই সময়ে নিমাই জ্ঞানার্জ্জনে অধিকতর অনুরক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবগণ জগন্নাথ মিশ্রের বংশে ভক্তি-বিরহিত পণ্ডিতের আবির্ভাব দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। পরিশেষে এমন এক ঘটনা উপস্থিত হইল, যে তিনি আর ধর্ম্মের দিকে মন না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। একদিন নিমাই সশিষ্য রাজপথে যাইতেছিলেন। সেই সময়ে শ্রীহট্ট-নিবাসী ও নিমাইয়ের সহাধ্যায়ী মুকুন্দ দত্তও গঙ্গাস্নানে যাইতে-ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ হরিভক্তি-পরায়ণ ছিলেন; ও হরি-গুণগানেই সময় অতিবাহিত করিতেন। মুকুন্দ নিমাইকে অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতেন, সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, সম্ভাষণ করিতে হইবে এই ভয়ে হঠাৎ অন্য পথে চলিয়া গেলেন। নিমাই ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, 'আমি এমন বৈষ্ণব হইব যে, যাহারা আমাকে দেখিয়া পলায়ন করে তাহারাও আমার গুণকীর্ত্তন করিবে।'

নিমাই প্রথম হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অনুরক্ত ছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মন বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাযুক্ত হয়। এক্ষণে এই ঘটনায় তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে পরমভাগবত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আগমন করেন। তিনি শ্রীবাসের গৃহে অবস্থিতি করিতেন। শ্রীবাসের আদি নিবাস শ্রীহট্ট ছিল। শ্রীবাসেরা চারি ভাই। ইহাঁরাও বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপে আগমন করিয়া নবদ্বীপেই এক বাটী করিয়া বাস করেন। শ্রীবাস পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি আপন বাটীতে থাকিয়া উচ্চস্বরে হরিনাম গান ও লোকের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতেন। তজ্জন্য অনেকে তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন ও তাঁহার প্রতি অত্যাচারও করিতেন। যাহা হউক ঈশ্বরপুরীর সহিত এই স্থানে নিমাইয়ের বিশেষ পরিচয় হইল এবং তৎসূত্রে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণের সহিত নিমাইয়ের বিশেষ সম্প্রীতি হইয়াছিল।

নিমাই উনিশ বৎসর-বয়সে পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রা করেন। তিনি চট্টগ্রাম প্রভৃতি নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া পদ্মানদীতীরে কিছু দিন অবস্থিতি করেন। এই স্থানে বহু লোক তাঁহাকে দর্শনার্থে সমাগত হইয়াছিল ও অনেকে তাঁহার ছাত্র হইয়াছিল। এইরূপে পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান কালে তদীয় সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীদেবী বিরহ-রূপ সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নিমাই গৃহে আসিয়া মাতাকে প্রণাম করিলেন, এবং আহারান্তে মাতাকে দুঃখিত দেখিয়া, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মা কোন উত্তর না করিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিমাই স্বীয় পত্নী লক্ষ্মীদেবীর প্রাণ বিয়োগ শুনিয়া শোকে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন পরে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন—

"কস্য কে পতি পুত্রঃ স মোহএবহি কেবলমিতি।"

এই বলিয়া তিনি মাতাকে নানা মতে বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিলেন।

তখন হইতেই নিমাইয়ের ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইতে লাগিল। তিনি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার সময়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা এবং তিলকধারণ আদি ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য-সকল উপদেশ দিতে লাগিলেন। অধ্যাপনাতেও তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। এদিকে শচীদেবী পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। নিমাই অল্পদিনের মধ্যেই রাজপণ্ডিত সনাতনমিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত পুনরায় পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইলেন। নবদ্বীপ-নিবাসী বুদ্ধিমন্ত খাঁ নামক জনৈক কায়স্থ বংশোদ্ভব ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার এই বিবাহের, সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন।

দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে, একুশ বৎসর বয়সে নিমাই পিতৃ-ঋণ পরিশোধের জন্য গয়া যাত্রা করেন। এই স্থানে পূর্ব্ব-

পরিচিত ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি উক্ত পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসমান হইলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবন নববেশ ধারণ করিল। যে ভক্তিতে সমস্ত ভারত বিমোহিত হইয়াছিল, সেই ভক্তির বীজ এই সময় হইতে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইল।

গয়াধাম হইতে নিমাই যেন একটী নূতন মানুষ হইয়া আসিলেন। বহুদিনের পর বন্ধুবান্ধবগণকে পাইয়া নিমাই তাহাদিগকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপাদপদ্মের নাম লইবামাত্রই তাঁহার উন্নত দেহ পুলক-পূরিত হইয়া উঠিল।

গয়া হইতে ফিরিয়া নিমাইএর মুখে "হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" ভিন্ন কোন কথা নাই, একবার 'কৃষ্ণ' বলিতেই সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূরিত হইতেছে--দুনয়ন বহিয়া অশ্রু বহিতেছে, প্রেমে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, দ্বিতীয়বার কৃষ্ণ বলিবার শক্তি থাকিতেছে না। কৃষ্ণ বিরহ এত প্রবল হইয়াছে যে 'কোথা কৃষ্ণ' ভিন্ন কথা নাই। সংসার ভাল লাগে না, প্রিয় অধ্যাপনাতেও তাঁহার মন বসে না, অধ্যাপনা করিতে বসিলে তিনি সূত্র বৃত্তি সব কৃষ্ণ পক্ষে ব্যাখ্যা করেন। যাহা কিছু পড়েন বা পড়ান সকল বিষয়েই তাঁহার কৃষ্ণ স্ফুর্ত্তি। তাঁহার বন্ধুবান্ধববর্গ এই ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার ছাত্রগণ অন্য কাহারও নিকট পাঠ স্বীকার করে নাই। তাঁহাকে পাইয়া তাহারা নবোত্মসে পাঠ অভ্যাস করিতে ইচ্ছা করিল। তিনিও পুর্ব্বের অভ্যাস মত ছাত্রগণকে লইয়া মুকুন্দসঞ্জয়ের গৃহে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধ্যাপনা করিবে কে? কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্য তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোন ছাত্র কৃষ্ণ পক্ষে ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিলে, প্রেমোন্মত্ত নিমাই তাহাকে দণ্ড লইয়া তাড়না করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া ছাত্রগণের কেহ অন্য চতুষ্পাঠীতে চলিয়া গেল, কেহ বা তাঁহার

সহিত মিলিয়া সুধামাখা হরিগুণগানে যোগ দিলেন। অধ্যাপনার পরিবর্ত্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

তৎকালে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইত না; সুতরাং কেহই কীর্ত্তন করিতে জানিতেন না। হরিসংকীর্ত্তনের কোন পদ বা এখনকার মত খোল করতালও ছিল না। তখন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

গৌরাঙ্গের স্বরচিত এই ধুয়া ধরিয়া পরস্পর করতালি দিয়া সমকণ্ঠে গীত গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে নিমাই কখন ভাবে বিভোর হইয়া নাচিতেন, কখন বা মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেন।

নিমাইএর এই নূতন ভাব দেখিয়া-শুনিয়া শচীদেবী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এমন ভাব ত কেহ কাহারও দেখে নাই। তাঁহার প্রিয় পুত্রের কি হইল? ইহা কি বায়ুরোগ না আর কিছু? ইহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া দিন দিন তাঁহার আকুল চিন্তা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া জানিতে পারিলেন যে ইহা বায়ু-রোগ নহে—কৃষ্ণপ্রেম। ইহা শুনিয়াও তাঁহার চিন্তা দূর হইল না। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসব্রতের কথা মনে হইতে লাগিল। শচীদেবী কাতরকণ্ঠে ভগবানকে ডাকিয়া কহিলেন,—"সুস্থচিত্তে গৃহে মোর রহ বিশ্বম্ভর।"

অদ্বৈত আচার্য্য পূর্ব্বেই গৌরের হরিভক্তির কথা শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীবাসাদি ভক্তগণের মুখে সমস্ত শুনিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। অদ্বৈত গৌরাঙ্গকে বরাবর ভালবাসিতেন। বাল্যকালে নিমাইএর অপরূপ দিব্য রূপরাশি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু নিমাইএর বিদ্যাবিলাসিতা, ভক্তিহীন পাণ্ডিত্য, ঔদ্ধত্য দেখিয়া অদ্বৈত নিমাইএর সহিত বড় মিশিতেন না। এক্ষণে তিনি নিমাইএর ভক্তিভাব শুনিয়া কহিলেন, "নিমাই বড় মানুষের পুত্র—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র

সর্ব্বগুণসমন্বিত সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। আশীর্ব্বাদ কর তাহার যেন শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয়।”

অদ্বৈত আচার্য্য চারিদিকে ভক্তিহীন ও ধর্ম্মহীন লোক দেখিয়া অন্তরে বড় ক্লেশ পাইতেন; এবং ভগবানের অবতার জন্য সর্ব্বদা ভগবানের ভজনা করিতেন। অদ্বৈত একদিন গীতার এক শ্লোকের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মনোদুঃখে অনাহারে নিদ্রা যাইতেছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, এক দিব্য পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে সেই শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন; এবং কহিলেন, “উঠিয়া আহার করিয়া আমার পূজা করিও। যাঁহার জন্য এত আরাধনা করিয়াছ, সেই আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।” নিদ্রাভঙ্গে অদ্বৈত চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে বিশ্বপাতা বিশ্বম্ভর দণ্ডায়মান। তিনি ভাবিলেন এতদিনে কৃষ্ণকে পাইলাম। এই গৌরই আমার কৃষ্ণ।

এই সময় হইতেই নিমাই শ্রীবাসের গৃহে হরিসভা করিতে লাগিলেন। গদাধর, মুরারিগুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, শ্রীমান্ পণ্ডিত, বনমালী আচার্য্য, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী আদি বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়া, দিনরাত্র হরিগুণ কথন ও হরিসংকীর্ত্তনেই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ-বাসী শাক্তগণ বহির্দ্দেশ হইতে নানাপ্রকার অত্যাচার ও চীৎকার করিয়া তাহাদের সভার বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল। এই সময়ে অবধূত নিত্যানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দের সঙ্গমে নিমাইয়ের হরিসঙ্কীর্ত্তন চতুর্গুণে বর্দ্ধিত হইল। পথে পথে কীর্ত্তনের দল লইয়া তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। অনেকেই তাঁহাদের মতাবলম্বী হইল, বিরোধী পক্ষেরা কহিতে লাগিলেন, “হিন্দুধর্ম্মের লোপের জন্যই কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। মনসা বা চণ্ডীরই কীর্ত্তন হইয়া থাকে, কৃষ্ণের আবার কীর্ত্তন হয় ইহা কখনও শুনা যায় নাই। অতএব এরূপ নূতনবিধ কীর্ত্তন যে হিন্দু ধর্ম্মের উচ্ছেদের জন্যই প্রচারিত হইয়াছে সন্দেহ নাই”।

মহা-প্রকাশ।—স্বগণ সহিত নিমাই একদিন শ্রীবাসের বাটীতে বেলা এক প্রহরের সময় ভাবাবেশে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি—সাত প্রহরকাল ব্যাপিয়া সংকীর্ত্তন হইল;—ইহাকে সাতপ্রহরিয়া ভাব বলা হইয়া থাকে। আজকাল সংকীর্ত্তনকালে নিমাইএর প্রায়ই বাহ্যজ্ঞান থাকিত না—কখন কখনও বা "মুই সেই, মুই সেই," বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন; কখন বা বিষ্ণু-খট্টায় উঠিয়া বসিতেন। আবার সে ভাব সম্বরণ করিয়া যেন মহা ভ্রমক্রমে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া কত অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছেন এই ভাব প্রকাশ করিতেন। ইহাতে কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাবমুগ্ধ ভক্তগণের হৃদয় ভুলিত না—তাঁহারা ঐশ্বর্য্য ভাবই ভাল বাসিতেন।

ভগবান জ্ঞানের অতীত। জ্ঞানযোগে তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি কখন কখন ভক্তির বাধ্য হইয়া ভক্তের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ ভক্তিযোগেই তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন। আজ তাই ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য নিমাই মহৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গৌরচন্দ্র প্রেমে বিভোর হইয়া বিষ্ণুখট্টায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার কমনীয় দেহ হইতে সুবিমল সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল জ্যোতি বাহির হইয়া গৃহপ্রাঙ্গণ বিমল ধবল জ্যোতিতে বিভাসিত করিল। ভক্তগণ তাঁহার এই রূপমাধুরী দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তখন মহাপ্রভু ভক্তগণকে অভিষেক গীত গাহিতে আদেশ করিলেন। গীত আরম্ভ হইলে নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ শত শত নূতন কলসীতে জল আনিয়া প্রভুর মস্তকে ঢালিতে লাগিলেন। স্নানান্তে ভক্তগণ গৌরচন্দ্রকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাকে নূতন আসনে বসাইলেন এবং মাল্যচন্দনাদি দ্বারা শ্রীঅঙ্গ পরিশোভিত করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ছত্র ধারণ করিলেন। নরহরি আদি ভক্তবৃন্দ চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

লীলাপটু নিমাই এইবার ভক্তগণ সমক্ষে আহার্য্য চাহিলেন। আজ যাঁহার যাহা প্রিয় তিনি প্রভুর নিমিত্ত তাহাই আহরণ করিলেন। গৌরাঙ্গ স্বহস্তে সেই সকল ভক্ষণ করিয়া ভক্তগণের তৃপ্তিসাধন করিলেন। ভোজনান্তে গদাধর তাম্বুল আহরণ করিলেন। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবাস, অদ্বৈত, গদাধর প্রভৃতিকে ডাকিয়া গত বিষয়ের বিবিধ কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, ভক্তগণ মহাসমারোহে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া মহাপ্রভুর আরতি করিলেন।

আরতি সম্পন্ন হইলে প্রভু শ্রীধরকে ডাকিয়া, তাহার সহিত বাজারে যে প্রকার আনন্দ কলহ করিতেন সেই কথার উত্থাপন করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে তাহার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং শ্রীধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস ও মুরারি গুপ্ত প্রভৃতিকে অভীষ্ট বর প্রদানে কৃতার্থ করিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন।

জগাই মাধাই।—নিমাই আজকাল শ্রীবাসাঙ্গনে হরিনামামৃত পানে দিনরাত্র বিভোর থাকেন। হরিনাম-বিমুখ জীবের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া যায়, কেবল ভাবেন 'কত দিনে জীব হরিনাম গ্রহণ করিয়া তাহার জীবন সফল করিবে'। একদিন করুণা-পরবশ হইয়া নিমাই, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, 'তোমরা আজ হইতে নবদ্বীপের দুয়ারে দুয়ারে হরিনাম প্রচার কর। আচণ্ডালে যাচিয়া যাচিয়া, তাহাদের হাতে ধরিয়া, পায়ে পড়িয়া হরিনাম লওয়াও, ইহাই তোমাদের নিকট আমার মিনতি।' আদেশ পাইয়া প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দ ও হরিদাস নগরের পথে পথে পল্লীতে পল্লীতে নাম প্রচারে ব্রতী হইলেন।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস উভয়েই উদাসীন সন্ন্যাসী ও পরম প্রেমিক। "কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বল কর কৃষ্ণ শিক্ষা" তাঁহাদের এই সরলতাপূর্ণ সপ্রেম

উপদেশে অনেকেরই মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু সকলের মন সমান নহে—কেহ কেহ বা তাহাদিগকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিতেও ছাড়িল না। এইরূপে নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রতিদিনই নদীয়ার ঘরে ঘরে পতিতপাবন কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে নবদ্বীপে শক্তিসাধনা অতিশয় প্রবল ছিল। নবদ্বীপের প্রায় সমুদায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই শাক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জগাই মাধাই নামক দুই ভ্রাতা বাল্যকাল হইতেই সুরাসক্ত হইয়া যারপরনাই কুক্রিয়াশালী হইয়াছিল। নবদ্বীপের প্রায় সমস্ত লোকই তাহাদের অত্যাচার-পীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। জগাই মাধাই নিমাইএর হরিসংকীর্ত্তনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কোনরূপে তাহার বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিলে অপরিসীম আনন্দানুভব করিত। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাসের মনে সকরুণ ক্লেশের উদয় হইল; তাঁহারা ভাবিলেন—"এই দুই ভ্রাতা যদি সৎপথে না আসিল, তবে হরিনামের মাহাত্ম্য কি? নামের পতিতোদ্ধারিণী শক্তি কি?"

প্রতিদিনের ন্যায় নিত্যানন্দ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নবদ্বীপের বাজার দিয়া সুধামধুর হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছিলেন; ঐ সময়ে জগাই মাধাই কতকগুলি মদোন্মত্ত স্বপক্ষীয় লোক লইয়া নিত্যানন্দকে আক্রমণ করিল। দুরাত্মগণ কাহারও মৃদঙ্গ ভাঙ্গিল, কাহারও ধ্বজা ছিঁড়িল, কাহারও বা শিখাগুচ্ছ আকর্ষণ করিল। মদোন্মত্ত মাধাই একটী কলসীর কাণা লইয়া নিত্যানন্দের মস্তকে এমন অব্যর্থ সন্ধান করিল যে, সেই প্রহারে তাঁহার মস্তক বিদ্ধ হইয়া অজস্র শোণিতধারা বহিতে লাগিল। প্রেমবিহ্বল নিতাইএর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। এত আঘাতেও পরমানন্দ নিত্যানন্দের লেশমাত্র ক্রোধের উদ্রেক নাই—একমাত্র ব্যথা যে এখনও ইহারা হরিনাম লইল না। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া, "আয়রে মাধাই, কোলে আয়—ভাই একবার হরি হরি

বলিয়া আমায় কিনিয়া ল'।" বলিয়া মাধাইকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মাধাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় মারিতে উদ্যত হইলে, জগাই নিত্যানন্দের সেই অপরিসীম ক্ষমাগুণে মুগ্ধ হইয়া মাধাইএর হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক মারিতে নিষেধ করিলেন। নিতাই তখন দুই ভাইকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'আয় ভাই, আমরা হরিনাম করি।'

নিত্যানন্দের আঘাতের কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গদেব ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি নিত্যানন্দের অঙ্গে রুধিরধারা দেখিয়া যারপরনাই ক্রোধ-প্রকাশ পূর্ব্বক জগাই মাধাইকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। তখন নিত্যানন্দ অতিশয় অনুনয় করিয়া কহিলেন, "প্রভু, ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া শাস্তি দেওয়া হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্য নহে। আমরা উভয়ে উপস্থিত থাকিয়াও এই দুইজনকে যে সৎ পথে আনিতে পারিলাম না, ইহাতে আমরা যে বেদনা পাইতেছি—সামান্য রক্তপাত তৎতুলনায় কিছুই নহে। বিশেষতঃ, মাধাই পুনরায় মারিতে উদ্যত হইলে জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে। জগাইএর কোন দোষ নাই।" নিত্যানন্দের এই কথা শুনিবামাত্রই গৌরের সে ভাব তিরোহিত হইল। তিনি যখন শুনিলেন মাধাই মারিতে উদ্যত হইলে জগাই নিবারণ করিয়াছে, তখন প্রেমে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, এবং "আয়রে জগাই কোলে আয়" বলিয়া জগাইকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পাপিষ্ঠ জগাই মাধাই গৌরাঙ্গদেবের এই অলৌকিক সকরুণ ক্ষমা দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং সেই প্রেমের স্পর্শে উভয়ের শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল হৃদয় বিগলিত হইয়া তাহাদের চক্ষু দিয়া অনবরত বারিধারা বহিতে লাগিল। তখন নিতাই কহিলেন, "প্রভু, ইহাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।" নিমাই সময় বুঝিয়া নিরপরাধ জগাইকে ক্ষমা করিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। এই সকল দেখিয়া মাধাইএর হৃদয় অনুশোচনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে অতি সলজ্জভাবে নিমাইএর নিকট স্বীয় অপরাধের

ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ কহিলেন, "তুমি নিতাইএর নিকট অপরাধী তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" নিতাই কহিলেন, "চাহিবার আগেই তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি, একবার হরি বলিয়া আমার ব্যথা দূর কর।" গৌরাঙ্গদেব জগাই মাধাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সহস্র পাপের মধ্যে পরনিন্দারূপ পাপ তোমাদিগকে স্পর্শ করে নাই। তোমাদের যত কিছু পাপ আমাকে অর্পণ করিয়া তোমরা নিষ্পাপ হও।" তদনন্তর পাপনিরত জগাই মাধাই গৌর নিতাইএর এই অসীম কারুণ্য দর্শনে তাঁহাদের চরণে লুটাইয়া পড়িল।

তদবধি জগাই মাধাই সমস্ত অসদ্বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম বৈষ্ণব হইল। ভ্রাতৃদ্বয় পাপমুক্ত হইবার জন্য গঙ্গাতীরে আশ্রয় লইয়া স্নানার্থী সকল লোকেরই নিকট স্বকীয় অপরাধের বর্ণনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জগাই নগরে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং মাধাই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গঙ্গাতীরে হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। মাধাইএর ঘাট 'পাপহরণ ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ হইল।[২] হরিনামের যে কি মাহাত্ম্য এবং ক্ষমার কি অপরিসীম শক্তি তাহা জগাই মাধাইএর জীবনে উত্তমরূপে প্রকাশিত হইল।

একদিন প্রভু শ্রীবাসের সহিত নগরপ্রান্তে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তৎকালে শৌণ্ডিকালয়-সকল নগর মধ্যে থাকিত না—প্রান্তভাগেই থাকিত। শৌণ্ডিকালয় দেখিয়া নিমাই ভাবাবেশে বারম্বার "মদ আন, মদ আন" বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস নিমাইএর কলঙ্ক ভয়ে বারম্বার তাহাকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। এদিকে মাতালগণ নিমাইকে ঘেরিয়া ফেলিল। তখন নিমাই "হরি হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া মাতালেরা হরিধ্বনি

(২) প্রভুর আজ্ঞায় মাধাই ঘাট বান্ধিল।
পাপহরণ ঘাট তার নাম থুইল॥ ৫৯পৃঃ (জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল)

করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহারা হরিনামে বিভোর হইয়া গেল। তখন শ্রীবাস প্রভুর লীলা বুঝিতে পারিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

কাজী উদ্ধার।—জগাই মাধাই উদ্ধারের পর নগরে হরিনামের রোল পড়িয়া গেল। অনেক বিরোধী ব্যক্তিও গৌরাঙ্গের ভক্ত হইয়া পড়িল; প্রতি গৃহে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ইহাতে পাষণ্ডিগণ ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইয়া নদীয়ার কাজীর নিকট অভিযোগ করিয়া কহিলেন, "নিমাই যে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে, সেই কীর্ত্তনে হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে।" তৎকালে নবদ্বীপ-মণ্ডলের সিমুলিয়া পল্লীতে একজন মুসলমান বিচারপতি থাকিতেন। এই সময়ে যিনি কাজী ছিলেন তাঁহার নাম চাঁদ-কাজী,[৩] তিনি নিমাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য একদিন নিজে সদলে নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সত্যই নগরবাসিগণ সোৎসাহে সংকীর্ত্তন করিতেছেন। কাজীর অনুচরগণ তাহাঁদিগকে তাড়না করিলে, নাগরিকগণ ব্যস্ততা-সহকারে পলাইয়া গেল, এবং কাজী যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকে মারিলেন ও মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়া সংকীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি আরও কহিলেন, এইরূপ হরিসংকীর্ত্তন করিলে তাহার জাতিনাশ করিবেন। তখন হইতে কাজীর ভয়ে কএক দিন হরিসংকীর্ত্তন কিছু কমিয়া গেল। যথাসময়ে গৌরাঙ্গদেব এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধান্বিত হইয়া নিতাইকে কহিলেন, "সমস্ত নগরের বৈষ্ণব-সমাজে প্রচার কর যে আজ রাত্রিতে আমি সমস্ত নবদ্বীপে নগর-সংকীর্ত্তন করিব।" এই সংবাদে বৈষ্ণবগণ ও নাগরিক অন্যান্য সাধুগণ মহোৎসাহে কীর্ত্তনের আয়োজন করিতে

(৩) সিমুলিয়ার এক অংশের বর্ত্তমান নাম কাজীপাড়া। সেই স্থানে পুরুষানুক্রমে কাজী সাহেবের বাস। তথায় পরম বৈষ্ণব চাঁদ-কাজী সাহেবের সমাধি এক অমর গুলঞ্চ-তরুতলে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

লাগিলেন। প্রতি গৃহ আম্রশাখা ও পুষ্পদ্বারা পরিশোভিত হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বৈষ্ণব ও নাগরিকগণ খোল করতাল সহিত দলে দলে গৌরাঙ্গের ভবনে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিতে দেখিতে অঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গেল; আনন্দময় উচ্চ হরিধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গৌরসুন্দর সন্ধ্যার প্রাক্কালেই স্বীয় দলকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া সংকীর্ত্তনে বহির্গত হইলেন। প্রথম দলে অদ্বৈতাচার্য্য, দ্বিতীয় দলে হরিদাস, তৃতীয় দলে শ্রীবাস ও চতুর্থ দলে গৌরচন্দ্র স্বয়ং নিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল; গৌরচন্দ্র ভাবে গদ্‌গদ্ হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; তাঁহার অশ্রু কম্পন ঘর্ম্মাদি স্বাত্ত্বিক বিকার সমস্ত দর্শনে লোকমাত্রেই বিমোহিত হইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। চতুর্দ্দিকে মশাল জ্বলিয়া উঠিল। হরিধ্বনির সহিত পুরমহিলাগণের মঙ্গলসূচক শঙ্খ ও হুলুধ্বনি মিশিয়া বিপুল আনন্দের কোলাহল উঠিল। চতুর্দ্দিকে লাজা, পুষ্প ও কপর্দ্দক বর্ষিত হইতে লাগিল। গৌরাঙ্গদেব প্রথমে আপনার ঘাটে, পরে মাধাইএর ঘাটে, তদনন্তর সিমুলিয়ায় প্রবেশ পূর্ব্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে কাজীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কাজী ইতঃপূর্ব্বে গৌরচন্দ্রের হরিনামধ্বনি শুনিয়াই ভয়ে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কীর্ত্তনিয়াগণ কীর্ত্তনামোদে এমন বিভোর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহাদের উদ্দণ্ড নৃত্যাবেশে কাজীর উদ্যানাদি যে নষ্ট হইতেছে তাহার জ্ঞান নাই। গৌরচন্দ্র উহাদিগকে বিরত করিয়া কাজীকে বাটীর ভিতর হইতে আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখুন, আমি আজ আপনার অতিথি, কোথায় আপনি আমাকে অভ্যর্থনা করিবেন, না আমাকে দেখিয়া আপনি বাটীর ভিতর পলাইয়া গেলেন!" বাস্তবিক কাজী ভীত হইয়াই ভিতর বাটীতে গিয়াছিলেন। এখন গৌরচন্দ্রের শান্তভাব দেখিয়া তিনি কহিলেন, "তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী

আমার চাচা হইতেন। সে সম্বন্ধে তুমি আমার ভাগিনেয়; দেহ-সম্বন্ধ হইতে গ্রাম-সম্বন্ধ গৌরবের। সুতরাং আমি তোমার মাতুল। ভাগিনা বলিয়া যেমন আমি তোমার ক্রোধ সহ্য করিলাম, তেমনি মাতুল বলিয়া তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর।" এইরূপে গৌরের সহিত কাজীর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কাজী হরিনামের মাহাত্ম্য শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি এখন নিশ্চয় বুঝিয়াছি—হিন্দুরা যাঁহাকে নারায়ণ বলেন তুমি সেই।" গৌরহরি হাসিয়া কাজীর গাত্রস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তোমার মুখে যখন নারায়ণ নাম উচ্চারিত হইল, তখন তোমার সমস্ত পাপক্ষয় হইয়া পবিত্র হইলে।" গৌরের এই কথা শুনিয়া, কাজীর চক্ষু হইতে অজস্র প্রেমধারা বহিতে লাগিল। কাজী প্রভুর চরণে পতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "তোমার অনুগ্রহে আজ আমার কুমতি দূর হইল। এখন আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার চরণে আমার দৃঢ় ভক্তি থাকে।" গৌরহরি কাজীকে ভক্তি প্রদান করিয়া কহিলেন, "তোমার নিকট আমার এক ভিক্ষা আছে; আদেশ কর, যেন নদীয়ায় কীর্ত্তনের বাধা না হয়।"

"কাজী কহে মোর বংশে যত উপজীবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বধিবে॥[৪] (চৈ, ভা)

ইহা শুনিয়া প্রভু হরি হরি বলিয়া উঠিলেন। বৈষ্ণবেরাও হরিধ্বনি করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; প্রভু কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। কাজীও এই সংকীর্ত্তনের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভু কাজীকে বিদায় করিলেন। নবদ্বীপে অবাধ কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল।

(৪) কাজীর বংশধর পরম বৈষ্ণব ফজলে খোদা কাজী সাহেবের মুখে শুনিয়াছি তাঁহারা এখনও অখাদ্য ভক্ষণ করেন না এবং তাঁহারা এখনও কাজীর তালাক মানিয়া চলেন। গৌরচন্দ্রে তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি আছে।

নূতন পথে।—নিমাই এখন সর্ব্বদাই নিজ ভাবে বিভোর থাকেন। কখন কখন তিনি "গোপী গোপী" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদা টোলের কোন ছাত্র তাঁহাকে গোপী নাম জপ করিতে শুনিয়া কহিল, "পণ্ডিত মহাশয়, লোকে তো কৃষ্ণ নামই জপ করে, কাহাকেতো গোপী নাম জপ করিতে শুনি নাই।" তখন গোপীর গৌরবে গৌরচন্দ্রের হৃদয় বিভোর ছিল। তিনি কহিলেন, "কৃষ্ণ তো লম্পট চোর, তাহাকে ভজিলে কি হইবে!" এই বলিয়া নিকটস্থ যষ্টি হাতে লইয়া, তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ছাত্র পলাইয়া গেলেও তিনি তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সেই ছাত্র সমপাঠীদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া গৌরচন্দ্রের নানাবিধ নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "যে কৃষ্ণ নিন্দা করে সে বৈষ্ণব কিসের!" কেহ বলিল, 'তি ন মারিতে পারেন আমরা কি চুপ করিয়া থাকিব?' ক্রমে এই সকল কথা গৌরসুন্দরের কর্ণগোচর হইলে, আলাপ-প্রসঙ্গে তিনি ভক্তগণকে উদাসীন ভাবে কহিলেন, —

"করিলুঁ পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥" (চৈ, ভা)

"দেখিতেছ না সংসার ঘোর মায়ায় মুগ্ধ, তাহারা ভ্রমেও কৃষ্ণনাম করিতেছে না। কেহই ভক্তিপথে আসিতেছে না। লোকের ঘরে ঘরে হরিনাম করিয়া বেড়াইলাম তাহাতে কি ফল হইল? কৃষ্ণ কথা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাহারা আমার নিন্দা করিয়া ও আমাকে মারিতে চাহিয়া অপ-রাধী হইতেছে, এখন উপায় কি? সংসারে থাকিয়া হরিনাম বিতরণ হইবে না, জীব উদ্ধার হইবে না। স্বার্থপর সংসারীর কথা লোকে শুনিবে কেন? ইহাতে লোকের দোষই বা কি দিব? তাহারা তো বিষয় বিকারের রোগী, আমরা সে রোগের চিকিৎসা কি করিয়াছি? সংসারত্যাগ না করিলে নিঃস্বার্থভাবে হরিনাম ও প্রেম বিতরণ হইবে না।

তোমরা জান সংসারত্যাগী উদাসীন সন্ন্যাসীকে এ দেশের সকল লোকেই প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকে। আমি সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে কেঁদে কেঁদে লোকের ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিব। দেখি, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করেন কি না?"

ক্রমে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা সকল ভক্তই জানিতে পারিলেন। এই কঠোর কথা যিনি শুনিলেন তিনিই কাতর হইলেন। কিন্তু কাহার কিছু বলিবার সামর্থ্য নাই।

মাতা পুত্রে।—নিমাই সন্ন্যাসী হইবেন, কথাটা দেখিতে দেখিতে নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। লোকের কাণাকাণিতে শচীদেবীর আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না; কিন্তু তিনি সাহস করিয়া পুত্রকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। ভয়—পাছে নিমাই বলিয়া ফেলেন তিনি সন্ন্যাসী হইবেন, এই ভাবিয়া বলি বলি করিয়াও তিনি কিছু বলিতে পারেন না। কিন্তু প্রাণের ভিতর তাঁহার কি বিষম যাতনাই আরম্ভ হইল—তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। একদিন নিমাই আহারান্তে বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বন করিতেছেন, এমন সময়ে মাতা নিকটে আসিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া কহিলেন, "নিমাই বাপ্, তুই নাকি আমাদের ছাড়িয়া—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি সন্ন্যাসের কথা আর মুখে আনিতে পারিলেন না। উচ্ছলিত শোকাবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। নিমাই তৎক্ষণাৎ দুই বাহু বেষ্টন করিয়া জননীর মস্তক স্বীয় স্কন্ধে রক্ষা করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "কে বলিল মা, আমি সন্ন্যাস করিব?"

শচী—"কেন নগরের সকল লোকই তো কহিতেছে; কেবল বৌমা ও আমি জানি না। দেখ বাপ নিমাই, তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, আমার সর্ব্বস্ব ধন, আমার সব গিয়াছে কেবল তোমাকে লইয়া সংসারে আছি—আমাকে ছাড়িয়া যাইও না!"—নিমাই তুই চলিয়া গেলে আমি

কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব? তোকে পাইয়া আমি পতিপুত্রের শোক যে ভুলিয়াছিলাম। বাপ্, কেমন করিয়া তুই সন্ন্যাসীর ক্লেশ সহ্য করিবি? ক্ষুধার সময় কে তোঁকে খাইতে দিবে? তৃষ্ণার সময় কে জল দিবে? এই কি তোর সন্ন্যাসের বয়স—এখনও তোর সন্তান হয় নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার দশাই বা কি হইবে? তাহার এ অসামান্য রূপযৌবন যে জ্বলন্ত আগুনি, তোর বিহনে সেই সোনার প্রতিমা শুখাইয়া যাইবে, কে তাহার রক্ষা করিবে?"

নিমাই—"মা, আমি কি করিব, আমি স্ববশে নাই। আমি জানি তুমি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, তোমার চরণ-সেবাই আমার পরম ধর্ম্ম। কিন্তু কি করিব মা, আমার মন মানে না। কোথায় গেলে সেই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকে পাইব আমার সেই ভাবনা।"

শচী—"কেন বাপ্, ঘরে বসিয়া কৃষ্ণ ভজন করিতে কি জান না? ঘরে বসিয়া কৃষ্ণ কথা কহ, কৃষ্ণনাম গান কর, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ।" এই বলিয়া শচীদেবী কাঁদিতে লাগিলেন। মাতার ক্রন্দন দেখিয়া—বেগময় নয়ন-নীরে নিমাইএর বদনকমল ভাসিয়া গেল।

নিমাই কহিলেন, "মা, আমি স্ববশে নই। কৃষ্ণের জন্য আমি পাগল হইয়াছি। কীর্ত্তন ভাল লাগিতেছে না। তাই মনে করিয়াছি সন্ন্যাসী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে বাহির হইব।" এই নিদারুণ কথা শ্রবণমাত্র শচীদেবী বাত-প্রহত কদলী-তরুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। তখন গৌর অনেক যত্নে মাতার মূর্চ্ছাপনোদন করিয়া ধীরগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"মা, মায়া-মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বৃথা শোক করিবেন না; আপনি তো জানেন এ সংসারে সকলই অনিত্য—সকলই অসার। এই যাহা আছে, পরক্ষণেই তাহা নাই; কাল যাহা ছিল, আজ তাহা নাই; এখন যাহা আছে, কাল তাহা থাকিবে না। এখন আপনি আছেন পরে থাকিবেন না, আজ আমি

আছি আমিও থাকিব না। মা, ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক বিকাশে নয়নের যেমন তৃপ্তি হয় না, তেমনি এই অবিরল পরিবর্ত্তনশীল জগৎ দর্শনে তৃপ্তি-লাভ করিতে পারা যায় না। তাই বলিতেছি মা, এই ক্ষণস্থায়ী সংসারের জন্য কাতর হইলে চলিবে না। মা, যাহাকে পাইলে পাওয়ার সাধ মিটিয়া যায়, সকল আশার তৃপ্তি হয়; যেখানে পরিমাণের কণিকা নাই, চাঞ্চল্যের ছায়া নাই; প্রাণ ভরিয়া বুক ভরিয়া স্থিরভাবে যাহাকে দেখিতে পাইব—যাহার দর্শনে বিচ্ছেদ নাই, বিবাদ নাই—সেই স্থির দিব্য পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লও। তাহাকে পুত্ররূপে লইতে পারিলে, আর পুত্রবিরহজনিত কষ্ট পাইতে হইবে না, শোক-দুঃখ কিছুই থাকিবে না।"

শচীদেবী গৌরাঙ্গের এই সারগর্ভ কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, 'বাপ্, তাহা হইলে, এই জগৎ মাতা পিতা পুত্র সকলই কি মিথ্যা?'

নিমাই—"না মা, মিথ্যা নহে। কিন্তু এ সকল ক্ষণিক অনিত্য ও পরাধীন। শ্রীকৃষ্ণই সকলের মূলাধার, তাহা হইতেই এ সকলের উৎপত্তি, আবার তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। সাগরের ঢেউ যেমন সাগরে উৎপন্ন হইয়া সাগরেই মিশিয়া যায়, এ সকলও তাহাই। মা, এই অনিত্য সম্বন্ধ-বিচ্ছেদে কাতর না হইয়া, যাহা হইতে এই সম্বন্ধ উদ্ভূত হয় সেই পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হউন। আমাকে যে স্নেহ করেন তাহা তাঁহাকেই অর্পণ করুন—পরম সুখ পাইবেন।"

শচী কহিলেন, "এই সম্বন্ধ ক্ষণিক বটে. মরিয়া গেলে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, বাঁচিয়া থাকিলে সে সম্বন্ধ যায় না। তুমি জীবিত থাকিতে আমি তোমায় দেখিতে পাইব না, এ যাতনা কেমনে সহিব বাপ্?"

তখন নিমাই কহিলেন, "মা, আমি তোমার ঋণ কোটী জন্মে পরি-শোধ করিতে পারিব না। আমি বিশ্বরূপের ন্যায় নিরুদ্দেশ হইব না, আমার সন্ন্যাস পরিত্যাগের জন্য নহে, যেখানে থাকি জানিতে পারিবেন।

যখনই আমার জন্য ব্যাকুল হইবেন, তখনই আসিয়া আমি আপনাকে দেখা দিয়া যাইব।"

সরলমতি শচীদেবী পুত্রের এই নিদারুণ কথা শুনিয়া শোকে ম্রিয়মাণা হইলেন। যখন দেখিলেন যে নিমাই আর কোন বাধাই মানিবেন না, তখন অগত্যা তিনি সম্মত হইলেন।

পতি-পত্নী।—নিমাই মাতার নিকট সম্মতি পাইলেন। এক্ষণে পত্নীর নিকটও তাঁহার সম্মতি লওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য তিনি রজনীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে দিবাভাগে গুরুজন সমক্ষে পত্নী সম্ভাষণ নিন্দনীয় ও সমাজবিরুদ্ধ থাকায় দিবাভাগে উভয়ের কোন কথা হইল না। ক্রমে রজনী সমাগত হইলে, নিমাই আহারান্তে শয়নগৃহে গমন করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দিবাভাগে মাতাপুত্রের সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন; তাঁহার বুঝিতে আর কিছু বাকি ছিল না। তিনি শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন প্রিয় পতি নিদ্রা যাইতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া পদতলে বসিয়া তাঁহার পা দু'খানি হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নীরব অশ্রুধারায় গৌরের পদযুগল অভিষিক্ত হইল। উষ্ণ-জলস্পর্শে নিমাইএর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি প্রিয়পত্নীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর কথার উত্তর না দিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তিনি অচেতন-প্রায় হইয়াছেন। তখন নিমাই কহিলেন, 'প্রিয়ে, কি হয়েছে বল? কান্‌ছ কেন?' গৌরের এই মধুর সম্ভাষণে বিষ্ণুপ্রিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন, 'নাথ, তুমি নাকি আমাকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিবে? আমি যে তোমাকে পতি পাইয়া বড় ভাগ্যবতী হইয়াছিলাম; আমার যে কত আশা ছিল! কিন্তু আমি আমার জন্য ভাবিতেছি না, তোমার জন্যই আমার বড় ভয়! তুমি কেমন করিয়া

এই নবীন বয়সে সন্ন্যাসীর কঠোর দুঃখ বহন করিবে? সন্ন্যাস গ্রহণে তোমার অনাথিনী মাতা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া মাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। আমাদিগকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে, লোকে তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কার্পণ করিবে, তাহাই বা কি প্রকারে সহ্য করিব?'

গৌরচন্দ্র পত্নীর এই সকল কথা শুনিয়া ধীরমনে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ কহিলেন, 'প্রিয়ে, কে কাহার পতি, কে কাহার পত্নী, শ্রীকৃষ্ণই সকলের পতি। তুমি, আমি, আর যাহা কিছু দেখিতেছ এ সকলই প্রকৃতি, তিনিই একমাত্র পুরুষ।'

"কি নারী পুরুষ দেখ, সবার সে আত্মা এক
মিছা মায়া বন্ধভাবে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি, আর সব প্রকৃতি
এ কথা না বুঝে মাত্র কেই॥" (চৈঃ মঃ)

'অতএব তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ করিয়া যোগাভ্যাস কর, তিনি আমাদের সকলের পতি। তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিতে পারিলে আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না, তাঁহার প্রেমের সমান প্রেম নাই।'

বিষ্ণুপ্রিয়া কহিলেন, 'সত্য, শ্রীকৃষ্ণ জগতের পতি, কিন্তু আমার এমন কি তপস্যা আছে যে তাঁহাকে পাইব? তাই বলিতেছি, আমাদিগকে অকূল দুঃখ-সাগরে ভাসাইও না।'

তখন গৌরচন্দ্র কহিলেন, 'আমার প্রতি ভগবানের আদেশ অন্য রূপ। আমি নিজে স্বাধীন নহি, তাঁহার আজ্ঞার একান্ত অধীন।' এই বলিয়া তিনি প্রিয় পত্নীকে নানা মতে বুঝাইয়া, বারম্বার প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'তোমরা আমার অন্তর হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও অন্তর্হিত হইবে না। আমি যখন যেখানে থাকিব, তোমার হৃদয়ে মিশিয়া থাকিব।'

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আর কোন উপায় নাই বুঝিয়া স্থির ও গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'নাথ, তুমি ভগবানের আদেশ পালনে ব্রতী, আমি সে ব্রত ভঙ্গ করিয়া পাপভাগিনী হইতে চাহি না। আমার সাংসারিক সুখে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তোমার যাহাতে সুখ, আমারও তাহাতেই সুখ। আমি আর দুঃখ জানাইয়া তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দিতে চাহি না।' এইরূপে নিমাই প্রিয়পত্নীর নিকট বিদায় লইলেন।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বদিন।— গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণার্থ গৃহত্যাগের ধার্য্য দিন মাতা ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়জন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন। আজ সেই ১৪৩১ শকের (১৫১০ খৃঃ অঃ) উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন।[৫] আজ নিমাই গৃহত্যাগ করিবেন। গৌরচন্দ্র প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রীবাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপে আজিকার কীর্ত্তন তাঁহার শেষ কীর্ত্তন। ইহা মনে করিয়া তিনি ভাবে বিভোর হইয়া ভক্তমণ্ডলীর সহিত উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ এমন বিহ্বল হইয়াছিলেন যে তাঁহারা বুঝিলেন, এমন কীর্ত্তন বুঝি আর কখন হয় নাই। তাঁহারা বুঝিলেন না যে, এই কীর্ত্তনই নবদ্বীপে নিমাইএর শেষ সংকীর্ত্তন। আজ রজনী শেষে নদীয়ার পূর্ণ শশধর নবদ্বীপ তমসাচ্ছন্ন করিয়া অস্তমিত হইবেন।

সঙ্কীর্ত্তনের পর গৃহে আসিয়া নিমাই যথানিয়মে দৈনন্দিন কার্য্য সমাপন করিলেন। সন্ধ্যাকালে নিমাই চণ্ডীমণ্ডপে বসিলে, নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, মুরারি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আসিয়া সমাগত হইলেন। নগরের

(৫) এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥ (চৈ, ভা, মধ্য)

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস। (চৈ, চ, মধ্য)

অন্যান্য লোকও আজ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। নানা কথার পর গৌরচন্দ্র ভক্তগণকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ভাইসব, যদি আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে, তবে কখনও কৃষ্ণনাম ছাড়িও না; সম্পদে, বিপদে, জীবনে, মরণে কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর গতি নাই।'

আহারান্তে নিমাই শয়নগৃহে গমন করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রিতা, গৌরচন্দ্রের নিদ্রা নাই। রজনী শেষ হইয়া আসিতেছে, নিমাই দেখিলেন আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তিনি চিরদিনের মত বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখখানি একবার দেখিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ হইতে আজ চির-অস্তমিত হইলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, নদীয়াবাসিগণ জাগরিত হইয়া এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। নবদ্বীপে শোকের স্রোত বহিতে লাগিল। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি সমবেদনায় সকলের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। এতদিন যাহারা নিমাইকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া নিন্দা করিত, নিমাইএর গৃহ ত্যাগে তাহারাও কোন ক্রমেই অশ্রুসম্বরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

সন্ন্যাস গ্রহণ।—বাটী হইতে বাহির হইয়া নিমাই আপন মনের আবেগে ভাগীরথী তীর-পথে কাটোয়া অভিমুখে ধাবিত হইলেন,—মনের ধারণা সেখানে যাইলেই অভীষ্ট লাভ হইবে। এই অবস্থায় নিমাই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া কাটোয়ায় যাইতে হইবে। সেই নিশীথ রাত্রে নৌকা কোথায়, নাবিক কোথায়? তাহাতে কি তাঁহার অভীষ্ট লাভের বাধা হইবে? পৌষের সেই দারুণ শীতকে উপেক্ষা করিয়া সন্তরণে তিনি গঙ্গা পার হইলেন। যুবতী ভার্য্যার অতুলনীয় প্রেম, বৃদ্ধা মাতার অপরিমেয় স্নেহ যাহাকে বাধা দিতে পারে নাই, তাহাকে বাধা দিবে কে? নিমাই পূর্ব্বাহ্নেই কাটোয়ায় গিয়া শ্রীমৎ কেশবভারতীর আশ্রমে উপনীত হইলেন, এবং তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের প্রার্থনা করিলেন।

গঙ্গাতীরেই ভারতী গোসাঞির কুটীর। স্নানার্থী লোকগণ এই নবীন যুবকের অপরিসীম রূপলাবণ্য দর্শনে তথায় জনতার সৃষ্টি করিলেন। ভারতী গোসাঞি বহু যুক্তি দ্বারা নিমাইকে সন্ন্যাস গ্রহণে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। চব্বিশ বৎসরের তরুণ যুবা সন্ন্যাসের কঠোর ক্লেশ-সহনের উপযোগী নহে—শাস্ত্রেরও নির্দ্দেশ পঞ্চাশ বৎসরের পর সন্ন্যাস গ্রহণের সময়। এমন অবস্থায় নিমাইকে সন্ন্যাস দিলে ভারতীকে লোক-সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে। এমন সময়ে নবদ্বীপ হইতে নিমাইকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নিতাই, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য্য কাটোয়ায় উপ-নীত হইলেন। কিন্তু, কি ভারতী গোসাঞির যুক্তি, কি নিত্যানন্দ প্রভৃতির নিবারণ, কি উপস্থিত জনগণের কাতর প্রার্থনা—কিছুতেই তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রবল ইচ্ছায় বাধা দান করিতে পারিল না। তাঁহার একমাত্র উক্তি—'জীবন অনিশ্চিত, পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব তাহার স্থিরতা নাই, আমার সংসার-বন্ধন মোচন করিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় করিয়া দিন।' অবশেষে ভারতী গোসাঞিকে তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে হইল। মাঘের প্রথম দিবসে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—মস্তক হইতে চাঁচর চিকুর অন্তর্হিত হইল, শ্রীঅঙ্গে কৌষেয় বাস শোভা করিল। তাঁহার বেশ দেখিয়া জনগণ বিহ্বল হইয়া পড়িল; সকলের মনে হইতে লাগিল, বুঝি তাহারই আদরের দুলাল সন্ন্যাসী হইল। ক্ষুব্ধ জনতা শতমুখে ভারতীকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

নবীন সন্ন্যাসী অশ্রুপূরিত-লোচনে পরমানন্দে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে মত্ত আছেন। ভারতী ভাবিতেছিলেন, নিমাইএর সন্ন্যাসের কি নাম হইবে। শেষে তিনি শিষ্যের **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য** নাম রাখিলেন, বলিলেন 'জীব কৃষ্ণ ভুলিয়া আছে, তোমা হইতে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে চৈতন্য হইবে। অতএব এই নামই তোমার উপযুক্ত।'

ন্যাসিবর চৈতন্যদেব কয়েক দিবস পথে পথে হরি-সংকীর্ত্তন করিয়া

শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নবদ্বীপ হইতে শচীমাতাকে আনাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শচীদেবী নিমাইএর দণ্ডি-বেশ দেখিয়া অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কহিলেন, 'বাপ্ নিমাই, বিশ্বরূপের ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না. সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে ভুলিও না, মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিও।' তখন নিমাই কহিলেন, 'মা, এ জীবনে আপনার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। আপনি যে শরীর পোষণ করিয়াছেন, আমার সেই দেহ আপনারই আছে জানিবেন। আপনি যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিব। সন্ন্যাসী বলিয়া, আমার মন পার্থিব সকল বস্তু হইতে নিস্পৃহ থাকিতে পারে, কিন্তু আপনাকে কখনই ভুলিব না।' অতঃপর চৈতন্যদেব মাতৃ-আদেশে নীলাচলে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন।

পুরী যাত্রা ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।—চৈতন্যদেব কয়েক দিবস শান্তিপুরে যাপন করিয়া, মাতা ও সঙ্গিগণের নিকট বিদায় লইয়া, নিতাই জগদানন্দ দামোদর ও মুকুন্দ দত্ত এই চারিজন ভক্ত সমভিব্যাহারে পুরী যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ক্রমে কটক, জাজপুর আদি পরিভ্রমণ করতঃ কমলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজা দৃষ্ট হয়। ধ্বজা দেখিয়া চৈতন্যদেব আনন্দে বিহ্বল হইলেন, এবং সঙ্গিগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতপদে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রেমসিন্ধু একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি জগন্নাথকে আলিঙ্গন মানসে যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি প্রেমবিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি চৈতন্যের তথাবিধ অবস্থা দেখিয়া বাহকদ্বারা তাঁহাকে তুলিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি

সঙ্গিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুকুন্দ উচ্চৈঃস্বরে হরি-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহর সময়ে গৌরচন্দ্র চৈতন্যলাভ করিলেন, এবং ভক্তমণ্ডলীকে পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া মিষ্ট বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য[৬] শুনিলেন যে, এই নবীন সন্ন্যাসী নবদ্বীপ-নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র। এই পরিচয় পাইয়া তিনি নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। সার্ব্বভৌমেরও নিবাস নবদ্বীপ; তাঁহার পিতা ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সহাধ্যায়ী ছিলেন। চৈতন্যের অলোকসামান্য রূপলাবণ্য, প্রেমপূরিত চক্ষু, ধর্ম্মে একাগ্রতা, মনোমুগ্ধকর চরিত্র ও সুমধুর হাস্য—যাহা মনুষ্য মাত্রেরই মন মোহিত করিয়াছিল—সেই মূর্ত্তি সার্ব্বভৌমের হৃদয়ও অধিকার করিল।

ভোজনান্তে সার্ব্বভৌম কহিলেন, "নবদ্বীপ সম্বন্ধে তুমি আমার গৌরবের পাত্র। বিশেষতঃ যখন তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ তখন আমার বিশেষ পূজনীয়।" এই কথায় চৈতন্যদেব বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি আমাকে ওরূপ কথা বলিবেন না। আপনি জগদ্-গুরু, আমার পরম পূজনীয়। আমি বালক জ্ঞানহীন, আপনার শরণাপন্ন হইলাম—আমাকে শিক্ষাদান করুন। আমি জগন্নাথ দর্শনে এখানে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আপনাকে দর্শন করাই আমার মূল উদ্দেশ্য। কিরূপ করিলে আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষা পায়, পুনর্ব্বার সংসার-মায়ায় মুগ্ধ হইতে না হয়, তাহাই আমাকে উপদেশ দিন।"

(৬) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যই বাসুদেব সার্ব্বভৌম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা—

এই মহেশ্বর বিশারদের আলয়। বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহার তনয়॥
প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর নীলাচলে স্থিতি। গোপীনাথাচার্য্য যাঁর হন ভগ্নীপতি।
(ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ)

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রসঙ্গ গ্রন্থের ১২৮-২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তর্কশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন।

সার্ব্বভৌম চৈতন্যের মধুর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুমি পরম সুবুদ্ধি হইয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। এই অল্প বয়সে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে কেন? মাথা মুড়াইয়া মাতা ও স্ত্রী ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলে কি লাভ হয়? বরঞ্চ বয়োজ্যেষ্ঠ ও মহাসম্মানিত ব্যক্তিগণ প্রণাম করায় প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। সন্ন্যাসী কাহারও নিকট প্রণত হন না। যদিও মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি অনেকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই জীবনের শেষভাগে ঔদ্ধত্য নষ্ট হইলে, এই পথের পথিক হইয়াছিলেন। তোমার এই নবীন বয়সে সন্ন্যাসী হওয়া ভাল হয় নাই।"

চৈতন্য কহিলেন, "আমাকে সেরূপ সন্ন্যাসী মনে করিবেন না। আমি হরি-বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া সংসারাশ্রম ও শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য ঘরের বাহির হইয়াছি, অহঙ্কার বিনাশ জন্যই আমার শিখাসূত্র ত্যাগ করা।"

তখন সার্ব্বভৌম মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, ইহাঁকে বেদান্ত অধ্যয়ন করাইয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে আনয়ন করিতে হইবে। তিনি প্রকাশ্যে কহিলেন, "বেদান্তাধ্যয়ন ও বেদান্তপাঠ শ্রবণই সন্ন্যাসীর কার্য্য। অতএব তুমি আমার বাটীতে প্রত্যহ বেদান্তপাঠ শ্রবণ করিবে।" চৈতন্য কহিলেন, 'আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই আমার কর্ত্তব্য।' এই বলিয়া তিনি প্রত্যহ সার্ব্বভৌমের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তাহ অতীত হইল, কিন্তু চৈতন্য ভাল কি মন্দ একটী কথাও কহিলেন না। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাত দিন বেদান্তপাঠ শুনিলে, কৈ কোন উত্তর করিলে না? বুঝিতে পারিয়াছ কি?' তখন চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন, 'আমি বেদান্ত সূত্রের অর্থ উত্তম বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু ভাষ্যের অর্থ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। ভাষ্যে মুখ্যার্থ গোপন করিয়া গৌণার্থ প্রকাশ করিতেছে।'

অনন্তর সার্ব্বভৌমের সহিত ঐ বিষয়ে চৈতন্যের নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক হইল। তাহাতে সার্ব্বভৌম একেবারে পরাস্ত হইলেন। তখন চৈতন্যদেব কহিলেন, 'আপনি যে বিদ্যায় বিভূষিত, তাহাতে ঐশ্বরিক কোন বিষয় জানিতে সমর্থ নহেন; ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ভগবানের সহিত আমাদের চিরসম্বন্ধ, ভক্তিযোগে সেই সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্মের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা ভগবানে প্রেম ও ভক্তি। আত্মারাম মুনিগণও ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন।' এই বলিয়া তিনি ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন—

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নিগ্রর্ন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থং ভূত গুণোহরিঃ॥

ভগবানের এতাদৃশ গুণ যে, যাঁহারা আত্মারাম ঋষি ও মৌন ব্রতাবলম্বী, যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে তাঁহারাও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

সার্ব্বভৌম মহাশয় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলে চৈতন্য কহিলেন, 'আপনি মহাপণ্ডিত, আপনি আগে ব্যাখ্যা করুন। আমি যাহা জানি পরে বলিব।' সার্ব্বভৌম স্বীয় পাণ্ডিত্যের বলে উক্ত শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। অতঃপর চৈতন্যদেব সেই ব্যাখ্যা ব্যতীত অষ্টাদশ প্রকার নূতন ব্যাখ্যা করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আপনার বিদ্যাবুদ্ধিতে ধিক্কার দিয়া চৈতন্যের শরণাপন্ন হইলেন।

তদনন্তর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, চৈতন্য কহিলেন, 'কলিতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করাই শ্রেষ্ঠ সাধন।'

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণের ন্যায় সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অভিমানশূন্য হইয়া

সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিবে। বৃহস্পতিকল্প সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের কৃপায় ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া, নীলাচলবাসী কাশীমিশ্র প্রভৃতি বহু প্রধান পণ্ডিত চৈতন্যের পথাবলম্বন করিলেন। সার্ব্বভৌমের চেষ্টায় শ্রীমন্দিরের অদূরে কাশীমিশ্রের আলয়ে চৈতন্যদেবের বাসস্থান নির্ণীত হইল। কিছু দিন পুরী বাসের পর তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

তীর্থযাত্রা ও রায় রামানন্দ।– ১৫১০ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে[৭] চৈতন্যদেব তীর্থপর্য্যটন-মানসে দাক্ষিণাত্য-যাত্রা করেন। তিনি ক্রমে জিয়ড়-নৃসিংহ ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া কয়েক দিন পরে গোদাবরী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোদাবরীর নির্ম্মল জল দর্শনে বৃন্দাবন মনে হওয়ায়, তিনি নদীজলে সন্তরণ, অবগাহন ও জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এই স্থানের নাম বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রী। কিছুক্ষণ পরেই রামানন্দ রায় দোলারোহণে বহুসংখ্যক লোক-সমভিব্যাহারে স্নানার্থ নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামানন্দ করণবংশীয়, এবং গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজোপাধি ছিল। রামানন্দ সন্ন্যাসী দেখিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের মুখে রামানন্দের কথা শুনিয়াছিলেন; এক্ষণে এই রাজপুরুষকে প্রণাম করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারই নাম কি রায় রামানন্দ?' রাজপুরুষ উত্তর করিলেন, 'হাঁ, আমি সেই অধমই বটে।' তখন চৈতন্যদেব তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর মধ্যাহ্নাদি সমাপনান্তে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল।

চৈতন্য কহিলেন—সাধ্যবস্তু কি?

রামানন্দ কহিলেন—স্বধর্ম্মাচরণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

(৭) চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥ (চৈ, চ, মধ্য ৭ম)

শূদ্র এই চারি বর্ণের, ঋষিগণ যে যে আশ্রমধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই যাজনা করিয়া ভগবানের আরাধনা করার নাম স্বধর্ম্মাচরণ।

চৈতন্য কহিলেন—এ বাহিরের কথা, গূঢ় কথা বল।

রামানন্দ কহিলেন—ভগবানে কর্ম্মার্পণ, অর্থাৎ দানধর্ম্মাদি সকল কার্য্যের ফলই ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে।

চৈতন্য—এও বাহিরের কথা।

রামানন্দ—তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-নিরূপিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিসাধন করাই শ্রেয়ঃ।

চৈতন্য—ইহাও বাহিরের কথা।

রামানন্দ—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধনের সার। অর্থাৎ যাঁহার বিপদ সম্পদ শুভাশুভ সমজ্ঞান হইয়া চিত্ত নির্ম্মল ও প্রসন্নতা-লাভ হইয়াছে, তিনিই পরা ভক্তি লাভ করিয়াছেন।

চৈতন্য—ইহাও বাহিরের ধর্ম্ম, ইহার পর কি বল।

রামানন্দ—জ্ঞানবর্জ্জিত ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধনা। অর্থাৎ যিনি জ্ঞানানুসন্ধানে রত না হইয়া সাধুজন-প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করেন, ভগবান্ অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও, এরূপ লোকের নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

চৈতন্য—আর কি সাধন আছে?

রামানন্দ—প্রেমভক্তিই সাধনের সার। এইরূপ কথাবর্ত্তা-প্রসঙ্গে ক্রমশঃ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কান্ত রসের অবতারণা হইল, এবং 'মহাভাবই' সাধনার চরম অবস্থা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

চৈতন্য—যতদূর বলিলেন তাহাই সাধনার চরম অবস্থা বটে, কিন্তু ইহার পর যদি আর কিছু থাকে তবে বলুন।

রামানন্দ—ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে জগতে এমন লোক আছে বলিয়া জানিতাম না। কিন্তু সে কথা আছে—শ্রীরাধার প্রেমই

সাধনার পরের কথা। ইত্যাদি কথা-প্রসঙ্গে চৈতন্যদেব অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

রামানন্দের সহিত সক্ষাতের পর, চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শৈব ও রামাৎ সম্প্রদায়ের অনেককে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় বেঙ্কট ভট্টের আলয়ে চারি মাস কাল অবস্থান করিয়া তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে তিনি কতকগুলি বৌদ্ধকে স্বমতে আনয়ন করিয়া,[৮] দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে পর্য্যটন পূর্ব্বক অবশেষে দ্বারকা তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া, দণ্ডকারণ্যের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতঃ পুনরায় তিনি ভক্ত রামানন্দের স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। চৈতন্যদেব, রামানন্দ রায়কে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুরীধামে আসিতে বলিয়া, নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভক্তগণ বহুদিনের পর মহাপ্রভুকে পাইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

চৈতন্যদেব নীলাচলে আসিয়াই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে গৌড়দেশে পাঠাইয়া দিলেন, এবং শ্রীবাসকে ডাকিয়া কহিলেন, 'প্রিয় শ্রীবাস, মাকে আমার প্রণাম জানাইয়া এই বস্ত্রখানি ও মহাপ্রসাদ প্রদান করিবে। আমার আরও অনুরোধ যে, তুমি তাঁহার নিকট মিনতি করিয়া বলিবে—আমার সন্ন্যাস-গ্রহণ-রূপ অন্যায় আচরণ, এবং গৃহে থাকিয়া তাঁহার সেবা না করার অপরাধকে যেন ক্ষমা করেন। আমি নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি, মূর্খ সন্তানদিগের মাতার নিকট ক্ষমা পাইবার অধিকার আছে।'

এই সময়ে চৈতন্যদেবের খ্যাতি এত অধিক প্রচারিত হইয়াছিল যে, নরপতিগণও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিতেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না। একদিন উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেব, যাহাতে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পাইয়া

(৮) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদ।

কৃতার্থ হন, তাহার উপায় করিয়া দিবার জন্য সার্ব্বভৌমকে অনুরোধ করেন। সার্ব্বভৌমের প্রস্তাবে চৈতন্যদেব সম্মত না হইয়া কহিলেন, 'যে ব্যক্তি ভবসাগর-পারে গমনেচ্ছু তাহার স্ত্রীলোক ও সংসারভোগ-সুখ-রত ব্যক্তিকে বিষ অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর জ্ঞান করা উচিত।'

বৃন্দাবনপথে গৌড়দেশ —অনন্তর চৈতন্যদেব (১৫১৪ খৃঃ অঃ বিজয়া দশমীর দিন)[১] বৃন্দাবনে তীর্থগমনের জন্য পুরী হইতে যাত্রা করিলেন। গৌড়দেশ হইয়া, জননী ও জাহ্নবী দর্শন পূর্ব্বক, বৃন্দাবন যাত্রাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি প্রথমে পানিহাটী, পরে কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দ সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির বাটীতে উপনীত হইলেন। চৈতন্যদেব বাচস্পতির গৃহে আসিয়াছেন শুনিয়া নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্ত্তী নানাস্থান হইতে বহু লোক তাঁহার দর্শনাভিলাষে সমাগত হইল। বহু লোক সমাগত হওয়ায়, চৈতন্যদেব তথা হইতে রাত্রিযোগে অজ্ঞাতসারে কুলিয়া গ্রামে গমন করেন। এই কুলিয়া গ্রাম তৎকালে নবদ্বীপের পূর্ব্বপারে ছিল। চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে—

"সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥" (অন্ত্য, ৩য়)

চৈতন্য এখানে আসিয়াছেন শুনিয়া বহু লোক, পণ্ডিত ও ছাত্রগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই কুলিয়া গ্রামে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস ছিল; ভাগবত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, এবং জ্ঞান-মার্গেই তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ বিহারের সময় তিনি শ্রীবাসের নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন; এক্ষণে চৈতন্যদেবকে পাইয়া তাঁহার অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা পূর্ব্বক ভক্তিমার্গের পথিক হইলেন।

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

কুলিয়া গ্রামে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া, চৈতন্যদেব গঙ্গাতীর-পথে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন ভ্রমণের পর তিনি বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড়নগরের প্রান্তবর্ত্তী রামকেলি গ্রামে উপনীত হইলেন। তৎকালে পাঠান বংশীয় সায়দ হোসেন শাহ (১৪৯৪—১৫২২ খৃঃ অঃ) বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। চৈতন্যদেব তথায় উপস্থিত হইলে, নানাদেশীয় লোকে ঐ নগর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেখানে লোকের এত অধিক সমাগম হইয়াছিল, যে সেনাপতিকেও ভীত হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা যখন জানিলেন যে, একজন সন্ন্যাসী দর্শনে এই লোক-সমাগম হইয়াছে, তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন।

রূপ ও সনাতন।—দবিরখাস ও সাকর মল্লিক নামক দুই ভ্রাতা গৌড়ের বাদশাহের উজীরি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা চৈতন্যদেবের নাম ও গুণগ্রাম শ্রবণে মোহিত হইয়া, রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে দন্তে কুটা করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে চৈতন্য-সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং চৈতন্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে জগাই-মাধাই-ত্রাতা পতিত-পাবন, আমাদের প্রতি দয়া করুন। জগাই মাধাই নবদ্বীপ-নিবাসী ব্রাহ্মণ-কুমার ছিলেন, তাঁহাদিগকে সহজেই উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু আমরা ম্লেচ্ছ-জাতীয় ও ম্লেচ্ছ-সঙ্গী বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা করিবেন না। হে দয়াময়, আমাদিগকে ত্রাণ করুন।' তখন দয়াময় শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাদিগের নাম রূপ ও সনাতন রাখিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে এই দুই জনের যেরূপ পরিচয় আছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে আপাততঃ ম্লেচ্ছ বংশোদ্ভূত বলিয়াই অনুভূত হয়। কিন্তু শ্রীজীব-কৃত লঘুতোষিণী গ্রন্থে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। যাহা হউক, তাঁহারা ম্লেচ্ছসংসর্গে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

চৈতন্যদেবের সহিত অত্যন্ত লোক-সংঘট্ট হওয়ায়, এই লোকসংঘ-সহ বহু দূরপথে তাঁহার বৃন্দাবন গমন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি এ যাত্রা বৃন্দাবন দর্শনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া একবার জননী ও জন্মভূমিকে দর্শন করিয়া শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বৃন্দাবন যাত্রা।—বর্ষার চারিমাস শ্রীক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়া, চৈতন্যদেব একমাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সমভিব্যাহারে অরণ্যপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে উড়িষ্যার উত্তর-পশ্চিমে ঝারিখণ্ডের কতক-গুলি নীচ-জাতীয় ম্লেচ্ছ ও ভীলকে[১০] তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া-ছিলেন।

কয়েক দিবস দিবারাত্র চলিয়া তিনি কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়া, তিনি প্রয়াগে উপস্থিত হন, এবং তথায় কিছু দিন থাকিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া, তিনি সকলই কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন; এবং কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া তিনি বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন চৌরাশী ক্রোশ বিস্তৃত। এখন যে স্থানকে বৃন্দাবন কহে, তাহা চৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরগণের প্রকাশিত। যে স্থানে এখন গোবিন্দজীর মন্দির দৃষ্ট হয়, তাহা তাঁহারই আবিষ্কৃত। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির ধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করেন বলিয়া তাঁহার আগমন সময় হইতে বৃন্দাবন একটী তীর্থ হইয়াছে।

বৃন্দাবনে কিছু দিন থাকিয়া তিনি পুনরার প্রয়াগে আগমন করিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি পাঠান মুসলমানকে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পাঠানদিগকে বৈষ্ণব করা তাঁহার অতিশয় সাহসের কার্য্য হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসে এই রূপ ঘটনা আর দেখা যায় নাই। এই পাঠানসকল সর্ব্বত্র হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া হরিনাম

(১০) মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড। ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥
নাম প্রেম দিয়া কৈল সভার নিস্তার। চৈতন্যের গূঢ় লীলা বুঝে শক্তি কার॥ (চৈ,চ, মধ্য)

প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহারা পাঠান বৈষ্ণব[১১] বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তথায় রূপ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। রূপ ও সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণাবধি রাজসংসারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রূপ চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন যাত্রা শ্রবণ করিয়া সমস্ত সম্পদ্ স্বীয় বৈষ্ণব-স্বজনদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রয়াগে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এখান হইতে চৈতন্যদেব কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তপন মিশ্রের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন।

প্রকাশানন্দ স্বামী—কাশীধামে অবস্থান কালে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিশিতেন না। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ ঘোর মায়াবাদী; তাঁহারা চৈতন্যদেবের হরিসংকীর্ত্তন দেখিয়া সকলেই তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের সভায় সর্ব্বদা আত্মশ্লাঘা ব্যতীত কোন সৎপ্রসঙ্গ হইত না; এই জন্য চৈতন্যদেব তাঁহাদের নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন। তিনি ঐ সকল নিন্দাবাদ শুনিয়াও কোন উত্তর করিতেন না। কিন্তু তাঁহার ভক্ত তপন মিশ্র, মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র প্রভৃতি ঐ নিন্দা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথা পাইতেন। অবশেষে একদিন, প্রভুনিন্দা শ্রবণে বিদীর্ণ-হৃদয় মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র চৈতন্য-চরণে তাঁহার মনোবেদনা নিবেদন করিতেছেন, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া চৈতন্যকে বলিলেন, 'আমি আজ কাশীবাসী সমস্ত সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমার বাটীতে পদধূলি দেন ইহাই আমার প্রার্থনা।' চৈতন্যদেব এইরূপ নিমন্ত্রণ অনেক বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; কিন্তু এই নিমন্ত্রণ এবার গ্রহণ করিলেন।

(১১) পাঠান বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥ (চৈ, চ, মধ্য ১৮)

কাশীবাসী দণ্ডিগণ যখন শুনিলেন যে, এই সভায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিমন্ত্রণ আছে, তখন তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য কাশীস্থ সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ নিমন্ত্রণ-স্থানে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশানন্দ স্বামী সভামধ্যে বসিয়া প্রগল্‌ভতা করিতেছেন। চৈতন্যদেব নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিপ্রভবনে উপস্থিত হইয়া, উপস্থিত সন্ন্যাসিবর্গকে নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পাদ-প্রক্ষালন স্থানে উপবেশন করিলেন। চৈতন্যের অলোকসামান্য রূপ-লাবণ্য ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া, সন্ন্যাসিগণ আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদিগের প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী চৈতন্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, 'শ্রীপাদ সভামধ্যে আসুন, আমাদের সহিত একাসনে উপবেশন করুন। এই অপবিত্র পাদপ্রক্ষালন স্থান আপনার আসনযোগ্য নহে!' বিনয়ের মূর্ত্তি মহাপ্রভু কহিলেন, 'আমি হীন সম্প্রদায়, আপনাদের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য নহি।' চৈতন্যের এই বিনয়নম্র বচনে মোহিত হইয়া প্রকাশানন্দ স্বামী তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সভামধ্যে বসাইয়া কহিলেন, 'তুমি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, এই স্থানেই আছ, অথচ আমাদিগের সহিত আলাপ কর না। বেদান্তপাঠ সন্ন্যাসীর ধৰ্ম্ম, তুমি তাহা পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদের ন্যায় সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছ কেন?' চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন, 'আমার গুরু আমাকে মূর্খ জানিয়া এই উপদেশ দিয়াছেন, যে তোমার বেদান্তে অধিকার নাই। কলিতে নাম জপই সার, তুমি কেবল কৃষ্ণনাম জপ কর, কৃষ্ণনাম জপ ও কৃষ্ণভক্তি করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। এই বলিয়া তিনি বৃহন্নারদীয় পুরাণের—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই বচন আমাকে উপদেশ দিলেন। আমি সেই গুরুর আদেশে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া থাকি, সেই নাম জপ করিতে করিতে আমি পাগল

হইয়াছি।' এই বলিয়া চৈতন্যদেব হরিনামের মহিমা-সূচক এক অপূর্ব্ব বর্ণনা করিলেন; এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে যেরূপে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরমহংসদিগকে চমৎকৃত করিলেন। তখন প্রকাশানন্দ বেদান্তের প্রকৃত অর্থ কি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, চৈতন্যদেব তাঁহাকে, ব্রহ্মই যে পরমতত্ত্ব একমাত্র উপাস্য, জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, ইত্যাদি সম্বন্ধ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসিগণ তাঁহার সেই অলৌকিক ব্যাখ্যা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া হরিধ্বনি পূর্ব্বক চৈতন্যের সহিত প্রেমরসে মত্ত হইলেন।

এক দিন চৈতন্যদেব বিন্দুমাধবের মন্দিরে হরিসংকীর্ত্তনে নিমগ্ন হইয়া নৃত্য করিতেছেন, সেই সময়ে প্রকাশানন্দ স্বামী সশিষ্য আসিয়া দর্শন ও শ্রবণে পুলকিত হইয়া চৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন। চৈতন্য অমনি নৃত্য বন্ধ করিয়া ব্যস্ততাসহকারে কহিলেন, 'আপনি আমার পূজনীয়, আমি আপনার শিষ্যেরও যোগ্য নহি; আমার প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণ করিয়া কেন আমাকে অপরাধী করিলেন?' প্রকাশানন্দ কহিলেন, 'আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, লোক নিস্তারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। পূর্ব্বে না জানিয়া নিন্দা করিয়া অপরাধ করিয়াছি, মার্জ্জনা করুন।' চৈতন্যদেব কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন, 'বিষ্ণু বিষ্ণু, আমি জীবাধম, আপনি জগদ্-গুরু, এমন করিলে আমার অপরাধ হয়।' অতঃপর উভয়ে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। সমস্ত কাশীপুরী হরিপ্রেমে টলমল করিতে লাগিল।

এই প্রকাশানন্দ স্বামীই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'প্রবোধানন্দ সরস্বতী' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, রাধারসসুধানিধি, বৃন্দাবনশতক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

এইরূপে কাশীতে হরিনামের ধ্বজা তুলিয়া চৈতন্যদেব পুনরায় নীলাচলে যাত্রা করিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব ছয় বৎসর কাল এইরূপে ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। এখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। অবশিষ্ট আঠার বৎসর কাল তিনি কেবল শ্রীক্ষেত্রেই অবস্থান করিয়াছিলেন। নিতাই ও অদ্বৈতকে পূর্ব্বেই তিনি গৌড়দেশে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এক্ষণে রূপ ও সনাতনকে বৃন্দাবনে ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরণ করিলেন। এখানে তিনি কেবল ক্রন্দন ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন, এবং অনুচরদিগকে ধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ দিতেন। চৈতন্যের সময় হইতে প্রতি বৎসর নানাদেশীয় বহু যাত্রী জগন্নাথদেব ও তাঁহাকে দর্শনার্থে তথায় সমাগত হইতেন। ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী বহু লোকও তাঁহাদের সহিত আগমন করিতেন। এক দিবস চৈতন্যদেব প্রত্যূষে সার্ব্বভৌমকে জাগাইয়া কহিলেন, 'এই মহাপ্রসাদ আনিয়াছি গ্রহণ করুন।' মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সার্ব্বভৌম তৎক্ষণাৎ তাহা ভক্ষণ করিলেন। তদবধি শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালে কোন ধর্ম্মপরায়ণ পবিত্র ব্রাহ্মণ কোন অপবিত্র চণ্ডাল-প্রদত্ত জগন্নাথদেবের অন্ন মহাপ্রসাদ গ্রহণ বা ভক্ষণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে স্পর্শদোষ বা উচ্ছিষ্ট বিচার নাই।

এই সময়ে সনাতন চৈতন্যদর্শনে বৃন্দাবন হইতে আগমন করেন। পথিমধ্যে তিনি অতি ঘৃণিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। তিনি নীলাচলে উপস্থিত হইয়া এই ঘৃণিত অবস্থায় চৈতন্যের সম্মুখে গমন করা অপকর্ম্ম বিবেচনা করিলেন, এবং রথাগ্রে নৃত্যপরায়ণ মহাপ্রভুকে দূর হইতে শেষ দর্শন করিয়া, জগন্নাথদেবের রথচক্রে প্রাণত্যাগ করিবেন এইরূপ বাসনা করিয়া হরিদাসের আশ্রমাভিমুখে যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে চৈতন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সনাতনকে দৃষ্টিমাত্রেই তিনি ব্যগ্রতাসহকারে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। সনাতন সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিয়া কহিলেন, 'প্রভু, আমাকে স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি নীচ, তাহাতে আবার অতি ঘৃণিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছি, আমাকে ক্ষমা

করুন।' চৈতন্যদেব তাহা না শুনিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং কহিলেন, 'তোমার দেহ আমার পক্ষে অতি পবিত্র, ঘৃণা করিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে।' পরে চৈতন্য দিব্য জ্ঞান-প্রভাবে সনাতনের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, 'যদি দেহত্যাগ করিলে কৃষ্ণ পাওয়া যায়, তবে নিমেষের মধ্যে কোটি কোটি দেহত্যাগ করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ভক্তি ও ভজন।' এইরূপে সনাতনকে বহুবিধ উপদেশ দিয়া কিছুদিন কাছে রাখিলেন, পরে বুঝাইয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। চৈতন্যদেবের স্পর্শে সনাতন রোগমুক্ত হইয়াছিলেন।

চৈতন্যের সন্ন্যাসের নিয়ম অতি কঠোর ছিল। তিনি স্ত্রীলোকদিগের ছায়াও স্পর্শ করিতেন না; এবং তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে কেহ করিলেও তাহা সহ্য করিতেন না। একদিন নীলাচলে তিনি যমেশ্বর টোটায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে স্ত্রীকণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর গীতগোবিন্দের পদ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া যেদিক হইতে কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল সেই দিকে তিনি ধাবমান হইলেন। তিনি যেমন স্ত্রীলোকটীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি সহচর গোবিন্দ দাস বলিয়া উঠিলেন 'স্ত্রীলোক'। চৈতন্য এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ও তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'আজ তুমি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ, আর একটু বিলম্ব করিলেই আমি ধর্ম্মচ্যুত হইতাম।'

একদিন ছোট হরিদাস প্রভুর সেবার নিমিত্ত পরমবৈষ্ণবী প্রাচীনা মাধবী দাসীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব এই কথা শুনিয়া ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করেন। ছোট হরিদাস এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, চৈতন্য তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণে মোহিত

হইতেন। চৈতন্যদেবের আদেশে ছোট হরিদাস বর্ত্তমান 'খোল' যন্ত্রের সৃষ্টি করেন।

শ্রীক্ষেত্রে হরিদাস ঠাকুর চৈতন্যদেবের প্রিয় সহচর ছিলেন। তাঁহার স্বভাব চৈতন্যের দৃষ্টান্তস্থল ছিল। হরিদাস ঠাকুর পুরীধামে মহাপ্রভুর বাসস্থানের নিকটে 'সিদ্ধবকুল মঠে' বাস করিতেন। মহাপ্রভুর সম্মুখেই তিনি নাম করিতে করিতে দেহপাত করেন। মহাপ্রভু প্রিয় ভক্তকে স্বহস্তে সমুদ্রতীরে স্বর্গদ্বারে সমাহিত করিয়া, স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া তাঁহার বিরহ-মহোৎসব সম্পন্ন করেন। সেই সমাধি পুরীধামে হরিদাস ঠাকুরের মঠ নামে পরিচিত।

পুরীধামে অবস্থান কালে, স্বরূপ-দামোদর, রায় রামানন্দ, গদাধর পণ্ডিত, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, শঙ্কর পণ্ডিত, গোবিন্দদাস, পণ্ডিত জগদানন্দ এবং হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতির সহিত চৈতন্যদেব অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। গৌড় হইতে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, রাঘব পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, এবং কুলীন গ্রামবাসী ভক্তগণ প্রতিবৎসর তাঁহাকে দেখিতে রথযাত্রার সময় শ্রীক্ষেত্র যাইতেন, এবং চারি মাসকাল মহাপ্রভুর সঙ্গসুখ উপভোগ করিয়া গৃহে ফিরিতেন। সমস্ত ভক্তসঙ্গে মহাপ্রভু রথাগ্রে নর্ত্তন ও কীর্ত্তন করিতেন, এবং তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিতেন। মহাপ্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের প্রবর্ত্তক।

মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অভ্যাস মত তিনি স্নান, ভোজন এবং জগন্নাথ দর্শন করিতেন; কিন্তু সর্ব্বদাই বৃন্দাবন-স্ফূর্ত্তি ভিন্ন তাঁহার মনে আর কোন চিন্তা স্থান পাইত না। তিনি জগন্নাথে সাক্ষাৎ মুরলী-বদন দর্শন করিতেন, নীল নির্ম্মল সলিল দেখিলেই তাঁহার যমুনা ভ্রম হইত, উচ্চ ভূমি দেখিলেই গোবর্দ্ধন মনে হইত, উপবন দেখিলেই বৃন্দাবন জ্ঞান হইত, এবং সকল স্থানেই তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল বিলাস দর্শন করিতেন। কোন রূপে বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিলেই এই

স্ফূর্ত্তির অভাব হেতু বিরহ-বেদনায় তিনি আকুল হইয়া পড়িতেন। তিনি যে কথা বলিতেন তাহা রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা,—স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত সারা রাত্রি জাগিয়া গম্ভীরার নিভৃত প্রকোষ্ঠে এই কথারই আলোচনা হইত। কখন প্রভাত হইত কাহারও সে জ্ঞান থাকিত না। দূরশ্রুত মধুর শব্দ মাত্রকেই তিনি কৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনি বলিয়া মনে করিতেন। এই ভাবে কৃষ্ণ-বিরহোৎকণ্ঠায় তাঁহার দিন যাপন হইতে লাগিল।

এই সময়ে চৈতন্যদেবের প্রেম-বিহ্বলতা এতদূর বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল যে, একদা তিনি নিশীথ কালে পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্ররশ্মি-বিভাসিত সুনীল জলধি-বক্ষ দেখিয়া যমুনায় রাধাকৃষ্ণের জলকেলি মনে করিয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন। কিন্তু তপঃকাষ্ঠা হেতু কৃশ ও লঘুকায় হওয়ায় তিনি ভাসিয়া উঠেন, এবং এক ধীবরের জালে পড়িয়া তীরে উত্তীর্ণ হন। এদিকে সহচরগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করেন এবং ধীবরের মুখে শুনিয়া, অনুচরগণ গিয়া দেখেন যে, চৈতন্যদেব স্পন্দ-হীন হইয়া পড়িয়া আছেন। তখন সকলেই তাঁহার কর্ণমূলে হরিনাম শুনাইতে লাগিলেন। অমনি চৈতন্যদেবও হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ঐ দিবস ধীবরের জালে না পড়িলে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইত না।

চৈতন্যের এত যে মত্ততা তথাপি তিনি মাকে ভুলেন নাই। তিনি বৎসর বৎসর মাকে মহাপ্রসাদ ও বস্ত্র পাঠাইয়া দিতেন, এবং মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।

ক্রমেই তাঁহার প্রেম-বিরহোন্মাদ বৰ্দ্ধিত হইল। ইদানীং তাঁহার আর বড় জ্ঞান থাকিত না। তিনি কাহার সহিত বড় কথা কহিতেন না ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে তিনি এক দিবস ভক্তগণ-বেষ্টিত হইয়া বৃন্দা-বনের কথা কহিতে কহিতে নীরব হইলেন এবং উঠিয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। ভক্তগণও নীরবে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

চৈতন্যদেব মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। দ্বারোদ্ঘাটিত হইলে তাঁহাকে আর দেখা গেল না। এইরূপে বঙ্গজ-কুলতিলক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের জীবন-লীলা ১৪৫৫ শকের (১৫৩৩ খৃঃ অঃ) আষাঢ় মাসে পর্য্যবসিত হইল। নবদ্বীপের অকলঙ্ক চন্দ্র ৪৮ বৎসর সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া অস্তমিত হইলেন।[১২]

চৈতন্যের ধর্ম্ম-মত।—চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকেই পরমব্রহ্ম বলিতেন। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—তিনি সর্ব্বকারণের কারণ পরমেশ্বর। তাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ধ্বংস নাই। তিনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে, সৃজন পালন সংহার করেন; এবং পৃথিবীর ভারমোচন ও প্রজাপালনার্থে যুগে যুগে পূর্ণাবতার অংশাবতার প্রভৃতি অনন্তরূপ ধারণ করিয়া অনন্তলীলা প্রকাশ করেন।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ অসাধারণ প্রীতি ও অনুরাগ দেখাইয়া গিয়াছেন যে অবনি-মণ্ডলে এ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মসংস্কারক আপন উপাস্যদেবের প্রতি তাদৃশ প্রগাঢ় প্রীতি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি নিরাকারবাদী ছিলেন, কিন্তু মূর্ত্তির ভিতর দিয়া পরমব্রহ্মের অনন্তগুণ ও মহিমা দর্শন করিতেন। ইহাতে তাঁহাকে সাকারবাদীও বলা যায়। বলিতে গেলে পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত এমন কোন ধর্ম্ম প্রচলিত হয় নাই, যাহার ভিতর এইরূপ সাকারবাদিতা নাই।

তাঁহার মতে ভগবানে প্রেম-ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন। তাহার অনুষ্ঠানে যাবতীয় ধর্ম্মের ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। তিনি নীরস জ্ঞানকাণ্ড

(১২) চৈতন্যদেবের তিরোভাব সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে।
১৪৫৫ শক ৩১এ আষাঢ় শুক্লা সপ্তমী রবিবার (১৫৩৩ খৃঃ ২৯এ জুন) মহাপ্রভুর তিরোভাব তিথি। (চৈতন্য-জাতক—পৃঃ ১৮)

ও কর্ম্মকাণ্ডকে, ভক্তিরসে ডুবাইয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন গ্রন্থ বা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা ভক্তিপথ দেখান নাই। কেবল সমস্ত জীবনে নিজে আচরণ করিয়া ভক্তির লক্ষণ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

অর্থাৎ, তৃণের ন্যায় বিনম্র, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও আপনি অভিমান-শূন্য হইয়া অপরকে মান দান করিয়া সর্ব্বদা হরিসংকীর্ত্তন করিবে—তিনি আজীবন এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিনয়ী ও প্রমত্ত ভক্ত আর দেখা যায় না। তাঁহার এই অসাধারণ বিনয় ও দুর্জয় ভক্তির প্রভাবে সকলেরই জ্ঞান-গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যাইত ও সকলেই তাঁহার মতাবলম্বী হইতেন। তিনি বাক্যে যাহা বলিতেন, কার্য্যেও তাহাই করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"শুচিসদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নি দগ্ধ দুর্জাতি কল্মষঃ।
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোহপি নাস্তিকঃ॥"

সদ্ভক্তিরূপ পবিত্র দীপ্তাগ্নি দ্বারা যাহার দুর্জাতি জন্য পাপ নষ্ট হইয়াছে এমন চণ্ডালও জ্ঞানী লোকের আদরণীয়, আর ভক্তিশূন্য নাস্তিক যদি বেদজ্ঞ হয় তথাপি সে আদরের পাত্র নহে।

"নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যোযথাহ্যহং॥"

একজন অবিশ্বাসী চতুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও আমার ভক্ত হয় না, কিন্তু একজন বিশ্বাসী চণ্ডালও আমার প্রিয়পাত্র। তাঁহাকে দান করিবে ও তাঁহার দান গ্রহণ করিবে। তিনি আমার পূজ্য। চৈতন্য আপন জীবনে আচরণ দ্বারা এই ভগবদ্ভক্তির পালন করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বজাতীয় লোকেই প্রেমভক্তির অধিকারী। কি হিন্দু, কি ম্লেচ্ছ,

কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, সকল লোকেই প্রেম-ভক্তির অনুষ্ঠানে সমর্থ। ভগবানকে একান্ত প্রেম, ভক্তি ও অনুরাগ ভরে ভজনা না করিলে তিনি কখনই জীবসমূহের পক্ষে সুলভ নহেন। তিনি রস বা ভাববিশেষের বশীভূত। সেই রস বা ভাব পঞ্চ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কান্ত।

শান্ত—শান্তরসটী ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রথম রস। ইহা সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয়। সনক-সনাতনাদি এই রসের উপাসক ছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া যখন পরব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেন তখন শান্তরস উপভোগ করিতেন। ইহাতে পরব্রহ্মের সহিত সাধকের কোন সম্বন্ধ নাই।

দাস্য—দাস্যরসটী দ্বিতীয় রস। হনুমান এই রসের উপাসক। এই রসে ভগবান আমার প্রভু ও আমি তাঁহার দাস এইরূপ একটী সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। উহাতে শান্তরসের সমস্ত সম্পদ ও মমতারূপ আর একটী রস লক্ষিত হয়। অতএব শান্ত হইতে দাস্য প্রধান।

সখ্য—দাস্য হইতে সখ্য প্রধান। ভীমার্জ্জুন ও উদ্ধব এই রসের উপাসক। ইহাতে দাস্যরসের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্যতীত বিশ্বাসরূপ আর একটী অতিরিক্ত গুণ দৃষ্ট হয়।

বাৎসল্য—সখ্য হইতে বাৎসল্য প্রধান। সকল ভুলিয়া ঈশ্বরকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে পারাই সাধনশ্রেষ্ঠ। নন্দ যশোদা এই রসের উপাসক ছিলেন। ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী সকল রস দৃষ্ট হয়।

মধুর বা কান্তভাব—এই রস সকল রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সতী স্ত্রী যেমন প্রিয় পতিকে দেহ মন প্রভৃতি সর্ব্বাবয়ব দ্বারা আত্ম-সমর্পণ করেন, তেমনি ভাবে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহাতে শান্তরসের অচঞ্চলতা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের স্নেহ এবং কান্তের আত্মসমর্পণ সকলই আছে। অতএব সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে

এই কান্তভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই রসে পূর্ব্ববর্ণিত সকল রস পূর্ণভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে। চৈতন্যদেব এই রসের উপাসক ছিলেন।

ইতিহাসে চৈতন্যদেবকে বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্কারক বলা হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বেও চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি তন্মধ্যে মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের অবলম্বিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের নিত্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কৃষ্ণপূজা ও বিগ্রহসেবা প্রচলিত থাকিলেও, রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তির সেবা ও পূজা প্রচলিত ছিল না। বঙ্গদেশে পূজিত অনেক প্রাচীন বিগ্রহের বামে রাধা-ঠাকুরাণী পরে স্থান পাইয়াছেন। চৈতন্যদেব শ্রীমতী রাধিকার পরকীয়া ভাবে কৃষ্ণ সেবার আদর করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রচারিত উপাসনা-পদ্ধতিকে 'রাগমার্গে পরকীয়া ভাবে' উপাসনা বলা হয়। রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা পরম সাধ্য বস্তু। তাঁহার মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' নামে পরিচিত।

সমস্ত প্রধান ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, পরমার্থ-তত্ত্ব আদিকাল হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া আসিতেছে, এবং ভাগীরথী-তীরে নবদ্বীপ নগরে শ্রীচৈতন্যদেবে ঐ পরমধর্ম্ম চরম উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইলে, তৎকালে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু জাতি, বিশেষতঃ বাঙ্গালী এবং বঙ্গভাষার অবস্থা কিরূপ হইত তাহা বলা যায় না। একদিকে বিজেতা মুসলমান জাতির সভ্যতা, লোভনীয় নবাগত মুসলমান ধর্ম্ম, মুসলমান রাজ-সরকারে উচ্চ পদপ্রাপ্তির প্রলোভন, এবং প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা—জাতিকে ক্রমাগত মুসলমান ধর্ম্ম এবং উদার মুসলমান সমাজের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। অন্যদিকে হিন্দুধর্ম্মের কঠোরতা, জাতিভেদের নির্ম্মম অত্যাচার, ব্রাহ্মণের অসাধারণ প্রতিপত্তি, এবং স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্ভাবিত নব নব বিধি, জাতিকে ক্রমশঃই বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে লাগিল। চারিদিকে সঙ্কীর্ণতা জাতিকে দুর্ব্বল করিতে লাগিল।

জাতির মধ্যে অবাধ শিক্ষার প্রচলন না থাকায়, মুষ্টিমেয় সংস্কৃতজ্ঞ লোকই ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিবার অধিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহ লেখাপড়া জানিতেন না বলিলেই হয়। তখন ধর্ম্মশাস্ত্র-সকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইত—কাজেই জনসাধারণকে ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষা করিতে হইত। তাঁহারাও উদার ধর্ম্মশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া শূদ্র স্ত্রী প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার নাই বলিয়া প্রচার করিতেন। এইরূপে গুণ অপেক্ষা জন্মের গৌরব অধিক হইয়া পড়িল; ধর্ম্মশাস্ত্র এক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া হইল। অপর দিকে তন্ত্রের নামে ঘৃণ্য আচরণ লোককে মনুষ্যত্বহীন করিতে লাগিল; ধর্ম্মের নামে ভৈরবীচক্রের মধ্যে অবাধে দুষ্ক্রিয়া ও ব্যভিচারের শ্রোত বহিতে লাগিল। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া দেশ, জাতি ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার মহৎ চরিত্র, আদর্শ উদার ব্যবহার, আপামর-সাধারণে সমজ্ঞান, আচণ্ডালে সমান প্রীতি এবং গুণবান শূদ্র—এমন কি যবনেরও আদর—দেশের সমক্ষে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল। তাঁহার সরল অনাড়ম্বর ধর্ম্মাচরণ, কলিযুগে হরিসঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র ধর্ম্ম—এই উপদেশ, দেশবাসী সাগ্রহে শিরোধার্য্য করিয়া লইল। ঘরে ঘরে করতালিযোগে হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোল উঠিল। হরি বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রীতিভরে যবনকে কোল দিল, দুঃখ শোক ও উচ্চনীচ ভেদ সকলে ভুলিয়া গেল। এই ভাবে বাঙ্গালা দেশে আর এক প্রেম-সুরধুনী প্রবাহিত হইল; সেই প্রবাহে বঙ্গদেশ হইতে অধর্ম্ম-অনাচারের আবিলতা দূর হইয়া গেল।

গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ।—গৌরাঙ্গের প্রকট কালেই নানাস্থানে তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সেই বিগ্রহের সেবা-পূজা হইত। ঢাকা দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ, বোধ হয়, সর্ব্বপ্রাচীন; তৎপরে কল্‌নায় গৌরীদাস পণ্ডিত নিতাই-গৌর বিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠিত করেন। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

আছে তাহা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সংস্থাপিত। গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের পর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া গৌরাঙ্গের পাদুকা পূজা ও বৃদ্ধা শ্বশ্রূ শচীদেবীর সেবাশুশ্রূষা করিতেন। তাঁহার সেবায় শচীমাতার অপত্য-বিরহ অনেকাংশে প্রশমিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শচীদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৩৩৫ শকে (১৫১৩ খৃঃ অঃ) রচিত গৌরাঙ্গ-সহচর মুরারি গুপ্তের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতে' অবগত হওয়া যায় যে. চৈতন্যদেবের প্রকটকালেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কৃষ্ণজ্ঞানে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।[১৩] বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহত্যাগের পর তাঁহার ভ্রাতা মাধবাচার্য্য ঐ সেবার অধিকারী হন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ ঐ মূর্ত্তির সেবা করিয়া আসিতেছেন। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন নরপতি বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্য কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের একটী প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই মন্দির গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে, সেবকগণের প্রতিগৃহে পর্য্যায়ক্রমে গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ নীত ও পূজিত হইতে থাকেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তোতারাম দাস বাবাজি মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বর্ত্তমান স্থানে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের বাস-মন্দির প্রস্তুত হয়। এই মন্দিরের দ্বারদেশে নীলবর্ণের যে কষ্টি প্রস্তর-খণ্ড (Blue basalt) দৃষ্ট হয়, তাহা বীর হাম্বীর-নির্ম্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে আনীত হইয়াছিল।

শ্রীখণ্ড ও কাটোয়ায় সেবিত গৌরাঙ্গ-বিগ্রহদ্বয়ও তাঁহার প্রকট কালেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত ভারতের নানাস্থানে গৌরাঙ্গের

(১৩) প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্ত্তিম্।
বিধায় তস্যাং স্থিত এব কৃষ্ণঃ সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্॥
(মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে ৪র্থ প্রক্রম, ১৪শ সর্গ)

নবদ্বীপস্থ গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের পাদপীঠে ১৪৩৫ শক খোদিত আছে।

ক্ষত বিগ্রহ পূজিত হইতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল গৌরাঙ্গ নহেন, তাঁহার সঙ্গে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যও ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজিত হইতেছেন।

চৈতন্যদেবের ভক্তগণ ও গ্রন্থাবলী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে চৈতন্যদেব মহাপ্রভু নামে অভিহিত, এবং অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভু পদবাচ্য। বৈষ্ণবগণ সকল কার্য্যের প্রারম্ভে তিন প্রভুর পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সহিত শ্রীবাস ও গদাধর পণ্ডিতকে লইয়া পঞ্চতত্ত্ব হয়। রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট—এই ছয় জন গোস্বামী পদবাচ্য, এবং ইঁহারাই এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য।

অদ্বৈতাচার্য্য।—শ্রীহট্টের অন্তর্গত নবগ্রামের আদিনিবাসী বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ কুবের পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য্যের পিতা এবং কুবেরপত্নী নাভাদেবী তাঁহার মাতা। বৃদ্ধ বয়সে ব্রাহ্মণদম্পতীর এক পুত্র সন্তান হয়, তাহার নাম কমলাক্ষ। কুবের কমলাক্ষের শৈশবাবস্থাতেই গঙ্গাস্নানার্থে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। কমলাক্ষের বাল্যকালেই তাঁহার পিতা মাতা শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। তদনন্তর কমলাক্ষ পিতৃ-কৃত্য সাধন-উদ্দেশ্যে গয়াধামে গমন করিয়া পিতৃকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক, নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে বিদ্যাবুদ্ধিতে তিনি পরম পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। শান্তিপুর-নিবাসী নৃসিংহ ভাদুড়ী তাঁহার সদ্গুণে মোহিত হইয়া স্বীয় তনয়া শ্রীদেবী ও সীতাদেবীর সহিত কমলাক্ষের বিবাহ দেন। বিবাহের পর তিনি শান্তিপুরে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। কমলাক্ষ পরম ভক্ত—তিনি শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থেরই অধ্যাপনা করিতেন।

তিনি ভক্তিপক্ষে এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিতেন যে, ছাত্রগণ সেই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে ভাবে বিমোহিত হইয়া পড়িতেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার ভগবৎপরায়ণতার সুখ্যাতি চারিদিকে সুপ্রচারিত হয়। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বর হইতে অভেদে পূজা ও ভক্তি করিত, এই জন্য তাঁহার নাম অদ্বৈত হয়। পরে তিনি কমলাক্ষ নাম অপেক্ষা অদ্বৈত নামেই বিখ্যাত হন। অধ্যাপনা উপলক্ষে তিনি নবদ্বীপে বাস করেন। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়া, বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ ও ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি চারিদিকে ভক্তিহীন ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অধর্ম্ম বিনাশহেতু ভগবান শীঘ্রই জগতে অবতীর্ণ হইবেন।

জগন্নাথ মিশ্রের সহিত অদ্বৈতের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ অদ্বৈতের নিকট ভাগবতাদি অধ্যয়ন করিতেন, এবং তাঁহার উপদেশেই বিশ্বরূপের বৈরাগ্য জন্মে। গৌরাঙ্গের জন্মকালে অদ্বৈত-পত্নী সীতা দেবী সূতিকা-গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নাম নিমাই রাখেন। চৈতন্যের জীবনে অদ্বৈতের প্রভাব এত অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় যে, চৈতন্যদেব অদ্বৈতকে গুরুবুদ্ধি করিতেন।

যবন হরিদাসকে তিনি শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রামে আশ্রয় দিয়া, যথেষ্ট সমাদর করেন, এবং তাঁহার উপদেশেই হরিদাস নবদ্বীপে আসিয়া গৌরাঙ্গের দর্শন লাভ করেন।

অদ্বৈত অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন, চৈতন্যের তিরোভাবের পরও তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তদ্বংশীয়গণের অধিকাংশ শান্তিপুরে বাস করিতেছেন, এবং এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে তাঁহারা প্রভু-সন্তান বলিয়া আদৃত হয়েন ও তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে।

নিত্যানন্দ।—বীরভূমের অন্তর্গত সাঁইথিয়ার নিকটবর্ত্তী একচাকা গ্রাম নিত্যানন্দের জন্মভূমি। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হাড়ো ওঝা তাঁহার পিতা,

এবং পদ্মাবতী তাঁহার মাতা ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ দম্পতী পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। এক দিন এক সন্ন্যাসী অতিথি হইয়া তাঁহাদের নিকট নিত্যানন্দকে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। জনক-জননী অতিথির অবমাননা করা অধর্ম্ম বিবেচনায়, অতিথির হস্তে আপন প্রিয় পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর প্রতি বঙ্গবাসীর কিরূপ বিশ্বাস ছিল দেখুন। তাহারা ধর্ম্মের অনুরোধে পুত্রকেও বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বালক নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সহিত নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া কিছু দিন মথুরায় অবস্থান করেন। নিতাই তথায় গৌরাঙ্গের ভক্তির কথা শুনিয়া নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন।

১৪৩৪ শকে (১৫১২ খৃঃ অঃ) চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচারে প্রেরণ করেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যের আদেশমতে প্রথমে পানিহাটী পরে নবদ্বীপাদি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সপ্তগ্রামে অবস্থিতি করেন। তিনি অবধূত সন্ন্যাসী ছিলেন, সুতরাং সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসোচিত ব্যবহার ছিল না। তিনি মাল্যচন্দন ধারণ, তাম্বুল ভক্ষণ ও কৌপীন পরিত্যাগ করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন। এই কারণে অনেকে তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হন। নবদ্বীপের কোন ব্রাহ্মণ শ্রীক্ষেত্রে নিত্যানন্দের এই আচরণের বিষয় চৈতন্যদেবকে জ্ঞাত করায়, চৈতন্যদেব উত্তর করেন—

শুন বিপ্র যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তার দোষ গুণ কিছু নাহি লয়॥ (চৈ, ভা)

নিত্যানন্দ ধর্ম্মপ্রচারে বড় সুবিধা করিতে পারিলেন না। তিনি উদাসীন বলিয়া অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল না। চৈতন্যের অনুমত্যনুসারে, তখন তিনি বিবাহ করিতে বাসনা করেন। কিন্তু তিনি ভ্রষ্টাচার ও অজ্ঞাতকুলশীল ছিলেন বলিয়া, কেহই তাঁহাকে কন্যাদান করিল না। এই সময়ে কালনা-নিবাসী সূর্য্যদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসুধা

দেবীর সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। নিত্যানন্দের কৃপায় উক্ত কন্যা পুনর্জীবিত হইলেন। সূর্যদাস নিত্যানন্দের এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান হন, এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা বসুধা ও কনিষ্ঠা জাহ্নবীদেবী উভয়কেই নিত্যানন্দকে সম্প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ বিবাহ করিয়া খড়দহে বাস করেন। খড়দহের গোস্বামীরা নিত্যানন্দের ও বলাগড়ের গোস্বামীরা তাঁহার দৌহিত্রের বংশীয়। ইঁহারাও প্রভুসন্তান বলিয়া অভিহিত।

নিত্যানন্দ ভেক দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। যাঁহারা ভেকাশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে জাতিবিচার থাকে না। তাঁহারা পরস্পরের পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন, এবং একত্র পান-ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। এই বিবাহের সময় গোস্বামীদিগকে ১।০ পাঁচসিকা দক্ষিণা দিতে হয়। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মস্তক মুণ্ডন, বহির্বাস তিলক ও ত্রিকণ্ঠী ধারণ করেন। ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা।

রূপ ও সনাতন।—রামকেলি গ্রামে চৈতন্যের সহিত সনাতন ও রূপের সাক্ষাৎ হওয়ার পর হইতেই, রূপ ও সনাতনের বিষয়ে অনাস্থা জন্মিল, এবং চৈতন্যের সঙ্গলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইল। রূপ ও বল্লভ প্রথমে সংসার ত্যাগ করিয়া চৈতন্যচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। রূপের গৃহত্যাগের সময়ে সনাতন বন্দী ছিলেন। তিনি প্রথমে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও, নবাবের নিকট বিদায় লইতে পারেন নাই। অবশেষে পীড়ার ভাণ করিয়া তিনি গৃহে বসিয়া রহিলেন। নবাবের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, সনাতনের চিকিৎসার জন্য রাজবৈদ্যকে প্রেরণ করেন। বৈদ্য সনাতনের পীড়া সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া নবাবের গোচর করিলেন। তখন নবাব সনাতনকে ডাকিয়া কহিলেন, 'তোমার এইরূপ প্রবঞ্চনা করিবায় কারণ কি?' সনাতন তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। শুনিয়া, নবাব তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

এই সময়ে উড়িষ্যায় যুদ্ধ চলিতেছিল। নবাব সনাতনকে ডাকিয়া কহিলেন, 'যদি তুমি আমার সহিত যুদ্ধ-যাত্রা কর, তাহা হইলে আমি তোমার কারামোচন করিয়া দিই।' তখন সনাতন কহিলেন, 'উড়িষ্যায় বিষ্ণুর বিখ্যাত অবতার জগন্নাথদেবের মন্দির আছে, আমি কখনই সেই পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে পারিব না। আমি আপনার এইরূপ অনুগ্রহ-প্রার্থী নহি।' এই উত্তরে নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুনরায় বন্দী করিলেন।

কিছুদিন পরে সনাতন কারারক্ষীকে সাত হাজার টাকা উৎকোচ দিয়া প্রচ্ছন্নবেশে বন্দিশালা হইতে পলায়ন করিলেন, এবং কাশীধামে চৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্যদেব সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং দুই মাস কাল ধরিয়া সাধ্য, সাধন, বৈষ্ণবকৃত্য, রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন প্রভৃতি বিষয়ে সনাতনকে শিক্ষা দিলেন।

রূপ সনাতনাদি ছয় জন গোস্বামী এ সম্প্রদায়ের ভূষণ-স্বরূপ। চৈতন্যদেব ইহাদিগকে বৃন্দাবনে থাকিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। রূপ ও সনাতন বহু পরিশ্রমী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। বৃন্দাবনের মদনগোপাল ও গোবিন্দজীর মন্দির তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত (শক ১৫১২)। এই সকল গোস্বামীর দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত-প্রতিপাদক বহুল গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, ও তাহার দিগ্দর্শনী নামে টীকা, লীলাস্তব এবং ভাগবতের দশম স্কন্দের বৈষ্ণবতোষিণী (১৪৭৬ শক) নামে টীকা প্রণয়ন করেন। রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত, ভক্তরসামৃত, মথুরামাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, অষ্টাদশকচ্ছন্দঃ, স্তবমালা, উৎকলিকাবলী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, নাটকচন্দ্রিকা, লঘুভাগবততোষিণী, বিদগ্ধ-মাধব, ললিতমাধব এবং

দানকেলি ভাণিকা প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিদগ্ধ-মাধব ১৪৪৭ শকে ও দানকেলিভাণিকা ১৪৭১ শকে রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থে কৃষ্ণলীলা বর্ণন ও ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের নিত্য কর্ত্তব্য অতি উত্তমরূপে বিবৃত হইয়াছে।

জীব গোস্বামী রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অনুপমের পুত্র। ইনিও একজন প্রধান গ্রন্থকার। ভগবৎ-ষট্‌সন্দর্ভ ও লঘুতোষিণী তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। তিনি বৃন্দাবনের রাধা দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

গোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্যবাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে যখন ইহাদের বাটীতে অবস্থান করেন, গোপাল তখন চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন হইয়া তাঁহার অনুগামী হন। গোপাল ভট্ট, সনাতন লিখিত হরিভক্তিবিলাসের সূত্র অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান-প্রচলিত 'হরিভক্তিবিলাস' নামক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের স্মৃতি-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গোপাল কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে রাধারমণের মন্দির স্থাপিত হয়। অদ্যাপি তাঁহার সন্তানেরা উহার উত্তরাধিকারী হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।

রঘুনাথ দাস।—ছয় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস সপ্তগ্রামের অধিপতি কায়স্থকুলোদ্ভব গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র (জন্ম ১৪৯৮ খৃঃ)। তাঁহার বাৎসরিক বার লক্ষ মুদ্রা আয় ছিল। বাল্যকালে রঘুনাথ যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বৈরাগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁহার পিতা তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার মানসে সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দেন, এবং তাহার প্রহরায় এক দল রক্ষী নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, একদিন সুবিধা পাইয়া রঘুনাথ একাকী নিঃসম্বলে পলাইয়া পুরীধামে চৈতন্যচরণ আশ্রয় করিলেন। তদবধি তিনি আর গৃহে ফিরেন নাই বা সাংসারিক সুখভোগ করেন নাই। তাঁহার বৈরাগ্য ও ত্যাগ বৈষ্ণবসমাজে আদর্শ-

স্থানীয় হইয়া আছে। তিনি মহাপ্রভুর লীলাসম্বরণ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পুরীতেই ছিলেন এবং স্বরূপ-দামোদরের প্রতি মহাপ্রভু রঘুনাথের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর, তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া রাধাকুণ্ড তীরে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার সময়ে রাধাকুণ্ডে কোন সরোবর ছিল না। চৈতন্যদেব সেই স্থানে শস্যক্ষেত্র দেখিয়াছিলেন, এবং সেই ক্ষেত্রকেই তিনি রাধাকুণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রঘুনাথ দাসের উদ্যোগে সেই স্থানে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড খনিত হয়। তিনি তথায় রূপ ও সনাতনের ছোট ভাইএর মত থাকিতেন। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, এবং বিলাপকুসুমাঞ্জলি মনঃশিক্ষা, মুক্তাচরিত, গদ্যপদ্যময় সারাৎসারসংগ্রহ ও দানকেলিচিন্তামণি নামক কয়খানি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন।

গদাধর পণ্ডিত।—নবদ্বীপে গদাধর পণ্ডিত (১৪৮৬ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাধব মিশ্রের পুত্র ও গৌরাঙ্গের বাল্যসঙ্গী ছিলেন, দুই জনে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। গদাধর গৌরাঙ্গকে যেমন অবিচারে ভাল-বাসিতেন, বোধ হয়, তেমন কেহই বাসিতেন না। গৌরাঙ্গের আদেশে তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর, গদাধর ক্ষেত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরীধামে বাস করিতে থাকেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে টোটায় গোপীনাথের সেবক নিযুক্ত করেন। এই স্থানে গদাধর মহাপ্রভুকে ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

শ্রীবাস আচার্য্য।—শ্রীহট্ট হইতে বিদ্যার্জ্জনের জন্য শ্রীবাসেরা চারি ভাই নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। জগন্নাথ মিশ্রের বাটীর নিকটে ইঁহাদের বাসস্থান ছিল। শ্রীবাসপত্নী মালিনী দেবী শচী দেবীর সখী স্থানীয়া ছিলেন। তিনি চিরদিনই বৈষ্ণব ছিলেন। গৌরাঙ্গের যখন কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ পাইল তখন তিনি এই শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতেই হরিসভাদি করিতেন। তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন প্রচারে শ্রীবাস প্রধান সহায়,

ছিলেন। সেজন্য শ্রীবাসকে নবদ্বীপ-পাষণ্ডীর নিকট বহুবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীবাসের গৌরাঙ্গনিষ্ঠা কিছুতেই ব্যাহত হয় নাই। তাঁহার গৌরাঙ্গ-প্রীতি এত প্রবল ছিল যে, একদিন সঙ্কীর্ত্তন কালে তাহার এক পুত্রের মৃত্যু হইলে, প্রভুর কীর্ত্তনভঙ্গ-ভয়ে তিনি নিজে কোনরূপ শোক প্রকাশ করেন নাই এবং পুরবাসিনী নারীদিগকেও শোকধ্বনি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতই গৌরাঙ্গের ভগবত্তা প্রথম স্বীকার করিয়া তাঁহার পূজা করেন। শ্রীবাসের গোষ্ঠীপ্রতি মহাপ্রভুর অপার কৃপা ছিল।

হরিদাস ঠাকুর।—হরিদাস ঠাকুরের পূর্ব্ব জীবনী জানিবার কোন উপায় নাই। তিনি যবন হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ, সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে, তিনি যবন কুলেই জন্মিয়াছিলেন।[১] কেহ বলেন তিনি হিন্দুর সন্তান, যবন দ্বারা পালিত হইয়াছিলেন। যেখানে যে ভাবেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন, তিনি যে একজন সাধককুলরত্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় ইষ্টে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। তাঁহার ন্যায় নির্য্যাতনের অগ্নিপরীক্ষায় অতি অল্প সাধকেই সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

তিনি বঙ্গদেশের নানাস্থানে থাকিয়া ভজন করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। আজীবন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। যবনেরা যখন দেখিলেন যে তাহাদেরই স্বজাতীয় একজন, হিন্দুর আচার ও উপাসনা গ্রহণ করিয়াছে তখন তাহাদের ক্ষোভের সীমা রহিল না। হরিদাসের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট অভিযোগ হইল এবং কাজী সেই বিবরণ মুলুকপতিকে জানাইলেন। বিচারে তাঁহার প্রতি বাইশ বাজারে ঘুরাইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত উন্মুক্তগাত্রে

---

(১) উজ্জ্বলা মায়ের নাম বাপ মনোহর॥
স্বরনদীতীরে ভাট কলাগাছি গ্রাম।
হীনকুলে জন্ম হয়ে উপরি পূর্ণ নাম। (জয়ানন্দ, চৈ, ম)

বেত্রাঘাতের আদেশ হইল। হরিদাসকে লইয়া নবাবের লোকেরা আদেশমত শাস্তি দিতে লাগিল। এপর্য্যন্ত দুই বাজারের অধিক কোন অপরাধীকে ঘুরাইতে হয় নাই, কিন্তু হরিদাসকে বাইশ বাজারেই বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইল। তাহাতেও হরিদাসের মৃত্যু নাই, নামগান সুধা পানে হরিদাস মৃত্যুঞ্জয়। হরিদাসের গাত্রে বেত্র পড়িতেছে, রক্ত ঝড়িতেছে, লোকে দেখিতেছে, কিন্তু হরিদাস যেন আঘাত জানিতে পারিতেছেন না। ইহার অপেক্ষা মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করাও সহজ। হরিদাস এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তির মহিমা প্রচার করিলেন। এই পরীক্ষাই হরিদাসের শেষ পরীক্ষা নহে—ইহার অপেক্ষাও সুকঠিন প্রলোভনের পরীক্ষায় হরিদাসকে পতিত হইতে হইয়াছিল।

যৌবনকালে মনুষ্য মাত্রেই নানারূপ ভোগবাসনায় অভিলাষী হয়। কিন্তু হরিদাস সমস্ত বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া যৌবন সময়ে বেনাপোলের বনে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন। এইজন্য তাঁহাকে অনেকেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। রামচন্দ্র খাঁ নামক নিকটস্থ কোন জমীদার তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, একদা এক পরম সুন্দরী বেশ্যাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এই স্ত্রীলোক ক্রমাগত তিন দিবস তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রলোভিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারিল না; পরন্তু হরিদাসকে এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ দেখিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন হরিদাস কহিলেন, "যদি আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহ, তবে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পতিতপাবন হরির চরণ সাধন কর।" তদবধি ঐ বেশ্যা একটী পবিত্রা বৈষ্ণবী হইল।

বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়া হরিদাস প্রতিষ্ঠার ভয়ে সেই দিনই বেনাপোল ত্যাগ করিলেন। প্রতিষ্ঠার করাল গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করাই সর্ব্বকঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। অতঃপর তিনি শান্তিপুরে উপস্থিত

হইয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বা[illegible] করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত তিনি প্রত্যহ ভাগবতপাঠ ও হরিসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন এবং অদ্বৈতাবাসে প্রসাদ পাইবেন। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া গৌরাঙ্গকে প্রথম দেখিলেন, এবং তদবধি নদীয়ায় হরিনাম প্রচারে তিনি একজন প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি পুরীধামে গিয়া বাস করেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

চৈতন্যযুগে বঙ্গসাহিত্য।

গৌর যে ভাবে বাঙ্গালীর মন চুরি করিয়াছেন, এমন ভাবে আর কেহ করে নাই। তিনি বাঙ্গালীর মনের মানুষ, তিনিই বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুর। মানুষের ভিতরে এমন দেবতা বাঙ্গালী আর কখন দেখে নাই, দেবতাকে এমন নিকটে, এমন আপনার করিয়া আর কখনও পায় নাই। তাই যখন বাঙ্গালীর মনের ভিতর তাঁহার গুণের গাথা গুঞ্জরিয়া উঠিল, সেই গুঞ্জরণ যখন ভাষায় রূপ গ্রহণ করিয়া দেখা দিল, তখন জাতির জন্মগত মাতৃভাষায় তাহা প্রকাশ পাইল—তাহা বাঙ্গালা ভাষায় বিকসিত হইল। সেই জন্য এই যুগে যত গ্রন্থ হইয়াছে, যত গীত, যত কথা হইয়াছে তাহা নবদ্বীপ ও নবদ্বীপচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় দুই চারিখানি গ্রন্থ না ছিল তাহা নহে—কিন্তু তাঁহার পর হইতে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই চৈতন্যের চরিত কথা। এতদ্ভিন্ন যে কেহ অন্য বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তিনিও চৈতন্য-চরণে একটী প্রণাম বা চৈতন্যচন্দ্রের একটী বন্দনা না করিয়া গ্রন্থ-সমাপন করেন নাই—সে গ্রন্থ চণ্ডীকাব্যই হউক বা শিবায়ণ, মনসামঙ্গল বা গঙ্গামহিমাকাব্যই হউক।

এই সময়ে, ভাষার সৌন্দর্য্যে, কাব্যের সরসতায়, পদাবলীর কমনীয়তায় ও ভাবমাধুর্য্যে বঙ্গভাষায় যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, চৈতন্যের ভক্তগণই তাহার প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশ নবদ্বীপেই জন্মলাভ করিয়াছিলেন, অথবা গৌরাঙ্গ-সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহাদের হাতেই বঙ্গভাষা সর্ব্ব-প্রথম সম্মার্জ্জিত ও অঙ্গভূষায় সম্বর্দ্ধিত হইয়া সভ্য সমাজে স্থানলাভ করিয়াছিল।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক মধুর পদাবলী-সকল রচনা করিয়া যান। তাঁহারা উভয়েই চতুর্দ্দশ শক শতাব্দীর শেষে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর, নদীয়ার গৌরব ফুলিয়ার কৃত্তিবাস ও তাঁহার রামায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর আমরা গুণরাজ খাঁ নামে আরও একজন বৈষ্ণব কবিকে দেখিতে পাই। তাঁহার প্রকৃত নাম মালাধর বসু, নিবাস কুলীন গ্রাম। নবাব কর্ত্তৃক তিনি গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' নামে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে একখানি কাব্য রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ ১৪০২ শকে (১৪৮০ খৃঃ) সমাপ্ত হয়।[১]

চৈতন্যের ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালা ভাষায় বহু সুমধুর গীত, পদাবলী ও গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীখণ্ড-নিবাসী বৈদ্যকুলতিলক নরহরি দাস এই সকলের আদি গুরু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনিই প্রথমে চৈতন্য সম্বন্ধে অনেক পদাবলী রচনা করেন। ইহার পর গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়, কোগ্রামবাসী লোচন দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ, প্রধানতঃ পদকর্ত্তা নামে অভিহিত। যে সকল কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কবিতা স্বরলয়ে গীত হয় তাহাদের নাম পদ। এই সকল পদকর্ত্তা গৌরাঙ্গ-লীলা

(১) তের শত পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ।
চতুর্দ্দশ দুই শকে গ্রন্থ হইল সমাপন॥ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)

অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণলীলার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, বহু সুললিত পদ রচনা করিয়াছেন। সেই সকল পদ 'গৌরচন্দ্র' নামে অভিহিত। সেগুলি বঙ্গভাষার অমূল্য রত্ন। এদেশে গৌরচন্দ্র পদের সমাদর এত অধিক যে, আজ পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কোন কীর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে তদুচিত গৌর-চন্দ্র গীত হইয়া থাকে। গোবিন্দ, বাসুদেব, মাধব, মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস—সকলেই নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন, এবং বৃন্দাবন দাস ব্যতীত অন্য সকলেই গৌরাঙ্গ-সহচর ছিলেন।

গোবিন্দ ঘোষ কর্ত্তৃক অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ স্থাপিত হয়। গৌরাঙ্গ যখন গঙ্গাতীরের পথ দিয়া গৌড় যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দ ঘোষও যাইতেছিলেন। একদিন গৌরাঙ্গ ভোজনের পর মুখ-শুদ্ধি চাহিলে, গোবিন্দ নিকটস্থ গ্রামে ভিক্ষা করিয়া একটী হরিতকীর একখণ্ড তাঁহাকে দিলেন। পর দিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা করিলেন, এবং মুখশুদ্ধি চাহিলে, গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ হরিতকী বাহির করিয়া দিলেন। তখন চৈতন্য কহিলেন, 'তোমার এখনও সংসারবাসনার তৃপ্তি হয় নাই। অতঃএব আমার সহিত তোমার যাওয়া হইবে না।' তাহাতে গোবিন্দ অতিশয় দুঃখিত হওয়ায় চৈতন্য কহিলেন, 'তুমি এই স্থানে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহাকেই পুত্ররূপে প্রতিপালন কর।' গোবিন্দ ঘোষ প্রভুর আদেশ মত গোপীনাথের বিগ্রহ স্থাপিত করিলেন।

বৃন্দাবন দাস শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্কন্যা নারায়ণী দেবীর পুত্র। তিনি স্বীয় গুরু নিত্যানন্দের আদেশে 'চৈতন্য ভাগবত' নামক চৈতন্য-চরিত্র-বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ১৪৫৭ শকে (১৫৩৫ খৃঃ) রচনা করেন। প্রথমে উহার নাম চৈতন্য-মঙ্গল ছিল। দুই বৎসর পরে (১৫৩৭ খৃঃ) লোচন দাস কৃত চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশিত হইলে, বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম চৈতন্য-ভাগবত হইল। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়া কথিত। নবদ্বীপের নিকট মামগাছি গ্রামে তাঁহার পাট এখনও বর্ত্তমান আছে।

ঝামটপুর-নিবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫৩৪ শকে (১৬১২ খৃঃ) চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, কাশীরাম দাসের মহাভারত, ঘনশ্যাম দাসের ভক্তিরত্নাকর, কবিকঙ্কনের চণ্ডী, ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ এই সময়ে রচিত হইয়া বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে।

চৈতন্যযুগে নবদ্বীপ।

চৈতন্যযুগে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাতে তাৎকালিক নবদ্বীপের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। সেই নবদ্বীপ বহু-জন-পূর্ণ বিস্তীর্ণ নগরী ছিল। তাহার পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিতা ভাগীরথীর তীরে পূর্ব্বস্থলী, জান্‌নগর, পাহাড়পুর, বিদ্যানগর, সমুদ্রগড় ও কুলিয়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ অবস্থিত ছিল।[১] নবদ্বীপের উত্তর প্রান্তে সিমুলিয়ায় কাজিবাড়ী এবং তাহার পূর্ব্ব সীমাতেও ভাগীরথীর অপর ধারা প্রবাহিত ছিল।[২] গাদিগাছা গ্রাম এই সীমার মধ্যবর্ত্তী ছিল বলিয়া মনে হয়। তখন নবদ্বীপের এক এক পল্লীতে এক এক জাতি বাস করিত; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, তন্তুবায়, শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, মালাকার প্রভৃতি প্রধান।[৩] সকলেই

(১) কবিকঙ্কনচণ্ডী—ধনপতি ও শ্রীপতির সিংহল যাত্রা, এবং ভক্তি রত্নাকর—১২শ তরঙ্গ।

(২) ভক্তি রত্নাকরের ১২শ তরঙ্গে লিখিত হইয়াছে, নবদ্বীপ সুরধুনী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। যথা—

'এই কতো দূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধুনী বেষ্টিত পরম রম্য স্থান॥'

সম্ভবতঃ পূর্ব্বপ্রবাহিত ভাগীরথীতে খড়িয়া নদী মিলিত হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবতের (অন্ত্য খণ্ড ১ম অ) বর্ণনায়, সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন চৈতন্যদেব শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন তখন নবদ্বীপবাসিগণ নদী পার হইয়া শান্তিপুর গমন করিতেছেন দেখা যায়। ইহাতেও জানা যায় তৎকালে নবদ্বীপের পূর্ব্ব সীমায় নদী ছিল।

(৩) চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

স্বস্ব ব্যবসায়ে রত ছিলেন, এবং 'রমাদৃষ্টিপাতে' পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তখন নবদ্বীপের গঙ্গায় নাগরিয়া বারকোনার ঘাট, নিদয়ার ঘাট, মহাপ্রভুর নিজ ঘাট ও মাধাইএর ঘাটের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং 'একো গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করিত' জানা যায়। প্রতি পল্লী তখন নৃত্যগীতে মুখরিত ছিল, এবং প্রতি ঘরে বেদপাঠ হইত। তখন প্রত্যেক গৃহচূড়ায় বিচিত্র কলস ও তাহাতে চঞ্চল পতাকা উড়িত। তখনকার নবদ্বীপ ইষ্টক-রচিত প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গন দ্বারা সুসজ্জিত, 'চূর্ণবিলেপিত দেউল দেহরা', নাটশালা, পাঠশালা, মঠ, মণ্ডপ ও সুন্দর চত্বর সুশোভিত 'বিচিত্র নগরী' বলিয়া পরিগণিত হইত।[৪]

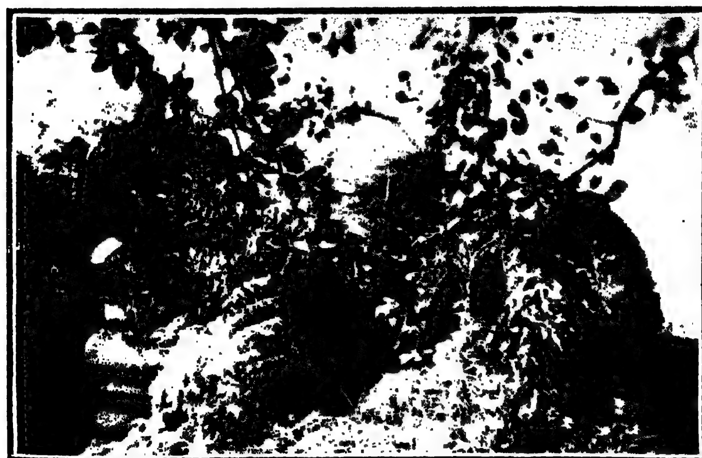
তখন সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি, বিশারদ, বিদ্যাবিরিঞ্চি, ভট্টাচার্য্য শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি ?) প্রভৃতি উপাধিধারী পণ্ডিতগণ নবদ্বীপ অলঙ্কৃত করিতেন।[৪] তাঁহারা 'মহা অধ্যাপকের' পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নবদ্বীপকে, গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বিদ্যা বিতরণ করিতেন। তখনও ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে বিদ্যার্থীর দল নবদ্বীপে আসিত—এখানে না পড়িলে বিদ্যা-রস পাওয়া যাইত না।[৫]

তৎকালে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য তৈজসাদি ও বিলাস-দ্রব্যের মধ্যে ডাবর, বাটা, পাণের ডিবা, দর্পণ, রসবাটিকা, তামার হাঁড়ী, পিত্তল কলস, বারাণসী তেপায়া, বাটি, রসময় থাল, রসখুরি, ত্রিহুতের গাড়ু, পিত্তলের ঝারি, পাথরের বাসন, খড়িকারঙ্গি ডুরে, উড়িয়া গৌড়িয়া কুলুপ, বিচিত্র চিরুণী, সাঁপুড়া, টাড়, গেঁঠে কড়ি, সোনার মাতুলী, শাঁখা, কাশ্মীরী খুর, কেয়ুর, কঙ্কন, রত্ননূপুর, কাঞ্চীদেশের বেণী, পাটের কাপড়, ভোট কম্বল, শ্রীরামখানি জমকা, ভোট্ট দেশের ইন্দ্রনীলমণি, লক্ষ্মীবিলাস, বিষ্ণুতৈল,

(৪) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, নদীয়া খণ্ড।
(৫) চৈতন্য ভাগবত, আদি খণ্ড।



বল্লাল ঢীবি—পৃঃ ৫৫



পারুলিয়ার মসজিদ—পৃঃ ২৭৭

কৃষ্ণকেলি বসন, খাট প্রভৃতি 'ভুবন-দুর্লভ দ্রব্য' সমুদয় নদীয়ার হাটে বিক্রীত হইত।[৬] এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, তৎকালে কাশী, কাঞ্চী, উড়িষ্যা, ত্রিহুত, ভোট ও কাশ্মীরের ন্যায় বহুদূর ও দুর্গম দেশ হইতেও নবদ্বীপে দ্রব্যসকল বিক্রয়ার্থ আনীত হইত,—ইহা বড় কম গৌরবের কথা নহে। এই সকল দ্রব্যের অনেকগুলিই এখন বঙ্গসমাজে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শাঁখা ও খড়িকারঙ্গি ডুরে এখনও নারীদের কাছে একেবারে মর্য্যাদা হারায় নাই।

তখন নবদ্বীপের নিকটে পিরল্যা (পারুলিয়া) গ্রামের অধিবাসী যবনেরা অতিশয় প্রবল ছিল। এখনও সেই স্থানের প্রাচীন সুবৃহৎ মসজিদ তাহার পরিচয় দিতেছে। নবদ্বীপের প্রতি তাহাদের অত্যন্ত আক্রোশ ছিল, তাহারা মুসলমান বাদশাহকে জানাইল যে, নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে। যবনরাজ সে কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগকে ধরিয়া যবন করিবার আদেশ দিলেন। গৌড়াধিপতি যবন-রাজের আজ্ঞায় পিরল্যা গ্রামবাসীরা নবদ্বীপে আসিয়া যাহাকে পারিল, ধরিয়া যবন করিতে লাগিল। এই উৎপাতের সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই নবদ্বীপ ছাড়িয়া পলায়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌমও ছিলেন। গৌড়েশ্বর কর্তৃক নবদ্বীপ এইরূপে বিনষ্ট হওয়ায়, নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—দিগম্বরী, খড়্গাখর্পরধারিণী, ভীষণা কালীমূর্ত্তিতে নিদ্রিত যবনরাজের নেত্রপথে উদিত হইলেন। স্বপ্নে যবনরাজ অতিশয় ভীত হইয়া, নবদ্বীপের উপর আর কোন অত্যাচার করিতে বিরত হইলেন এবং নবদ্বীপবাসীকে অভয়দান করিলেন। তিনি কহিলেন, "পূর্ব্বে জেমত ছিল নবদ্বীপ রাজধানী। তার শতগুণ অধিক জেন শুনি॥" (জয়ানন্দ) অতঃপর নবদ্বীপে যবন-দৌরাত্ম্য দূর হইয়া তাহার পূর্ব্বশ্রী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।[৬]

---

(৬) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, নদীয়া খণ্ড।

এই সকল বৈষ্ণবগ্রন্থে যেমন তৎকালীন বেশভূষার পরিচয় আছে, তেমনই তৎকাল-প্রচলিত বহুবিধ খাদ্যদ্রব্যেরও নাম উল্লিখিত হইয়াছে। রন্ধন পারিপাট্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে বাঙ্গালীর ভোজনপটুতা ও ভোজনবিলাসিতা উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে বহুবিধ মিষ্টান্নেরও নামোল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে মুদ্গবড়া, মাসবড়া, কলাবড়া, ক্ষীরপুলি, নারিকেল পিঠা, অমৃতকেলি, সরপুলি প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। পায়স, দুগ্ধচিড়া, চাঁপাকলা, দধি, ছানা, চিনি, সন্দেশ প্রভৃতি ভোজনের বহুল প্রচলন ছিল। (চৈ, চ) এই সকল মিষ্টান্নের অধিকাংশই তণ্ডুলচূর্ণ ও নারিকেল সহযোগে প্রস্তুত হইত। ভদ্রসমাজে তখন চিড়া ও হুড়ুম আদরের সহিত চলিত। শাক, শুক্তা ও অম্ল নিত্য আহার্য্যের মধ্যে ছিল। লবঙ্গ, এলাচি, জায়ফল, কর্পূর প্রভৃতি মূল্যবান্ মসলার এবং চৈ ও আদার বহুল প্রচার ছিল। অঙ্গরাগের জন্য গোরোচনা, হরিদ্রা, মেথি, আমলকী ও কস্তূরী ব্যবহৃত হইত। চন্দন, কেতকী ও অগুরু গন্ধ দ্রব্যের প্রধান উপাদান ছিল।

তৎকালে নবদ্বীপ কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহা চৈতন্যযুগের গ্রন্থসমুদায় পড়িলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়। গৌরাঙ্গের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও তাহার সমৃদ্ধির পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, 'সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।' চৈতন্য ভাগবতকার লিখিয়াছেন, 'নবদ্বীপ সমগ্রাম ত্রিভুবনে নাই,' ও 'নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।' জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, 'ভূমিস্বর্গ নবদ্বীপ পৃথিবী মণ্ডলে।' কবির অতিরঞ্জন ত্যাগ করিয়া ধীরচিত্তে বিবেচনা করিলে, ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ নগরী কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ও গৌরব-মণ্ডিত ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

——):*:(——

চতুর্থ খণ্ড

বাঙ্গালার জমিদার—নবদ্বীপ রাজবংশ

নবদ্বীপের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালাদেশ যখন মুসলমানদের অধীন তখনও নবদ্বীপ জ্ঞান, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও নীতি মুক্তহস্তে জগদ্বাসীকে বিতরণ করিয়াছে। পরাধীন দেশের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। দেশ যখন বিধর্ম্মীর অধীন, হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পাইবার যখন সম্ভাবনা নাই, সেই সঙ্কটের সময় এই উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী হিন্দু জমিদারগণের ও মুসলমান সরকারের উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারীদিগের সহায়তা ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। গৌরাঙ্গের সময়েও বৈষ্ণবসাহিত্যপাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পণ্ডিতগণ এই উভয়বিধ ধনিলোকের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। ভূস্বামিগণ পণ্ডিতগণের পোষণ জন্য ভূমিদান অতিশয় পুণ্যজনক কার্য্য মনে করিতেন।

ভবানন্দ মজুমদারকে নবদ্বীপ-রাজবংশের প্রথম পুরুষ বলা যাইতে পারে। তাঁহারা আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণপঞ্চকের মধ্যে ক্ষিতীশের বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। ব্রাহ্মণপোষণ এই বংশের একটী বৈশিষ্ট্য। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে এই বংশীয় রাজগণ যথেষ্ট ভূমিসম্পত্তি দান করিয়াছেন। নবদ্বীপবাসী যে ব্রাহ্মণ ইঁহাদের দত্ত ভূমি ভোগ না করেন, তিনি নবদ্বীপের আদিম অধিবাসী নহেন।

ভবানন্দ মজুমদার।—যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দমনে, ভবানন্দ মহারাজ মানসিংহকে বিশেষ সাহায্য করায়, ভারতসম্রাট্ জাহাঙ্গীর ভবানন্দের প্রতি সবিশেষ সন্তুষ্ট হন, এবং হিঃ ১০১৫ অব্দে

(১৬০৬ খৃঃ) তাঁহাকে নদীয়া মহৎপুর, লেপা, সুলতানপুর প্রভৃতি ১৪টি পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। সম্রাট্ ভবানন্দকে সম্মানসূচক মজুমদার উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ভবানন্দ মজুমদার নদীয়া জেলার মাটিয়ারি গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার সহিত নবদ্বীপ নগরের বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় না। তাঁহার পরলোকের পর—তদীয় তিন পুত্রের মধ্যে গোপাল রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। নরেন্দ্র, রামেশ্বর ও রাঘব নামক গোপালের তিন পুত্র ছিল। রাঘবকে কর্ম্মদক্ষ ও ধার্ম্মিক দেখিয়া, গোপাল তাহাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

রাঘব।—পিতার দেহত্যাগের পর রাজা রাঘব (১৬১৮ খৃঃ) সিংহাসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের জন্ম বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। তিনি এই বংশের উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার সময়ে যেমন জমিদারী বর্দ্ধিত হয়, তেমনই তিনি নানা শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বদেশের বিশেষ হিতসাধন করেন। বিদ্যাবিষয়েও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। এই সময়ে নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও উলা তাঁহার জমিদারীর মধ্যে প্রধান নগর ছিল।

তিনি পৈতৃক জমিদারী ব্যতীত রায়পুর প্রভৃতি কয়েকটী পরগণার জমিদারী সম্রাট্ সাজাহানের নিকট প্রাপ্ত হন। তিনি পণ্ডিতগণের সঙ্গসুখ-লাভেচ্ছায় মাটিয়ারি পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিতপ্রধান স্থান নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও উলার মধ্যবর্ত্তী রেউই (কৃষ্ণনগর) নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাজা রাঘব কৃষ্ণনগরের চতুর্দ্দিক পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করেন, এবং কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর, উলা (বীরনগর) এবং নবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। তিনি দীঘনগর গ্রামে এক প্রকাণ্ড দীঘী খনন করাইয়া তদ্দেশবাসীদিগের জলকষ্ট নিবারণ করেন, এবং ১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খৃঃ) তত্তীরে এক প্রকাণ্ড মন্দির

নির্ম্মাণ করাইয়া রাঘবেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করেন।[১] তিনি নবদ্বীপেও ইষ্টকাদিময় সুরম্য মন্দিরে মনোরম গণেশ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। মন্দির সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই রাজা রাঘব একান্ন বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।[২]

এই সময় হইতেই কৃষ্ণনগরের রাজবংশের সহিত নবদ্বীপের সম্বন্ধ সংঘটিত দেখা যায়, এবং কৃষ্ণনগরের রাজন্যবর্গ নদীয়ার ব্রাহ্মণপণ্ডিত-দিগকে ভূমি ও অর্থাদির দ্বারা সাহায্য করিতে থাকেন। রাঘব অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার সময়ে নবদ্বীপে গদাধর ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ, মধুসূদন বাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন। রাঘব গোবিন্দ ন্যায়বাগীশকে আড়বান্দী গ্রামে ১০৬৭ সালের (১৬৬১ খৃঃ) ১১ই ফাল্গুন তারিখে ৭০০ বিঘা ভূমি, এবং গদাধর ভট্টাচার্য্যকে মালি-পোতা গ্রামে ১০৬৮ সালের (১৬৬১ খৃঃ) ২২এ আষাঢ় তারিখে ৩৬০ বিঘা ভূমি দান করিয়া বিদ্যোৎসাহিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

রাজা রাঘব যে শুধু নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকেই উৎসাহ দিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত উলা (বীরনগর) গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাস ছিল। তিনি তাহাদিগকেও প্রচুর ভূমি দান করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। রঘুনাথ সার্ব্বভৌম নামে একজন

---

(১) নিম্নলিখিত শ্লোকটি উক্ত মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে।—

শাকে সোমনবেষুচন্দ্রগণিতে পুণ্যৈকরত্নাকরো
ধীর শ্রীযুত রাঘবো দ্বিজমণিভূ র্মিভুজামগ্রণীঃ।
নির্ম্মায় স্ফুরদূর্মি নির্ম্মলজল প্রদ্যোতিনীং দীর্ঘিকাং
তত্তীরে কৃতরম্যবেশ্মনি শিবং দেবং সমস্থাপয়ৎ॥

(২) অথ কিয়দ্দিনান্তরং নবদ্বীপে নিরুপমগণেশমূর্ত্তিং সংস্থাপ্য মহেশ্বরলিঙ্গং স্থাপয়িতু-মেকমিষ্টকাদিময়ং মন্দিরং সমারব্ধবান্। এবং ক্রমেণৈকাধিক পঞ্চাশদ্বৎসরান্ সুরপতিরিব পৃথিবীং শশাস, মন্দিরেচার্দ্ধাবশিষ্টে ত্যক্তপ্রাণঃ পরমগতিমবাপ॥

(ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত তখন উলায় বাস করিতেন। তিনি দায়াধিকার সম্বন্ধে 'স্বত্বব্যবস্থার্ণবসেতুবন্ধ', শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তবিষয়ে 'সিদ্ধান্তার্ণব', রাজা কামদেবের আদেশে জ্যোতিষ সম্বন্ধে গদ্যপদ্যময় 'সৎকৃত্যমুক্তাবলী' এবং রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব অবলম্বনে রাজা রাঘবের আদেশে ১৫৩৩ শকে(?) (১৬১১ খৃঃ) 'স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব' নামে চারিখানি গ্রন্থ রচনা করেন।[৩]

রাঘবের রাজত্বকালে নবদ্বীপ-সমীপে সাতসইকা পরগণার অধিপতি যবনরাজ সায়েফ খাঁ বর্ত্তমান ছিলেন।

রুদ্র।—রাঘবের পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্র ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণনগরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রেউই নগরে অনেক গোপের বসতি ছিল, তাহারা অতি সমারোহে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিত। এই জন্য রুদ্র রেউইএর নাম কৃষ্ণনগর রাখেন। তিনি নবদ্বীপে পিতৃ-আরব্ধ মন্দির সম্পন্ন করিয়া, 'রাঘবেশ্বর' নামে এক বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] তিনি রাজধানীর তিন দিকে প্রশস্ত পরিখা ও পশ্চিম দিকে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করান এবং কৃষ্ণনগরকে বহু সুরম্য অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত করেন। সম্রাটের নিকট রুদ্র 'মহারাজ' উপাধি পান, এবং অনুগ্রহের চিহ্ন-স্বরূপ গয়েশপুর প্রভৃতি কয়েকটি পরগণার জমিদারী ও প্রাসাদে কাংরা প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায়

(৩) শাকেঽগ্নিমঙ্গলহরাস্তকলানিধানে
শ্রীরাঘবাবনিপতের্ধবৎসরস্য।
প্রীত্যর্থমাশু রচিতোঽর্ণব এব দায়-
ভাগব্যবস্থিতিময়োঽষ্টম উত্তরার্দ্ধঃ॥
ইতি সকলহিতার্থং বন্দ্যবংশাবতংসঃ
কৃতবসতিরমুস্মিন্ বিশ্রুতোলাসমাজে।
সকলমুনিমতেষং নির্ম্মমে সার্ব্বভৌমঃ
স খলু রুচিরবন্ধো গ্রন্থরাজঃ সমাপ্তঃ॥

(৪) নবদ্বীপে পিতৃসমারব্ধমন্দিরশেষং সমাপ্য তত্র রাঘবেশ্বরনামানং শিবলিঙ্গং পিতৃসমানসমারম্ভঃ স্থাপয়ামাস। (ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতে সপ্তম পরিচ্ছেদ)

মহারাজ রুদ্রও বিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন, এবং বিবিধ পুরাণ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া 'পুরাণসার' নামক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ (অনুমান ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে) রচনা করেন।[৫] এই গ্রন্থের আরম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকের পর নবদ্বীপ নগরী ও নবদ্বীপ রাজবংশের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ।—রুদ্রের দুই রাণী—জ্যেষ্ঠার গর্ভে রামচন্দ্র ও রামজীবন এবং কনিষ্ঠার গর্ভে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ রুদ্রের পরলোক প্রাপ্তির পর রামচন্দ্র ও পরে রামজীবন জমিদারী প্রাপ্ত হন। তৎপর

(৫) নবদ্বীপ লাইব্রেরীর ১৯৯ সংখ্যক পুথি পুরাণসার, তাহার প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে—

বিশ্বস্য জন্মস্থিতি সংযমার্থে কৃতাবতারস্য পদাম্বুজং তে।
ব্রজেম সর্ব্বে শরণং যদীশস্মৃতং প্রযচ্ছত্যভয়ং স্বপুংসাং॥
নারায়ণং ভবমহার্ণবকর্ণধারং কারুণ্যপূর্ণজলধিকলধৌতবর্ণং।
সর্গস্থিতিপ্রলয়মূলমমূলমেকং কেয়ুরকৌস্তুভবিভুষ ণমানতোস্মি॥
শ্রীনন্দনন্দনপদদ্বিতীয়ারবিন্দং বন্দে পুরন্দরপুরঃসরবন্দ্যবন্দ্যং।
আনন্দকন্দমতনোদরবিন্দজোপি যল্লীলয়াভুবনসৃষ্টিবিতানমেনং॥

সদানন্দানন্দাত্মজচরণলাভাৎ সুরধুনী
ধুনীতেঘং যস্যাস্ত্রিপুরমথনাস্যাপ্রণয়িনী।
স্বয়ং বাণী সাক্ষাদনুদিনবিনোদী দ্বিজগণো
জয়ত্যেকা ধন্যা ত্রিজগতি নবদ্বীপনগরী॥

ররাজ তত্র দ্বিজরাজতেজা দ্বিজো ভবানন্দ ইতি ক্ষিতীন্দ্রঃ।
ননন্দ তন্নন্দন এবমার্য্যঃ পূতঃ প্রজাপালনমুখ্যকার্য্যঃ॥
তাতেতি ভক্তো দ্বিজদেবরক্তো গোপালরায়স্তনয়স্ততোহস্য॥
হৃষ্টপ্রশাস্তাখিলশিষ্ট গোপ্তাশিবাশ্রয়োবাঙ্নিলয়ো দয়ালুঃ।
অসৌ যশোধাম রমাভিরামঃ শ্রীমান্ রমন্ রাঘবরায় আস্তে॥

অপিচ।
অধোনীতানীতিঃ শ্রিতবিবুধরীতিঃ ক্ষিতিপতী
র্যমেণৈকক্রীড়াভবনমবনীদেবকুলপঃ।
সদাদানোদ্ধৃতাবনিনিখিলদৈন্যো মধুরবাক্
গুণগ্রামৈরন্যো দ্বিষদনধিগম্যোতি মহসা॥

একত্রোত্তমধর্ম্মশাস্ত্র সুরকৃৎ স্তোত্রাদি শুশ্রূষয়া
সংগৃহ্যাখিলসারমীপ্সিতকরং নানাপুরাণাদিমং।
গ্রন্থং নাম পুরাণসারমখিলামোদায় মোক্ষপ্রদং
শ্রীমদ্রাঘবরায়সূনুরকরোৎ শ্রীরুদ্রশর্ম্মা চিরাৎ॥

রামজীবনকে জাহাঁগীর নগরে (ঢাকা) কারারুদ্ধ করিয়া, কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ জমিদারী অধিকার করিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের বিদেশীয় ছাত্রগণের ব্যয়ের নিমিত্ত বহু টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করিয়া যান। সেই সম্পত্তির আয় হইতে অধ্যাপকগণ প্রত্যেক রাজার সময়ে ঐ টাকা রাজকোষ হইতে পাইতেন। পরে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত জমিদারী দশশালা বন্দবস্ত হইলে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট উক্ত সম্পত্তির আয় স্বহস্তে লইয়া নবদ্বীপের অধ্যাপকগণকে সরকারী রাজকোষ হইতে মাসিক দুই শত টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। এখনও ঐ টাকা রাজা রামকৃষ্ণের প্রদত্ত বলিয়া খ্যাত আছে। রামকৃষ্ণ নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গকে সাহায্য করায়, পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'নবদ্বীপাধিপতি' উপাধি দান করেন। তদবধি কৃষ্ণনগরের রাজগণ নবদ্বীপাধিপতি নাম সাদরে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।[৬]

রামকৃষ্ণের সহিত তাৎকালিক নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অসদ্ভাব হওয়ায়, তিনি রামকৃষ্ণকে কৌশলে ঢাকার 'বৈকুণ্ঠে' বন্দী করেন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই স্থানেই রামকৃষ্ণের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে, রামজীবন কারামুক্ত হইয়া পুনরায় নদীয়া রাজ্য গ্রহণ করেন। নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত যে রাজপথ আছে, তাহা মহারাজ রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়, এবং তাহার উভয় পার্শ্বের বৃক্ষশ্রেণী মহারাজ রামজীবন কর্ত্তৃক রোপিত হওয়ায় উহা 'রামজীবনের সার' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

মহারাজ রামকৃষ্ণের সময় বাঙ্গালার ইতিহাসে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৬৯৫ খৃঃ অব্দে শোভাসিংহ নামে, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চিতুয়ার জমীদার বিদ্রোহী হইয়া, বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরামের প্রাণসংহার করে, এবং বর্দ্ধমান-রাজকুমার জগৎরাম পলায়ন করিয়া নবদ্বীপাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। এদিকে

(৬) দেওয়ান মহাশয় লিখিত ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত—পৃঃ ৬৮ ও ৯১।

কামোন্মত্ত শোভাসিংহ বন্দীকৃতা বর্দ্ধমান-রাজকুমারীর ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হইলে, তেজস্বিনী রাজকুমারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। ১৬৯৮ খৃঃ শাহজাদা আজিম-উশ্বানের অনুগ্রহে ইংরাজ বণিক্‌গণ, কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী ক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়া বাঙ্গালায় স্থায়ীভাবে নিরাপদে বাণিজ্য করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৬৯৯ খৃঃ অঃ ইংরাজেরা কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপন করিয়া নিজেদের কুঠী সুরক্ষিত করেন। তাৎকালিক কলিকাতাস্থ ইংরাজ গভর্ণরের সহিত মহারাজ রামকৃষ্ণের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল, এই প্রীতির চিহ্নস্বরূপ ইংরাজ গভর্ণর মহারাজের ব্যবহারের জন্য ২৫০০ সৈন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন।

কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য।—মহারাজ রামকৃষ্ণের সময় নবদ্বীপে কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য নামে এক পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি অতিশয় বিনয়ী ও নিষ্কিঞ্চন ছিলেন। ভাগবতাদি শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। পণ্ডিত-সমাজে তাঁহার বিদ্যার গৌরব প্রস্ফুটিত থাকিলেও, সাধারণে তাঁহাকে বড় জানিতেন না। কৃষ্ণরাম সম্বন্ধে এদেশে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোন সময়ে মহারাজ রামকৃষ্ণ, পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য এবং গঙ্গাস্নান মানসে সপরিবারে নবদ্বীপে উপস্থিত হন। মহারাণী গঙ্গাস্নানে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণরাম-পত্নী রাণী দর্শনে উৎসুক হইলেন। বহু অনুনয় বিনয়ে স্বামীর অনুমতি পাইয়া তিনি সোৎসাহে রাণী দর্শনে গমন করিলেন। তখন মহারাণী স্নানার্থ গঙ্গানীরে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্নানের জন্য গঙ্গার প্রায় অর্দ্ধাংশ মণ্ডপ দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল। কৃষ্ণরাম-গৃহিণী রাণী দর্শনের জন্য মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিলেন. এবং মহারাণীর সৌন্দর্য্য ও বেশভূষা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া সেই স্থানেই স্নান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্নানান্তে আহ্নিক করিবার সময়, তাঁহার আচমনের জল মহারাণীর গাত্রে ছিটকাইয়া পড়ে। তাহাতে

মহারাণীর দাসীগণ বিরক্ত হইয়া কৃষ্ণরাম-পত্নীকে যথেষ্ট ভৎ'সনা করিয়া ভীতি-প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, "ইনিই নবদ্বীপের রাণী।" তাহাতে কৃষ্ণরাম-পত্নী সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "রাণী আবার কে ? আমিই নবদ্বীপের রাণী, যতদিন আমার বাম হস্তের লাল সূতা আছে ততদিন আমিই রাণী।" এই বলিয়া তিনি সগর্ব্বে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে মহারাজ ভোজনে বসিলে রাজমহিষী তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণপত্নী সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা কহিলেন, এবং আরও কহিলেন, "শুনিতে পাই, আপনি নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে যথেষ্ট অর্থ ও ভূমিদান করিয়া, নবদ্বীপাধিপতি নাম লইয়াছেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ পত্নীতে তাহার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে! এই ব্রাহ্মণীর গাত্রে এক তোলাও রাঙ্‌ রত্তি নাই। অতএব আপনার রাজ্যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা কিরূপ সুখে আছেন বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমার ইচ্ছা যে, ব্রাহ্মণ-পত্নীকে অনুসন্ধান করিয়া কিছু অর্থ প্রদান করেন।" মহারাজ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, উৎসাহিত ও স্বীকৃত হইলেন। তিনি যথাসময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণরমণীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে কৃষ্ণরামপত্নী স্নানান্তে গৃহে গিয়া, রাণী সংক্রান্ত সকল কথাই স্বামীর গোচর করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ঐ কথা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, এবং অবিলম্বে মহারাজের কর্ণগোচর হইল।

মহারাজ কৃষ্ণরাম-গৃহিণীর বিবরণ অবগত হইয়া প্রভূত অর্থ-সহিত তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণরাম মহারাজকে স্বভবনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া, তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং "স্ত্রীলোক অজ্ঞান" ইত্যাদি সানুনয় বাক্যে রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ হাসিয়া কহিলেন, 'মহাশয়, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার কোনই আবশ্যকতা নাই। আপনার পত্নী কোন অপরাধই করেন নাই, পরন্তু এ পক্ষে আমারই ত্রুটি প্রতীয়মান হয়। আমি এক্ষণে

সেই ক্রটি সংশোধনের চেষ্টায় আসিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন। আমি মহিষীর মুখে শুনিয়াছি যে, আপনার পত্নীর গাত্রে কিছুমাত্র আভরণ নাই। এই জন্য আমি ১০০০৲ টাকা দিতেছি, আপনি গ্রহণ করিয়া উচিত বিধান করুন।' তখন কৃষ্ণরাম ভীত কম্পিত স্বরে উত্তর করিলেন, 'মহারাজ আমার টাকার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ, চোর ডাকাতের যেরূপ ভয়, তাহাতে টাকা নিরাপদে রাখিবার স্থানও নাই।'

ব্রাহ্মণী অন্তরালে থাকিয়া এই সকল বিবরণ শুনিতেছিলেম। এক্ষণে স্বামি-মুখে টাকা রাখিবার স্থান নাই শুনিয়া, ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "টাকা রাখিবার স্থান যথেষ্টই আছে, কিন্তু আমাদের টাকা নাই।' ইহাতে কৃষ্ণরাম পত্নীর লোভ-প্রবণতা দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া পত্নীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ বুঝিলেন যে, অতঃপর ব্রাহ্মণীকে টাকা দিলেই তিনি গ্রহণ করিবেন। মহারাজ ব্রাহ্মণীকে টাকা দিতে উদ্যত হইলে, ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'মহারাজ, একটু অপেক্ষা করুন। আমি টাকা রাখিবার স্থান আনি।' এই বলিয়া তিনি পাড়ার গরীব-দুঃখীদিগকে টাকা দিবেন বলিয়া আনয়ন করিলেন রাজা আসায়, পূর্ব্ব হইতেই অনেক লোক আসিয়াছিল, এক্ষণে টাকা পাইবার লোভে আরও অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'মহারাজ, আমার টাকা রাখিবার স্থান আসিয়াছে, এই আমার লোকদিগের প্রত্যেক স্থানে একটী করিয়া টাকা রাখুন। তাহা হইলেই আমার টাকা নিরাপদে থাকিবে।' মহারাজ ব্রাহ্মণীর এইরূপ বাক্যে নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অগত্যা ব্রাহ্মণীর বাক্যানুসারে, মহারাজ প্রত্যেককে একটী করিয়া টাকা দিতে বাধ্য হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার আনীত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া গেল। তখনও অনেক লোক অপ্রাপ্ত রহিল দেখিয়া ব্রাহ্মণী কহিলেন, 'মহারাজ,

এখনও টাকা রাখিবার অনেক স্থান আছে, কিন্তু টাকা নাই।'

তৃণাচ্ছাদিত গৃহে যাহার বাস, অভাবসঙ্কুল সংসারের পীড়নে যাহার ক্ষীণ তনু, দারিদ্র্য-বশতঃ লালসূতা মাত্র যাহার আভরণ—সেই ব্রাহ্মণ পত্নীর উচ্চহৃদয়, উদারতা ও সহৃদয়তা জগতের আদর্শ স্থানীয়।

মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকালে, জয়পুররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর আচরিত পরকীয়া মত দুষ্ট, এবং স্বকীয়া ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন জন্য বিচারার্থী হইয়া জয়পুর ও বৃন্দাবনবাসী বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া জয়পতাকা লিখাইয়া লয়েন। কিন্তু জয়পুরপতি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, বিচার জন্য তাঁহাকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন। কৃষ্ণদেব অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, বিবিধশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। পথিমধ্যে তিনি কাশী ও প্রয়াগবাসী বৈষ্ণবগণকে বিচারে পরাস্ত করেন। অবশেষে তিনি নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, জাজিগ্রাম প্রভৃতি বৈষ্ণবপ্রধান স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন ঐ সকল স্থানে বহু পণ্ডিত ভক্ত বৈষ্ণবের বাস ছিল। তাঁহারা কৃষ্ণদেবের মত ভ্রান্তি-মূলক ও পরকীয়া ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর ভক্তপ্রবর রাধামোহন ঠাকুর বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা কহিলেন যে, বিনা বিচারে পরকীয়া মত ত্যাগ করিতে পারিব না, আমরা "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বী, অতএব বিচারে যে ধর্ম্ম স্থাই হয় তাহাই লইব। এই মত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিঁহো কহিলেন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজ্‌বিজ হয় না অতএব বিচার কবুল করিলেন সেই মত সভাসদ হইল শ্রীপাঠ নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ও তৈলঙ্গ দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার সোণার গ্রামের শ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য গয়রহ শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়নানন্দ ভট্টাচার্য্য সাং মহলা।" বিচারে রাধামোহন ঠাকুর পরকীয়া ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব

সংস্থাপন করেন, এবং কৃষ্ণদেব পরাজিত হইয়া রাধামোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের জয়-পরাজয়ের দলিল ১১২৫ সালের (১৭১৯ খৃঃ) ৫ই ফাল্গুন তারিখে সম্পাদিত হয়।[৭] এই সভায় নবদ্বীপ-বাসী কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য বিচারে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রঘুরাম।—রামজীবনের দেহত্যাগের পর তাঁহার পুত্র রঘুরাম নদীয়া রাজ্যের অধিপতি হন। তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান্ বীর ও ধনুর্দ্ধারী তৎকালে এদেশে কেহ ছিল না। বারাকোটির যুদ্ধে তিনি নবাব জাফর খাঁর (মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ) সেনাপতি লাহরি-মলের যথেষ্ট সাহায্য করেন, এবং রাজসাহির বিদ্রোহী রাজা উদয়চাঁদের সেনাপতি আলি মহম্মদকে তীরবিদ্ধ করিয়া নিহত করেন। এদেশে তিনি 'রঘুবীর' নামে পরিচিত। তিনিও পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার সভাসদ্ নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম, মহারাজ রঘুরামের আদেশে পদাঙ্কদূত নামে গ্রন্থ ১৭২৩ খৃঃ অব্দে রচনা করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ রাজ্য শাসন করিয়া রঘুরাম ১৭২৮ খৃঃ অব্দে গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।—পিতার পরলোক গমনের পর, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সে ১৭২৮ খৃঃ অব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাঁহাকে বালক দেখিয়া, তাঁহার পিতা রঘুরাম স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কিন্তু রামগোপাল অত্যন্ত অলস ও ব্যসনাসক্ত থাকায়, নবাব স্যাহ্ সুজা কৃষ্ণচন্দ্রকেই রঘুরামের স্থলাভিষিক্ত করেন।

---

(৭) রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রকাশিত এই দলিলের প্রতিলিপি, ১৩০৬ সালের ৪র্থ সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই দলিলের অনুরূপ আর একখানি দলিলের প্রতিলিপি ত্রিবেদী মহাশয় কর্তৃক ১৩০৮ সালের ১ম সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় দলিলখানি প্রথমখানি হইতে কিছু স্বতন্ত্র, এবং স্বাক্ষরকারীর ও সাক্ষীর নামেও কতক কতক তফাৎ আছে, দুইখানির তারিখও এক নহে, কিন্তু উভয় দলিলেই নবদ্বীপ-নিবাসী কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যের নাম দেখা যায়।

জমিদারী প্রাপ্ত হইবার সময়, নবাব সরকারে কৃষ্ণচন্দ্রের পৈতৃক ঋণ প্রায় বিশ লক্ষ টাকা ছিল। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই ঐ ঋণের দশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে (১৭৫৫ খৃঃ) আলিবর্দ্দি খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব ছিলেন। বাকি টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় কৃষ্ণচন্দ্র নবাব কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদে নীত হইয়া কারারুদ্ধ হন। তখন কৃষ্ণচন্দ্রের একান্ত বিশ্বস্ত ও শুভানুধ্যায়ী দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের চেষ্টায় ও যত্নে অল্পদিনের মধ্যেই বাকি রাজস্বের অধিকাংশই পরিশোধিত হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র রায় অবশিষ্ট টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তাঁহার জমিদারীর অবস্থা ভাল না থাকায়, অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া নবাব বাহাদুরকে স্বীয় জমিদারীর অবস্থা দেখাইয়া বাকি রাজস্বের দায় হইতে অব্যাহতি পান। নবাব বাহাদুরও কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জমিদারী পরিদর্শন কালে তাহার জমিদারীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র সত্যই রাজস্ব আদায় দিতে পারেন নাই ; এবং প্রজাপুঞ্জের মুখে তাঁহার শাসন সম্বন্ধীয় নিরপেক্ষতার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে "ধর্ম্মচন্দ্র" এই উপাধি দান করেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জমিদারীর ঋণ পরিশোধ করিয়া রাজ্যের মধ্যে নানা হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে মাজিদিয়া রেল ষ্টেশনের নিকটে, চূর্ণী নদী-তীরে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ঐ গঞ্জ স্থাপিত হওয়ায় তদঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছিল। তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়গণের নিষ্ঠুর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি কৃষ্ণগঞ্জের নিকট ইছামতী নদী-তীরে শিবনিবাস নামে এক নগর নির্ম্মাণ করেন। সেই স্থানে সুন্দর রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মিত করিয়া, তিনি নবনির্ম্মিত নগরী, রাজরাজেশ্বর (১৭৫৪ খৃঃ) রাজ্ঞীশ্বর (১৭৬২ খৃঃ) ও রামচন্দ্রের

(১৭৬২ খৃঃ) সূচ্চ মন্দির দ্বারা সুশোভিত করেন। তিনি রাণাঘাটের দক্ষিণে চূর্ণী নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে 'হরধাম' ও 'আনন্দধাম' নামে দুইটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। প্রাসাদ দুইটীর নামানুসারে গ্রামের নামও হরধাম ও আনন্দধাম হইয়াছে। কৃষ্ণনগর হইতে শিবনিবাস পর্য্যন্ত এক প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করাইয়া, তিনি উহার প্রতি ক্রোশ অন্তর এক একটী তুলসী মন্দির প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছেন। ঐ পথটী এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শেষ বয়সে নবদ্বীপের এক ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে অলকানন্দা নদী তীরে এক সুরম্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করেন এবং তথায় এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হরিহর-মূর্ত্তি (১৬৯৮ শক বা ১৭৭৬ খৃঃ) স্থাপন পূর্ব্বক ঐ স্থানের নাম 'গঙ্গাবাস' রাখেন।[৮] গঙ্গাবাসে আরও ছয়টি দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ স্থানের সমস্ত অট্টালিকাই কালের কঠোর আঘাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—কেবল হরিহরের মন্দিরটি অবশিষ্ট আছে। মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্রের সময়ে গঙ্গাবাসের ভগ্ন প্রাসাদ স্তূপের মধ্য হইতে চারিটি ছোট কামান বাহির হইয়া পড়ে। ঐ কামান কয়টি এক্ষণে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে রক্ষিত হইয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে, এই দেশ ঘোর বিভীষিকাময় হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে ইংরাজগণ রাজ্যলাভাশয়ে কলিকাতায় বদ্ধমূল হইতেছিলেন ; অন্য দিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা দেশ-লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গদেশ-বাসিগণের উপর অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিলেন। নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত গ্রাম-সমূহেও বর্গীর ভীষণ অত্যাচারের (১৭৪২ খৃঃ) কথা

(৮) এই হরিহর মন্দির গাত্রে নিম্নোক্ত শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে—

গঙ্গাবাসে বিধিশ্রুত্যনুগত সুকৃত ক্ষৌণিপালে সকেঽস্মিন্
শ্রীযুক্তঃ বাজপেয়ী ভুবি বিদিত মহারাজরাজেন্দ্র দেবঃ।
ভেত্তুং ভ্রান্তিং মুরারিস্ত্রিপুরহরভিদামজ্ঞতাং পামরাণাং
অদ্বৈতং ব্রহ্মরূপং হরিহরমুনয়া স্থাপয়ল্লোলয়াচ ॥

আজিও শ্রুতিগোচর হয়।[৯] তখন গৃহবিবাদে নবাব-সরকারের শাসন-ক্ষমতাও দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছিল, এবং তাঁহারাও প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিতেন না। চোর ও ডাকাতের ভয়ে দেশবাসী শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর, নবাব আলিবর্দ্দীর মৃত্যু হওয়ায়, অপরিণতবয়স্ক তদীয় দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, অবিমৃষ্য কার্য্যের দ্বারা কর্ম্মচারিগণের ও দেশের প্রধান প্রজাগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। মুসলমানদিগের নবাবীপদ নিরাপদ নহে—নবাব হইলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণই শত্রু হইয়া উঠেন। সিরাজ-উদ্দৌলার ভাগ্যেও তাহাই হইল। জগৎ শেঠ, খোজা বাজিদ, সেনাপতি মীরজাফর প্রভৃতি সকলেই সিরাজের প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টিত হইলেন। এই সময়ে ইংরাজ বণিক্‌গণ সিরাজ-উদ্দৌলার আদেশ অবহেলা করিয়া কলিকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হওয়ায়, সিরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। সুতরাং ইংরাজেরাও সিরাজের শত্রু হইয়া উঠিলেন। ইংরাজ কোম্পানীর সদস্যগণও নবাবের বিরুদ্ধে সৈন্য-পরিচালনের আদেশ দিলেন। ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বার্থে নবাব কর্ম্মচারী ও ইংরাজ উভয়কে এক সূত্রে আবদ্ধ করিল। সেনাপতি মীরজাফর ও ক্লাইবের মধ্যে ষড়্‌যন্ত্র স্থিরীকৃত হইল। পলাশী প্রাঙ্গণে ইংরাজ ও নবাব সেনার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২৩এ জুন মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সৈন্য পলায়ন করিল, ইংরাজদিগের জয় বিঘোষিত হইল। মীরজাফর ইংরাজ-

---

(৯) সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত মহারাষ্ট্র-পুরাণে বর্গীর হাঙ্গামায় যে সকল স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে। যথা -

সাতসইকা রাজবাটী আর চাঁদপুর। কাহারা সরাই ডামধে জম্বুপুর॥
ভাটছালা পোড়াএ আর মেরজাপুর চান্দড়ী। কুড়বন পালাসি যার বউচি বেড়ড়া॥
সমুদ্ধরগড় জান্নগর আর নদিয়া। মাহাতাপুর সুনন্টপুর থইল পোড়াএ গিয়া॥

দিগের ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হইলেন; ইংরাজদিগের অবাধ বাণিজ্যের পথ সম্প্রসারিত হইল। এইরূপে বঙ্গদেশে মুসলমানের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইল, এবং ভারতবর্ষে ইংরাজ-আধিপত্যের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

নবাবকে পদচ্যুত করিয়া ইংরাজদিগকে আনয়ন সম্বন্ধে যে ষড়্যন্ত্র হয়, কৃষ্ণচন্দ্রই তাহার প্রধান মন্ত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইংরাজ আনয়নে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরামর্শ ও সহায়তা তাঁহার দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়া থাকে। তাঁহার উপকারের নিদর্শন-স্বরূপ লর্ড ক্লাইব দীল্লীশ্বরের নিকট হইতে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য "রাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি আনাইয়া দেন, এবং পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত বারটী কামান তাঁহাকে উপহার দেন। আজিও ঐ কামানগুলি রাজবাড়ীতে দেখা যায়।[১০]

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজা ছিলেন। যে সকল গুণ থাকিলে মনুষ্য রাজপদবাচ্য হয় কৃষ্ণচন্দ্র তৎসমুদায়ে অলঙ্কৃত ছিলেন। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি সকল বিষয়েই তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা দেখা যায়।

তিনি অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় নামে দুইটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ঐ যজ্ঞে তাঁহার প্রায় বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই জন্য এই বংশীয় রাজারা আপনাদিগকে 'অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা প্রকৃত রাজসভা ছিল। এদেশে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পর এমন বহুগুণিজন-সমন্বিত সভা ভরেতবর্ষে আর হয় নাই। মহারাজ গুণগ্রাহী ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। তিনি স্বয়ং গুণী ছিলেন ও গুণিজনের আদর করিতেন। তিনি একাধারে কলা-বিদ্যাবিশারদ, সুবিজ্ঞ দার্শনিক, কাব্যামোদপ্রিয়, রহস্যালাপী, মিষ্ট-

(১০) Vide, Bengal District Gazetteers, Nadia, p. 160.

ভাষী, স্পষ্টবাদী, নির্ভীক, শাস্ত্রকুশল, অকপট ধাম্মিক, দাতা ও নিপুণ বিষয়ী ছিলেন। রাজার যাহা কিছু গুণ থাকা আবশ্যক "মহারাজ রাজেন্দ্রে" তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পর এমন আদর্শ নবদ্বীপাধিপতি আর কেহ হয়েন নাই।

কৃষ্ণচন্দ্র যেমন রাজ্যবৃদ্ধি ও রাজ্যের উন্নতি করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার সময় বিদ্যাচর্চ্চা ও শিল্পাদির বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি নিজে বিদ্বান্ ছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্য মধ্যে যাহাতে প্রচুর-পরিমাণে বিদ্যাচর্চ্চা হয় সে বিষয়ে তৎপর ছিলেন। তাঁহার সভা নানা পণ্ডিতে সুশোভিত ছিল। তাঁহার সময়ে ন্যায়শাস্ত্র-ব্যবসায়ী হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, এবং গোপাল ন্যায়পঞ্চানন, রামানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি স্মার্ত্ত, এবং শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্র তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার ও শঙ্কর তর্কবাগীশ প্রভৃতি দার্শনিকগণ নবদ্বীপ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। গুপ্তিপাড়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, এবং ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তৎকালে বর্ত্তমান ছিলেন। নবদ্বীপনিবাসী গদাধর তর্কালঙ্কার তাঁহার সভার পুরাণ-পাঠক ছিলেন। শান্তিপুর-নিবাসী রাধামোহন গোস্বামীও তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। মহারাজ এই সকল পণ্ডিতের সহিত মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রালাপ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন, এবং তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে অর্থ ও ভূমি দান করিতেন। কখন কখন কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ রাজসভায় পরীক্ষা দিয়া সম্বর্দ্ধিত হইতেন, ও প্রসংশাপত্র পাইতেন।* তাঁহারই সভাসদ্ পণ্ডিতগণ দ্বারা 'কৃত্যরাজ' নামক স্মৃতিগ্রন্থ বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হয়, তাঁহার সভাসদ্ রামানন্দ

* নবদ্বীপ লাইব্রেরীতে ২নং পুথির মধ্যে এইরূপ একখানি প্রশংসা পত্র পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া গেল—

বাচস্পতি 'আহ্নিকাচাররাজ' নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন, এবং তাঁহারই আদেশে ১৬৮৭ শকে (১৭৬৫ খৃঃ) নবদ্বীপ-নিবাসী কৃষ্ণকান্ত শর্ম্মা (বিদ্যাবাগীশ) দ্বারা 'জয়সিংহ-কল্পদ্রুম' নামক একখানি বৃহৎ স্মৃতিগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়। এই গ্রন্থখানি অম্বরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহের সভাপতি পৌণ্ডরিক-যাজী রত্নাকর কর্ত্তৃক ১৭৭০ সংবতে (১৭১৩ খৃঃ) রচিত হইয়াছিল।[১১] মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তাঁহার সভাসদ্ পণ্ডিতগণ 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্' নামে সংস্কৃতভাষায় মহারাজের পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেন। মহারাজের সভায় রামরুদ্র বিদ্যানিধি[১২] জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পঞ্চকোট রাজবংশেরও জ্যোতির্বিদ্ ও সভাসদ্ ছিলেন। কথিত আছে বিদ্যানিধি মহাশয়ের পিতামহ হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব ভবানন্দের সময় হইতে রামজীবনের রাজত্ব-

---

"শ্রীহরিঃ শরণং। সমুদ্রগড়নিবাসি শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের কৃষ্ণনগরীয় রাজধানীতে আগমনোত্তর এস্থানে পণ্ডিতবর্গের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রীয় পরিচয় লইয়া বোধ হইল যে উক্ত ভট্টাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রে প্রশংসিত—ইতি॥"

(১১) কৃত্যরাজ ও জয়সিংহকল্পদ্রুম নামক গ্রন্থ দুইখানিই নবদ্বীপ লাইব্রেরীতে আছে। তাহাদের পুথি সংখ্যা যথাক্রমে ৮ ও ২। কৃত্যরাজের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে—

নত্বা হেরম্বগৌরী গিরিশ হরিহরিদ্বাজিনঃ পঞ্চদেবান্
বাগ্দেবীকেলি গঙ্গোজ্জ্বলবলয় নবদ্বীপরাজ্যাধিপস্য।
রাজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রক্ষিতিপতিতিলকস্যাজ্ঞয়া প্রাজ্ঞবর্গা
ধর্ম্মস্য স্থাপনার্থং বিদধতি সুধিয়ঃ পুস্তকং কৃত্যরাজং॥

অপিচ॥ দৃষ্ট্বা তন্ত্রাণি যত্নাদ্বিবিধ বুধগণৈঃ সার্দ্ধমত্রাগ্নিহোত্রী
শ্রীলশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো ভরতভুবি মহারাজরাজেন্দ্র নামা।
তেনেহয়ং কৃত্যরাজং কলিকলুষমহাধ্বান্ত বিধ্বংসনার্থং
ধর্ম্মাণাং স্থাপনার্থং পরমকৃতিমতাং তোষণার্থঞ্চ হৃত্বং॥

(নবদ্বীপ লাইব্রেরীর ৮নং পুথি)

এবং জয়সিংহ কল্পদ্রুমের শেষে লিপিকাল এইরূপ লিখিত আছে—

ইদং কল্পদ্রুমপুস্তকং মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তি শ্রীলশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবস্য॥ লিখিতং শ্রীনবদ্বীপবাসিনা শ্রীকৃষ্ণকান্ত দেবশর্ম্মণা। শাকে ঋষিবসুরসসোমে শকাব্দীয়স্যসংখ্যকে ১৬৮৭॥ জ্যৈষ্ঠস্যোনবিংশদ্দিবসে সাঙ্গস্তবতু পুস্তকং॥০॥০॥

(নবদ্বীপ লাইব্রেরীর ২নং পুথি)

কাল পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল বর্ত্তমান ছিলেন; এবং তাঁহার পিতা বিষ্ণুদাস জ্যোতির্বিদ্ রাজা রঘুরামের সভার সদস্য ছিলেন। রামরুদ্র বিদ্যানিধির রচিত 'সারসংগ্রহ' ও অন্য কয়েকখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ ও পঞ্জিকাগণনার সহজ সঙ্কেত বর্ত্তমান আছে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি বৎসর একখানি পঞ্জিকা নবাব সরকারে দিতেন, ঐ পঞ্জিকার গণক ছিলেন রামরুদ্র বিদ্যানিধি। ইংরাজ-রাজও মহারাজের নিকট পঞ্জিকা গ্রহণ করিতেন। এখনও নদীয়ার কালেক্টর সাহেব নবদ্বীপের পণ্ডিতের গণিত একখানি পঞ্জিকা গ্রহণ করেন, এবং তদনুসারে বঙ্গদেশের পর্ব্বদিন উপলক্ষে সরকারী ছুটীর তালিকা প্রস্তুত হয়। বিদ্যানিধি মহাশয়ের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে 'নবদ্বীপ-পঞ্জিকার' গণক এবং ইহাই বর্ত্তমান-প্রচলিত "নূতন পঞ্জিকার" মূলভিত্তি।

নবদ্বীপনিবাসী লোচন কবিরাজ ও শ্যাম কবিরাজ[১২] দুইজন চিকিৎসা শাস্ত্রবিশারদ বৈদ্য তাঁহার সভায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন।

কৃষ্ণচন্দ্র উপযুক্ত উত্তর পাইলে বড় সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না, এবং তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের সহিত নানা বাদানুবাদ করিতেন। এই সময়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতবংশীয় অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বের টীকাকার পরমবৈষ্ণব পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামী বর্ত্তমান ছিলেন। নানা শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল।

(১২) আদিঞ্জন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রে বিশারদা।
রাজার (কৃষ্ণচন্দ্রের) সভায় তাঁরা থাকেন সর্ব্বদা॥
পঞ্জিকা করিতে গণক আছেন বিদ্যানিধি।
অব্যর্থ গণনা তাঁর যথাশাস্ত্র বিধি॥
লোচন কবিরাজ আর শ্যাম কবিরাজ।
বড়ই উত্তম দুঁহে স্থিতি সভামাঝ।
সর্ব্বদা থাকেন তাঁরা রাজার নিকটে।
(বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গল—জিয়াগঞ্জ হইতে নদীয়া)

একদিন গোস্বামী মহাশয় কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেলেডাঙ্গা গ্রামে কোন শিষ্যালয়ে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ সেই সংবাদ পাইয়া, অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, চৈতন্যদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" গোস্বামী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলেন?" মহারাজ উত্তর করিলেন, "আমি ঐ বিষয়ে অনেক শাস্ত্রালাপ করিয়াছি, কোন মতেই তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই।" তখন রাধামোহন কহিলেন, "মহারাজ, চৈতন্যদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে আমারও এতদিন সন্দেহ ছিল। আজ আমার সেই সন্দেহের নিরসন হইল। ভগবান যে যে সময়ে অবতার করিয়াছেন, সেই সেই সময়েই একজন রাজাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাই। কিন্তু চৈতন্যাবতারে আমি এ পর্য্যন্ত কোন রাজাকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পাই নাই, আজ মহারাজকে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী পাইলাম। সুতরাং চৈতন্যদেব যে অবতার, সে সম্বন্ধে আমার সকল সন্দেহ দূর হইল।" মহারাজ গোস্বামী মহাশয়ের এই শ্লেষপূর্ণ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ ছিল। তাঁহারই সভায় থাকিয়া, কবিবর ভারতচন্দ্র রায় ভক্তিগাথা 'অন্নদামঙ্গল', সর্ব্বজনপ্রিয় রঙ্গকাব্য 'বিদ্যাসুন্দর' ও কয়েকখানি ক্ষুদ্র কাব্যকণা প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষার রত্নভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। গুণগ্রাহী মহারাজ তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে 'গুণাকর' উপাধিদানে সমাদৃত করেন। মহারাজ, ভারতচন্দ্রকে শুধু ফাঁকা উপাধি দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তিনি দরিদ্র ও বিপন্ন কবির স্বাচ্ছন্দ্য মানসে তাঁহাকে ভাগীরথী-তীরে মূলাজোড় গ্রাম দান ও বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে মহারাজের জমীদারীর অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে

সাধক-চূড়ামণি রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 'প্রসাদী গীতের' অমৃতধারা পান করিয়া আজিও বঙ্গবাসী তৃপ্ত হইতেছে। মহারাজ তাঁহার ভক্তিমিশ্রিত কবিত্বে তৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিজ সভায় লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সংসারবিমুক্ত অনাসক্ত রামপ্রসাদ তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। গীতাবলী ব্যতীত কবিরঞ্জন, গুণাকরের ন্যায় 'কালীকীর্ত্তন' ও 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিয়াছিলেন।

রাজসভায় উলা নিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর নিবাসী নরসুন্দর জাতীয় গোপাল ভাঁড় এবং বিল্বপুষ্করিণীবাসী হাস্যার্ণব নামে তিন ব্যক্তি অসাধারণ রসিক ও পরিহাসপটু ছিলেন। তাঁহাদের রহস্যবাক্য ও সরস উত্তরে সকলেই আমোদিত হইতেন।

শিল্পবিদ্যায় মহারাজের বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁহার সময়ে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইত। মহারাজ ঐ সূত্র একত্র করিয়া যাহার সূতা ভাল হইত তাহাকে পারিতোষিক দিতেন এইরূপে উৎসাহিত হইয়া শিল্পিগণ উৎকৃষ্ট সূতা প্রস্তুত করিতে লাগিল। শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ এই সূতায় সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করিত। প্রাতঃকালে শিশিরের উপর ঐ বস্ত্র বিস্তীর্ণ করিলে মাকড়সার জালের ন্যায় বোধ হইত। ঐ সকল বস্ত্র ইউরোপীয় রমণীগণ তাঁহাদের মস্তকের ও মুখের আবরণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত কাপড়ের পাড়ে তন্তুবায়গণ নানাপ্রকার নক্সা প্রস্তুত করিত। কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে গিয়া তন্তুবায়দিগকে উৎসাহ দিতেন এবং প্রচুর বস্ত্র ক্রয় করিয়া বিতরণ করিতেন। কথিত আছে যে, উত্তম বস্ত্র খরিদ করিয়া তিনি তাহাতে জল ধরিয়া রাখিতেন। যে কাপড়ে জল পড়িতে অধিক বিলম্ব হইত, সেই কাপড়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত।

কৃষ্ণনগরের পার্শ্বে ঘুর্ণীগ্রামে অনেক কুম্ভকারের বাস। ঐ কুম্ভকারগণ মৃন্ময় পুত্তলিকা ও ফল গড়িতে বিশেষ পটু। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র

কুম্ভকারদের প্রস্তুত দ্রব্য সমুদায় পরিদর্শন করতঃ তাহার উৎকর্ষের বিচারপূর্ব্বক পারিতোষিক দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

তিনি মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসিয়া শঙ্খকারদের শঙ্খ পরীক্ষা করিতেন, এবং উৎকৃষ্ট শঙ্খ ক্রয় করিতেন। তিনি নবদ্বীপের কাঁসার ও পিতলের কারখানাগুলি পরিদর্শন করিতেন, এবং উৎপন্ন তৈজসপত্র ক্রয় করিতেন। এরূপে রাজার সহানুভূতি পাইয়া শিল্পিগণ বিশেষ উৎসাহিত হইত। বহুদিন হইতে নবদ্বীপে রাস-পূর্ণিমার দিন বার-ইয়ারী পূজা হইয়া থাকে। ঐ সময় আদ্যাশক্তি ভগবতীদেবীর নানামূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে, এবং পূজার পর দিবস ঐ প্রতিমা-সমূহ মহারাজকে দেখাইবার নিমিত্ত পোড়ামাতলায় সোৎসাহে আনীত হইত। মহারাজ ঐ সকল মূর্ত্তির গঠন-নৈপুণ্য, চিত্রের বিচিত্রতা, সাজের পারিপাট্য ইত্যাদি পরীক্ষা করিতেন ; এবং যে শিল্পী যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তিনি যথোচিত পারিতোষিক পাইতেন। এই পারিতোষিক পাওয়ায় শিল্পি-গণের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়, এবং দেশ মধ্যে বিবিধ শিল্প উন্নতিলাভ করে।

চৌরাশী পরগণা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকৃত ছিল, এবং তাঁহার রাজ্য উত্তরে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে ভাগীরথী খাত ও পূর্ব্বে বড়গঙ্গা পার ধুলিয়াপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিন্দুসমাজের উপরও তাঁহার প্রভূত আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার রাজ্যে নদীয়া, অগ্রদ্বীপ, উলা ও কুশদ্বীপ—এই চারিটি সমাজ ছিল। তৎকালে ঐ সকল স্থানের অধিবাসীরা আপন আপন সমাজের মত লইয়া সামাজিক কার্য্য করিতেন। তাহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হইলে, তাহার মীমাংসা করিতেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। এই জন্য তিনি চারি সমাজের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

বৃদ্ধ বয়সে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত

করিয়া, অলকানন্দা তীরে গঙ্গাবাসের প্রাসাদে বাস করিতে থাকেন, এবং সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ৭৩ বৎসর বয়সে অলকানন্দা তীরে ১১৮৯ সনের (১৭৮২ খৃঃ) ২২এ আষাঢ় স্বর্গারোহণ করেন।

মহারাজ শিবচন্দ্র (১৭৮২—১৭৮৮ খৃঃ অঃ)।—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান শিবচন্দ্র যেমন রূপবান্ তেমনি দয়াশীল ও ধার্ম্মিক ছিলেন। এই সময়ে কোম্পানী জমীদারী মেয়াদি বন্দোবস্ত করিতেন। শিবচন্দ্র কোম্পানী বাহাদুরের নিকট দুই লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি পাইতেন, তাহা হইতে পিতার আদেশ-ক্রমে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে ৪০,০০০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া অবশিষ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিতেন। রাজা শিবচন্দ্র নবাবের নিকট 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি পান; ঐ উপাধি গভর্ণর জেনারেলও অনুমোদন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি 'দেবীস্তুতি' নামে ৩৬০ শ্লোকাত্মক এক স্তোত্র রচনা করিয়া বিদ্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। রাজকার্য্যে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায় না। ইঁহারই সময়ে কুবেজপুর পরগণা নিলাম হইয়া যায়। ইনি ৬ বৎসর মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র (১৭৮৮—১৮০২ খৃঃ অঃ)।—ঈশ্বরচন্দ্রের সময়েই (১৭৮৬ খৃঃ অঃ) প্রসিদ্ধ দশসালা বন্দোবস্ত হয়। তাঁহার জমীদারীর রাজস্ব ৮,৫১,৫১২৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। এবং সমস্ত জমীদারী তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের অপর পুত্র ঈশানচন্দ্র জীবিত ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান জমীদারীর অংশ পাইবার নিমিত্ত ইংরেজ কোম্পানীর নিকট অভিযোগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই রাজবংশের উত্তরাধিকার জ্যেষ্ঠাধিকার ক্রমে নিয়মিত বলিয়া উত্তর দেন, এবং স্বীয় পিতা সেই নিয়মে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। বিচারপতি

এই বিষয় হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত কিনা মীমাংসা করিবার জন্য হিন্দু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকট ব্যবস্থা লইতে চাহেন। নবদ্বীপনিবাসী কৃপারাম তর্কভূষণ, ত্রিবেণীনিবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, কলিকাতা শোভাবাজার-নিবাসী হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হন। ইঁহারা সকলে একমত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লিখিত দানপত্র শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করেন। ইহাতে ঈশানচন্দ্রের অভিযোগ অগ্রাহ্য হয় ও ঈশ্বরচন্দ্র সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। ঈশ্বরচন্দ্র শিবনিবাস ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়া বাস করেন। তিনি বিলাসী ও আমোদপ্রিয় রাজা থাকায়, তাঁহার সময়ে অনেক জমীদারী বিক্রয় হইয়া যায়। ইনি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করায় অল্পদিনের মধ্যেই গতাসু হন। কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে যে বিষ্ণুমহল ও রণমহল আদি হর্ম্ম্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাঁহারই নির্ম্মিত। তাঁহার সভায় বিনয় বাক্‌পতি বলিয়া একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় জ্যোতির্ব্বেত্তা আর কেহই ছিল না। বিনয়ের কবিত্বশক্তিও উত্তম ছিল। তিনি সারদামঙ্গল নামে একখানি সঙ্গীত পুস্তক রচনা করিয়া যান। ঐ পুস্তক আর দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহার রচিত গীত এ প্রদেশের অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

গিরিশচন্দ্র।—পিতার মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র ১৮০২ খৃঃ অব্দে রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। তিনি নাবালক থাকায়, তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডের অধীন হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি সম্পত্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি সমস্ত সম্পত্তি কর্ম্মচারিগণের উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নবীন বয়সেই নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে তৃণের ঘরে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করেন, এবং তথায় থাকিয়া বহু পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে বসিয়া পুরশ্চরণ করেন, সেই

স্থান পুরশ্চরণের মাঠ বলিয়া বিখ্যাত আছে। নবদ্বীপের পূর্ব্বে (মতি রায়ের বাঁধের নিম্নে) ঐ পুরশ্চরণের মাঠ। ঐখানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি কৃষ্ণনগরে পুনরাগমন করেন।

তিনি কৃষ্ণনগরে আসিলেন বটে, কিন্তু বিষয় কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি ঐ সময়ে কৃষ্ণনগরে দুইটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ঐ মন্দিরের মধ্যে বৃহৎ মন্দিরটীতে 'আনন্দময়ী' নামে কালীমূর্ত্তি এবং ছোট মন্দিরটীতে 'আনন্দময়' নামে এক শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি ঐ মূর্ত্তিদ্বয় কৃষ্ণনগরে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার ধর্ম্মগৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

তিনি স্বপ্নে নবদ্বীপে ভাগীরথী তীরে এক গোপাল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহাকে নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নাম 'নবদ্বীপ নাথ' রাখেন। এক্ষণে ঐ মূর্ত্তি কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে আছে।

অতি সমারোহে ঐ গোপালের রথযাত্রা ব্যাপার সম্পন্ন হইত। ঐ সময়ে ৮ দিন ধরিয়া নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে ভোজন করান হইত এবং কাঁসার ও পিতলের নির্ম্মিত জলপাত্র ও ভোজনপাত্র ইত্যাদি স্তূপাকার করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বিতরণ করা হইত, অবশিষ্ট অপর লোক লুটিয়া লইত। দোলযাত্রার সময় তিনি যথেষ্ট ব্যয় করিতেন। তখন নবদ্বীপের সমস্ত রাজপথ আবীর দ্বারা রঞ্জিত হইত। কোন পথে ধূলি দৃষ্ট হইলে তিনি মহাবিরক্ত হইতেন। দোল ও রথের সময় নবদ্বীপ আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকিত।

তিনি ধর্ম্মকার্য্যে বহু ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিষয় কার্য্য নিজে কিছুই দেখিতেন না। কর্ম্মচারীদের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কর্ম্মচারীরা সেরূপ বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিতেন না। কাযেই বহু ব্যয় করায় কোম্পানীর রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে বাকীর দায়ে তাঁহার অধিকাংশ জমীদারী নীলাম হইয়া গেল। তিলিনীপাড়া-নিবাসী কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলিকাতা-নিবাসী

মধুসূদন সান্ন্যাল উভয়ে বেনামীতে জমীদারী কিনিতেছেন মহারাজার এইরূপ বিশ্বাস ছিল কিন্তু তিনি উহা আর ফিরিয়া পান নাই।

জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। কিন্তু এত দুরবস্থাতেও তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের কিছু মাত্র ন্যূনতা হয় নাই। তিনি ১২৩২ সালে (১৮২৫ খৃঃ)[১৩] নবদ্বীপে দুই প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার একটীতে 'ভবতারিণী' নামে দেবী-মূর্ত্তি ও অপরটিতে 'ভবতারণ' নামে এক প্রকাণ্ড মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ রুদ্র 'রাঘবেশ্বর' নামে যে শিবলিঙ্গ নবদ্বীপের ভাগীরথীতীরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পরে গঙ্গার ভাঙ্গনে উহার মন্দির গঙ্গা-কুক্ষিগত হওয়ার সম্ভাবনা হওয়ায়, বহুলোকের দ্বারা ঐ শিবকে বাহির করিয়া রক্ষা করা হয়। অস্পর্শীয় লোকে সেই সময় শিবকে স্পর্শ করায় উহার দেবত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং উহাকে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। পরে মহারাজ গিরিশচন্দ্র ঐ শিব উত্তোলন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে—মহারাজ রাঘবের প্রতিষ্ঠিত গণেশ মূর্ত্তিও উক্ত শিবের ন্যায় মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত ছিল। এই মূর্ত্তি মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উত্তোলিত হইবার সময়, উহার শুণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। অঙ্গহীন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা নিষেধ থাকায়, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের মতানুসারে, গণেশমূর্ত্তি হইতে ধ্যানানুযায়ী ভবতারিণী মূর্ত্তি খোদিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি দেবদেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। এত যে অবস্থাহীন হইয়াছিল, তথাপি ঐ বিগ্রহদ্বয়ের সেবার নিমিত্ত তিনি যথেষ্ট সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান। ঐ মন্দির ও মূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি বিঘোষিত করিয়া অদ্যাপি নবদ্বীপের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে।

মহারাজ গিরিশচন্দ্রও পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় শাস্ত্রালাপে ও রহস্য

---

(১৩) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত—১৮০ পৃঃ।

বিষয়ে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সভায় জেলা নদীয়ার অন্তর্গত বাড়েবাঁকা গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী নামক একজন ব্রাহ্মণ সংকবি, সদ্বক্তা ও সুরসিক পণ্ডিত ছিলেন। মহারাজ তাঁহার কবিতা-রসাস্বাদনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার নাম 'রসসাগর' রাখিয়াছিলেন। পাদ-পূরণে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল।

মহারাজ সতীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে, রাজা পৌত্রলাভে, যার-পর-নাই পুলকিত হইয়া, রসসাগরকে কহিলেন "মহী দুর কর মেয় নৃত্য করি।" তিনি ইহার এইরূপ পূরণ করিয়া দিলেন,—

নৃপ নন্দন নন্দন রাজধানী অবতীর্ণ
য্যায়সে গোকুলে অবতার হরি।
চউধ্ব ভুবন জন নাচেত গাওয়েত
চৌষট্ যোগিনী তাল ধরি॥
অপ্সর কিন্নর দশদিগধীশ্বর
তর্ তর্ শ্রীল গিরীশপুরী।
এৎনেক বোলে অহিরাজ কহে
মহী দূর কর মেয় নৃত্য করি॥

হট-হটিকা।—নবদ্বীপে হট-হটিকা নামে যে প্রসিদ্ধ বার-ইয়ারী পূজার কথা শুনা যায়, তাহাতে গিরিশচন্দ্রের অতিশয় যত্ন ও উৎসাহ ছিল। চৈত্রমাসে বাসন্তী পূজার সময়ে এই পূজা সম্পন্ন হয়। হটহটিকা বাসন্তী-মূর্ত্তি। এই সময়ে নবদ্বীপে তন্তুবায় কুলোদ্ভব হরগোবিন্দ প্রামাণিক মহারাজ গিরিশচন্দ্রের নায়েব পদাভিষিক্ত ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, তেজস্বী, পরহিতরত এবং মীমাংসক ছিলেন। নায়েবী পদে অভিষিক্ত থাকায় তৎকালে গ্রামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা তাঁহাকেই করিতে হইত। তিনি এই সকল মোকদ্দমা গ্রামস্থ অন্যান্য ভদ্রলোকের সাহায্য লইয়া করিতেন। ইহাতে শাসন ও বিচারকার্য্য

অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইত। আজও কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে লোক পরম্পরায় তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই বিচারকার্য্যে অপরাধিগণের যে অর্থ দণ্ড হইত তাহা গ্রাম্য তহবিলে জমা হইত ও সেই টাকা হইতে ক্ষমতাহীন ব্রাহ্মণের পুত্রের উপবীত দান, কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তির কন্যার বিবাহে দান ইত্যাদি সৎকার্য্যে ব্যয় হইয়াও প্রচুর টাকা জমা থাকিত। ঐ টাকা, গ্রাম্য লোকের প্রদত্ত চাঁদা এবং রাজ-দত্ত অর্থে এই হট-হটিকা পূজা ১২৩৪ সনে (১৮২৮ খৃঃ অঃ) সম্পন্ন হয়। ঐ প্রতিমা অতি প্রকাণ্ড হইয়াছিল। কএক দিন বহু সমারোহে ইহার পূজা, যাত্রা মহোৎসব, অন্নসত্র ইত্যাদি মহা ধূমধামে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই প্রদেশস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত জমীদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। উক্ত হরগোবিন্দ প্রামাণিক এই সকল আমন্ত্রিত জনসাধারণের এমন আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, যাহাতে মহারাজ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এমন কি হরগোবিন্দ প্রামাণিকের মাতৃশ্রাদ্ধের সভায় মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ হটহটিকা পূজা এইরূপ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল যে আজও নবদ্বীপবাসিগণ উহার নামোল্লেখ করিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

জগদ্ধাত্রী।—মহারাজ গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে অস্মদ্দেশে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলিত ছিল না। উক্ত মহারাজার যত্নে তন্ত্র হইতে ঐ মূর্ত্তি প্রকাশিত। শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মশাসন গ্রামনিবাসী চন্দ্রচূড় ন্যায়পঞ্চানন নামক জনৈক তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ঐ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। পরে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের অনুমোদিত হইলে, ঐ মূর্ত্তির পূজা হইতে আরম্ভ হয়। কৃষ্ণনগরের প্রায় ঘরে ঘরে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে।

নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ।—মহারাজ গিরিশচন্দ্রের, সময়ে নবদ্বীপে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, তন্মধ্যে নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ একজন প্রধান। নানাশাস্ত্রে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা

ছিল। তিনি কৃষ্ণমাতা নামে এক তান্ত্রিক মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। দশভুজা শ্যামবর্ণা ভগবতী শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক শিবোপরি দণ্ডায়মানা। শ্রীকৃষ্ণ মাতৃক্রোড়ে মাতৃহস্তে নবনীত ভক্ষণ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে গোপবালকগণ ক্রীড়ায়মান, দেখিলে মনুষ্যমাত্রেরই মন মোহিত হইয়া যায়। শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের এরূপ সমাহার আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ১২৪৩ সালে এই মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় এবং এক্ষণে নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমার দিন ঐ মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। নবদ্বীপের ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া কলিকাতার বড়বাজারের হরিসভার সম্পাদক রামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় উহার পট প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন।

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় (১৮৪১ খৃঃ—১৮৫৬ খৃঃ)।—গিরিশচন্দ্রের দত্তক-পুত্র মহারাজ শ্রীশচন্দ্র দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরের রাজাসন প্রাপ্ত হন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন এবং পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার পিতা মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সময় অন্যান্য জমীদারীর সহিত উখড়া পরগণাও নীলাম হইয়া যায়। নবদ্বীপ এই উখড়া পরগণার অন্তর্গত। রাজ্যাভিষেককালে নবদ্বীপ তাঁহার জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তৎকালে রাণী রাসমণি নবদ্বীপের উত্তরাংশের ও কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণাংশের জমীদার ছিলেন। মহারাজ বিশেষ চেষ্টা করিয়া কাশীনাথের নিকট নবদ্বীপের দক্ষিণাংশ পত্তনী লইয়া নবদ্বীপাধিপতি নাম রক্ষা করেন। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারল ডালহৌসীর নিকট ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে তিনি "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি ও যথোপযুক্ত খেলাৎ প্রাপ্ত হন।

এই বংশীয় রাজগণ পরম হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা পৌরাণিক ধর্ম্মমত ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সংরক্ষণে সহায়তা করিয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু মহারাজ শ্রীশচন্দ্র সেই সকল মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময়ে, বিখ্যাত রামমোহন রায়, বেদান্তের

অদ্বৈতবাদ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সংস্থাপন করেন। শ্রীশচন্দ্র এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণনগরে এক ব্রাহ্মসভা সংস্থাপন করেন, এবং বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণ বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত উদ্যোক্তা হইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইতে বিশেষ চেষ্টা করেন। এই সময়ে নবদ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, রামলোচন ন্যায়ভূষণ ও রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা একমত হইয়া বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণের অশাস্ত্রীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র অপরিমিত শারীরিক অত্যাচারের ফলে (১৮৫৬ খৃঃ অঃ) অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

কৃষ্ণনগর কলেজের নিমিত্ত যে ভূমি আবশ্যক হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ মহারাজ শ্রীশচন্দ্র দান করিয়াছিলেন, এবং কলেজ নির্ম্মাণার্থে বহু অর্থও সাহায্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরে গভর্ণমেণ্টের যে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে তাহারও ভূমি তিনি দান করিয়াছিলেন, এবং ঐ হাঁসপাতালে তিনি মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেন।

শ্রীশচন্দ্র তন্ত্রোক্ত নীলদুর্গা পূজা আবিষ্কার করেন। মকরসংক্রান্তিতে ঐ পূজা কোন কোন স্থানে হইয়া থাকে।

সতীশচন্দ্র।—মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের পর তদীয় পুত্র সতীশচন্দ্র বিংশতি বর্ষ বয়সে রাজাসন প্রাপ্ত হন। তিনিও পিতার ন্যায় পাশ্চত্য মতেই শিক্ষিত হইয়াছিলেন। অল্প দিন পরেই তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে 'মহারাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ও ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে তিনি মুসৌরী নগরে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

ক্ষিতীশচন্দ্র।—সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর মহারাণী ভুবনেশ্বরী মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, এবং সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে ক্ষিতীশচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ১৮৯০ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'মহারাজা বাহাদুর'

উপাধি পাইয়া তদানীন্তন বঙ্গের ছোট লাট Sir C. S. Bayley কর্ত্তৃক কৃষ্ণনগরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনিও পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং বিদ্যার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতপ্রবর অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ও আশুতোষ তর্কভূষণ তাঁহার সভাসদ্ পণ্ডিত ও টোলের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার প্রবল আত্মসম্মান বোধ ছিল, এবং ইহার ফলেই কৃষ্ণনগর কলেজ রক্ষা পায়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২রা ভাদ্র তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার একমাত্র পুত্র মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র নবদ্বীপ রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র।—ক্ষৌণীশচন্দ্রও পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবরক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ ছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য (Member of the Executive Council, Bengal) ছিলেন। ইহারই সময়ে নবদ্বীপস্থ ভবতারণ শিব মন্দিরটি সংস্কৃত হয়, এবং নবদ্বীপে এংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী স্থাপিত হইলে, তাহাতে বহু মূল্যবান্ হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি দান করিয়া তিনি বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ১৯১৫ খৃঃ অব্দে তিনি নবদ্বীপে সভাস্থ হইয়া মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশকে নৈয়ায়িকের প্রাধান্য পদ দান করেন। ১৩৩৫ সালে তাঁহার পরলোক হইলে, তাঁহার নাবলক পুত্র শৌরীশচন্দ্র সম্পত্তির অধিকারী হন, এবং কোর্ট অব ওয়ার্ড পুনরায় সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। সম্প্রতি মহারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হইয়া নিজ হস্তে সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাণীর দেবদ্বিজে ও স্বধর্ম্মে যথেষ্ট আস্থা আছে। গত ১৩৪৩ সালে মহারাণীর আদেশে নবদ্বীপস্থ ভবতারিণীর মন্দিরটী সুসংস্কৃত হইয়া পূর্ব্বপুরুষের গৌরব রক্ষা করিতেছে।

ইংরাজ রাজত্বে সংস্কৃত শিক্ষা।

মুসলমানদিগের শাসনকালে এদেশে শিক্ষা বলিতে সংস্কৃত ও পার্শি উভয়বিধ সাহিত্যে সম্যক্ জ্ঞানলাভ বুঝাইত। চাকুরী ও রাজকীয় কার্য্যের খাতিরে যেমন হিন্দুদিগকে পার্শি শিক্ষা করিতে হইত, তেমনি তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও দর্শন আলোচনার জন্য সংস্কৃত শিক্ষাতেও কম মনোনিবেশ করিতেন না। অনেক শিক্ষিত মুসলমানও সংস্কৃত শিক্ষায়, বিশেষতঃ জ্যোতিষের আলোচনায়, পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে বহু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে—ইতিহাস তাহার প্রমাণ। যখন ইংরাজ-গণ এদেশে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন এই প্রাচীন সভ্যজাতির সংস্পর্শ তাঁহাদের হৃদয়ে এই জাতির সাহিত্য ও ধর্ম্ম আলোচনার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেক উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষ ও বহু বিখ্যাত পণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় কৃতার্থম্মন্য হইয়া গিয়াছেন। Sir William Jones, H. H. Wilson প্রমুখ মনীষিগণ সংস্কৃত সাহিত্য-আলোচনায় যে সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, আজিও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইউ-রোপে যে মাত্রায় সংস্কৃত চর্চ্চা বাড়িতেছে তাহার শতগুণ মাত্রায় ভারতে সংস্কৃত চর্চ্চা কমিতেছে।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে (১৭৮১ খৃঃ অঃ) যখন তাঁহারা শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, তখন ভিন্নভাষাভাষী, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন সভ্যতার সাধক এই জাতিকে ন্যায়বিচার দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা শাসন-সৌকর্য্যার্থে কতকগুলি জজ পণ্ডিত ও মৌলবী নিযুক্ত করিলেন। তাহাতেও শাসনকার্য্য সহজ হইল না। ইংরাজরাজ, হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রের মর্ম্ম কিছুই বুঝেন না, তাঁহাকে

পণ্ডিত ও মৌলবীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। অনেক সময়ে বিচারে প্রজা সন্তুষ্ট হইত না। নিরুপায় হইয়া ইংরাজ সরকার হিন্দু ও মুসলমান আইন ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিলেন। পণ্ডিত ও মৌলবী জজের পদ উঠিয়া গেল—সংস্কৃত শিক্ষার আবশ্যকতাও কমিয়া গেল।

পরে ইংরাজ সরকার যখন বুঝিলেন যে এদেশে, এদেশীয় বিদ্যা ও বিদ্বানের আদর কমিয়া যাইতেছে তখন তাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষার শ্রোত রক্ষার্থে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সে বিষয়ে তদানীন্তন বড় লাট মাননীয় লর্ড মিণ্টো (১ম) বাহাদুরের মন্তব্য এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—"সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের মধ্যে উত্তরোত্তর বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবনতি হইতেছে। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি তাহাতে উক্ত প্রকার উক্তির যথেষ্টই কারণ আছে বলিয়া মনে হইতেছে। কেবল যে বিদ্বান ও পণ্ডিতজনের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে তাহা নহে, যাঁহারা বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও বিদ্যার ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ হইতেছে। মনোবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আর অধীত হয় না; বিদগ্ধজনোচিত সুকুমার সাহিত্যের আদর নাই; এবং প্রজাকুলের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিশ্বাস সংক্রান্ত সাহিত্য ভিন্ন অন্য বিদ্যার সমাদর দৃষ্ট হয় না। এই প্রকার অনাদরের ফল এই হইয়াছে যে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর অধীত হয় না; এমন কি অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; এবং এরূপ সম্ভব বোধ হইতেছে যে গভর্ণমেণ্ট যদি সাহায্যকারী হইয়া হস্তার্পণ না করেন, অচিরে পাঠ্যগ্রন্থের ও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে বিদ্যার পুনরুদ্ধার অসাধ্য হইয়া পড়িবে।" এইরূপে দেশের প্রাচীন বিদ্যার বিলোপাশঙ্কার সূচনা করিয়া লর্ড মিণ্টো প্রস্তাব করিয়াছিলেন—"অতএব আমি পরামর্শ দেই যে কাশীর কলেজ ব্যতীত, (সে কলেজের কিরূপে সংস্কার করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি) নবদ্বীপে ও ত্রিহুতের অন্তর্গত ভউর নামক স্থানে আর দুইটী সংস্কৃত

কলেজ স্থাপন করা হউক।"[১] এই মন্তব্যের পর লর্ড মিণ্টো উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিচালিত করিতে কিরূপ ব্যয় হইবে তাহারও আভাস দিয়াছিলেন।[২] কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রস্তাব ফলপ্রসূ হয় নাই।

যাহা হউক, লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের মন্তব্যে স্বদেশ ও বিদেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার ফলে ১৮১৩ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পুনর্গ্রহণের সময়, পার্লামেণ্টের ত্বরা পাইয়া কোর্ট-অব-ডিরেক্টরবর্গের সভ্যগণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিলেন—"প্রত্যেক বৎসরে অন্যূন একলক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। তাহা ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পণ্ডিতগণের উৎসাহ দান, ও ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তন ও উন্নতি জন্য ব্যবহৃত হইবে।" ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কমিটি অব পবলিক ইন্‌ষ্ট্রকশন (Committee of Public Instruction) নামে একটি কমিটী গঠিত হয়। উহার সভ্যগণ সেই একলক্ষ টাকা প্রাচীন

(১) Vide. Lord Minto's Minute, Dated Fort William, the 6th March, 1811 as in Rev. J. Long's selection from unpublished Records Government Appendix D—p. 554.

অনুবাদটী "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" হইতে গৃহীত।

(২) কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে কিরূপ ব্যয় পড়িবে তৎসম্বন্ধে লর্ড মিণ্টো লিখিয়াছেন।

2 Pandits at Rs.100 each	2400Rs.
12 Pandits at Rs.60 each	7200Rs.
	9600Rs.

Library.

The librarian to be one of the Pandits receiving pensions.

2 writers as assistants at Rs. 10	240Rs.
2 Duftaries at Rs 4	96Rs.
Paper, ink etc. at	40Rs.
Purchase of copying books	1000Rs.
	1376Rs.

Annual Prizes.

For the best scholar	800Rs.
For the next	400Rs.
For the 3rd	200Rs.
For the 4th	100Rs.
For other good scholars an honorary dress to each (consisting of a cloth of little value)	200Rs.
	1700Rs.

Besides a substantial building to be erected.

সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ, পণ্ডিতগণের বৃত্তি, ও সংস্কৃত শিক্ষার্থী-দিগের বৃত্তি প্রভৃতিতে ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন।

নদীয়ার রাজগণের প্রদত্ত ভূসম্পত্তি হইতে নবদ্বীপের অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে যে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছিল, সেই সম্পত্তি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে বার্ষিক ১২০ পাউণ্ড বৃত্তি নিয়মিত দান করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু দশসালা বন্দোবস্তের সময় ঐ সম্পত্তির উল্লেখ না থাকায়, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অব রেভিনিউ ঐ বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন।[৩] পরে নবদ্বীপের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের আবেদন ক্রমে, মুর্শিদাবাদের কমিসনর সাহেবের যত্নাতিশয়ে উহা পুনরায় মঞ্জুর করা হয়। তদবধি নবদ্বীপের বিদেশীয় ছাত্রগণ নদীয়ার কালেক্টরী হইতে মাসিক ২০০৲ টাকা পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের মহামান্য ছোট লাট সার জন উডবরণ সাহেব নবদ্বীপ আগমন কালে অধ্যাপকবর্গের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে উক্ত বৃত্তির পরিমাণ ৩০০৲ টাকা করিয়া দেন। সম্প্রতি উহা মাসিক পাঁচশত টাকায় পরিণত হইয়াছে। ইংরাজরাজ শুধু ছাত্রদিগের বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে সংস্কৃতশিক্ষা উৎকর্ষ লাভ করে সেই উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে দুইজন ন্যায় ও একজন স্মৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন। ন্যায়ের প্রধান অধ্যাপক মাসিক ১৫০৲ টাকা, দ্বিতীয় অধ্যাপক মাসিক ৭৫৲ টাকা এবং স্মৃতির অধ্যাপক মাসিক ৯০৲ টাকা পাইয়া থাকেন।

সংস্কৃত শিক্ষা রক্ষাকল্পে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে কলিকাতায় 'বোর্ড অব্ সংস্কৃত এসোসিয়েসন' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সভা সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন শাস্ত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃতবিদ্য ছাত্রগণকে তীর্থ-সম্বলিত উপাধি দান করেন, এবং উপযুক্ত অধ্যাপকগণকে যথোচিত

(৩) Vide, Hunter's Statistical Account of Nadia, p. 110.

পারিতোষিক ও বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টও প্রথিতনামা অধ্যাপকগণকে 'মহামহোপাধ্যায়' এই সম্মান-সূচক উপাধি দান করিয়া পণ্ডিতবর্গকে উৎসাহিত করিতেছেন। এইরূপে সংস্কৃত শিক্ষার ধারা কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে।

ইংরাজ রাজত্বে যে সকল প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া পাণ্ডিত্যগৌরবে দেশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইল।

ইংরাজ রাজত্বে পণ্ডিতবর্গ।

বুনো রামনাথ।—ইহাঁর প্রকৃত নাম রামনাথ তর্কসিং খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি আবির্ভূত হন। রামনাথ ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামনাথ অতিশয় দুঃখী ছিলেন। দারিদ্র্য-নিবন্ধন তিনি প্রথমে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পক্ষান্তরে রামনাথের ন্যায় সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে অনেকেই বাসনা করিয়াছিলেন। অবশেষে অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অনুরোধে তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হন। বিবাহের কিছু পরেই রামনাথের পাঠ সমাপন হয়।

তৎকালে নিয়ম ছিল যে, কোন ছাত্রের পাঠ শেষ হইলে তিনি নবদ্বীপের (কৃষ্ণনগরের) রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া বিদ্যার পরিচয় দিতেন ও রাজার নিকট টোল করিবার সাহায্য ও অনেক ভূমি প্রাপ্ত হইতেন। রামনাথের অবস্থা ভাল ছিল না বটে, কিন্তু তিনি রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন না। তিনি নবদ্বীপের প্রত্যন্ত প্রদেশে (যেখানে পুরাতন পাকা-টোল ছিল, এবং এখন যেখানে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যাপীঠ স্থাপিত

হইয়াছে) বনের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত রহিলেন।

রামনাথ হইতে শিক্ষা-প্রণালীর মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় শিক্ষা-প্রণালী অতি উচ্চ। পৃথিবীর কোন স্থানে কোন জাতির মধ্যে এরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত নাই। এই প্রণালীতে অধ্যাপকগণ ছাত্রগণের নিকট বেতন লয়েন না; পরন্তু তাঁহাদিগের অশনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। রামনাথের এই ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, তিনি অন্যের সাহায্য লইতেন না। এদিকে তাঁহার নিকট অনেক ছাত্র শিক্ষার্থী হইল। তখন রামনাথ ছাত্রদিগকে কহিলেন, তাহাদের আহারাদি প্রদান করিতে পারেন এ ক্ষমতা তাঁহার নাই। ছাত্রেরা কহিলেন, 'মহাশয়! আমরা পাঠার্থী হইয়াই আসিয়াছি, আহারার্থী হইয়া আসি নাই, অতএব আমাদের নিজের আহারের নিমিত্ত মহাশয়ের কোন চিন্তা নাই।' তদবধি নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজে ছাত্রগণের অশনাদিব নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

রামনাথের ঘরে অন্ন ছিল না, তথাপি তিনি কাহারও দ্বারস্থ হন নাই। একদিন প্রাতঃকালে তিনি টোলে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার গৃহিণী কহিলেন, "নাথ! আজ ঘরে কিছুই নাই, কি পাক করা যাইবে?" রামনাথ, শাস্ত্র-চিন্তায় নিমগ্ন, ব্রাহ্মণীর প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনোযোগ হইল না। তাঁহার কথাগুলি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল বটে, কিন্তু মনোযোগ অভাবে তাহা মস্তিষ্কে নীত হইল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিকটস্থ তিন্তিড়ী বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় কর্ম্মে চলিয়া গেলেন। অবোধ ব্রাহ্মণী ভাবিলেন, বুঝি স্বামী তিন্তিড়ী পত্র রাঁধিতে বলিয়া গেলেন। মধ্যাহ্নকালে স্বামী বাটী প্রত্যাগমন করিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিলে পর, ব্রাহ্মণী অন্ন ও তিন্তিড়ী পত্রের ঝোল রন্ধন করিয়া স্বামী সমীপে সংস্থাপিত করিলেন। ভোজন করিয়া রামনাথের অতীব

তৃপ্তি লাভ হইল। তখন তিনি ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আজ এ অমৃতময় বস্তু কোথায় পাইলে?" তখন ব্রাহ্মণী কহিলেন, "কেন নাথ! ওত তেঁতুল পাতা সিদ্ধ, তুমিই ত যাইবার সময়ে আমাকে রন্ধন করিতে বলিয়া গেলে!" তখন রামনাথ অতিশয় আহ্লাদ-সহকারে কহিলেন, "বটে, তেঁতুলপাতা সিদ্ধ এত উত্তম! তবে ত আর আমাদের আহারের ভাবনা নাই।"

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজ-সিংহাসনে মহারাজ শিবচন্দ্র আসীন ছিলেন। তিনি লোকমুখে রামনাথের এইরূপ কষ্ট শুনিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া, অবশেষে একদিন স্বয়ং তাঁহার চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন; তৎকালে রামনাথ ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেছিলেন। শিক্ষায় এতাদৃশ মনঃসংযোগ হইয়াছিল যে, মহারাজকে তাঁহার জ্ঞান-গোচর হইল না। পরে তর্ক শেষ হইলে মহারাজকে যথাবিহিত সম্মান-পুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! কোন বিষয়ে আপনার অনুপপত্তি আছে?" তখন রামনাথ কহিলেন, "মহারাজ! চারিখণ্ড চিন্তামণিশাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, কৈ আমার ত অনুপপত্তি কিছুই দেখিতেছি না; কেমন হে ছাত্রগণ! তোমাদের কিছু অনুপপত্তি আছে কি?" এই উত্তরে মহারাজ, একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন তিনি মনে করিলেন, হয় ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার কথার ভাব বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইল। তিনি পুনরায় কহিলেন, "মহাশয়! আপনাকে শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনার সাংসারিক অভাব কি আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" উহার প্রত্যুত্তরে রামনাথ কহিলেন, "মহাশয়! সে বিষয়ে ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারি না।" মহারাজ দেখিলেন যে, এই তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির সুন্দর উপায় হইয়াছে।

তিনি মনে করিলেন যে, স্ত্রীলোকেরা সহজেই অর্থের বশীভূত, অনায়াসেই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণীর সমীপে যাইবার বাসনা করিলেন। রামনাথের তাহাতে কোন আপত্তি নাই। তিনি কহিলেন, 'অদূরে যে কুটীর দেখিতেছেন ঐ কুটীরে ব্রাহ্মণী আছেন।' মহারাজ, আজ্ঞা পাইয়া ঐ কুটীর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, অভ্যন্তরে এক পরমসুন্দরী কৃশাঙ্গী তেজস্বিনী রমণী-মূর্ত্তি স্বীয় সৌন্দর্য্যে কুটীর আলোকময় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। মহারাজ, তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া কহিলেন, "মা! আপনাদের সংসারের অপ্রতুল নিবারণ জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি, এক্ষণে কি কি অপ্রতুল আছে, আমাকে দয়া করিয়া বলিলে, আমি তৎসমুদয় দূর করিয়া দিই।" তখন ব্রাহ্মণী সদর্পে উত্তর করিলেন, "বৎস! আমার কিছুমাত্র অভাব নাই। আমার পরণে ঠেঁটী আছে, জল খাবার ঘটী আছে, শয়নের চেটাই আছে, অধিক কি আমার বাম করে লৌহ আছে—আমার কিছুরই অভাব নাই।" মহারাজ শিবচন্দ্র, রামনাথ-পত্নীর এই উত্তর শ্রবণে একেবারে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন, এবং মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ধন্য রামনাথ পত্নি! তুমি তোমার পতির উপযুক্ত পত্নীই বট, কিরূপে স্বামীর সমদুঃখভাগিনী হইতে হয়, কিরূপে স্বামীর ধর্ম্মের মতানুবর্ত্তন করিতে হয় এবং কিরূপেই বা পতির সম্মান রক্ষা ও পতিভক্তি করিতে হয়, তাহা তুমিই উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছ। তুমি নারীকুলের আদর্শ এবং সতীর শিরোমণি!

অনন্তর রাজা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রামনাথকে অর্থ দিতে চাহিলেন কিন্তু রামনাথ কহিলেন, "মহারাজ! অর্থই অনর্থের মূল, ও অধ্যয়ন-রিপু, অর্থ লইলে আমার বংশাবলী ভোগবিলাসী, মূর্খ হইবে। আমার অর্থে প্রয়োজন নাই।"

এই সময়ে কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণের ভবনে একজন

নৈয়ায়িক, দিগ্‌বিজয় সংকল্পে আসিয়া উপস্থিত হন। তদুপলক্ষে তাঁহার ভবনে এক মহতী সভা হয়। ঐ সভায় তৎকালে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ও বংশবাটীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে রামনাথ আসিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া নবদ্বীপের মান রক্ষা করিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ রামনাথের পাণ্ডিত্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধন দিতে চাহিলেন। কিন্তু রামনাথ 'কাক-বিষ্ঠা' বলিয়া তাহা স্পর্শও করিলেন না। ধন্য রামনাথ! নিস্পৃহতা কি তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই তোমরা দম্পতীরূপে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলে।

তৎকালে নবদ্বীপে তর্কসিদ্ধান্ত উপাধিধারী দুইজন রামনাথ ছিলেন। একজন নৈয়ায়িক ও একজন স্মার্ত্ত। নৈয়ায়িক রামনাথ, গ্রামের প্রান্তে বাস করিতেন বলিয়া 'বুনো', এবং স্মার্ত্ত রামনাথ, গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া 'গেঁয়ে' নামে প্রসিদ্ধ হন। এই গেঁয়ে রামনাথের বংশাবলী নবদ্বীপে বর্ত্তমান আছেন। প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই গেঁয়ে রামনাথের প্রপৌত্র ছিলেন।

বুনো রামনাথের ছাত্র ধর্ম্মদহ বহিরগাছী নিবাসী কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতী মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের সভায় বর্ত্তমান থাকিয়া 'অন্তর্ব্যাকরণ নাট্য-পরিশিষ্ট' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ।– কৃষ্ণকান্ত সুপ্রসিদ্ধ রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের ছাত্র। ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধুকর মিশ্রের বংশধর কালীচরণ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র ছিলেন। অদ্যাপি ইহাঁর বংশধরেরা নবদ্বীপে ও পূর্ব্বস্থলীতে বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণকান্ত, ন্যায় ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি জগদীশকৃত ন্যায়শাস্ত্রীয় শব্দশক্তিপ্রকাশিকার এবং শিরোমণিকৃত

পদার্থতত্ত্বের 'টীকা', জীমূতবাহন-কৃত দায়ভাগের 'টীকা', গৌতমসূত্রের 'টীকা', কাব্যপ্রকাশিকার 'টীকা', এবং ন্যায়শাস্ত্রের উপমান-চিন্তামণির 'টীকা' রচনা করিয়া ন্যায় ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। কাব্যশাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তিনি 'গোপাললীলামৃত', 'চৈতন্যচিন্তামৃত' এবং 'কামিনীকামকৌতুক' নামে তিনখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় বিলক্ষণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি 'ন্যায়রত্নাবলী' নামে ন্যায়শাস্ত্রের সারসংগ্রহ এবং 'তন্ত্ররত্নাবলী' গ্রন্থে তন্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়রত্নাবলীতে লিখিত আছে—

নব্য প্রাচীন তার্কিক সর্ব্বার্থধীয়ান্ ধীমতা।
তন্যতে কৃষ্ণকান্তেন ন্যায়রত্নাবলী মতা॥

তিনি তন্ত্ররত্নাবলী গ্রন্থে নিম্নরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

এতদাদীনি তন্ত্রাণি পরিলোক্য বিচার্য্য চ।
বৈদিকান্বয়সম্ভূত নবদ্বীপনিবাসিনা॥
শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যেণ ধীমতা।
তন্ত্রাণাং সারভূতঞ্চ তন্ত্ররত্নং প্রতন্যতে॥ [১]

শব্দশক্তিপ্রকাশিকার 'শক্তিসন্দীপনী' টীকার প্রারম্ভে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

ন্যায়ালঙ্কারযুক্তং ত্রিভুবনজনকং শ্রীপতীশেন জুষ্টং
তুষ্টং ধীরেষু রুষ্টং সততমবিদুষাং শ্যামলং সামগীতং।
খ্যাতং তাতং নিতান্তং সদয়মসদৃশং মাদৃশাং সাধুসংজ্ঞং
শ্রীযুক্তং চাত্র কালীচরণমমচয়ং গ্রন্থমাদৌ প্রণম্য॥ ২
ন্যায়সংসারপাথোধি মগ্নোপাসকতারকং।
রামনারায়ণং বন্দে তর্কপঞ্চাননং গুরুং॥ ৫

(১) নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত পুথি হইতে সংগৃহীত।

ধীরশ্রীকৃষ্ণকান্তেন বিদ্যাবাগীশসংজ্ঞিনা।
ব্যাখ্যাগ্রতে সতাং তুষ্ট্যৈ শব্দশক্তিপ্রকাশিকা॥ ৬

এই 'টীকা' ১৭২৩ শকে (১৮০১ খৃঃ) রচিত হয়। যথা—

শাকে রামাক্ষিশৈলক্ষিতি পরিগণিতে কর্কটে যাতি ভানৌ
বিংশাহে বিশ্বনাথার্চিতপদযুগলং শ্যামলং মোক্ষবীজং।
ধ্যায়ন্নধ্যাপকানাং নিখিলপদপদার্থাদি চিন্তাপহন্ত্রীং
তেনে শ্রীকৃষ্ণকান্তাহ্বয় ইহ সুকৃতী টিপ্পনীং গূঢ়ভাবাং॥ ১

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তিনি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহ-কল্পদ্রুমের লিপি শেষ করেন।

চৈতন্যের লীলা অবলম্বন করিয়া 'চৈতন্যচিন্তামৃত' গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি প্রার্থনামূলক। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের বংশধর নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামীর নিকট চৈতন্যচিন্তামৃতের একখানি পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার শেষে গ্রন্থকর্ত্তার নাম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

শ্রীকৃষ্ণকান্তবচনং হৃদয়ে নিধায় গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণৌ পরিচিন্তয়ন্তু।
বৃন্দাবনে ব্রজপুরে গমনং বিনৈব মোক্ষং ব্রজন্তু সহসা ভুবি বৈষ্ণবা যে॥

মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপের উত্তরস্থ মাঠে ভূগর্ভ হইতে এক গোপাল মূর্ত্তি উত্থিত হয়। সেই ঘটনা অবলম্বনে 'গোপাললীলামৃত' লিখিত হয়। ঐ গোপাল দেব এক্ষণে কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছেন।

কৃষ্ণকান্ত অতিশয় অহঙ্কৃত ছিলেন। মৃত্যুকালে যখন তাঁহাকে গঙ্গার তীরস্থ করা হয়, তখন তাঁহার জনৈক আত্মীয় কহিলেন, "বিদ্যা-বাগীশ খুড়ো! গঙ্গায় আনা গেল; প্রণাম করুন।" তখন বিদ্যাবাগীশ উত্তর করিলেন, "বাপু হে! আনা গেল নহে, আনা রহিল। আমি গেলে নবদ্বীপের পনর আনা যাইবে, আনা মাত্র রহিবে।" এই বলিয়া তিনি

সেই মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন।

অধিগগন মনেকাস্তারকা দীপ্তিভাজঃ
প্রতি গৃহমপি দীপা দর্শয়ন্তু প্রভুত্বং।
দিশি দিশি বিলসন্তে ক্ষুদ্র খদ্যোতপোতাঃ
সবিতরি পরিভূতে কিন্নলোকৈর্ব্যলোকি॥

অর্থাৎ—সূর্য্য অস্তগমন করিলে আকাশে তারকা-সকল দীপ্তি পায়, গৃহে প্রদীপ-সকল প্রভুত্ব প্রদর্শন করে এবং ক্ষুদ্র জোনাকী পোকা সকলও টিপ্ টিপ্ করিয়া আলো করিবার চেষ্টা করে। ভাবার্থ, আমি চলিয়া গেলে, নবদ্বীপের পণ্ডিতেরাও সেই দশা প্রাপ্ত হইবেন।

ন্যায়ের প্রাধান্য পদ।—রঘুনাথ নবদ্বীপে ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপন করেন, এবং তিনিই প্রধান নৈয়ায়িক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তদবধি বঙ্গীয় নৈয়ায়িক সমাজে এক একজন প্রধান হইয়া আসিতেছেন। ঐ প্রাধান্যপদ রঘুনাথের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। রঘুনাথের পর হইতে, কে কোন সময়ে প্রাধান্য পদ প্রাপ্ত হন, তাহা ধারাবাহিক জানিতে পারা যায় নাই। গ্রন্থকার হইলেই প্রধান হইতেন এমন নহে। যাঁহার বিশেষ বাকৃপটুতা থাকিত এবং যিনি সভাজয়ী হইতে পারিতেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন হইতেন। হরিরাম তর্কবাগীশ প্রধান ছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়াছি। তৎপূর্ব্বে কে কোন সময়ে প্রধান ছিলেন জানিতে পারি নাই। গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ প্রধান ছিলেন তাহাও বলিয়াছি। গোবিন্দের পর আর কএক জনের বিষয় জানিতে পারা যায় নাই।

একজন প্রধান অধ্যাপকের মৃত্যু হইলে বঙ্গীয় পণ্ডিত-সমাজে একটী সভা হইত, বিচারে যিনি জয়ী হইতেন তিনিই একপত্রী হইতেন।

রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন।—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে

আমরা রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে এই প্রধানপদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। তিনি একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। ইহাঁর সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গদাধরের পৌত্র হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত, জগদীশের ছাত্র রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ ও যদুরাম সার্ব্বভৌম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ বর্ত্তমান ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ ও বুনোরামনাথ এই রামনারায়ণের ছাত্র ছিলেন। এক্ষণে রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের বংশ নাই।

হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত।—রামনারায়ণের মৃত্যুর পর হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত প্রাধান্য পদ প্রাপ্ত হন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ শিবরাম বাচস্পতির পুত্র। এই সময়ে শঙ্কর তর্কবাগীশ, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ ও রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে হরিরামের বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন। হেরম্ব ভট্টাচার্য্যের পুত্র হরমোহন বাবু এই বংশ সম্ভূত ছিলেন।

শঙ্কর তর্কবাগীশ।[২]—হরিরামের মৃত্যুর পর শঙ্কর তর্কবাগীশ প্রধান হইয়া উঠেন। শঙ্কর রাঢ়ী শ্রেণীয় যদুরাম সার্ব্বভৌমের পুত্র। তাঁহার প্রকৃত নাম রামশঙ্কর ও তাঁহার ভ্রাতা রামশরণ। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় বর্ত্তমান ছিলেন এবং পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। ইহাঁর সময়ে বুনোরামনাথ, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, (কৃষ্ণ) কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শরণতর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ বর্ত্তমান ছিলেন। শঙ্কর তর্কবাগীশের যদিও কোন গ্রন্থ নাই তথাপি তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে তাঁহার ও তদীয় সহোদর শরণ তর্কালঙ্কারের বংশধর, গঙ্গেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান আছেন।

শরণ তর্কালঙ্কার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। কবিত্বশক্তির জন্য তৎকালে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদিন আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও আলোকময় বিদ্যুৎমালা

(২) নবদ্বীপ নিবাসী কামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের গৃহে ১৬৭৮ শকে (১৭৫৬ খৃঃ) শঙ্কর তর্কবাগীশের স্বহস্তে লিখিত তিথিতত্ত্বের একখানি পুথি আছে।

দেখাইয়া, সেগুলি কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন। শরণ তর্কালঙ্কার মহারাজের যশঃ ও গুণ বর্ণনাচ্ছলে উত্তর দেন—

"শ্রীমন্নাথ তবার্জ্জিতোজ্জ্বল-যশঃ সংশুদ্ধমুক্তাবলী
মাদায়ৈব বিধির্বিধিৎসুরমলং হারং ত্বদীয়ৈ গুণৈঃ।
নীরন্ধ্রামপি তাং বিলোক্য সহসা নান্তং গুণানামপি
উৎপিৎসু র্গগনাঙ্গনে সমকিরৎ তান্তে তড়িত্তারকা॥ ৩

অর্থাৎ—হে মহারাজ, আপনার যশোরূপ পরম উজ্জ্বল মুক্তাবলী এবং আপনার গুণরূপ অতিশয় নির্ম্মল রজ্জু দেখিয়াই বিধি রমণীয় হার গাঁথিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ঐ মুক্তাবলী ছিদ্রশূন্য এবং গুণেরও অন্ত নাই দেখিয়া, বিরক্ত হইয়া বিধাতা সেগুলি আকাশ প্রাঙ্গণে ছড়াইয়া দিলেন। আপনারই গুণ ও যশোরাশি এক্ষণে আকাশে তড়িৎ ও তারকারূপে বিরাজ করিতেছে।

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি।—শঙ্করের পরলোকের পর তদীয় পুত্র শিবনাথ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে শঙ্কর তর্কবাগীশের শ্রাদ্ধ বাসরে বঙ্গদেশীয় অনেক স্থলের অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধ-সভায় সমবেত হন। বংশবাটী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই সভায় আহূত হইয়াছিলেন। তিনি শঙ্কর তর্কবাগীশের অবর্ত্তমানরূপ সুযোগ পাইয়া নৈয়ায়িক-সমাজে প্রাধান্য পদ লাভাশয়ে এক পূর্ব্বপক্ষ করিলেন। উপস্থিত অধ্যাপকগণ কেহই তাহার উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং নবদ্বীপের গৌরবলক্ষ্মী সেই দিনই অন্তর্হিত হইবার উমক্রম হইল। তখন শিবনাথ দানোৎসর্গ করিতেছিলেন। এমন সময়ে শিবনাথের কোন আত্মীয় কহিলেন, "শিবনাথ! তোমার পিতৃ-শ্রাদ্ধে বুঝি তোমার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া যায়।" তখন শিবনাথ দানোৎসর্গ পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথের সম্মুখীন হইলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের যথাযথ সিদ্ধান্ত করিয়া

(৩) হিতবাদী—১২ই শ্রাবণ ১৩০৭ সাল।

দিলেন। জগন্নাথ উত্তর শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "বৎস শিবনাথ! তোমার কিরূপ শিক্ষালাভ হইয়াছে তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য আমি এই পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি বুঝিলাম, যে তুমি তোমার পিতার উপযুক্ত পুত্র বট, তোমা হইতে নবদ্বীপের মান রক্ষা হইবে।" শিবনাথ অতি অল্প বয়সেই হরিনাথ নামে এক পুত্র রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। হরিনাথও বিশেষ পাণ্ডিত্যলাভ করেন। কোন এক সময়ে তিনি শ্রীরাম শিরোমণিকেও বিচারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কাশীনাথ চূড়ামণি।—শিবনাথের পর কাশীনাথ চূড়ামণি প্রধান নৈয়ায়িকের পদে অধিষ্ঠিত হন। এক্ষণে নবদ্বীপে কাশীনাথের বংশ নাই। কাশীনাথের পর **দণ্ডী** নামে একজন নৈয়ায়িক কিছুদিন ঐ পদ প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান নবদ্বীপের রাধাবাজার নামক পল্লী 'দণ্ডীর টোল' নামে আজিও অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীরাম শিরোমণি।—দণ্ডীর পর গদাধর ভট্টাচার্য্যের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, হরদেব তর্কসিদ্ধান্তের পৌত্র এবং কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীরাম শিরোমণি প্রাধান্য পদ প্রাপ্ত হন। তৎকালে নবদ্বীপে মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও শ্রীরাম শিরোমণি, এই দুইজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। মাধব তর্কসিদ্ধান্ত নলডাঙ্গার রাজার সভাসদ্ থাকিয়া সেই স্থানেই অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বিচার-সভায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীরাম শিরোমণিই প্রাধান্য-পদ প্রাপ্ত হন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে পর্য্যটক ভোলানাথ চন্দ্র নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীরাম শিরোমণিকে প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পান। 'নানা দিগ্দেশীয় প্রায় চল্লিশজন ছাত্র তখন তাঁহার টোলে শিক্ষালাভ করিত, তাহাদের মধ্যে একজন আসামদেশীয়, একজন ত্রৈলঙ্গদেশীয় ও একজন কালীঘাট হইতে আসিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীরাম শিরোমণিই বঙ্গদেশে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ঢাকা বিক্রমপুরের পণ্ডিতবর্গ

শ্রীরামকে বিদ্বান্ বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার বিমল প্রতিভায় সন্দেহ করিতেন। বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের এক বিরাট্ সভায় বিচারে তদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া শ্রীরাম শিরোমণি বিদ্বৎ-সমাজের অদ্বিতীয় সম্রাট্‌রূপে বিঘোষিত হন।"[৪] আলোকনাথ ও গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন নামে শ্রীরাম শিরোমণির দুইজন প্রধান ছাত্র ছিলেন। বেলপুকুরের মঃ মঃ প্রসন্ন ন্যায়রত্ন এবং রঙ্গপুরের অন্তর্গত ইটাকুমারীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কারও (মৃত্যু ১২৬০ সাল) তাঁহার ছাত্র ছিলেন। ইঁহারা সকলেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামের পুত্রগণও প্রধান ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত।—মাধবচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ যশোহর জেলার ভুগিলহাট গ্রাম হইতে নবদ্বীপ আসিয়া বাস করেন। কিম্বদন্তী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভৈরব নদের বেগ রোধ করায়, তাঁহারা 'বেগফেরান ভট্টাচার্য্য' নামে অভিহিত হইয়াছেন। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মাধবচন্দ্রের পিতা। শ্রীরাম শিরোমণির প্রাধান্য লাভের পর মাধবচন্দ্র নবদ্বীপে আসিয়াই চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তিনি অতি শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি শক্তিবাদের যে টীকা করেন তাহাতে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

> খ্যাতঃ পূতকুলার্ণবেন্দুসদৃশো যশ্চক্রপাণিঃ স্বয়ং
> তদ্বংশ্যো নদরাজভৈরব-মহাবেগান্যথাকারকঃ।
> যো রাজেন্দ্রকৃতী তদীয় কুলজো বিখ্যাতবিশ্বেশ্বর
> স্তৎপুত্রোঽহমিমাং করোমি বিবৃতিং শ্রীমাধবস্তার্কিকঃ॥
> টীকাং বিজ্ঞজনপ্রমোদজননীং সিদ্ধান্তসিদ্ধাং শুভাং
> শ্রীমন্মাধবনামকেন রচিতাং যত্নেন ধীভিঃ শুভৈঃ।

(৪) Vide, The Travels of a Hindu, Vol. I, by Bholanath Chunder,—p. 39.

কাষায়ৈঃ পরিমৃজ্য চিত্রতরণিং সংশ্রিত্য পারং পরং
ধীরো গচ্ছতু সৎপদার্থকুতুকী সৎশক্তিবাদার্ণবে॥

মাধবচন্দ্র কাব্যচন্দ্রিকার কাব্যমালাখ্য টীকা করেন। ঐ টীকায় তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

শ্রীনবদ্বীপবসতিঃ শ্রীমন্মাধবসজ্ঞকঃ।
বিদ্বজ্জনবিমোদার্থং তনুতে কাব্যমালিকাং॥

তিনি শিরোমণিকৃত পদার্থখণ্ডনের 'সুবোধা' নামে এক টীকা করেন। খণ্ডনের যে কয়খানি টীকা আছে, 'সুবোধা' তাহাদের কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। মাধব 'সুবোধা'য় লিখিয়াছেন—

যো বিষ্ণবে ত্রিজগতাং প্রণিধায় ভারং
স্বাভীষ্টয়া গিরিজয়া কুতুকী সদৈব।
দেবং তমেব প্রণিপত্য পদার্থতত্ত্বে
শ্রীমাধবো বিতনুতে বিবৃতিং সুবোধাং॥

এতদ্ভিন্ন মাধব জগদীশ্বর-রচিত হাস্যার্ণব প্রহসনের টীকা, মুগ্ধবোধের কারকচক্রের টীকা বিস্তৃতরূপে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, অমর-কোষের ন্যায় এক অভিধানও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল পুস্তক শেষ না হইতেই তিনি ১২৭১ সালের শেষে (১৮৬৫ খৃঃ) কালকবলে পতিত হন।

মাধবচন্দ্রের বংশধরেরা আজও নবদ্বীপে ব্যাদ্‌ড়াপাড়ায় বাস করিতে-ছেন। ১৩২১ সালের (১৯১৪ খৃঃ অঃ) ৯ আষাঢ় ইহাঁর পৌত্র হরিদাস ন্যায়সিদ্ধান্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। হরিদাস নিষ্ঠাবান, আনুষ্ঠানিক, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ এবং "নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ-সমাজ" সভার মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখন হরিদাসের পুত্র চিত্রশিল্পী শ্রীকালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

কোন্নগর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন,

বহরমপুরনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণি, এবং নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও কোঁড়কদি নিবাসী রামধন তর্কপঞ্চানন মাধবচন্দ্রের কৃতী ছাত্র ছিলেন।

গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন।—১৭২৮ শকে (১৮০৬ খৃঃ) হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের পুত্র গোলোকনাথ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে পিতার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কাব্য ও সাহিত্যাদি পাঠ করিবার সময়েই তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু তখন তাঁহার শরীর রুগ্ন থাকায় পাঠে তাদৃশ উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। পিতার নিকট পাঠ সমাপন করিয়া, গোলোকনাথ তৎকালীন বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণির নিকট ন্যায় পাঠে প্রবৃত্ত হন। পাঠ সমাপনান্তে তিনি অধ্যাপকের নিকট 'ন্যায়রত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং শান্তিপুরের জমিদার শিববাবুর অর্থ সাহায্যে নবদ্বীপে টোল সংস্থাপন করেন। ন্যায়শাস্ত্রীয় প্রতিভায় তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে প্রখ্যাত হন, এবং পাণ্ডিত্যে তাঁহার অধ্যাপককেও তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিচার-পদ্ধতি অতি সুন্দর ছিল—বিচারকালে তিনি এমন বিনীত ও ধীরভাবে প্রশ্ন সমুদায়ের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেন এবং এমন যুক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক তর্ক করিতেন যে, তাহাতে প্রতিপক্ষগণের সন্তুষ্টি ভিন্ন কখনও বিরক্তি-উৎপাদন করিত না। তিনি বিক্রমপুরের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত দেবীপুর নামক গ্রামে এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ক্রিয়োপলক্ষে নানাদেশীয় পণ্ডিত-গণের সহিত নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণি, মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় গোলোকনাথের প্রতিভার নিকট শ্রীরাম শিরোমণি ও মাধব তর্কসিদ্ধান্তের প্রতিভাকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার পর শ্রীরাম শিরোমণি ঈর্ষা-পরবশ

হইয়া গোলোকনাথকে পর্যুদস্ত করিতে চেষ্টা করেন। তখন গোলোকনাথ, শিরোমণি মহাশয়কে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "আপনি প্রদীপ, আমি মশাল; আমার মশাল আপনার দীপশিখায় ধরাইয়া লইয়াছি মাত্র।" বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিতে পটু নহেন। কিন্তু গোলোকনাথ সংস্কৃতভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারিতেন। একবার কলিকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে, জ্যোতিস্মর পরমহংস নামক পশ্চিমদেশীয় এক পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া বিচারপ্রার্থী হন। তাঁহার সংস্কৃত বাক্‌পটুতায় বঙ্গদেশীয় প্রায় সকল পণ্ডিতই বিনাবিচারে পরাভব স্বীকার করেন। কেবল গোলোকনাথ অসীম বাগ্মিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার বলে জ্যোতিস্মরকে বিচারে পরাজিত করিয়া, বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষা করেন। পূজার প্রাক্কালেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরে, নরাইলের জমীদার রামরত্ন রায় মহাশয়ের কলিকাতার উপনগরী কাশীপুরের বাসা বাটীতে, বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া, মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে, ১৭৭৬ শকে (১৮৫৪ খৃঃ) গোলোকনাথ কালকবলে পতিত হন।

এই অল্প সময়ে, গোলোকনাথের পাণ্ডিত্য-প্রতিভা এমন সুপ্রচারিত হইয়াছিল যে, ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাঁহাকে সভাসদ্ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতি ও মথুরাধিপতি তাঁহাকে নিজ নিজ সভায় লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বহু অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু নিস্পৃহ ন্যায়রত্ন মহাশয় অর্থের প্রলোভনে স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিতে ঘৃণাবোধ করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত অনেকগুলি পুথি নবদ্বীপ লাইব্রেরীতে রক্ষিত হইতেছে, এবং অনেকগুলি পাশ্চাত্য জগতে চলিয়া গিয়াছে। গোলোকনাথ ন্যায়রত্নের রচিত সামান্যনিরুক্তি, সব্যভিচার, অবচ্ছেদোক্তনিরুক্তি প্রভৃতি গ্রন্থের অনেকগুলি পত্রিকা পাওয়া যায়। এই পত্রিকাগুলি এরূপ

জটিল প্রশ্নে পূর্ণ যে, ঐগুলি ন্যায়সংসারে "গোলুকে কূট" নামে অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থ এরূপ সুপ্রচারিত হইয়াছিল যে, সুদূর মাদ্রাজ-প্রদেশেও তাঁহার গ্রন্থের পঠন-পাঠন হইত। মাদ্রাজ লাইব্রেরীতে তেলেগু অক্ষরে লিখিত গোলোক ন্যায়রত্নের 'পঞ্চলক্ষণীবিবেচনী' ও 'গোলোকন্যায়রত্নীয়ম্' নামক দুইখানি গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে।[৫] গ্রন্থ দুই-খানিতে ব্যাকরণের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। প্রসন্ন তর্করত্ন গোলোকনাথের ছাত্র ছিলেন।

হরমোহন চূড়ামণি।—শ্রীরাম শিরোমণির মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হরমোহন চূড়ামণি প্রাধান্য পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় মাধব তর্ক-সিদ্ধান্ত ও প্রসন্ন তর্করত্ন বর্তমান ছিলেন। মাধব প্রাধান্যের বাসনা না করায়, হরমোহন ঐ পদ প্রাপ্ত হন। হরমোহন, জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রণীত অনুমান খণ্ডের সামান্যলক্ষণা পরিচ্ছেদের 'সামান্য লক্ষণা ব্যাখ্যা' নামে একখানি টীকা করিয়া স্বীয় বংশগৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে—

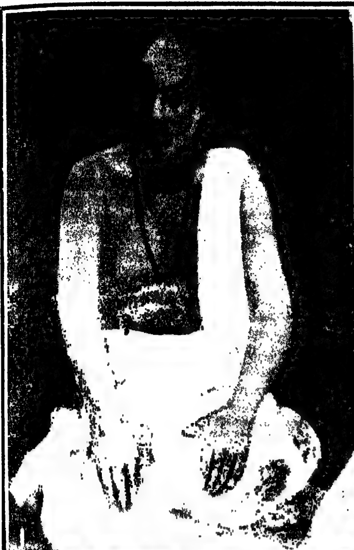
শ্রীরামমিব মত্তাতং শ্রীরামং পুরুষোত্তমং।
শিরোমণি তয়াখ্যাতং বন্দেঽহমতি যত্নতঃ॥
সামান্যলক্ষণাব্যাখ্যা জগদীশেন যা কৃতা।
তাং টীপ্পনীং শ্রিয়াযুক্ত স্তনুতে হরমোহনঃ॥

উক্ত পুস্তক ১৭৮৫ শকে (১৮৬৩ খৃঃ অঃ) লিখিত হয়।

রম্যং শ্রীহরমোহন দ্বিজ ইহচ্ছাত্রেচ্ছয়োবেত্যহং।
শাকে বাণ বসুদধীন্দু বিমিতেঽদঃ পুস্তকং নির্ম্মমে॥

হরমোহন চূড়ামণির পুত্র অবিনাশ ন্যায়রত্ন মহাশয়ও ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন।

(৫) Vide, A Triennial Catalogue of MSS., Government Oriental Manuscripts Library, Madras—R. 1583 (a) & (b).









১)   মঃ মঃ ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন   (২)   মঃ মঃ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন

৩)   মঃ মঃ রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন   (৪)   মঃ মঃ যদুনাথ সার্ব্বভৌম

প্রসন্ন তর্করত্ন।—প্রসন্ন তর্করত্ন একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। কোন সময়ে, লক্ষ্ণৌ-নিবাসী ধনাঢ্য মাড়ওয়ারী বাবুলাল আগরওয়ালার গুরুপুত্র নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিয়া প্রসন্ন তর্করত্নের টোলে পড়িতে থাকেন। তৎকালে টোল গৃহগুলিতে বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। গুরুপুত্রের কষ্টের কথা শ্রবণ করিয়া, বাবুলাল দয়াপরবশ হইয়া বহু অর্থ ব্যয়ে বিদ্যার্থীদের কষ্ট নিবারণের জন্য ইষ্টক-নির্ম্মিত এক সুন্দর গৃহ করিয়া প্রসন্ন তর্করত্নের টোল করিয়া দেন। ইহাই 'পাকাটোল' নামে পরিচিত। বাবুলাল কেবল টোল গৃহ করিয়া দিয়াছেন এমন নহে, তিনি ঐ টোলের ছাত্রদিগের আহারেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, নবদ্বীপের টোল-সমূহের তথ্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ই, বি, কাউ-য়েল মহাশয় নবদ্বীপে আগমন করেন। তৎকালে তিনি যে সকল টোল দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পাকা-টোলের বিশেষ উল্লেখ করিয়া, তাহার অবস্থান, গৃহসংখ্যা এবং প্রতিকক্ষের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[৬] মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার এবং মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্ব-ভৌম প্রসন্ন তর্করত্নের ছাত্র ছিলেন।

---

(৬) পাকাটোল সম্বন্ধে কাউএল সাহেব লিখিয়াছেন—

"It was built for him by a Hindu gentleman of Lucknow and is really an elegant building, occupying about half an acre of land. The quadrangle inside, is about 30 yds. square and contains 30 rooms for the students. The rooms are generally about 9 ft. long and 8 wide, with a window and a door. The corner rooms are rather longer. More than half of one side is given up to lecture-hall. This stands on a platform raised some five feet from the ground, it has two apartments, each about 33 ft. in length, the outer is ten and the inner 12 ft. wide, and the front is supported by 6 pillars, which produce a very good effect."

পাকাটোলের ভূমি ও গৃহাদি প্রসন্ন তর্করত্নের নামে থাকায়, উত্তরকালে তর্করত্ন মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণের সহিত, বাবুলাল নিযুক্ত পাকাটোলের ট্রাষ্টীগণের, টোলের স্বত্ব লইয়া মোকর্দ্দমা হয়। তাহাতে ট্রাষ্টীগণ পরাজিত হইয়া উক্ত টোলের গৃহাদি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন, এবং ১৩২৯ সালে তাহারা নবনির্ম্মিত সুরম্য গৃহে বর্ত্তমান পাকাটোলের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেন।

হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত।—হরমোহনের মৃত্যুকালে প্রসন্ন তর্করত্ন ও গোলোকনাথের পুত্র হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। হরিনাথ মূলাজোড়ের সংস্কৃত কলেজে ন্যায়াধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকায়, প্রাধান্য-পদের অনধিকারী হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মূলাজোড়ের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। শিক্ষার গুণে তাঁহার টোলে বহু ছাত্র হইয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন, তখন তাঁহার টোলে ৭৫ জন ছাত্র ছিল। ইহার বিশ বৎসর মধ্যে নবদ্বীপের কাহারও টোলে এত অধিক ছাত্রের সমাগম দেখা যায় নাই।

হরিনাথ অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করিয়াছেন, সেগুলি নৈয়ায়িক-সমাজে যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে। তিনি ১২৯৪ সালে গদাধর-বিরচিত মুক্তিবাদের টীকা করেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

ভূতিমিব জগদ্ভূতিং দর্শয়ন্নিব ভূতিমান্।
যো ভবঃ সভবানীকং বন্দে তং ভবহানয়ে॥
তর্কো ভৃঙ্গমিবাম্ভোজং গোলোকনাথমাপয়ন্।
তৎসূনু হরিনাথেন মুক্তিবাদো বিশদ্যতে॥

তিনি ১৯৪১ সংবতে (১৮৮৪ খৃঃ) গদাধর-বিরচিত শক্তিবাদেরও একটী টীকা রচনা করেন। তাহার প্রারম্ভে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্বদ্বরোঽভূদ্ হরচন্দ্রনামা তৎপুত্র আসীৎ প্রথিতাতিকীর্ত্তিঃ।
গোলোকনাথঃ শুচিনীরজং সদ্বাণীশ্রিতা যদ্রসনং বিদিত্বা॥
বিচিন্ত্য তত্তাতপদারবিন্দং বিভাব্য গাঢ়ং হরিনাথনাম্না।
বিশদ্যতে দুর্গমশক্তিবাদঃ সতাং প্রমোদায় গদাধরোক্তঃ॥

১২৯৪ সালে তিনি 'ন্যায়তত্ত্বপ্রবোধিনী' রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলি হরিনাথের পুত্র সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি শক্তিবাদের টীকাখানি পণ্ডিতপ্রবর দামোদর শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক কাশী হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

হরিনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে মূল গৌতমসূত্রের টীকা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, গ্রন্থখানি তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে—

মহর্ষিং গৌতমং নৌমি বাৎসায়নমহং পুনঃ।
গোলোকনাথপিতরং ন্যায়রত্নমতঃপরং॥
বাসুদেব-ভবানন্দ-রঘুনাথাদিতো যথা।
অবনী শোভিতা তদ্বন্নবদ্বীপোঽপি শোভিতঃ॥
জাতস্তস্মিন্ নবদ্বীপে হরিনাথঃ শ্রিয়া সুধীঃ।
ব্যাখ্যামি ন্যায়সূত্রাণি ভাষ্যাদেরনুসারতঃ॥

হরিনাথের ছাত্রগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীচণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন।

হরিনাথের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় B.A., B.L. এবং কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় B.A., L.C.E. (ইঞ্জিনিয়ার) মহাশয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হন; এবং মধ্যম পুত্র **সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম** সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন. এবং কিছুকাল পাকাটোলের সহকারী অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কিছুদিন 'নবদ্বীপ বিদগ্ধ-জননী সভার' সম্পাদক ছিলেন। তিনি পিতৃকৃত গ্রন্থসমুদায়, জয়কৃষ্ণ-বিরচিত 'শব্দার্থসারমঞ্জরী' এবং নিজ-রচিত বঙ্গানুবাদসহ 'সটীক ন্যায়দর্শন' মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। তিনি সংস্কৃতভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অকালে তাঁহার পরলোক হওয়ায়, এই বংশে সংস্কৃত শিক্ষা লোপ পাইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন।—হরমোহন চূড়ামণির মৃত্যুর পর তাঁহার সহোদর ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ন্যায়ের প্রাধান্য-পদ

প্রাপ্ত হন। তিনি পিতা শ্রীরামশিরোমণি ও খুল্লতাত রঘুমণি বিদ্যাভূষণের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশৎ বর্ষে সুবর্ণজুবিলি উপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় উপাধির সৃষ্টি হইলে, যে ছয়জন পণ্ডিত প্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা বিভূষিত হন, ভুবনমোহন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের দুইজন নৈয়ায়িক অধ্যাপককে গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইলে, ভুবনমোহন মাসিক ১০০৲ টাকার প্রথম বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় তার্কিক এদেশে কেহ ছিলেন না। নানাদেশীয় ছাত্রমণ্ডলীতে তাঁহার টোল পরিপূর্ণ ছিল, ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার পাণ্ডিত্য গৌরব প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র পণ্ডিত-সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বত্র বিজয়-লাভ করিয়া নবদ্বীপের গৌরব-লক্ষ্মীকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি গদাধর প্রণীত কাব্যাদর্শের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। আজীবন নীরস তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করিলেও, তাঁহার মধ্যে সুন্দর কাব্যরসের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি 'রাধাপ্রেমতরঙ্গিনী' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পাদপূরণেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা দেখা যায়। কোন সময়ে, তিনি কোন গার্হস্থ্য কলহের মীমাংসার জন্য সালিশী নিযুক্ত হন, সালিশে কলহের মীমাংসা না হওয়ায় নালিশ হয়, এবং তন্নিবন্ধন তাঁহাকে কয়েকবার আদালতে উপস্থিত হইতে হয়। এই কার্য্যে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া, নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী পোড়ামাতা দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক সরস বাক্যে তিনি বলিয়াছিলেন—

"বালিশং সালিশং মত্বা নালিশং কৃতবান্ যতঃ।
হালিশং নির্গতং দেহে মালিশং দেহি শঙ্করি॥"

তাঁহার রচিত বহু শ্লোক এখনও লোকমুখে প্রচলিত আছে, তাহাতে উচ্চশ্রেণীর কাব্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার অগণিত ছাত্রের মধ্যে—কোটালিপাড়া-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন ও জয়নারায়ণ তর্করত্ন, তর্ককেশরী মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় সীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি এবং কবিবর রাজকুমার ন্যায়রত্ন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"ভুবনান্ত গদাধরঃ"—ভুবনমোহনই গদাধর বংশের শেষ পণ্ডিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ১৩০০ সালের (১৮৯৩ খৃঃ) ১৯এ শ্রাবণ তাঁহার লোকান্তর হইলে, তাঁহার ছাত্র কোটালিপাড়া-নিবাসী পণ্ডিতবর জয়নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় অল্পদিন তাঁহার টোলে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

ভুবনমোহনের একমাত্র পুত্র শ্রীনগেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ এখন বর্ত্তমান আছেন।

মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন।—মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রাধান্য পদে অধিষ্ঠিত হন। রাজকৃষ্ণ সূর্য্যকান্ত বিদ্যালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৭৫৫ শক (১৮৩৩ খৃঃ) ২৯এ পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা তিন সহোদর—রাজকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও ব্রজকৃষ্ণ। রাজকৃষ্ণ পিতার নিকট ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া মাধব তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায় অধ্যয়ন করেন, এবং পাঠ সমাপ্তির পর ১২৭১ সালের প্রসিদ্ধ ঝটিকাবর্ত্তের পর মাধব তর্কসিদ্ধান্তের টোলের আসবাব পত্র সংগ্রহ করিয়া আপনার টোল স্থাপন করেন।

ইহাঁর সাংসারিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল, পিতৃহীন হইয়া কোন প্রকারে রাজকৃষ্ণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর যদুনাথ সার্ব্বভৌম ও রাজকৃষ্ণ প্রাধান্যপদের প্রার্থী হন। ইহাতে রাজ-সভাপণ্ডিত পণ্ডিতবর অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন, "যদুনাথের ১০০৲ টাকা বৃত্তি আছে, রাজকৃষ্ণকেই পদ দেওয়া উচিত।" মহারাজ উভয়ের দোষগুণ দেখাইয়া দিতে বলায়,

ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বলেন, "অধ্যাপক-বংশে রাজকৃষ্ণের জন্ম।" ইহাতেই রাজকৃষ্ণ ১৮১৭ শকে (১৮৯৫ খৃঃ) প্রাধান্যপদ প্রাপ্ত হন। ভুবনমোহনের মৃত্যুর পর তর্কপঞ্চানন মহাশয় গভর্ণমেণ্টের ন্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি পাইতে থাকেন। তিনি পাকাটোলেও অধ্যাপনা করিতেন। বঙ্গের তদানীন্তন লেফ্‌নাণ্ট গভর্ণর উডবরণ সাহেবের সময় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে বিসূচিকা রোগে ৭৮ বৎসব বয়সে তঁহার মৃত্যু হয়।

রাজকৃষ্ণ অতিশয় তেজস্বী, অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ও বিচারদক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার অনন্য-সাধারণ সূক্ষ্মদর্শন ছিল। হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ইহাঁর ছাত্র। ইহাঁর চারি পুত্রের মধ্যে শ্রীশিবনাথ তর্কতীর্থ সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য M. A. পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত।

মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম।[৭]—যদুনাথ ১২৪৮ সালের (১৮৪১ খৃঃ) আশ্বিন মাসে শুক্লাষষ্ঠীতে নবদ্বীপে মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন. হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ার নিকটবর্ত্তী সাতগাছিয়া গ্রাম-নিবাসী রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতা। তাঁহারা দুই ভাই—যদুনাথ জ্যেষ্ঠ ছিলেন ও কনিষ্ঠ মহেন্দ্রনাথ ভাগলপুরের সরকারী উকিল ছিলেন। যদুনাথ বাল্যে মাতামহ রামনাথ ন্যায়রত্নের নিকট পাঠ আরম্ভ করেন। তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতির পাঠ সমাপ্ত করিয়া, পাকাটোলের প্রথম অধ্যাপক প্রসন্ন তর্করত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। পঠদ্দশাতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছিল। তখনই তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি,

(৭) সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পৌত্র শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবরণ হইতে সংগৃহীত।

অলৌকিক মেধা, অক্লান্ত শ্রমশক্তি, অকাট্য যুক্তিনৈপুণ্য ধীরস্থির বিচারশক্তি ও অনন্যসাধারণ চরিত্র-মাহাত্ম্য দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। পাঠসমাপনান্তে অধ্যাপকের নিকট তিনি 'সার্ব্বভৌম' উপাধি প্রাপ্ত হন। শুনা যায়, এই উপাধি দান কালে তাঁহার অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, "বাসুদেব সার্ব্বভৌম হইতে নবদ্বীপে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, তোমাকে সার্ব্বভৌম উপাধি দিলাম—তোমা হইতে নবদ্বীপে ন্যায়ের শেষ হইবে।"

অতঃপর যদুনাথ, প্রসন্ন তর্করত্নের সহকারীরূপে পাকা টোলে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং তর্করত্ন মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনিই পাকা-টোলের প্রধান অধ্যাপক হন। কিন্তু অল্পদিন পরেই টোলের আভ্যন্তরীন গোলযোগের সূচনা হওয়ায় তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া, নবদ্বীপের ওলাদেবী তলায় স্বতন্ত্রভাবে টোল স্থাপন করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট হইতে নবদ্বীপের দুইজন নৈয়ায়িক অধ্যাপককে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইলে, যদুনাথ সার্ব্বভৌম মাসিক ৫০৲ টাকার দ্বিতীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হন, এবং ভুবনমোহনের মৃত্যুর পর তিনি নৈয়ায়িকের প্রথম বৃত্তি ১০০৲ পাইতে থাকেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।

মিথিলা, মান্দ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি বহু দূরদেশীয় ছাত্রগণে তাঁহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ ছিল। তাঁহার কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ, মিথিলাবাসী শ্রীচন্দ্রশেখর ঝা ও বৃন্দাবনবাসী অশেষ-শাস্ত্রাধ্যাপক গোস্বামী শ্রীদামোদরলাল শাস্ত্রীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উদয়নাচার্য্যের বৌদ্ধাধিকার বা আত্মতত্ত্ববিবেকের মথুরানাথ তর্কবাগীশ-কৃত বিবৃতির উপর টিপ্পনী রচনা করিয়া যদুনাথ পাণ্ডিত্যের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার টিপ্পনী সহিত আত্মতত্ত্ববিবেক ১৮২২ শকে মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে—

বৌদ্ধাধিকারবিবৃতিস্তর্কবাগীশনির্ম্মিতা।
সার্ব্বভৌমোপাধিকশ্রীযদুনাথেন তন্যতে ॥

মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর এক বৎসর পরে ১৩১৯ সালের (১৯১২ খৃঃ) ২৭এ আষাঢ় যদুনাথ সার্ব্বভৌমের দেহত্যাগ হওয়ায়, নবদ্বীপ নৈয়ায়িক-শূন্য হইয়া তাঁহার অধ্যাপকের বাক্য সার্থক করিয়াছে। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে কেহই সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন নাই। তাঁহার পৌত্রগণ নবদ্বীপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।—মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌমের মৃত্যুতে নবদ্বীপ নৈয়ায়িক-শূন্য হইলে, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় প্রধান ন্যায়াধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আপন গুরুস্থান, নবদ্বীপে আগমন করেন।

১২৫০ সালে (১৮৪৩ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসে হাওড়া জেলার প্রতাপপুর গ্রামে কামাখ্যানাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামব্রহ্ম শিরোমণি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও নিতান্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। বাল্যকালে কামাখ্যানাথ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের পাঠ শেষ করিয়া ১৩ বৎসর বয়সে তড়া আঁটপুর গ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ন্যায়ভূষণ মহাশয় তীক্ষ্ণ-প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রের তৃপ্তিসাধন করিতে না পারায়, তাঁহাকে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের নিকট পাঠাইয়া দেন। ভুবনমোহন, পরীক্ষা দ্বারা কামাখ্যানাথের বুদ্ধিমত্তার যথোচিত পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। এইস্থানে তিনি প্রায় দশ বৎসর ন্যায়াধ্যয়ন ও তর্কের কূট প্রশ্ন-সমূহ আয়ত্ত করিয়া 'তর্কবাগীশ' উপাধি লাভ করেন।

অতঃপর তিনি স্বগ্রামে টোল স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায়প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়াখ্যানাথকে প্রথমে মাত্র ত্রিশ টাকা বেতনে স্কুলে প্রবেশ করান। পরে তিনি টোল বিভাগে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন সংস্কৃত কলেজে এম-এ পড়ান হইত। তর্কবাগীশ মহাশয় এম-এ ক্লাশে ন্যায় ও নৈষধ পড়াইতেন।

এসিয়াটিক সোসাইটী ন্যায়শাস্ত্রের প্রাচীন পুস্তক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তর্কবাগীশ মহাশয় উক্ত কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন, এবং সমগ্র 'তত্বচিন্তামণি দীধিতি বিবৃতি' প্রকাশ করেন। প্রাচীন ন্যায় 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের টীকা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ ছিল, তিনি হরিদাসী টীকার উপর একটী টীকা রচনা করেন। 'সাংখ্যদীপনী', 'ন্যায়তত্ত্ববোধিনী', 'ন্যায়বার্ত্তিক', 'ন্যায়সপ্তপদার্থী', ও ভাষাপরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রীয় বহুগ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন।

দ্বারভাঙ্গা. ত্রিপুরা, যোধপুর, জয়পুর প্রভৃতি প্রদেশের রাজন্যবর্গ সকলেই তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায়শাস্ত্রীয় বিচার শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। সর্ব্বত্রই তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাকে সভাপণ্ডিত পদে বরণ করেন। তিনি নির্ভীক পুরুষ ও সুরসিক ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

সংস্কৃত কলেজ হইতে পেন্সন গ্রহণ করিবার পর, তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নবদ্বীপের চাকুরী গ্রহণ করিয়া এখানে আগমন করেন। বঙ্গের প্রথম গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ৩০এ আগষ্ট যখন নবদ্বীপ দর্শন করিতে আসেন, তখন তর্কবাগীশ মহাশয়ের টোলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বঙ্গভাষায় আলাপ-পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। তখন তিনি তর্কবাগীশ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "বঙ্গের কেন আপনি সমগ্র ভারতবর্ষের ন্যায়সূর্য্যের প্রতীক।" লাট সাহেবের উক্তি

সর্ব্বৈব সত্য। তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায় বিচার-দক্ষ তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত অতি বিরল। ১৩৪৩ সালের (১৯৩৭ খৃঃ) ২৬এ ফাল্গুন ৯৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, সত্যই ভারতের ন্যায়সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। এই অতি বার্দ্ধক্যে মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত তিনি অতি দক্ষতার সহিত অধ্যাপনা করিয়াছেন। তাঁহার বহু কৃতী ছাত্র বর্ত্তমান আছেন—তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্ত্রী, আশুতোষ শাস্ত্রী, সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল—তাঁহার গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীঅখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল. হাওড়া কোর্টে ওকালতি করেন।

মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ।[৮]—যশোহর জেলার অন্তঃপাতী মল্লিকপুর গ্রামের চট্টোপাধ্যায়বংশে বিশ্বনাথ শিরোমণির পুত্র আশুতোষ তর্কভূষণ ১২৬৮ সালের (১৮৬১ খৃঃ) ২০এ ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে পিতার কাছে ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া তিনি ন্যায়াধ্যয়ন জন্য মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে গমন করেন। সেই স্থানে কিছুকাল হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়া, তিনি কোঁড়কদির রামধন তর্কপঞ্চাননের নিকট নব্য-ন্যায়ের পাঠ সমাপ্ত করেন, এবং ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে পরীক্ষা দান করিয়া 'তর্কভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি নবদ্বীপে আগমন পূর্ব্বক পুনরায় হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নিকট প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং 'ন্যায়তীর্থ' উপাধি পান। রাজসাহীতে পরীক্ষা দিয়া তিনি 'ন্যায়ভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

---

(৮) তর্কভূষণ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় M.A., B.T. মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত।

অতঃপর তিনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের কৃষ্ণনগরস্থ টোলে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। এই স্থানে বার বৎসর কার্য্য করিবার পর (১৯০৬ খৃঃ) নবদ্বীপের পাকা-টোলের দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। মঃ মঃ রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে, তর্কভূষণ মহাশয় গভর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় ন্যায়াধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি গভর্ণমেণ্টের টোল, পাকাটোল ও রায় ভগবান দাস বগলা বাহাদুরের কাঁচা টোলে অধ্যাপনা করিতেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় পাকাটোলের নবনির্ম্মিত গৃহ প্রস্তুত হয়।

তর্কভূষণ মহাশয় কুসুমাঞ্জলির সটীক বঙ্গানুবাদ করেন, রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি ন্যায়দর্শনের বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই—তাহার একখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। টাকীর বিদ্যোৎসাহী জমীদার শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহে ও অর্থ-সাহায্যে তিনি ১৮৩১ শকে (১৯০৯ খৃঃ) গৌতমসূত্রের টীকা রচনা করেন। এই টীকা তাঁহার অধ্যাপক হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। গৌতমসূত্রের টীকায় তর্কভূষণ মহাশয় যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন তাহা পাদটীকায় প্রদত্ত হইল।[৯] তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েসন, নবদ্বীপ

---

(৯) গৌতমসূত্রের টীকার শেষে তর্কভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—

নত্বা রামধনং গুরুং গুরুসমং সত্তর্কপঞ্চাননং
পাদাব্জং হরিনাথতার্কিকগুরোঃ সঞ্চিন্তয়ন্ চেতসা।
শাকে চন্দ্র শিবাক্ষিনাগবিধুমে তস্যোপদেশাদহং
উত্তীর্ণোস্মি সমাপ্য গোতম বচো ব্যাখ্যা স্বচিন্তার্ণবাৎ॥

গোলোকবস্তুহরিরত্র নবীনভূমৌ শিক্ষার্থমেব সকলস্য য আবিরাসীৎ।
দুর্গম্য তর্কগহনে কিল যস্য লীলা, সোঽধ্যাপকো মম গুরুর্হৃদয়ে চকাস্তু॥
ব্যাখ্যায় সূত্রমিহ স প্রথমাহ্নিকস্য, ক্ষৌণীন্দু নাগধরণী প্রমিতে শকাব্দে।
যাতঃ স্বধাম সহসা বিধিদুর্বিপাকাৎ, তৎ কীর্ত্তিরক্ষণ বিধাবহমত্র বৃত্তঃ॥

বঙ্গ-বিবুধজননী সভা ও পঞ্জাব গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় অতি শান্তপ্রকৃতি, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার প্রবল প্রীতি ছিল। তিনি ভিক্ষালব্ধ অর্থে স্বগ্রামে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩১ সালের (১৯২৫ খৃঃ) ২৩এ চৈত্র নবদ্বীপে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি নবদ্বীপে স্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র এখন নবদ্বীপেই বাস করিতেছেন।

হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, পঞ্জাব, নেপাল প্রভৃতি স্থানবাসী বহু ছাত্র তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিত। তাঁহার কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে, শশাঙ্ক-ভূষণ তর্কতীর্থ মহাশয় তাঁহার মৃত্যুর পর পাকাটোলের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং অমরচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় পাকাটোলের দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

দ্বিতীয়াহ্নিকমারভ্য চতুর্থৈকোনবিংশতিং।
যাবৎ ব্যাখ্যায়ি সূত্রস্তু ময়া ভাষ্যাদিভিস্ততঃ॥
সপ্তমাহ্নিক পর্য্যন্তং ব্যাখ্যায় পীড়িতে ময়ি।
সর্ব্বেশ্বরো হি তৎপুত্রো মৃতোঽনুত্তীর্ণযৌবনঃ॥
অথ বিঘ্নে সমুৎপন্নে ব্যাখ্যাতুং পুনরেব হি।
ঋষিসূত্রস্য টীকায়াং সন্তঃ সন্দিগ্ধমানসাঃ॥
ততো যতীন্দ্রনাথেন শ্রীমতা যত্নতঃ পুনঃ।
গুরুকীর্ত্তিবিধানার্থমহং তত্র নিয়োজিতঃ॥
সর্ব্বেষামববোধার্থং সূত্রং সহজয়া গিরা।
ভাষ্যং বৃত্তিঞ্চ সঞ্চিন্ত্য ব্যাচখ্যৌ সারসংগ্রহৈঃ॥
বিরুদ্ধমুক্তং স্যাদত্র যদাল্পবুদ্ধিতো ময়া।
প্রমাদাদ্দোষশ্চ বা কিঞ্চিৎ সন্তঃ সংশোধয়ন্তু তৎ॥
মধ্যবঙ্গে মল্লিকাদিপুরবাসিষু তার্কিকঃ।
শ্রিয়াশুতোষ ভূদেবশ্চট্টজস্তর্কভূষণঃ॥
নবদ্বীপ মহারাজ সভায়ামাস্থিতঃ পুরা।
ইদানীন্তু নবদ্বীপে ছাত্রাধ্যাপন তৎপরঃ॥

মহামহোপাধ্যায় সীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি।[১০]—বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কাইগ্রাম নামক গ্রামে ১২৭০ সালে (১৮৬৪ খৃঃ) ২৪এ ফাল্গুন সীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। নবীনচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার পিতা ছিলেন। শৈশবে বিদ্যারম্ভের সহিত ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের প্রতিভা-জ্যোতি প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। পিতার নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া, তিনি নবদ্বীপস্থ মঃ মঃ ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ১২৯৭ সালে তিনি 'বিবুধজননী সভায়' পরীক্ষা দিয়া 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন, ইহার পূর্ব্বেই তিনি গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৩০২ সালে "বঙ্গবিবুধজননী সভা" হইতে তিনি 'ন্যায়াচার্য্যশিরোমণি' এই সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি কাশীতে স্বামী বলরাম এবং স্বামী বিশুদ্ধানন্দের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। বাঙ্গালা ও উর্দ্দু ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখা যায়। নানাশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিবার পর মুর্শিদাবাদের নবাব ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে তিনি ১৩০২ সালে মুর্শিদাবাদ নগরে 'মুর্শিদাবাদ মঠ' নামে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া নানাবিধ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ১৩১৮ সালে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া তিনি নবদ্বীপে আগমন করেন, এবং এখানে দেয়ারা পাড়ায় বনমধ্যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় রত হন। তাঁহার টোল সাধারণতঃ 'আরণ্য-চতুষ্পাঠী' নামে বিখ্যাত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ছাত্র সমুদয় তাঁহার টোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু কৃতী ছাত্রের মধ্যে মঃ মঃ বামাচরণ ন্যায়রত্ন ও কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক ৺সুধেন্দু-কুমার দাশ M.A., Ph. D. মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়।

---

(১০) ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীকুমারকেশব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সুধিবৃন্দ তাঁহার অসামান্য গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যার শ্রীল বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর, নবদ্বীপাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁহার অরণ্যস্থিত চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইয়া ন্যায়াচার্য্য মহাশয়কে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানাধিপতি ন্যায়াচার্য্য মহাশয়কে তাঁহার 'বিদ্বৎশোভিনী সভার' সভ্য মনোনীত করিয়া, তাঁহার টোলের সাহায্যার্থ উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকার তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষা বিভাগের কার্য্যকরী সভার সদস্য মনোনীত করেন। ঐ সালেই তিনি 'বঙ্গীয় বেদ সভার' সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের মহারাণী রাজপরিবারের সর্ব্ববিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের উপদেষ্টারূপে তাঁহাকে বরণ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ সকল পদ পরিশোভিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার রচিত শতাধিক সংস্কৃত গ্রন্থ ও কয়েকখানি বাঙ্গালা গ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকটিত হইতেছে। তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, বঙ্গভাষায় রচিত তাঁহার 'হরিবাসর সংগীত'ও উপাদেয় গ্রন্থ। গীতাঞ্জলির একটীমাত্র অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

নহিরে বেলা-বনতা ছায়া
ধরণৌ,
কলসকপূর্ত্ত্যৈ ঘট্টং চালয়
চরণৌ।

জলধারা-কলনদনং
হস্তাকুলয়তি সন্ধ্যাগগনং

অয়ে আহ্বয়তে মাং তদেব রবণং
সরণৌ,
কলসকপূর্ত্ত্যৈ ঘট্টিং চালয়
চরণৌ।
কোঽপি ন কুরুতে গমনাগমনং
বিপিনে,
অয়ে উদিততরঙ্গা প্রেমনদীয়ং
পবনে।
ন বেদ্মি কিং স্যাং প্রত্যায়াতঃ
কেন ভবেৎ পরিচয়োঽস্য জাতঃ
বীণাং বাদয়তে সোঽজ্ঞাত
স্বরণৌ।
কলসকপূর্ত্ত্যৈ ঘট্টিং চালয়
চরণৌ ॥[১১]

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সীতারাম শিরোমণি মহাশয় কুম্ভমেলা দর্শনের জন্য হরিদ্বার গমন করেন, এবং প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এক বৎসর কাশীধামে বাস করিয়া, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন পার্থিব শরীর ত্যাগ করেন।

ন্যায়াচার্য্য মহাশয় সুকবি ও সদ্‌বক্তা ছিলেন। তিনি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় উদারতার সহিত জীবন-যাপন করিতেন। তাঁহার বালসুলভ কোমল প্রকৃতি, লোভশূণ্যতা, জ্ঞানস্পৃহা ও দেবোপম চরিত্র বরেণ্যগণের ঈর্ষার বস্তু ছিল। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীঘনরাম ভট্টাচার্য্য ও পুত্র শ্রীকুমারকেশব ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপেই বাস করিতেছেন।

মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ।—মঃ মঃ আশু-

(১১) গীতাঞ্জলির—"(আর) নাইরে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে"—ইত্যাদি ২৭নং গীতের অনুবাদ।

তোষ তর্কভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুর পর, তৎপদে শ্রীচণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় নিযুক্ত হইয়া নবদ্বীপে আগমন করেন। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত হালালিয়া গ্রাম তাঁহার নিবাসভূমি। তিনি নবদ্বীপবাসী হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহরমপুরের রাণী আন্নাকালী দেবীর টোলে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। মঃ মঃ কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের মৃত্যুর পর তিনি ন্যায়ের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন।

স্মার্ত্ত পণ্ডিতবর্গ।—স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ন্যায়শাস্ত্রের ন্যায়, স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে নবদ্বীপে একজন স্মার্ত্ত অধ্যাপককে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ৬০৲ টাকা ছিল, সম্প্রতি উহা ৯০৲ টাকায় পরিণত হইয়াছে। যে সকল স্মার্ত্ত পণ্ডিত ইংরাজ রাজত্বে নবদ্বীপের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, নিম্নে তাঁহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

গোপাল ন্যায়পঞ্চানন।—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (রাম) গোপাল নবদ্বীপে বৈদিক ব্রাহ্মণ অগ্নিবেশ্য গোত্রীয় অর্জ্জুন মিশ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রঘুনন্দনের প্রায় দুই শত বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল, এবং তিনি প্রধান স্মার্ত্তের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি রঘুনন্দনের 'তত্ত্বের' ন্যায় "নির্ণয়" নামক অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই নির্ণয় সকলে প্রাচীন স্মৃতি ও নব্য মীমাংসকগণের মতামত অতি সুন্দররূপে বিচারিত হইয়াছে। তৎপ্রণীত 'প্রায়শ্চিত্ত' 'তিথি' ,দায়' 'কাল' 'সম্বন্ধ' 'শুদ্ধি' 'উদ্বাহ' 'আচার' 'বিচার' 'অধিকার' 'দুর্গোৎসব' সংক্রান্তি' আদি অনেক নির্ণয়গ্রন্থ প্রচলিত আছে। তিনিই নবদ্বীপে রঘুনন্দনের স্মৃতি-

তন্ত্রের অধ্যয়ন প্রচলিত করেন। গোপাল ন্যায়পঞ্চাননের পুত্র রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চানন এবং গেঁয়ে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন।[১২]

এই সময়ে নবদ্বীপের মহারাজ সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। গোপাল ন্যায়পঞ্চানন তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। সেই সময়ে ঢাকার রাজা রাজবল্লভের বালিকা কন্যা বিধবা হওয়ায়, তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার মানসে পূর্ব্বদেশীয় কতিপয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতের ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন, এবং ঐ ব্যবস্থায় নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীর স্বাক্ষর জন্য কতিপয় প্রধান পণ্ডিতকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে এক সভা আহূত হয়। ঐ সভায় গোপাল ন্যায়পঞ্চানন অতি সুন্দররূপে বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা, অপ্রশস্ততা এবং দেশাচারবিরুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়া দেন। সুতরাং নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজের অনুমোদিত না হওয়ায়, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হয় নাই।

গোপাল ন্যায়পঞ্চাননের সময়ে বঙ্গভূমি ইংরাজদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। ইংরাজ রাজপুরুষগণ স্বহস্তে বিচার-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তৎকালে হিন্দু ব্যবস্থায় নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা হিন্দু-অধ্যাপকদিগের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। গোপাল ন্যায়পঞ্চানন এইরূপ একজন ব্যবস্থাপক ছিলেন। তজ্জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। গোপাল খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরলোক গমন করেন। কিন্তু তাঁহার বংশধরেরা পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতে লাগিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দেবী তর্কালঙ্কার, তাঁহার পৌত্র

(১২) 'তত্র নবদ্বীপনিবাসিনঃ স্মৃতিতন্ত্রাধ্যয়নপ্রবর্ত্তকস্য অস্মদতিবৃদ্ধপ্রপিতামহভ্রাতৃ-পৌত্রস্য নির্ণয়াদিগ্রন্থপ্রণেতুঃ পূজ্যপাদ গোপাল ন্যায়পঞ্চাননস্য রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চাননঃ। গোপালস্যাপরশ্ছাত্রো নবদ্বীপনিবাসী রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তঃ।"—কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন কৃত স্মৃতিসিদ্ধান্তে।

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত এবং প্রপৌত্র শ্রীনাথ শিরোমণি এই বংশ-সম্ভূত প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। দিনাজপুর রাজবাটীর সভাপণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ (মৃঃ ১৩৪২ সাল) এবং মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হরিপদ স্মৃতিতীর্থ (মৃঃ ১৩৪৩ সাল) উভয়েই এই বংশসম্ভূত বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। এক্ষণে এই বংশীয় অনেকেই বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু কেহই আর পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত হন নাই।

বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন।—ইনি গোপাল ন্যায়পঞ্চাননের সমসাময়িক ও স্মৃতিশাস্ত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনিও ইংরাজদিগকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা নবদ্বীপে বর্ত্তমান আছেন। বীরেশ্বরের বংশীয় অম্বিকা ভট্টাচার্য্যের পৌত্রগণ এখন বর্ত্তমান আছেন।

তৎকালে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিচারকার্য্যে বিশেষ অসুবিধা হওয়ায়, গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় নানাদেশীয় ১১ জন পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণবসেতু' নামক একখানি গ্রন্থ সংকলিত হয়। ঐ গ্রন্থের পারশ্য অনুবাদ হইতে হলহেড্ সাহেব 'Code of Gentoo Laws' নামক একখানি ইংরাজী অনুবাদ ইংলণ্ডে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থের সংকলয়িতাদের[১৩] মধ্যে নবদ্বীপের কৃপারাম তর্করত্ন, রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন ও বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চাননের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত

---

(১৩) ১৮১৩ শকে বিবাদার্ণবসেতু গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার শেষে গ্রন্থ সঙ্কলয়িতাদের নাম প্রদত্ত হইয়াছে—

বাণেশ্বর কৃপারাম রামগোপাল কৃষ্ণজীবনাখ্যৈঃ।
বীরেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরীকান্তাভিধানৈঃ সদ্ভিঃ॥
কালীশঙ্কর শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকেশব সজ্ঞৈঃ।
সীতারাম সজ্ঞৈশ্চ কৃতো গ্রন্থঃ স্ফুরত্তু সভায়াং॥
ইত্যনেকবিষয়বাসিবিদ্বজ্জনোপবর্ণিতঃ।
বিবাদার্ণবসেত্বাখ্যো গ্রন্থঃ সম্পূর্ণতাং গতঃ॥

পণ্ডিতবর্গের সকলেই উক্ত গ্রন্থ সংকলনের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন গবর্ণর জেনারেলের আদেশ মতে 'হিন্দু-ল' (Hindu Law) সঙ্কলন করিতে সাহায্য করায়, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৬এ জুন তারিখে মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পান। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ২৯এ অক্টোবর ঐ বৃত্তি তাঁহার বংশাবলী পাইবার আদেশ হয়। তদনুসারে তাঁহার পুত্র ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য ৭৫ বৎসর বয়সে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৬ই নবেম্বর তারিখে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তি পাইয়াছিলেন।[১৪] কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কেহই আর ঐ বৃত্তি পান নাই, কেন পান নাই তাহা জানা যায় না।

কথিত আছে, বীরেশ্বর একদিন তাঁহার ভৃত্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে একটী চড় মারেন। এক চড়েই উক্ত ভৃত্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিচারে ভট্টাচার্য্য মহাশয় অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু মহারাজ কহিলেন, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনার কার্য্যটী দৈত্যের ন্যায়

(১৪) বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চাননের পুত্র ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য সিভিল অডিটর R. H. Tulloর নিকট ১৮৩৪ খৃঃ ৬ই নবেম্বর তারিখে তাঁহার বৃত্তি প্রাপ্তির যে সার্টিফিকেট পান তাহাতে লিখিত আছে—

NAME OF THE PRESENT PENSIONERS AND IN WHAT SITUATION PENSIONED :—Bholanath Sarmana calls himself the son of Bireswar Panchanana Bhattacharjee, one of the Pandits who was employed by the late Governor General for compiling a Code of Hindu Laws.

GENERAL REMARKS AND DATE OF AUTHORITY.—The pandits who were placed on the establishment of the Saddar Dewany Adalat transferred from that establishment and considered as pensioners of Government under orders of Government for 26th June and the allowances continued to their decendants under orders of Government dated 29th October 1801, Revenue Department.

NOTE. The name of Bholanath Sarmana has been stated in a pension document signed by A. Jonstone. P. B. T.

Vide, Descriptive certificate or Roll granted, R. H. Tullo Esq. Civil Auditor 6th Nov. 1834.

হইয়াছে।' তদবধি উক্ত ভট্টাচার্য্য ও তদ্‌বংশীয়েরা 'দৈত্য' নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

রামানন্দ বাচস্পতি।—রামানন্দ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্‌ ও একজন প্রধান স্মার্ত্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বানন্দী মেলের পুষ্করাক্ষের প্রপৌত্রের পৌত্র ছিলেন। তিনি 'আহ্নিকাচাররাজ' নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গ্রন্থকারের পরিচয় লিখিত হইয়াছে।[১৫] 'কৃত্যরাজ' ও 'সমাহিতরাজ' নামক গ্রন্থ দুই খানিও ইহাঁরই রচিত বলিয়া মনে হয়। নবদ্বীপ লাইব্রেরীতে কৃত্যরাজের দুইখানি পুথি আছে, তাহার মধ্যে ১১৮নং পুথির শেষে লিখিত হইয়াছে,

---

(১৫) নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের গৃহে আহ্নিকাচার-রাজের একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ পুথিখানি ১১৯২ সালের পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার প্রারম্ভে লিখিত আছে—

ভক্ত্যা পুণ্যবলেন চাতিমহতা স্বীকৃত্য মূর্ত্ত্যৈকতাং
গোবিন্দো গিরিজাপতিশ্চ নৃপতে র্যস্যালয়ে রাজতে।
নত্বা পদসরোজরাজমনয়োঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপঃ
সম্বদ্ধং স সমাদিদেশ বিদুষো গ্রন্থং দিবাকর্ম্মণে॥

অপিচ॥ কীর্ত্ত্যা যেন বিকাশিতং ত্রিভুবনং কান্ত্যা জিতশ্চন্দ্রমা
মত্যা দেবগুরুঃ সুধা চ বচসা মূর্ত্ত্যা মনঃসম্ভবঃ।
ধৃত্যা ক্ষ্মা ক্ষময়া দ্বিজাঃ সুকৃতিনঃ পুণ্যৈঃ প্রতাপৈর্নৃপা
দানৈর্দীনজনৌঘ দুঃখমখিলং দৃষ্ট্বা বিভবাশ্রিতাঃ॥
যেনেষ্টং বাজপেয়প্রভৃতিমখগণৈরগ্নিহোত্রৈশ্চ নিত্যং
ভক্ত্যা শ্রীরামকৃষ্ণেশ্বর গিরিতনয়ামূর্ত্তয়ঃ স্থাপিতাশ্চ।
গেহে যস্যাব্ধিকন্যা নিবসতি সততং ভারতী কণ্ঠদেশে
অদ্বৈত ব্রহ্মরূপা স্মরহরমহিষী নিশ্চলাহৃৎসরোজে॥
যোহয়ং গৌড়দ্বিজেন্দ্রো ভরতভুবি মহারাজরাজেন্দ্রনামা
বীরো ধীরাগ্রগণ্যো নৃপকুলতিলকঃ শ্রীনবদ্বীপনাথঃ।
আদেশাত্তস্য পূর্ব্বোদিত বিবিধমত গ্রন্থসংঘান্ বিলোক্য
শ্রীরামানন্দনামা রচয়তি রুচিরমাহ্নিকাচাররাজং॥
আচার্য্যঃ পুষ্করাক্ষোযঃ সর্ব্বানন্দিকুলোজ্জ্বলঃ।
তস্য প্রপৌত্রপৌত্রেণ শ্রীরাজেন্দ্র সভাসদা।
শ্রীবাচস্পতিনা গ্রন্থো নিবদ্ধো নৃপসম্মতঃ॥

"গ্রহণবিবেচনন্তু মৎকৃত-সমাহিতরাজে দ্রষ্টব্যং"। এই স্থলে 'মৎকৃত' শব্দ থাকায় মনে হয়, বহু পণ্ডিত দ্বারা কৃত্যরাজ রচিত হয় নাই. রামানন্দ বাচস্পতি একাকীই ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ মনে করিবার আরও কারণ, 'কৃত্যরাজ' ও 'আহ্নিকাচাররাজে'র প্রারম্ভিক শ্লোকগুলির প্রায়-সাম্য রামানন্দের বংশধর কেহ আছেন কিনা জানা যায় নাই।

রামানন্দের পর (গেঁয়ে) রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কৃপারাম তর্কভূষণ, লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ ও রামলোচন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ।—লক্ষ্মীকান্ত, রামনারায়ণ ন্যায়পঞ্চাননের পুত্র এবং (গেঁয়ে) রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের ছাত্র ছিলেন। তিনি মহারাজ গিরিশচন্দ্র রায়ের সময় বর্ত্তমান থাকিয়া, রাজ-পুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এজন্য তাঁহার বংশধরগণ 'রাজ-পুরোহিত ভট্টাচার্য্য' নামে অভিহিত। তিনি জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা বিষয়ে ৭৮টী শ্লোকে 'রথপদ্ধতি' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

এই সময়ে মহারাজ গিরিশচন্দ্রের দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে এক বিবাদ উপস্থিত হয়। 'তৎকালে নবদ্বীপে স্মার্ত্তের দুই দল প্রবল ছিল। এক দলের প্রধান রাজপুরোহিত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ, অপর দলের প্রধান রাম-মোহন বিদ্যাবাচস্পতি। ন্যায়ভূষণের মতানুসারে এই দত্তক গৃহীত হইয়াছিল, একারণ বাচস্পতি, কালাশৌচগ্রস্ত বালককে দত্তক গ্রহণ করা শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া, এক ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়া, রাজা এ প্রদেশস্থ অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন। এ বিষয়ে তুমুল বিচার হইল। বহুতর বিতর্কের পর, লক্ষ্মী-কান্ত, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, প্রতিবাদিগণকে পরাজিত করিলেন যে, "যখন শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অশৌচ গ্রহণ না করিলে, কেহ

অশুচি হয় না, তখন অশৌচ সংজ্ঞা যাহার জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না, তাহার অশুচি হইবার সম্ভাবনা কি ?"[১৬]

লক্ষীকান্ত ন্যায়ভূষণের ছয় পুত্রের মধ্যে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও হরিদাস শিরোমণি মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন।—খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রজনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া, স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে শোভাবাজারের মহারাজ স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীতে যে সভা হয়, তাহাতে ব্রজনাথ, বিচারে বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া মহারাজ কর্তৃক বিশেষরূপে পুরস্কৃত হন।

ব্রজনাথ হইতে নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজে এক মহান্ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণ পর্য্যন্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। পরন্তু চৈতন্য-সম্প্রদায়ের উপর নবদ্বীপ-নিবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের ও নবদ্বীপের রাজাদিগের বিশেষ বিদ্বেষই ছিল। এই কারণে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণববর্গ স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেন। গ্রামবাসীদিগের সহিত তাহাদের সাহানুভূতি ছিল না। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন হইতে এই ভাব অনেক বিদূরিত হইয়াছে। ব্রজনাথ শেষ বয়সে চৈতন্যের মতানুবর্ত্তন করেন, এবং চৈতন্যদেব যে ভগবানের পূর্ণাবতার তাহা স্বীকার করিয়া অবতারত্ব প্রতিপাদক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তিনি নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় ভূয়োদর্শিতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি পুস্তক লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যাহাতে চৈতন্যের মত বহুলরূপে প্রচারিত হয় তজ্জন্য স্বীয় চতুষ্পাঠীতে এক হরিসভা স্থাপন (১২৭৫ সালে) করিয়াছিলেন। ঐ হরিসভা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। হরিসভায় নবদ্বীপের

(১৬) ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত পৃঃ ১৭৯, পাদটীকা।

অনেক পণ্ডিত, অধিবাসী ও বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়া হরিগুণগান, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেন। তৎপরে তিনি ঐ সভায় এক গৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই বঙ্গদেশের আদি 'হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা'। তিনি বঙ্গদেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বহু হরিসভা স্থাপন করেন। ১২৯২ সালে ব্রজনাথের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র মথুরানাথ পদরত্ন, তৎপরে তৎপুত্র শিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য এবং সম্প্রতি শিতিকণ্ঠের পুত্র মুরারিমোহন ভট্টাচার্য্য, ঐ মূর্ত্তির সেবা করিতেছেন। ব্রজনাথ অতি অমায়িক ও নিরহঙ্কত লোক ছিলেন।

তাঁহার অগণিত ছাত্রের মধ্যে, ময়মনসিংহ সেরপুরের অধিবাসী মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ভাজনঘাট-নিবাসী 'রাই-উন্মাদিনী' প্রণেতা কৃষ্ণকমল গোস্বামী, তৎপুত্র মথুরানাথ পদরত্ন, লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, শিবনারায়ণ শিরোমণি, রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন, হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মথুরানাথ পদরত্ন প্রধান স্মার্ত্তের পদ প্রাপ্ত হন। মথুরানাথের পর ব্রজনাথের ছাত্র ও জামাতা লালমোহন বিদ্যাবাগীশ ঐ পদ প্রাপ্ত হন।

অতঃপর ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের ভ্রাতা পুরুষোত্তম ন্যায়রত্নের পুত্র **শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি** মহাশয় স্মৃতির প্রাধান্য পদ প্রাপ্ত হন। তিনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্রের টোলের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'অষ্টাকবলী' ও 'স্মৃতিবিচার-সার-কৌমুদী' (১৮১৯ শকে) মহারাজের অনুকম্পায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় অন্ধাবস্থায় শেষোক্ত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন।

শিবনাথের পুত্র নৃসিংহপ্রসাদ স্মৃতিভূষণ পিতার নিকট সমগ্র স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র এবং ছাপরা জিলার অন্তর্গত হাসনপুরবাসী নবদ্বীপস্থ অধ্যাপক শিবগোবিন্দ ভারতীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি বহু-

দিন 'বঙ্গ বিবুধ জননী' সভার সম্পাদক ছিলেন। শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয় বর্দ্ধমানের রাজ-চতুস্পাঠী ত্যাগ করিলে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহ-প্রসাদ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন তিনি বর্দ্ধমান রাজ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। ১৩২৩ সনে ৪৭ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির ভ্রাতুস্পুত্র নিরঞ্জন বিদ্যাভূষণ রাজ-পুরোহিত বংশের শেষ অধ্যাপক।

গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হইলে, ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের ছাত্র রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় সর্ব্বপ্রথম স্মৃতির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া মাসিক ৬০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন।—গদাধর বংশীয় শ্রীরাম শিরোমণির কনিষ্ঠ পুত্র, মধুসূদন, রামলোচন ন্যায়ভূষণের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। মধুসূদন ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন-কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামক পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়া 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়াঙ্কপ্রকাশ' নামে এক পুস্তক, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করিয়া আর একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। উভয় পুস্তকেই তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্যাবত্তা, ভূয়োদর্শিতা ও বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের অনেকগুলি মুদ্রিত করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনিই নবদ্বীপের দ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়। হরিপাল-নিবাসী মঃ মঃ চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন।—অগ্নিবেশ্য গোত্রীয় অর্জ্জুন মিশ্রের বংশে ১৭৫৫ শকে (১৮৩৩ খৃঃ) নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী পূর্ব্বস্থলী গ্রামে কৃষ্ণনাথ জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহাঁর পিতা। নবদ্বীপেই তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস ছিল, তাঁহার পিতামহ অভয়াচরণ তর্কবাচস্পতি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বস্থলীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ









(১) পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন (২) মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন

(৩) মঃ মঃ অজিতনাথ ন্যায়রত্ন (৪) মঃ মঃ আশুতোষ তর্কভূষণ

করেন। বাল্যে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে, পূর্ব্বস্থলী নিবাসী দুর্গাদাস ন্যায়রত্নের নিকট তিনি ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন। বহু শাস্ত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অমায়িক, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী এবং অর্থ সম্বন্ধে অতিশয় নির্লোভ ছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি-কর্ত্তৃক তিনি নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্তের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহুদিন যাবৎ ঐ পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। নিরপেক্ষতাগুণে তিনি ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক পদে গৃহীত হন, এবং উক্ত সভা হইতে ১৮২৮ শকে 'পণ্ডিতকুলচক্রবর্ত্তী' উপাধি প্রাপ্ত হন।

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় বহু টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন— 'কর্পূরাদি স্তোত্রের টীকা', 'দায়ভাগপ্রবোধিনীটীকা', 'মলমাসতত্ত্বের টীকা' 'বৃহৎমুগ্ধবোধ', শ্যামাপূজার কালনির্ণয় সম্বন্ধে 'শ্যামাসন্তোষ', 'স্মৃতিসিদ্ধান্ত' অভিজ্ঞানশকুন্তলের টীকা, লোগাক্ষি ও ভাস্কর প্রণীত অর্থসংগ্রহের টীকা, তত্ত্বকৌমুদীর টীকা, ন্যায়প্রকাশের টীকা এবং নিজকৃত দূতকাব্য সটীক 'বাতদূত'। এই সকল গ্রন্থে তিনি তাঁহার বাসভূমির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন —

নবদ্বীপাসন্নভূমৌ শ্রীমদ্ ভাগীরথী তটে।
গ্রামং পূর্ব্বস্থলীং নাম বিদ্ধি বাসস্থলীং মম॥

শেষ বয়সে তিনি কাশীবাস করেন, এবং সেই স্থানেই ১৩১৮ সালের (১৯১১ খৃঃ) ২৬এ অগ্রহায়ণ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার অগণিত ছাত্রের মধ্যে নবদ্বীপবাসী মঃ মঃ শিতিকণ্ঠ বাচস্পতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রজনীকান্ত বিদ্যারত্নের পর **হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন** গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার সাঁকরাইল গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, তিনি স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক ১৬ বৎসর

অধ্যাপনা করেন। মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজেও তিনি কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, অতঃপর নবদ্বীপে স্মৃতির অধ্যাপক হইয়া আগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ছাত্র যশোহর মল্লিকপুর নিবাসী **যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ** উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নবদ্বীপ চৈতন্যচতুষ্পাঠীরও একজন অধ্যাপক ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের পর বর্ত্তমান কালে নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় গবর্ণমেণ্টের স্মৃতির অধ্যাপক-পদ পরিশোভিত করিতেছেন।

লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ (২য়), উমেশচন্দ্র তর্কবাগীশ, জটিয়া যাদুর বংশে তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যোগেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, 'বিবুধজননী সভা'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্যামাচরণ স্মৃতিতীর্থ এবং অর্দ্ধকালী-বংশীয় দুর্গা-মোহন স্মৃতিতীর্থ ও শশিমোহন স্মৃতিতীর্থ দুই ভ্রাতা স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি মহাশয়ের তন্ত্রশাস্ত্রেও বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁহার প্রযত্নে বুড়াশিবের বর্ত্তমান সুরম্য মন্দির (১৯০৭ খৃঃ) নির্ম্মিত হয়।

মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি।—শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ক্ষেত্রনাথ চূড়া-মণি নবদ্বীপের মিশনারী স্কুলের পণ্ডিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাচস্পতি মহাশয় মঃ মঃ অজিতনাথ ন্যায়রত্নের নিকট কাব্য পাঠ করিয়া অতিশয় যোগ্যতার সহিত 'কাব্যতীর্থ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চাননের নিকট তিনি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং 'বঙ্গবিবুধ-জননী' সভা হইতে ১২৯২ সালে 'বাচস্পতি' উপাধি লাভ করেন। তিনি ১৯০৭ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান-রাজের চতুষ্পাঠীতে স্মৃতির প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজের টোল-বিভাগে স্মৃতির অধ্যাপক পদ প্রাপ্ত হন। পেন্সন লাভের পর, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯২৮

খৃষ্টাব্দে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। বহুদিন যাবৎ তিনি "বঙ্গবিবুধ জননী" সভার সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাগ্মিতা, কবিত্ব, অমায়িকত্ব, স্বদেশপ্রেমিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় "ভারতের দণ্ডনীতি", 'অলঙ্কারদর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ১৯৩৬ খৃঃ ৯ই ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ছয়টি পুত্র বর্ত্তমান—সকলেই ইংরাজী শিক্ষায় কৃতবিদ্য।

নবদ্বীপে নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত পণ্ডিত ব্যতীত ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য, পুরাণ, জ্যোতিষ, তন্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শী বহু পণ্ডিতের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা ন্যায় ও স্মৃতির প্রখর আলোকে দীপ্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতের মধ্যে কয়েকজন দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বিবরণ নিম্নে সংকলিত হইল।

কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন।—ইনি একজন কাব্যশাস্ত্র বিশারদ সৎকবি, এবং নবদ্বীপের মিশনারি বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের সমকালে ইহাঁর পরলোক হইয়াছে। ইনি নানা বিষয়িণী প্রাচীন কবিতা-সকল সংগ্রহ করিয়া 'সৎকাব্যকল্পদ্রুম' নামে দুইখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৭৯৫ শকাব্দে ঐ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, এবং তাহাতে তাঁহার স্বরচিত অনেক শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা, হিন্দী, পারসী ও ইংরাজী মিশ্রিত বাঙ্গলা কবিতাও দৃষ্ট হয়। উক্ত গ্রন্থে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

ধ্যাত্বা শঙ্কর পাদপদ্মযুগলং প্রাচীন পদ্যাবলীং
সংগৃহ্য স্বকৃতং তথা সুকবিতাবৃন্দং সদানন্দদং।
সাহিত্যার্ণব-রত্নরাজি সদৃশং শ্রীকৃষ্ণকান্তঃ কবিঃ
ধীরাভীষ্টফলপ্রদং প্রতনুতে সৎকাব্য-কল্পদ্রুমং॥

কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন মহাশয়ের যত্নে বুড়াশিবের প্রাচীন মন্দির

নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে নড়াইল কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হরগোবিন্দ শিরোমণি, এবং নবদ্বীপ চৈতন্যচতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা ব্রজরাজ গোস্বামী মহাশয় প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন।—১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খৃঃ) ঝুলন পূর্ণিমার পরবর্ত্তী চতুর্থী তিথিতে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ভ্রাতা মাধবানন্দ সহস্রাক্ষের বংশে অজিতনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। এই বংশীয়গণ 'রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য্য' নামে প্রসিদ্ধ। রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তাঁহার পিতা ছিলেন। অজিতনাথ বাল্যে জ্যেষ্ঠ সহোদর নীলমণি ভট্টাচার্য্যের নিকট ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া, মাধব তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকট অলঙ্কার, ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতি এবং যদুনাথ বিদ্যারত্নের নিকট সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভা সুপ্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠ সমাপনান্তে তিনি 'ন্যায়রত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন। বহুদিন যাবৎ তিনি কৃষ্ণনগরের মহারাজের টোলে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় তাঁহাকে 'কবিভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন। দ্ব্যর্থমূলক সরস শ্লোক রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব অপ্রতিহত ছিল। সভায় উপস্থিত হইয়া দ্রুত শ্লোক রচনা দ্বারা সভ্যগণকে মোহিত করিতে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না। তিনি যে শুধু সুকবি ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার ন্যায় শাব্দিক ও আলঙ্কারিক তৎকালে এদেশে আর দেখা যায় নাই। তাঁহার শ্লোকাবলী লোকের মুখে মুখে আজও চলিতেছে, সেগুলি সংকলিত হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুরকে তিনি যে কয়েকটী শ্লোক উপহার দিয়াছিলেন, তাহার একটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ঐ শ্লোকের বহু প্রকার অর্থ সংঘটিত হয়।

"সন্তানো হি মমৈষ দেবি তব কিং স্বত্বং কলানাং নিধৌ
কৌমারাকৃতিরত্র মামকতয়া বিজ্ঞাপয়ত্যেব যৎ।

গৌরী শ্রীরিতরাশ্চ যত্র কলহায়ন্তে মিথো মাতরঃ
সর্ব্বত্রোদয়তামসৌ নবনৃপ নিলাঞ্ছনশ্চন্দ্রমাঃ ॥"

গবর্ণমেণ্ট কৃষ্ণনগরের কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলে, একটী কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি দ্বারা আহূত হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় সভামধ্যে কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়া, তদানীন্তন নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করেন, এবং কি প্রকারে নবদ্বীপের পূর্ব্ব গৌরব রক্ষিত হইতে পারে তাহাও বুঝাইয়া দেন। ঐ শ্লোকগুলির মধ্যে একটী নিম্নে লিখিত হইল—বহু প্রকার অন্বয়ের দ্বারা উহাতে নদীয়ার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

"নদীয়া নীরসামান্যাপ্রশস্যা পৃথুবংশভৃং।
পুনর্বস্যুদয়েনৈব বর্দ্ধমানাস্তু সা পুনঃ ॥"

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ন্যায়রত্ন মহাশয়কে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান করিয়া, কবির সমাদর করিয়াছেন। তাঁহার উদার প্রকৃতি, দেশপ্রীতি, বন্ধুবাৎসল্য ও মহৎ চরিত্র আদর্শস্থানীয় ছিল। নবদ্বীপস্থ তাঁহার টোলের নাম ছিল 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ এবং কৃষ্ণানন্দবাচস্পতি-বিরচিত অন্তর্ব্যাকরণ-নাট্যপরিশিষ্টের 'রাজসরণী' নামক ব্যাখ্যা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাওয়ালির জমীদারগণের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। চৈতন্যশতক, অমরার্থ-চন্দ্রিকা ও বকদূত তাহার রচিত অন্য গ্রন্থ। বিশ্বদূত নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কিছুদিন তাঁহার সম্পাদনায় বহির্গত হইয়াছিল। বকদূত একখানি শ্লিষ্ট দূতকাব্য—ইহাতে তৎকালীন নবদ্বীপের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া, তিনি পণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণির সহযোগিতায় রামতর্কবাগীশের টীকাসহ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সম্পাদন করেন। তৎকালে নবদ্বীপে কোন মাননীয় ব্যক্তি আসিলে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় অগ্রণী হইতেন। দরিদ্র

নবদ্বীপবাসীর পক্ষ হইতে দুইটী শ্লোক উপহার দিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে কখনই তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। অজিতনাথ চিরকাল এ বিষয়ে অজেয় ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতব বাহাদুর, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ও হর্ণেল সাহেবের সহিত নবদ্বীপ পরিদর্শনে আগমন করিলে, ন্যায়রত্ন মহাশয় যে অভিনন্দন শ্লোকাবলী উপহার দেন, তাহাই তাঁহার শেষ রচনা ও শেষ সভায় যোগদান। সেই সভায় তিনি যে শ্লোকাবলী পাঠ ও বক্তৃতা করেন তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে চির-জাগরূক থাকিবে। ১৩২৬ সালের (১৯২০ খৃঃ) ২৪এ মাঘ তিনি লোকান্তর গমন করিলে, রত্নপ্রসূ নবদ্বীপ শেষ রত্ন হারাইল। তাঁহার তিন পুত্র প্রমথনাথ, উপেন্দ্রনাথ, ও শৈলানন্দ ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন—সকলেই ইংরাজী শিক্ষিত। মঃ মঃ শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, মঃ মঃ সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ, কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপণ্ডিত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার বিশিষ্ট ছাত্র। অমৃতলাল বসুর পিতা কৈলাসচন্দ্র বসুর স্থাপিত কলিকাতা বাগবাজারের এ-ভি স্কুলের উপরের ক্লাসে ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছুদিন পড়াইয়াছিলেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু সেই সময় তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন।

শিবনারায়ণ শিরোমণি।—শিবনারায়ণ শিরোমণি মহাশয় প্রথম অবস্থায় নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল-বিভাগে সাহিত্যের অধ্যাপক পদ প্রাপ্ত হন। তিনি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি শ্লোক উদ্ভট-সাগরে সংকলিত হইয়াছে। তিনি বালকদিগের সংস্কৃত-শিক্ষার্থ "সংস্কৃতকলিকা" নামে একখানি প্রথমপাঠ্য সুন্দর পুস্তক রচনা করেন। এই শ্রেণীর পুস্তকের ইহাই প্রথম। দেবেন্দ্রনাথ সেন-দিগের প্রকাশিত মুগ্ধবোধ তিনিই শেষ বয়সে সম্পাদন করেন।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশের বংশধর শরচ্চন্দ্র গোস্বামি-কাব্যতীর্থ মহাশয় কাব্য ও ব্যাকরণের বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। তৎকালে তাঁহার টোলে যত পাঠার্থী ছিল, তত পাঠার্থী অন্য টোলে দেখা যায় নাই। তিনি 'গৌরাঙ্গমূর্ত্তি পরিচয়' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অহিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় কাব্যের অধ্যাপক ছিলেন, এবং ১৯৩১ খৃঃ পর্য্যন্ত 'বঙ্গবিবুধ জননী' সভার সম্পাদক ছিলেন। দীননাথ চূড়ামণি, চৈতন্যসভার প্রতিষ্ঠাতা প্যারীলাল ভাগবতভূষণ এবং চৈতন্যতত্ত্বদীপিকা-প্রণেতা শশিভূষণ ভাগবতরত্ন পুরাণের অধ্যাপক ছিলেন। জগদীশের বংশীয় দ্বারকানাথ শিরোরত্ন (মৃঃ ১৩৩৫ সাল) প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি কিছুদিন মুর্শিদাবাদ কান্দির ইংরাজী বিদ্যালয়ে, এবং পরে দীর্ঘকাল নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলের প্রধান-পণ্ডিত ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

কাশীনাথ শাস্ত্রী।—নবদ্বীপ যদিও বঙ্গদেশের প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র, তথাপি এখানে ন্যায় দর্শন ব্যতীত অন্য কোন দর্শনের আলোচনা নাই বলিলেই হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কাশীনাথ শাস্ত্রী নামক একজন বেদান্তের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস উড়িষ্যা দেশে ছিল। তিনি বহুদিন নবদ্বীপে ছিলেন, এবং তাঁহার নামে নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলে একটী ছাত্রবৃত্তি আছে।

পঞ্জাবদেশীয় পণ্ডিত **রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী** বহুদিন ধরিয়া পাকাটোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং পরে উক্ত টোলের বৃত্তিবিভাজক হন। তিনি পরিণত বয়সে ঐ টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হরিদ্বার গুরুকুলের প্রধান ন্যায়াধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া (১৯০৬ খৃঃ) নবদ্বীপ ত্যাগ করেন।

শিবগোবিন্দ ভারতী।—ছাপরা জেলার অন্তর্গত হসনপুর গ্রামে ইহাঁর পূর্ব্ব নিবাস ছিল। তিনি শঙ্কর সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী ছিলেন। বেদান্তে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বহুকাল নবদ্বীপে বাস

করিয়া বেদান্তের অধ্যাপনা করেন। সাধারণে তিনি 'স্বামীজি' নামে পরিচিত ছিলেন। পরিপক্ক বয়সে তিনি জ্যোষিমঠের অধ্যক্ষ হইয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করেন।

সত্যব্রত সামশ্রমী ও ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী উভয় ভ্রাতা বঙ্গদেশের মধ্যে বেদের অদ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই মথুরানাথ পদরত্নের জামাতা ছিলেন, এবং নবদ্বীপে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহারা বহু বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন।

জ্যোতিষ।—অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় জ্যোতিষের চর্চ্চাও নবদ্বীপে যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বল্লাল সেনের সময় জ্যোতিষের আলোচনার সূত্রপাত হয়, এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ইহা পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এস্থানের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ 'নবদ্বীপ-বঙ্গ-সমাজের' অন্তর্গত। সিদ্ধান্ত রহস্য-প্রণেতা রাঘবানন্দ (১৫১২ শক) নবদ্বীপবাসী ছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতিষীদের মধ্যে কয়েকটী প্রসিদ্ধ বংশ নবদ্বীপের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট।

হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণবের বংশোদ্ভব জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই পুরুষানুক্রমে কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের সভায় বর্ত্তমান থাকিয়া পঞ্জিকা প্রণয়ন করিতেন। যে রাজার সময়ে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইত, ও যাহা দ্বারা গণিত হইত, পঞ্জিকায় তাঁহাদের নাম উল্লিখিত থাকিত। এই বংশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ রামরুদ্র বিদ্যানিধি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহার রচিত 'জ্যোতিঃসাগরসার' নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তিনি রাজসভায় যে পঞ্জিকা প্রণয়ন করিতেন তাহা 'নবদ্বীপ-পঞ্জিকা' নামে অভিহিত হইত। এই পঞ্জিকার এক খণ্ড নবাব সরকারে প্রদত্ত হইত, এবং সেই পঞ্জিকা অনুসারেই রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে রাজকার্য্যে দেশীয় তারিখের সম-

ধিক প্রচলন ছিল, কিন্তু তখন তাদৃশ বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রচলিত না থাকায়, রাজকার্য্যের ও সাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইত। এই অভাব দূর করিবার জন্য গবর্ণরের অনুরোধ-ক্রমে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক এক বিশুদ্ধ পঞ্জিকা (১৭৯৯ খৃঃ) গণিত হইয়া, নদীয়ার কলেক্টরের মারফৎ গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়।[১৭] আজ পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত আছে। এই বংশের শেষ পণ্ডিত দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায়, পঞ্জিকা-গণনা কার্য্য অন্য হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

দুর্গাদাস বিদ্যারত্নের পর গবর্ণমেণ্টের পঞ্জিকা প্রণয়নের কার্য্য **বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব** মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত হয়। ইনি কমলাকর জ্যোতিষীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নানাশাস্ত্রে অধিকার ছিল। জ্যোতিষার্ণব মহাশয় 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার'ও গণক ছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটী প্রকাশিত রবিসিদ্ধান্ত-মঞ্জরী, বঙ্গানুবাদসহ দিনকৌমুদী এবং গণিত-গ্রন্থ বিদগ্ধতোষিণী নামক গ্রন্থ কয়খানি জ্যোতিষার্ণব মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর (১৩১৯ সাল) পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশ্রীশচন্দ্র জ্যোতীরত্ন মহাশয় ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গণক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত বোর্ডের জ্যোতিষ পরীক্ষার একজন পরীক্ষক, এবং বর্ত্তমান নবদ্বীপের একমাত্র জ্যোতির্ব্বিদ্। জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের ভ্রাতাগণ ও অন্যান্য পুত্র-গণ ইংরাজী শিক্ষায় কৃতবিদ্য।

সুবুদ্ধি শিরোমণির বংশীয় গোকুলানন্দ বিদ্যানিধি মহারাজ কৃষ্ণ-

---

(১৭) Letter from Secretary to Board stating that he has repeatedly found difficulty in procuring an accurate Bengali Almanac and suggesting that Collector, Nadiya be directed to transmit one properly authenticated by Brahmanical Astronomy for the use of office. July 5th 1799.

No. 8217 Hunter's Unpublish ed Bengal MSS. Records.

Collector transmits the same, August 9th.

No. 8305 Hunter's Unpublished Bengal MSS. Records.

চন্দ্রের নিকট বৃত্তি গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন, এবং মহারাজের অন্যতম জ্যোতির্ব্বিদ্ পদে নিযুক্ত হন। গোকুলানন্দ একটী উৎকৃষ্ট পারদময় ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নিমাই, নবদ্বীপ মালঞ্চ পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত 'পাড়ার মা'র (পল্লীমাতা দেবী) উপাসক কোন সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষিত হইয়া, উক্ত দেবীর সম্মুখে বসিয়া জপ করিতে থাকেন। তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া কাশী চলিয়া যান। এই বংশে পঞ্চানন উপাধ্যায় বর্ত্তমান আছেন।

বর্ত্তমান নবদ্বীপের চতুষ্পাঠী।—বর্ত্তমান (১৯৩৭ খৃঃ) নবদ্বীপের চতুষ্পাঠী, তাহার অধ্যাপক ও অধ্যাপিত শাস্ত্রের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ন্যায়ের টোল।—গবর্ণমেণ্টের দুইটী ন্যায়-চতুষ্পাঠীতে মঃ মঃ শ্রীচণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ ও শ্রীপ্রাণগোপাল তর্কতর্কতীর্থ (অস্থায়ী) অধ্যাপনা করিতেছেন। রায় ভগবানদাস বগলা বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত কাঁচাটোলে জগদীশ-বংশীয় শ্রীযতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ অধ্যাপনা করিতেছেন। ইনি 'বুধবাগ্‌বিবেক' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই টোলে ছাত্রদের বাসস্থান ও অশনের ব্যবস্থা আছে। পাকাটোলের অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত তর্কতীর্থ ও শ্রীঅমরচন্দ্র তর্কতীর্থ। শ্রীশিবনাথ তর্কতীর্থ, রামকণ্ঠ তর্কতীর্থ এবং গদাধর-বংশীয় শ্রীরামগোপাল তর্কতীর্থ নিজ নিজ টোলে অধ্যাপনা করেন।

স্মৃতির টোল।—গবর্ণমেণ্টের স্মৃতির টোলের অধ্যাপক শ্রীত্রিপথ-নাথ স্মৃতিতীর্থ।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত টোলগুলিতে ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয় পড়ান হইয়া থাকে।

চৈতন্য চতুষ্পাঠী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, তারাসের বিদ্যোৎসাহী জমীদার রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুরের অর্থ সাহায্যে, পণ্ডিত ব্রজরাজ গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চতুষ্পাঠী বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট

ও তারাসের জমীদারগণ হইতে সাহায্য পায়। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ পঞ্চতীর্থ ইহার বর্ত্তমান অধ্যাপক।

মিউনিসিপাল টোল।—এই টোলে মনোরঞ্জন কাব্যব্যাকরণস্মৃতি-তীর্থ অধ্যাপনা করেন। ইহাতে মিউনিসিপালিটী কাব্য ও ব্যাকরণ পাঠের জন্য মাসিক ২০৲ টাকা সাহায্য করেন।

শ্রীবাসাঙ্গন টোলের অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সিদ্ধান্ত, 'সার্ব্বজনীন গৌরাঙ্গ চতুষ্পাঠীর' অধ্যাপক ভবানন্দ কাব্যরত্ন, মণিপুর মহারাজার প্রতিষ্ঠিত 'চূড়াচাঁদ চতুষ্পাঠী'র শ্রীশিবদত্ত শর্ম্মা তর্কতর্কতীর্থ, 'লীলাবতী ভক্তিশাস্ত্রপীঠে'র অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত তর্কতীর্থ, শিতিকণ্ঠ স্মৃতিতীর্থ ও কমলাকান্ত স্মৃতিরত্নের টোল, এবং 'বিষ্ণুপ্রিয়া দর্শন টোলে'র অধ্যাপক শ্রীগৌরকিশোর বেদান্ততীর্থ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

অর্দ্ধকালী-বংশায় গৌরীপুর রাজবাটীর সভাসদ্ শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, পঞ্জাব গুরুকুলের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয়েরা নবদ্বীপে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান নবদ্বীপে ছয়খানি টোলে ন্যায়, পাঁচখানি টোলে স্মৃতি ও আটখানি টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যাপনা হয়। সার্ব্বজনীন গৌরাঙ্গ চতুষ্পাঠীতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল ছাত্রকেই পাঠ দেওয়া হয়।

উক্ত টোল-সমূহে প্রায় ২৫০ ছাত্র অধ্যয়ন করে। তন্মধ্যে ৬০ জন ন্যায়, ৫০ জন স্মৃতি এবং অবশিষ্ট অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। এই সকল ছাত্রের মধ্যে প্রায় ১২৫ জন গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শিক্ষার ধারা পূর্ব্বানুরূপ প্রচলিত ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই শিক্ষা বিষয়ে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে, সংস্কৃত ও পারশীর পরিবর্ত্তে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিবেন, এবং রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি এদেশীয় মনীষিগণও ইংরাজী শিক্ষাই এদেশ-বাসীর হিতকর বিবেচনা করিয়া, এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনে উদ্যোগী হইলেন। এইরূপে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাস্থ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উদ্যোগে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল। এই হিন্দু কলেজই বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার আদি কেন্দ্র। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দেশ করিবার জন্য কলিকাতায় School Book Society প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত হইল। বঙ্গের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ সকলেই হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। অপর দিকে মিশনারিরা শিক্ষা প্রচারের জন্য শ্রীরামপুর ও মফস্বলের অন্যান্য স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।

বিশিষ্ট অধ্যাপক ডি-রোজিও ও ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতির সাহচর্য্যে আসিয়া এদেশের তরুণ শিক্ষার্থিগণের হৃদয় তাঁহাদের চরিত্র-মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া যায়; এবং তাঁহাদের সহিত অবাধ মেলামেশার ফলে তাহারা ইংরাজ-সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার ফলে বাঙ্গালী ইংরাজের বেশ-ভূষা, পানাহার প্রভৃতি সকল বিষয়ের অনুকরণ করিতে লাগিল। এমন কি সুরাপানও দেশবাসীর পক্ষে হিতকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এমন অবস্থা হইল যে, এ দেশীয় আচার ব্যবহার ও শিক্ষার প্রতি লোকের ঘৃণা জন্মিয়া গেল। খৃষ্টান মিশনারিগণ-কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মপ্রচার ও ঐ ধর্ম্মে জাতিভেদ প্রথার অভাব, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও খাদ্যাখাদ্যের বিধিনিষেধ না থাকার সুবিধা পাইয়া বহুলোক খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল। চাকুরী,

ইংরাজসমাজে মেলা-মেশার সুবিধা ও সম্মানলাভের সুযোগ দেখিয়া লোকে ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করিল। এইভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষিত শূদ্রও ইংরাজ সরকারের গুণগ্রাহিতার ফলে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া সম্মানলাভ করিতে লাগিল। অপরদিকে ব্রাহ্মণের জন্মগত সম্মানের হানি হইতে লাগিল। সংস্কৃত শিক্ষিত ঋষিকল্প অধ্যাপকের অন্নাভাব ঘটিল, অথচ অল্পশিক্ষিত ইংরাজীনবীশগণ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুর বদ্ধমূল ধারণাসকল শিথিল হইয়া পড়ায়, ক্রিয়া-কর্ম্ম একরূপ উঠিয়াই গেল, ব্রাহ্মণকে দান আর ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই সকল কারণে ধীরে ধীরে এদেশে ইংরাজী-শিক্ষার প্রচলনের সহিত সংস্কৃতশিক্ষা লোপ পাইল। ব্রাহ্মণের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা আর লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিল না। অপর দিকে ইংরাজের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা, তাহাদের উন্নত বিজ্ঞান শিক্ষার ফলস্বরূপ দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোত ও রথ, সমরোপকরণ, তাহাদের বীরত্ব, কল-কারখানা, সাহিত্য ও সমাজ জাতিকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল—সকলেই এক পথে ছুটিতে লাগিল।

খৃষ্টান মিশনারিরা ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের নানাস্থানে কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেই সকল স্থানে তাহারা স্কুল ও হস্‌পিটাল স্থাপন করিয়া ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রচারের সহায়তা করেন। ইহারা ছাত্রদের নিকট বেতন লইতেন না—বিদ্যা ও চিকিৎসা বিতরণ করিতেন। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাল্‌না ইহাঁদের এইরূপ একটী কেন্দ্র ছিল। ডিয়ার (Deerr)[১] সাহেব কাল্‌নার একজন মিশনারি ছিলেন। তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কিছুদিন কৃষ্ণনগরে বাস

(১) In 1832, a Mr. Deerr, who was then stationed at Kalna in the Bardwan district, went to Krishnagar for a change of air, and, while there, opened two schools in the town of Nabadwip and one at Krishnagar itself.
Vide, Bengal District Gazetteers, Nadia, p. 136.

করেন। সেই সময়ে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি কৃষ্ণনগরে একটী এবং নবদ্বীপে দুইটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইরূপে 'ভারতীর রাজধানী'তে ইংরাজী শিক্ষা প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু এই মিশনারি বিদ্যালয় অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য।—ইনি নবদ্বীপে মিশনারি সাহেবদের নিকট সর্ব্বপ্রথম প্রাথমিক ইংরাজী শিক্ষা করেন, এবং তিনি একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়া বালকদের কিছু কিছু ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তিনি সাধারণে 'রুদ্রকণ্ঠ মাষ্টার' নামে পরিচিত ছিলেন।

মিশনারি স্কুল।—Rev. Hasell সাহেব তৎকালে বঙ্গদেশে মিশনারিগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। কৃষ্ণনগরে তাঁহাদের প্রধান প্রচার-কেন্দ্র ছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি চাপড়ায় স্কুল স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ের কাছাকাছি তিনি নবদ্বীপেও স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে প্রথমতঃ টোলের ন্যায় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও তাহার সহিত কিছু কিছু ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইত। কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। Hasell সাহেবের পর, Rev. Melin সাহেব, এবং তাহার পর Rev. Schour সাহেব ঐ স্কুলের সেক্রেটারী হন। শুর সাহেবের সময়ে এই স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত খোলা হয়। শ্যামাচরণ ঘোষ (খৃষ্টিয়ান) এই স্কুলের প্রথম হেড মাষ্টার, এবং ভারতচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। শ্যামাচরণ বাবুর সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের কোন কারণে বচসা হওয়ায়, ছাত্রেরা একযোগে সাহেবের নিকট শ্যামাচরণ বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তাহার ফলে শ্যামাচরণ বাবুর চাকুরী যায়, এবং দ্বিতীয় শিক্ষক কৃষ্ণনগর-বাসী নবকৃষ্ণ গাঙ্গুলী প্রধান শিক্ষক হয়েন। ৩।৪ বৎসর যাবৎ ঐ বিদ্যালয় হইতে ছাত্রেরা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে থাকে।

হিন্দুস্কুলের জন্মকথা।—কোন কারণে সেক্রেটারীর সহিত বনিবনাও না হওয়ায়, নবকৃষ্ণ বাবুর চাকুরী যায়। তিনি নবদ্বীপস্থ সমস্ত

ভদ্রলোকের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। নবদ্বীপের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া, মিশনারি-আধিপত্য হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক হিন্দু স্কুল স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। তদনুসারে নসীবাবুর বৈঠকখানা বাড়ীতে (বর্ত্তমান রাধারমণ বাগ) হিন্দুস্কুল (১৮৬৮ খৃঃ) স্থাপিত হয়। এই স্কুল স্থাপিত হওয়ায় মিশনারি সাহেবদিগের সহিত নবদ্বীপবাসীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তখন নবদ্বীপের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ হিন্দু স্কুলটী স্থায়ী করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন, এবং তদর্থে চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ সান্ন্যাল, কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন, নৃসিংহপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নসীরাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মাধবচন্দ্র বিদ্যারত্নের বাটীতে এক সভা করেন। স্কুল স্থায়ী করিতে সকলেই একমত হইয়া, তারিণী বাবুকে সম্পাদক এবং দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্য্যকে সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত করেন। তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া স্কুলের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকেন। তারিণীবাবু স্কুলের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন, এবং এই স্কুলও তারিণীবাবুর স্কুল বলিয়া পরিচিত হয়। কিছুদিন পরে নসীবাবুর অসুবিধা হওয়ায়, বৈঠকখানা হইতে স্কুল উঠাইয়া লইয়া রাইমণি ময়রাণীর বাড়ীতে (ষষ্ঠীতলায়) স্থাপন করা হয়। এই সময়ে তারিণীবাবু পেন্সন লইয়া বাড়ী আসেন, এবং কিছুকাল নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এই জন্য এই স্কুলে বহু ছাত্র যোগদান করে। এইরূপে নবদ্বীপে দুইটী এণ্ট্রান্স স্কুল চলিতে থাকে, ও উভয় বিদ্যালয় হইতে ছাত্রেরা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে থাকে। রাইমণি ময়রাণীর বাড়ী স্কুল থাকা কালে, হাইকোর্টের বিচারপতি Justice Phear নবদ্বীপে টোল পরিদর্শনের জন্য আগমন করেন। তখন তিনি মিশনারি স্কুল ও হিন্দুস্কুল পরিদর্শন করেন। তিনি তারিণীবাবুর সহিত আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া মন্তব্য করেন যে, যখন হিন্দুস্কুলে বেতন লওয়া হয়, তখন ইহা স্থায়ী হইবে, অবৈতনিক মিশনারি স্কুল উঠিয়া যাইবে।

হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক নবকৃষ্ণ গাঙ্গুলী মিশনারিদের সহিত যোগ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন প্রকাশ পাওয়ায়, তারিণীবাবুর নির্দ্দেশমত তিনি চাকুরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল তারিণীবাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মিশনারি স্কুল সম্বন্ধে তাঁহার কাগজে নিয়মিত আলোচনা হইতে থাকে। এদিকে তারিণীবাবুও মিশনারিদের সম্বন্ধে ডিরেক্টর অব পবলিক ইন্‌সট্রকসনের সহিত লেখালেখি করিতে থাকেন। এই আন্দোলনে সম্ভবতঃ Phear সাহেবও সাহায্য করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে মিশনারী স্কুল উঠিয়া গিয়া হিন্দুস্কুল স্থায়ী হইল। মিশনারি স্কুল উঠিয়া যাইবার আর একটি কারণ—সেই সময়ে মিশনারিগণ নবদ্বীপবাসী কোন ব্রাহ্মণ তনয়কে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টিত হওয়ায়, নবদ্বীপবাসিগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে যত্নবান হন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন মিশনারিদের হস্তে শিক্ষার ভার থাকিলে, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা সুকঠিন হইবে।

এই সময়ে নবদ্বীপবাসী জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় মিশনারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তিনি সমস্ত ছাত্র লইয়া হিন্দুস্কুলে যোগ দেন ও তাহার প্রধান শিক্ষক হয়েন। কিন্তু জগদ্বন্ধু বাবুর কার্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া, তারিণীবাবু দ্বিতীয় শিক্ষক বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি-এ মহাশয়কে প্রধান শিক্ষকের পদে (১৮৭৮ খৃঃ) নিযুক্ত করেন।

বর্ত্তমান হিন্দুস্কুলের জমী তারিণীবাবু নিজ ব্যয়ে ক্রয় করিয়া দান করেন, এবং রত্নমণি কুণ্ডুর প্রদত্ত ৮৭৫০৲ টাকা এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া মুক্তামণি দাসীর (বৌকুণ্ডু) প্রদত্ত ৫০০৲ টাকা অর্থ-সাহায্যে ও তারিণীবাবুর যত্নে স্কুলের প্রাথমিক গৃহাদি নির্ম্মিত হয়।

তারিণীবাবুর মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় স্কুলটিকে নিজ সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং তারিণীবাবুর উইলের একটি ক্রোড়পত্র উপস্থিত করেন। ইহাতে নবদ্বীপবাসী

ভদ্রমহোদয়গণ রায় দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য বাহাদুরের অধিনায়কত্বে অশ্বিনী বাবুর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। হাইকোর্টের বিচারে হিন্দুস্কুল সাধারণের স্কুল বলিয়া (১৯০৫ খৃঃ) স্থিরীকৃত হয়।

তারিণীবাবু ও পরে সাধারণের যত্নে এই স্কুল বঙ্গদেশের একটী প্রধান স্কুল বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র উত্তর কালে সমস্ত দেশে, এমন কি পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই সকল ছাত্রের মধ্যে পাটনা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীশক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মঃ মঃ ডাঃ সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ M.A., Ph. D., হাজারিবাগের উকিল শ্রীকালীপদ রায় B. L., কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগচি, M.A., B.L., স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির জজ শ্রীরমণীমোহন গোস্বামী M. A., B. L., কৃষ্ণনগরের সরকারী উকিল শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় B. L., বর্ম্মার সিভিল সার্জ্জন শ্রীমণিলাল কুণ্ডু M.B. (Cal), F. R. F. P. S. (Glas) L.M. (Dub), অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার M.A., P.R.S., Ph. D. প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বকুলতলা ইংরাজী বিদ্যালয়।—ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের সহিত নবদ্বীপে বকুলতলায় একটি মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিলিজাতীয়া যাদুমণি দাসীর অর্থ-সাহায্যে ইহার প্রাথমিক গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতঃপর এই বিদ্যালয় মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ইহার সেক্রেটারী অবসর-প্রাপ্ত স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌সপেক্টর রামদাস মুখোপাধ্যায়ের যত্নে বিদ্যালয়টী দিন দিন উন্নতি-লাভ করিতেছিল। এদিকে হিন্দুস্কুলের ছাত্রসংখ্যা বহুলরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় নবদ্বীপবাসী কয়েক জনের মনে আর একটী উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প জাগরূক হয়। ইহাদের মধ্যে শ্রীজনরঞ্জন রায় ও শ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের চেষ্টায় এবং নবদ্বীপ ও অন্য স্থানবাসী

দাতাগণের প্রদত্ত অর্থ-সাহায্যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান বকুলতলা উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এবং পূর্ব্বতন মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর উদ্যমের ফলে নূতন শিক্ষায়তনটি গড়িয়া উঠে। ১৯২৬ খৃঃ হইতে এই বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতেছে।

বালিকা বিদ্যালয়।—পূর্ব্বকালে এদেশস্থ বালিকাগণ নিজ গৃহে অভিভাবকদের নিকট গৃহকার্য্যের উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও প্রচলিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি মনীষিগণই স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহাদের সহযোগিতায় মহাত্মা বেথুন সাহেব ১৮৪৯ খৃঃ বালিকাদের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। মিশনারিগণই নবদ্বীপে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বালকদিগের বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে, বালিকা বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইল। আজও খৃষ্টান মিশনারিদিগের শেষ চিহ্ন-স্বরূপ এই বিদ্যালয়টী নবদ্বীপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং কৃষ্ণনগরের মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। অতঃপর তারিণীবাবুর চেষ্টায়, এবং ভূকৈলাসের রাণী তারা-সুন্দরী দেবীর অর্থ সাহায্যে (১৮৮০ খৃঃ) 'তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয় দুইটীতেই উচ্চ-প্রাইমারী পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমপাদের শেষে সমস্ত দেশে স্ত্রীশিক্ষা অগ্রসর হইতে থাকে। নবদ্বীপেও বালিকাদিগকে উচ্চ-ইংরাজী শিক্ষা দিবার মানসে শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামী এম-এ ও কতিপয় উচ্চ-শিক্ষিত নব্যযুবকের চেষ্টায় (১৯২৯ খৃঃ) 'বঙ্গবাণী বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানে বালিকাদিগকে নানাবিধ ললিতকলার সহিত ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার গ্রামের দক্ষিণ-

ভাগে দেয়ারাপাড়াতেও আর একটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ পল্লীবাসী কয়েকটী নব্যশিক্ষিত উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় এবং শ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অর্থ সাহায্যে দেয়ারাপাড়া-বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য 'ঈশানী স্মৃতিমন্দির' নির্ম্মিত হইল। এই বিদ্যালয়ে মধ্য-ইংরাজীর পাঠ্য পড়ান হয়। এতদ্ভিন্ন নবদ্বীপ রাধারমণ বাগে বালকবালিকাদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এই উভয় বিদ্যালয়েই ছাত্র বা ছাত্রীগণের নিকট বেতন গ্রহণ করা হয় না। নবদ্বীপ ভজনাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কল্পে বালিকাদের জন্য একটী অবৈতনিক পাঠশালা পরিচালন করেন।

সপ্তম এডোয়ার্ড এংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী।—উপরি-বর্ণিত বিদ্যালয় কয়টি দ্বারা নবদ্বীপের বালক-বালিকাদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হয় নাই। শিক্ষার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপবাসী অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, যদুনাথ সার্ব্বভৌম, রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ, এবং রায় দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য বাহাদুর, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগচি, জমীদার আনন্দময় রায়, তারাপ্রসন্ন বাগচি প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের প্রযত্নে একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। মহামান্য ভারত-সম্রাট্ ৭ম এডোয়ার্ডের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে ঐ লাইব্রেরীটি 'সপ্তম এডোয়ার্ড এংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী' নামে (১৯১০ খৃঃ) পরিচিত হয়। অতঃপর দানবীর কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব, ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়, জমীদার মন্মথনাথ পাল চৌধুরী এবং নবদ্বীপবাসী জমীদার আনন্দময় রায় ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সহৃদয় বদান্যগণের অর্থ সাহায্যে, ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের ভ্রাতা হরিদাস শিরোমণির টোল বাড়ী ক্রীত হইয়া বর্ত্তমান লাইব্রেরীগৃহ নির্ম্মিত হয়। বঙ্গের প্রথম লাট মহামান্য লর্ড কারমাইকেল

বাহাদুর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ৩০এ আগষ্ট তারিখে এই নবনির্ম্মিত পাঠাগারে সস্ত্রীক আগমন করেন। পণ্ডিতমণ্ডলী এবং পাঠাগারের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধক্রমে তিনি পুস্তক ও আসবাব পত্র ক্রয় করিবার জন্য ২০০০৲ টাকা দান করেন। এই লাইব্রেরীতে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। হস্তলিখিত বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুথিও এই স্থানে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় লাইব্রেরীটি বঙ্গদেশের প্রথমশ্রেণীর লাইব্রেরী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। লাইব্রেরীটি গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় মিউনিসিপালিটির সাহায্য পায়।

ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ।

তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।[১]—কাল্‌নার নিকটবর্ত্তী দেড়েটোন গ্রাম-নিবাসী শশিশেখর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১২৩৯ সালে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপ-নিবাসী মাধবচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার মাতুল ছিলেন। তাঁহার পিতা রংপুর কালেক্টরের সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। তখন নবদ্বীপে ইংরাজী বিদ্যালয় না থাকায়, তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে পড়েন। মাতুলালয় হইতে চাউল, ডাউল প্রভৃতি মাথায় করিয়া লইয়া পদব্রজে তিনি কৃষ্ণনগর যাইতেন। তথায় তিনি নবদ্বীপবাসী দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের সহপাঠী ছিলেন, এবং দুইজনে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি পান।

সৈনিক বিভাগে তিনি প্রথম চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রধান-শিক্ষকের পদে

(১) তারিণীবাবু সম্বন্ধীয় বিবরণ সমূহ তাঁহার মাতুল-পুত্র ৺যজ্ঞেশ্বরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া সংকলিত হইল।

নিযুক্ত হন। অতি যোগ্যতার সহিত তিনি এই পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। শরীর অসুস্থ হওয়ায় এক-তৃতীয়াংশ পেন্সন লইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতায় বাস কালে, তিনি সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মনস্বিবর্গের সহিত সর্ব্বদাই তাঁহার মেলামেশা হইত। সমাজ সংস্কার কার্য্যে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য যে দরখাস্ত করা হয় তাহার স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে তারিণীবাবুও একজন ছিলেন।[২]

শিক্ষা বিস্তারের প্রতি চিরকালই তাঁহার দৃষ্টি প্রখর ছিল। তিনি বঙ্গভাষায় 'ভূগোল বিবরণ', 'ভূগোল প্রবেশ', ও 'ভারতের ইতিহাস' প্রণয়ন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় ভূগোল বা ইতিহাসের অন্য কোন গ্রন্থ ছিল না। ভূগোল বিবরণ ১৮৫৬ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছিলেন। পেন্সন লইয়া নবদ্বীপ আসিবার পর তিনি 'হিন্দুস্কুল' স্থাপনে ও পরিচালনে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। নবদ্বীপের উন্নতিবিধান তাঁহার জীবনের পণ ছিল; এবং সারাজীবন তিনি জনহিতকর কার্য্য দ্বারা সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহারই যত্নে ১৮৬৯ খৃঃ নবদ্বীপে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়া, পথঘাটের উন্নতিবিধানের সূত্রপাত হয়। নবদ্বীপবাসীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান হন। তৎকালে প্রতিবর্ষায় বন্যার জলে নবদ্বীপ-নগর ডুবিয়া যাইত। তারিণীবাবুর চেষ্টায় চারিদিকে বাঁধ দিয়া নবদ্বীপকে বন্যাজল হইতে রক্ষা করা হয়। তারাসুন্দরী বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় তিনিই অগ্রণী ছিলেন।

---

(২) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর জীবনী—পৃঃ ২৫৫, পাদটীকা।

আর একটী কার্য্যে নবদ্বীপ ও নদীয়া জেলাবাসীর কাছে তারিণী বাবুর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বঙ্গের ছোটলাট Sir George Camplellএর সময়ে, বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনার সাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভাগীরথীর নৈসর্গিক সীমা অনুসারে, নবদ্বীপ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বাবলারী, কালীনগর ও মহীসূরা গ্রাম কয়টী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরবাসীদের বহু প্রতিবাদে, এবং সংবাদপত্রের তীব্র আন্দোলনে লাটসাহেব কর্ণপাত করিলেন না। অমৃতবাজার পত্রিকা, 'A body without a head'—নবদ্বীপবিহীন নদীয়া জেলা, বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ক্যাম্বেল সাহেবের নিকট আবেদন করিয়া কোন ফল হইবে না বিবেচনায়, সকলেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে নবদ্বীপ বর্দ্ধমান জেলার কাল্না মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যথারীতি মোকদ্দমা প্রভৃতি চলিতে লাগিল।

এই সময়ে ত্রিহুত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লর্ড নর্থব্রুকের সহিত ক্যাম্বেল সাহেবের মতভেদ হওয়ায় তিনি কার্য্য ত্যাগ করেন, এবং Sir Richard Temple বঙ্গের ছোট লাট হয়েন। টেম্পেল সাহেব অতি ভাল মানুষ ছিলেন। তখন Lord Ulick Brown প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার এবং Steevens সাহেব নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইউলিক ব্রাউনও বহুদিন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। নবদ্বীপের উপর তাঁহাদের দুজনেরই অতিশয় প্রীতি ছিল, ও দুজনেই নবদ্বীপকে নদীয়ায় রাখিবার পক্ষে ছিলেন। এই সময়ে নবদ্বীপকে নদীয়ায় রাখিবার জন্য নবদ্বপবাসিগণ ছোট লাটের নিকট পুনরায় এক আবেদন করিলেন। তাহার উত্তরে, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অণ্ডার-সেক্রেটারী J. Crawfurd সাহেব, ১৮৭৪ খৃঃ ৯ই এপ্রিল তারিখে জানাইলেন যে, "আগামী বর্ষায় নদীর অবস্থা না দেখিয়া, ছোটলাট বাহাদুর এত শীঘ্র নবদ্বীপকে নদীয়া জেলায় পুনরানয়ন

কার্য্য উচিত বিবেচনা করেন না। উপস্থিত যেমন কার্য্য চলিতেছে, সেইরূপই চলিবে।"৩

যাহা হউক, নবদ্বীপবাসী দুর্গাদাস বাগ্‌চি মহাশয় কমিসনারের সেরেস্তাদার ছিলেন। কমিসনার সাহেব তাঁহাকে দিয়া নবদ্বীপের তারিণী বাবু ও জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্র দিয়া জানান যে, 'Temple সাহেব ষ্টীমার যোগে নবদ্বীপ হইয়া ত্রিহুত দুর্ভিক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতেছেন। তাঁহার নিকট memorial দিলে, যাইবার সময় তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন।' তদনুসারে memorial দেওয়া হয়। পূজার পরেই ছোটলাট Temple সাহেব, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনার Lord Ulick Brown, নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট Steevens ও বৰ্দ্ধমান বিভাগের কমিসনার Buckland সাহেবের সঙ্গে নবদ্বীপ আগমন করেন। তারিণীবাবু-প্রমুখ বহু ভদ্রলোক তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য রাণীর ঘাটের বটতলায় উপস্থিত থাকেন। সাহেবরা ষ্টীমার হইতে ঐ স্থানে অবতরণ করেন। তখন মাত্র ঐ স্থানটী স্থল ছিল ও অন্য সব জলময় হইয়া গিয়াছিল। সেদিন কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে ইচ্ছাভোজন থাকায়, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ কেহই উপস্থিত ছিলেন না। শ্রীনাথ শিরোমণি, মাধব বিদ্যারত্ন প্রভৃতি দুই একজন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা লাট সাহেবকে সংস্কৃতে অভিনন্দন পত্র দেন।

এই সময়ে Buckland সাহেব লাট সাহেবকে জানান যে, 'নবদ্বীপের সমুদায় লোকেরই ইচ্ছা নবদ্বীপ বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত থাকে।

(৩) বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অফিসিয়েটিং আণ্ডার সেক্রেটারী J. Crawfurd সাহেবের, নবদ্বীপ নদীয়া জেলায় পুনরানয়ন সম্বন্ধে আবেদন পত্রের ১৮৭৪ খৃঃ ৯ই এপ্রিল তারিখের উত্তর পত্রের ৪র্থ প্যারাগ্রাফ—

4. The Leult. Govr. does not consider that a case has been made out for a complete and immediate re-transfer of the villages in question to the Nuddea jurisdiction, and would prefer to wait to see the result of the action of the river during tha approaching rains and for the present the arrangements notified must stand.

কারণ সকলেরই জমী জমা বৰ্দ্ধমান জেলায়। কেবল তারিণীচরণ চট্টো-পাধ্যায় নামে একজন, তাহার কোথাও জমী জমা নাই, তিনিই নবদ্বীপকে নদীয়ায় রাখিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন।' কিন্তু লাট সাহেব নবদ্বীপে জনসমাগম দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, Buckland সাহেবের কথা ঠিক নহে। অতঃপর যাঁহারা মেমোরিয়ালে স্বাক্ষর করেন নাই তাঁহাদিগকে তিনি সরিয়া যাইতে বলেন। তাহাতে একমাত্র যদুনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এল সরিয়া যান, এবং বলেন যে, মেমোরিয়ালে সহি করিবার সময় তিনি উপস্থিত না থাকায় সহি করিতে পারেন নাই, কিন্তু উহার সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। টেম্পল সাহেব, অতঃপর, গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া স্থির করেন নবদ্বীপ নদীয়া জেলার অন্তর্গত থাকিবে। এই কথা তিনি হাসিমুখে ঘোষণা করিয়া জনসাধারণের উদ্বেগ প্রশমিত করেন।

এইরূপে দেশসেবা করিয়া ১৩০৩ সালে (১৮৯৬ খৃঃ) ২৮এ আষাঢ় তারিখে তরণীবাবু পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার চারিপুত্র বর্ত্তমান ছিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় B. L. হিন্দুস্কুলের মোক-দ্দমার পর নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ (তারাসুন্দরী বালিকাবিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সম্পাদক) নবদ্বীপে বাস করিতেছেন।

রায় দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য বাহাদুর।[৪]—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীনাথ তর্কবাগীশ 'জজ পণ্ডিতে'র পদে নিযুক্ত ছিলেন। যে বংশে দ্বারকানাথ জন্মগ্রহণ করেন তাহা 'ব্যান্দড়া বংশ' নামে পরিচিত। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যশোহর

(৪) নবদ্বীপবাসী ডাঃ শ্রীরণজিৎকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত।

জিলার ভুগিলহাট নামক গ্রামে বাস করিতেন। তথায় তাঁহারা 'গাংফিরানো ভট্টাচার্য্য' নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশীয় সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকাকার ক্রমদীশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র রুদ্ররাম নবদ্বীপাধিপতির নিকট ব্রহ্মত্র ও বৃত্তি পাইয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁর পুত্র মহাদেব একবার মহারাজার পশুশালা দেখিতে যান, এবং মজা দেখিবার জন্য একটা পাতায় কিছু নস্য ঢালিয়া বাঘের ঘরে গরাদের ভিতর রাখিয়া দেন। বাঘ ঘ্রাণ লইবামাত্র প্রলয় কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। মহারাজ সংবাদ পাইয়া ও সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলেন, "ঠাকুর, আপনি ত ভারি ব্যাদড়া (দুষ্ট)!" তদবধি তিনি ও তদ্বংশীয়গণ 'ব্যাদড়া' নামে অভিহিত হন। তাঁহারা নবদ্বীপের যে পল্লীতে বাস করেন তাহাও 'ব্যাদড়া পাড়া' নামে পরিচিত হয়।

ছয় ভ্রাতার মধ্যে দ্বারকানাথ ছিলেন দ্বিতীয়। অল্প-বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায়, তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী শিশু পুত্রকন্যা লইয়া বিশেষ কষ্টে পতিত হন, ও অতি যত্নের সহিত সন্তানদিগের লালন-পালন করিতে থাকেন। দ্বারকানাথ বাল্যে কিছু সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষা করিয়া ইংরাজী শিক্ষার জন্য কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্ত্তি হন। কৃষ্ণনগর কলেজ ত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতা হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জজ দ্বারিকানাথ মিত্র তখন তাঁহার উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন। তাঁহাদের কোন কোন পাঠ এক সঙ্গে দেওয়া হইত। এই সূত্রে মিত্র মহাশয়ের সহিত দ্বারকানাথের বন্ধুত্ব জন্মে।[৫] অতঃপর তিনি সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হন, এবং উত্তরপাড়া স্কুলে সামান্য বেতনে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের অধীনে (১৮৫৪ খৃঃ) সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের

(৫) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর জীবনীতে প্রকাশিত দ্বারকানাথের পত্র —পৃঃ xvii।

উপযুক্ত সহকারী ছিলেন, এবং উভয়ের কার্য্যকুশলতায় উত্তরপাড়া স্কুলের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।[৬] অতঃপর তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গণিতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং যাঁহারা সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদিগকে একেবারে বি-এ পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেন। দ্বারকানাথ ১৮৬৫ খৃঃ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং শিক্ষকতা করিতে করিতেই পরবর্ত্তী বৎসরে গণিত-শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় (Honours in Arts সহিত) উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৮ খৃঃ তিনি বি-এল পরীক্ষা পাস করিয়া মুন্সেফী কার্য্য গ্রহণ করেন। কার্য্যদক্ষতার গুণে কর্ম্মজীবনে তিনি দিন দিন উন্নতিলাভ করিতে থাকেন, এবং শেষে সব-জজের পদে উন্নীত হন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় প্রীত হইয়া সরকার বাহাদুর ১৮৯৪ খৃঃ তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। কর্ম্মজীবনে তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং বহু সিভিলিয়ান সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় অবস্থান কালে দ্বারকানাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁহার সহচরবৃন্দের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সদ্‌গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দ্বারকানাথ তাঁহার বাল্যবন্ধু হাইকোর্টের জজ দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া বিদ্যাসাগরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।[৫] বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য যে দরখাস্ত করা হয়, দ্বারকা-নাথ তাহাতে স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন,[৭] এবং প্রথম বিধবাবিবাহের উৎসব সভায় তিনি সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আহারাদির বিষয়ে নিতান্ত আত্মীয় স্থলে এক প্রকার দৌরাত্ম্যের ব্যবস্থা

---

(৬) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পৃঃ ৩৮৬।

(৭) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর জীবনী—পৃঃ ২০৪, পাদটীকা॥

করিয়াছিলেন। ভোজন-সমিতি (Gastronomy Club) নামে একটি ক্ষুদ্র দল গঠিত হইয়াছিল। এই সভার ৯।১০ জন সভ্যের মধ্যে দ্বারকানাথও একজন ছিলেন। একবার এক গৃহস্থকে পীড়ন করিয়া ঐ সমিতির একটা খুব জাঁকাল রকম আহার জুটিল। অতি ভোজনে, পর দিবস দ্বারকানাথের উদরাময় হইল। সকলের মিলিত সেবাশুশ্রূষায় তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু সেবাকারীদের মধ্যে কেহ বলিলেন, 'ইহার পেটের দোষ আছে, ইহাকে সভ্যপদ হইতে খারিজ করিয়া দাও।' তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'না হে, উহাকে খারিজ করিলে অধর্ম্ম হইবে। যে ব্যক্তি Martyr to the cause (এই কার্য্যে প্রাণ দিতে উদ্যত) তাহাকে বিদায় করিয়া দিলে, কাকে নিয়ে থাকবে'? (৮)

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর দ্বারকানাথ কিছুদিন মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ষ্টেটের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। অতঃপর তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া জন্মভূমির উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করেন। নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল স্থাপিত হইবার সময়েই তিনি সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিদেশে থাকায় ঐ কার্য্যে তাদৃশ মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। তারিণীবাবুর মৃত্যুর পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় স্কুলটিকে নিজ সম্পত্তি বলিয়া অধিকার করিলে, দ্বারকানাথ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া, হাইকোর্ট পর্য্যন্ত দুইবার মামলার পর, সাধারণের পক্ষ হইতে স্কুলটিকে উদ্ধার করিয়া দেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে, স্যর রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। স্কুলের মোকদ্দমায় স্যর রাসবিহারী ঘোষ সাধারণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি তিনি তাঁহার শিক্ষকের সম্মানার্থ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। পারিশ্রমিক-স্বরূপ যে ৫০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন তাহা তিনি হিন্দুস্কুলকে দান করেন। ঐ অর্থ হইতে বর্ত্তমানে তাঁহার

(৮) Ibid—পৃঃ ৪৭১-২।

নামে ইংরাজীভাষায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে প্রতিবৎসর একটী পদক দেওয়া হয়। দ্বারকানাথকে, ঘোষ মহাশয় এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, দ্বারকানাথের বার্দ্ধক্যে তাঁহাকে শেষ দেখিবার জন্য তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।

হিন্দুস্কুল সাধারণের হাতে আসিবার পর দ্বারকানাথ কিছুদিন উহার রিসিভার ও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি বহুদিন মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। সেই সময়ে, তিনি সম্পূর্ণ নিজের উদ্যমে ও চেষ্টায় স্থানীয় 'গ্যারেট হাঁসপাতাল' প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই কাজে তিনি নবদ্বীপের মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, নারাজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ ও ভূকৈলাসের রাণী তারাসুন্দরী দেবীর নিকট যথেষ্ট অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'বিদ্যাসিন্ধু' উপাধি দান করেন।

দ্বারকানাথ-প্রমুখ বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের মিলন স্থান (club) ছিল, কৃষ্ণকুমার সান্ন্যাল মহাশয়ের বাড়ী। সেখানে প্রতিদিন বৈকালে দ্বারিকবাবু, গঙ্গানারায়ণ সান্ন্যাল, কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং গ্রন্থকার প্রভৃতি মিলিত হইয়া নানারূপ সদালোচনা করিতেন।

তিনি 'ক্যাথারীনের উপাখ্যান' নামে একখানি গল্প পুস্তক ও 'Elements of Arithmetic' নামে একখানি পাটীগণিত রচনা করিয়াছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অনুরাগ ছিল। তাঁহার পাটীগণিতে বহু নূতন পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন। জীবনের শেষকালে দীর্ঘ অবসরকাল উপভোগ করিয়া, এবং স্বীয় চরিত্র ও বুদ্ধি বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণে সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট রাখিয়া, তিনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট তারিখে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

ব্যাদড়া বংশ।—বর্ত্তমানকালে ব্যাদড়াবংশের সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং অনেকেই সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। দ্বারকানাথ উপার্জ্জনক্ষম

হইলে, প্রধানতঃ তাঁহার অর্থ সাহায্যে ও চেষ্টায় তাঁহার অপর ভ্রাতাগণ লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে যদুনাথ চিকিৎসা ব্যবসায়ে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পঞ্চম ভ্রাতা দিননাথ ওভারসিয়ারী শিক্ষা করিয়া কিছুকাল গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করেন। কিন্তু সাংসারিক দুর্ঘটনায় পীড়িত হইয়া অকালে পেন্সন লইয়া, ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামনাথ কৃষ্ণনগর আদালতের একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন। তিনি ৫০ বৎসরের অধিককাল ওকালতী করিয়া, ৮৪ বৎসর বয়সে (১৯৩২ খৃঃ) দেহত্যাগ করেন। এই ভ্রাতৃবৃন্দ সকলেই মিউনিসিপালিটী, হিন্দুস্কুল, লাইব্রেরী প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ছিলেন।

দ্বারকানাথের পুত্র সুকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল, সবজজ ছিলেন। তিনি পেন্সন লইয়া মুর্শিদাবাদ নবাব ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই বংশের মধ্যে প্রমোদকুমার বি-এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কিরণ-কুমার এম-এ, বি-এল (কলি), এল্-এম্ (লণ্ডন), ব্যারিষ্টার, মুন্সেফী গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসর কার্য্য করিবার পর, ছুটী লইয়া লণ্ডনে গমন করেন এবং সেখানে অতিশয় যোগ্যতার সহিত এল-এম্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন। অতঃপর তিনি মুন্সেফী কার্য্য ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল-রিডারের (Law reader) পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বিমলকুমার এম-এ, বি-এল. মুন্সেফী পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যের জন্য ইনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদক ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর বহু বীরত্বসূচক কার্য্যের পরিচয় সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে। কমলকুমার এম্-এ, বি-এল, আলিপুর আদালতে ওকালতী করিতেছেন। সুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য বি-এ ঠাকুর ষ্টেটের সহকারী ম্যানেজার। প্রবোধকুমার বি-এ, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, ও রাজকুমার বি-এ, বি-এল উকীল। প্রফুল্লকুমার স্থানীয়

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা, এবং রণজিৎকুমার এম্-বি, নবদ্বীপের উন্নতিশীল চিকিৎসা ব্যবসায়ী। তিনি বহুদিন যাবৎ মিউনিসিপাল কমিসনার ও হিন্দুস্কুলের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কেদারেশ্বর বি-এ, কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। করুণাকুমার বি-এ, বি-এল, কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকীল। অমূল্যকুমার এম্-এস্‌সি, বি-এল, মুন্সেফ। তিনি এণ্ট্রান্স ও ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষায় ১৫৲ টাকার বৃত্তিলাভ করেন, এবং এম্-এস্‌সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান ও বি-এল্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে কৃষ্ণনগর জজকোর্টের উকীল নরহরি মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতি সুদক্ষ ব্যবহারাজীব ছিলেন, এবং বহুদিন মিউনিসিপালিটি ও হিন্দুস্কুল বোর্ডের সভ্য ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ভাগিনেয় নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল্, কৃষ্ণনগরের সরকারী উকীল।

রাম ধার্ম্মিকের পুত্র নীলমণি চট্টোপাধ্যায় (সাহেব) হুগলী নর্ম্মাল স্কুল হইতে ওকালতি পরীক্ষা পাস করেন, কিন্তু পিতার নিষেধহেতু ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না হইয়া, সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি কুচবিহারের নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। নর্ম্মাল বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে নীলমণি বাবু কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী 'কবিতা-কলাপ' নামক তিনখণ্ড কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী।[১]—কান্তিচন্দ্র নবদ্বীপ-নিবাসী মাধবচন্দ্র ভাদুড়ীর পুত্র। পুত্রকে ইংরাজী শিক্ষা দান করিবার অভিপ্রায়ে কান্তিচন্দ্রকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালীগ্রামে লইয়া যাওয়া হয়, এবং উত্তরপাড়া স্কুলে

(১) তাঁহার চতুর্থপুত্র শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত।

ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই স্থানে কান্তিচন্দ্র প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহিড়ী ও নবদ্বীপ-নিবাসী দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের ছাত্র ছিলেন। এই স্থানে উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সংশ্রবে আসিয়া কান্তিচন্দ্র আদর্শ নির্ম্মল স্বভাব ও চরিত্র লাভ করেন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, অর্থোপার্জ্জনের আশায় প্রথমতঃ হুগলী জেলার ভান্ডারার স্কুলে ও পরে কোন্নগরের স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। অতঃপর তিনি হাওড়ার জিলা-স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করেন যে, বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহই জেলা-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে স্থায়ী হইবেন না। ইহা অবগত হইয়া কান্তিচন্দ্র আইন অধ্যয়নের জন্য পুনরায় কলিকাতায় হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। অর্থাভাব-বশতঃ এই সময়ে তাঁহাকে বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুর জজ আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ে সফল-মনোরথ হইতে না পারিয়া, তিনি মুন্সেফের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। এই কার্য্যে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়া, সবজজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। চক্ষুর পীড়া বশতঃ দেহ অপটু হইলে, মাত্র ১২ বৎসর এই চাকুরী করিবার পর তাঁহাকে অবসর লইতে হয়। অতঃপর তিনি কলিকাতায় তৈল ও তামাকের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবসায়েও তিনি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি দয়ালু, আশ্রিত-বৎসল, দাতা এবং ছাত্র-পোষক ছিলেন। ১৯১২ খৃঃ ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

নীলমণি চৌধুরী।—ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে নীলমণি চৌধুরী মহাশয় মেডিকেল কলেজ হইতে (১৮৬৭ খৃঃ) এল্-এম্-এস্ পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই প্রদেশের বহুস্থানে যোগ্যতার সহিত তিনি 'এসিস্‌ট্যাণ্ট সার্জ্জনে'র কার্য্য করিয়াছেন। বহ্রাইচের অন্তর্গত নানপাড়া তালুকের রাজা জঙ্গ্ বাহাদুর খাঁ তাঁহার চিকিৎসায় প্রীত হইয়া, শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ লক্ষ্ণৌ নগরে তাঁহাকে একখানি সুন্দর অট্টালিকা দান করিয়াছিলেন।[১০] তিনি কিছু দিন মথুরার সিভিল সার্জ্জন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩২৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার পুত্রগণ এখন লক্ষ্ণৌ নগরে বাস করিতেছেন। নীলমণি বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রসন্নকুমার চৌধুরী নবদ্বীপের প্রথম হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক। এই চৌধুরী বংশে বিনয়কুমার চৌধুরী এম্-এ, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইকনমিক্সের অধ্যাপক এবং 'Elements of Civics and Economics Bks. I & II' নামক গ্রন্থ দুইখানির প্রণেতা; শম্ভুশরণ চৌধুরী এম্-এ, এম-এসসি, পাটনা মেডিকেল কলেজের বাইওলজির অধ্যাপক, এবং শিবশরণ চৌধুরী এম-এ, হেতমপুর কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক। বিনয়কুমার চৌধুরী বহুদিন হিন্দুস্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল।—রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের (মাষ্টার) দুইপুত্র—জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ যোগীন্দ্রনাথ। দুই ভ্রাতাই পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া অতুল পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতাই বাল্যে পিতার নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। মহেন্দ্রনাথ ১৮৬৯ খৃঃ এম-এ ও ১৮৭১ খৃঃ বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। কর্ম্মজীবনে তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী ১৮ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলি বিজ্ঞান বিষয়ক। তাঁহার রচিত 'পদার্থ দর্শন', 'পদার্থ বিদ্যা', 'বিজ্ঞান-রহস্য', 'বিজ্ঞান-সূত্র' প্রভৃতি

(১০) বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (উত্তর ভারত)—পৃঃ ৩৮৩।

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি ঐ জাতীয় পুস্তকের আদি বলিলেও চলে, এবং এই পুস্তকগুলি বিদ্যালয়-সমূহে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কয়েকখানি প্রথম পাঠ্য ইংরাজী ও গণিতপুস্তকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন, এবং নবদ্বীপের প্রতি প্রীতি-প্রযুক্ত তাঁহার পুস্তকের নাম 'Nadiya Readers' রাখেন। ১২৯১ সালে মহেন্দ্র বাবুর যত্নে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি বিধানার্থে ও সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণের উৎসাহ বিবর্দ্ধনার্থ নবদ্বীপে "সংস্কৃত বিদ্যা বিবর্দ্ধিনী বিদগ্ধ জননী সভা" নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভা হইতে তিনি 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা' নামে একখানি পঞ্জিকার প্রচলন করিয়াছিলেন। স্থানীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'বিদ্যারণ্য' উপাধি দান করেন।

মহেন্দ্রনাথ সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর বিশেষ অনুগ্রহ-পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে মহেন্দ্রনাথের বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ আস্থা জন্মে, এবং তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসনা করিতে থাকেন। তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে তিনি অন্যতম। শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ সহযোগ ছিল। তিনি পণ্ডিতদিগের সাহায্যে, চৈতন্যদেবের অবতারত্ব, পৃথক্ পূজা ও মন্ত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রচার করেন, এবং মহাসমারোহে ১৩০০ সালে নিজ গৃহে নিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

মহেন্দ্রনাথের কন্যা হরিবালা দেবী বিদুষী ছিলেন, তিনি অল্প বয়সেই 'সতীসংবাদ' নামে একখানি কব্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

ডাঃ যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্তশিরোমণি এম্-এ, ডি-এল্।—মহেন্দ্রনাথের ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথ ১৮৭১ খৃঃ বিজ্ঞানে এম্-এ পরীক্ষা (Honours in arts সহিত), ১৮৮৩ খৃঃ অনার্স-ইন্-ল, এবং ১৮৮৫ খৃঃ ডি-এল্ পরীক্ষা পাস করেন। ডি-এল্ পরীক্ষার জন্য তিনি 'গবেষণা-মূলক 'হিন্দু-ল' নামক প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেন, 'ব্যবস্থা কল্পদ্রুম' তাঁহার অন্য গ্রন্থ। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট

তিনি 'স্মার্ত্তশিরোমণি' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ব্যবসায়ে সুবিধা করিতে না পারিয়া, বর্দ্ধমান রাজষ্টেটে 'ল-মেম্বারের' কার্য্য গ্রহণ করেন, অতঃপর তিনি কাশ্মীর-রাজের আইনের উপদেষ্টা হন। সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তিনি হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কর্ম্মজীবনে যোগীন্দ্রনাথ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। দুই ভ্রাতাই অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

যদুনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এল।—রাজপুরোহিত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণের কনিষ্ঠ পুত্র যদুনাথ, এই বংশে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা করেন। তাঁহার অপর ভ্রাতাগণ প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৮৬৯ খৃঃ কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কৃষ্ণনগরে ওকালতী আরম্ভ করেন। দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ইহার পূর্ব্ব বৎসর বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও, ওকালতী ব্যবসায়ী বি-এল-দের মধ্যে যদুনাথই প্রথম। এই জন্য সাধারণে তিনি 'যদু বি-এল' নামেই পরিচিত ছিলেন।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।[১১]—নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী মোয়াইল গ্রামে বিশ্বেশ্বর ১৭৭৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবদ্বীপে বাস করিতেন, এখানে তাঁহার মাতুলালয়। বাল্যে পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় তিনি মাতার যত্নে প্রতিপালিত হন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য চুপী-নিবাসী হুগলীর উকিল স্বনামধন্য শিবনাথ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া, তিনি হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়িতে থাকেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর ছিল। তাঁহার মাতা অল্প-বয়স্ক পুত্রকে দূরে রাখিতে অসম্মত হওয়ায়, তিনি নবদ্বীপ মিশনারি স্কুলে আগমন করেন। এই স্থান হইতেই তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আর্থিক অস্বচ্ছলতা নিবন্ধন আঠারো বৎসর বয়সেই তাঁহাকে শিক্ষকতা কার্য্য অবলম্বন করিতে হয়, এবং নড়াইল ও জাহানাবাদের

---

(১১) বিশ্বেশ্বর বাবুর স্বহস্ত-লিখিত অপ্রকাশিত আত্মচরিত "তত্ত্বকথা" হইতে সংকলিত।

স্কুলে কিছুদিন কার্য্য করার পর, তিনি নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলে আগমন করেন। শিক্ষকতা করিতে করিতেই তিনি ১৮৭৭ খৃঃ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং পরবর্ত্তী বৎসরে হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। তখন তাঁহার মাতুল শিবনারায়ণ শিরোমণি হিন্দুস্কুলের প্রধান পণ্ডিত এবং তাঁহার দুই বন্ধু পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ও বিনোদলাল গোস্বামী তাঁহার সহকারী শিক্ষক ছিলেন। আত্মীয়-পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি অতীব আনন্দের সহিত কার্য্য করিতে থাকেন, এবং তাঁহাদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই উচ্চপদস্থ ও দেশ-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতিশয় যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া তিনি ১৯০৬ খৃঃ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

মিশনারি স্কুলে পড়িবার সময়ে বাইবেল পড়িয়া এবং খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশ পাইয়া, খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে, কিন্তু পাছে তাঁহার মাতৃদেবী ও আত্মীয় স্বজন কোনরূপ ক্লেশ পান ইহা ভাবিয়া খৃষ্টধর্ম্মের মত ত্যাগ করিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব নির্ণয়ে চেষ্টিত হন। ধর্ম্মে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল, সাধু সঙ্গে তাঁহার অকৃত্রিম প্রবৃত্তি ছিল, এবং তাঁহার মাতৃভক্তি আদর্শ-স্থানীয় ছিল। নিজ ভবনে 'হিতকরী সভা' প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দরিদ্রগণের সহায়তা করিতে সচেষ্ট হন, এবং রবিবারে বন্ধু ও আত্মীয়গণের সহিত সভায় মিলিত হইয়া তিনি ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তিনি আদর্শ শিক্ষক ছিলেন এবং শিক্ষকতার মধ্য দিয়া বালকদিগকে ধর্ম্ম ও চরিত্রগঠনের উপদেশ দিতেন। বহু দরিদ্র ছাত্রের তিনি প্রতিপালক ছিলেন।

অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। বেণীমাধব গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহযোগিতায় তিনি 'Manual of Translation' ও 'Junior Text Book of Translation' রচনা করেন। ছাত্র-সমাজে এই দুইখানি গ্রন্থ বিশেষ পরিচিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার

'ছাত্রশিক্ষা', 'বালিকারঞ্জন', 'গীতাভাস', 'পাঠাবলী', 'শব্দশিক্ষা' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকগুলিও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার 'উপাসক' বঙ্গ-সাহিত্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বল রত্ন। সুধী-সমাজে এই গীতিকাব্যখানি বিশেষরূপে প্রশংসিত।

বিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিলে, তাঁহার ছাত্র নবদ্বীপবাসী গোপীকৃষ্ণ চন্দ্র বি-এ, হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। বিশ্বেশ্বরবাবু কিছুদিন হিন্দুস্কুলের সেক্রেটারী ও মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩২৫ সালে ১০ই অগ্রহায়ণ তিনি দেহত্যাগ করেন।

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাকান্ত মুন্সীর পুত্র নবদ্বীপ মিশনারি স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া কিছুদিন শিক্ষকতা করিবার পর, দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলপথে একাউন্টেণ্টের পদে কার্য্য করেন। উক্ত রেল কোম্পানীর পেন্সন দিবার ব্যবস্থা না থাকিলেও, তাঁহার কার্য্যদক্ষতা সততা ও চরিত্র-গুণে প্রীত হইয়া, রেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে পেন্সন দিবার ব্যবস্থা করেন।

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।[১২]—পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, নবদ্বীপের গদাধর তর্কালঙ্কার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভার পুরাণ পাঠক ছিলেন। তাঁহারই বংশে বৈদ্যনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দীননাথ তর্করত্ন। এই পণ্ডিতবংশে ইংরাজী লেখাপড়া শিখিবার জন্য বৈদ্যনাথ বাবুই প্রথম নবদ্বীপস্থ মিশনারি স্কুলে প্রবেশ করেন। সেই স্থান হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, দারিদ্র্য-প্রযুক্ত তিনি কর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, এবং সমুদ্রগড় গ্রামে সামান্য শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী

---

(১২) বৈদ্যনাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-বি মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত।

যুবক এই কার্য্যে তৃপ্ত না হইয়া, (১৮৮০ খৃঃ) সুদূর হোলকার রাজ্যে গমন করিয়া, মালোয়া রেলপথে ১৫৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য চাকুরী গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার সাংসারিক দৈন্য একটুও অপসারিত হয় নাই। বাল্যাবধি গণিতশাস্ত্রে তাঁহার অশেষ বুৎপত্তি ছিল। এই সময়ে তিনি Accountantship পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায়, তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল। ১৯০০ খৃঃ নাগপুর হইতে কলিকাতা ও পুরী পর্য্যন্ত বি, এন রেলপথ বিস্তৃত হইলে, বৈদ্যনাথ বাবু বি, এন্, আরের কলিকাতাস্থ প্রধান অফিসে আগমন করেন এবং স্বীয় অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতার গুণে তিনি ক্রমশঃ এসিষ্টাণ্ট অডিটার, ডেপুটী অডিটার ও সিনিয়র ডেপুটী চীফ অডিটারের পদ লাভ করেন। তিনি ১৫৲ টাকা বেতনের সামান্য কেরাণী হইতে কি প্রকারে ১৮০০৲ টাকা বেতনের চীফ অডিটারের পদলাভ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই উন্নতির মূলে অধ্যবসায়, কর্ম্মকুশলতা, সততা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বর্ত্তমান ছিল। অতিশয় দক্ষতা ও সুখ্যাতির সহিত দীর্ঘকাল কার্য্য করিবার পর, ১৯২০ খৃঃ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, তিনি নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার অনুগ্রহে বহুলোক চাকুরী লাভ করিয়াছে। মিতব্যয়িতা, আশ্রিতবাৎসল্য ও দয়া তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। ১৯৩০ খৃঃ তিনি পরলোক গমন করেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি-এচ-ডি।—কমলাকর জ্যোতিষীর প্রসিদ্ধ বংশে সতীশচন্দ্র ১২৭৭ সালের ১৫ই শ্রাবণ (১৮৭০ খৃঃ ৩০এ জুলাই) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশের তৃতীয় পুত্র ছিলেন, এবং বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব ইহাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ১৮৮০ খৃঃ তিনি নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯২ খৃঃ কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে তিনি বি-এ পরীক্ষায় বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম স্থান

অধিকার করিয়া সুবর্ণ-পদক লাভ করেন, এবং পরবর্ত্তী বৎসরেই তিনি সংস্কৃতে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি শিবনারায়ণ শিরোমণির নিকট ব্যাকরণ, মহেশ ন্যায়রত্ন, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও গোবিন্দ শাস্ত্রীর নিকট দর্শন, স্মৃতি ও বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি নবদ্বীপস্থ 'বিদগ্ধজননী সভা' হইতে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃতাধ্যাপক থাকিবার কালে, তিনি মঃ মঃ অজিতনাথ ন্যায়রত্নের নিকট কাব্য এবং মঃ মঃ যদুনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি শুধু ভারতীয় ভাষা ও শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পালি, তিব্বতীয়, চীন জাপান ও শ্যামদেশীয় ভাষা, এবং জর্ম্মান ও ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা করেন, এবং ঐ সকল ভাষার মধ্য দিয়া, বিভিন্ন দেশের দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় দর্শনের সকল শাখাতেই তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময়ে, ১৯০১ খৃঃ তিনি পালি ভাষায় এম্-এ পরীক্ষা দান করেন। ভারতবর্ষে পালি ভাষার পরীক্ষক না থাকায়, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রীজ-ডেভিস সাহেব, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উত্তর পত্র পরীক্ষা করিয়া উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ভারতের মধ্যে পালি ভাষায় প্রথম এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী convocationএ বড়লাট লর্ড কর্জ্জন তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৮৯৭ খৃঃ তিনি তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হন, এবং রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের সহযোগিতায় তিব্বতীয়-ইংরাজী অভিধান এবং বৌদ্ধ-সংস্কৃত অভিধান সংকলন করেন।

তিনি আজীবন ছাত্রের ন্যায় অধ্যবসায়ের সহিত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ১৯০৬ খৃঃ তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান করিয়া তাঁহার বিদ্যাবত্তার সমাদর করিয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র

৩৬ বৎসর ছিল, এত অল্প বয়সে কেহই মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন নাই। ১৯০৭ খৃঃ 'A Short History of the Mediæval School of Indian Logic' গ্রন্থ লিখিয়া তিনি Griffith Memorial Prize প্রাপ্ত হন, এবং ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ইতিহাস "A History of Indian Logic" লিখিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এচ্-ডি উপাধি লাভ করেন। তিনি ১৯০৯ খৃঃ সিংহল গমন করিয়া মাহিন্দা কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। ১৯১০ খৃঃ তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতীয় ভাষার অধ্যাপক এবং সিনেটের সদস্য ছিলেন।

তিনি যে সকল সভা, সমিতি ও শিক্ষায়তনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এস্থানে তাহাদের পরিচয় দান করা অসম্ভব। তিনি বঙ্গদেশীয়, ইংলণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডস্থিত এসিয়াটিক সোসাইটি ও টেক্সট্ বুক কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি বহুদিন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার' সম্পাদক ছিলেন, সাহিত্য পরিষদের যশোহর অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। পুণায় Oriental Conferenceএর যে প্রথম অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সহকারী সভাপতি এবং তাহার পালি ও বৌদ্ধ শাখার সভাপতি ছিলেন।

তিনি নানাস্থান হইতে যে সকল উপাধি প্রাপ্ত হন, তাহার মধ্যে বৌদ্ধ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য 'ত্রিপিটক বাগীশ্বর', নিখিল ভারতীয় জৈন কন্‌ফারেন্স হইতে প্রাপ্ত 'সিদ্ধান্ত মহোদধি' এবং যোধপুর শ্বেতাম্বর জৈন সাহিত্যিক কন্‌ফারেন্স হইতে প্রাপ্ত 'শাস্ত্রসুধাকর' উপাধির উল্লেখ করিতে পারা যায়।

তাঁহার প্রণীত আত্মতত্ত্বপ্রকাশ, পালি ব্যাকরণ, বুদ্ধদেব, ভবভূতি প্রভৃতি গ্রন্থ সাহিত্য-সংসারে বিশেষ পরিচিত। ১৯২০ খৃঃ ২৫এ এপ্রিল তারিখে ৫০ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

সতীশচন্দ্রের পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য—পূর্ণচন্দ্র আচার্য্য ডেপুটি

ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এবং জগচ্চন্দ্র আচার্য্য বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেন।

সতীশচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা 'দক্ষিণাপথভ্রমণ', 'শঙ্করাচার্য্যচরিত', 'রামানুজচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস রাজসাহী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের পুত্র স্বুবর্ণপদক প্রাপ্ত হেমচন্দ্র শাস্ত্রী এম্-এ (ডবল) হুগলী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী সি-ই।[১৩]—নবদ্বীপ নিবাসী কেশবচন্দ্র ভাদুড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খৃঃ লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ হইতে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, একটি মিশনারি বিদ্যালয়ে গণিত-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই স্থানে এক বৎসর কার্য্য করিবার পর তিনি রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন, এবং সি-ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধ্য প্রদেশে সরকারী কার্য্যে ব্রতী হন। কার্য্যদক্ষতার গুণে তিনি অল্প দিন মধ্যেই (১৯১২ খৃঃ) কামপ্‌টীর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পদ লাভ করেন। দ্রুগে থাকিবার সময়ে তিনি মুরামসিলির Syphon প্রস্তুত করেন। ভারতের মধ্যে ইহাই একমাত্র সাইফন, এবং পৃথিবী মধ্যে এত বড় সাইফন খুব অল্পই আছে। ইহা প্রস্তুত করিতে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে ও দক্ষতার পরিচয় দিতে হইয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দান করিয়া গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

---

(১৩) সুরেন্দ্রবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র ভাদুড়ী বি-এসসি, বি-এল এর প্রদত্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত।

১৯২৩ খৃঃ তিনি গোয়ালিয়ার-রাজের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন, এবং আজও সেই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে এই রাজ্যে বহু ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্য সমাহিত হইয়াছে। সেই সকল কার্য্যের মধ্যে সিমেণ্ট কংক্রিটে প্রস্তুত চম্বল নদীর সেতু, গোয়ালিয়রের জলের কল, উজ্জয়িনীর 'মহারোগ-আরোগ্য হাঁসপাতাল', কাশীর সিন্ধিয়া-ঘাট ও বহু সুরম্য অট্টালিকার নির্ম্মাণের কথা উল্লেখ করা যায়। বিকানীর রাজ্যে 'গঙ্গাসাগর ক্যানেলে'র বাঁধ নির্ম্মাণ কার্য্যে বহু কৃতবিদ্য ইঞ্জিনিয়ারের যত্ন ব্যর্থ হইলে, বিকানীররাজ গোয়ালিয়ার রাজ্য হইতে তিন মাসের জন্য সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া যান। তিনি উক্ত বাঁধ প্রস্তুত করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হন, এবং বিকানীররাজ তাঁহাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেন। সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মন্মথনাথ ভাদুড়ী বি-এসসি, এল-এলবি, মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুরের সরকারী উকিল। তিনি অল্প দিন মুন্সেফের কার্য্যও করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপবাসী নীলমণি ভাদুড়ীর পুত্র **রায় সাহেব নলিনীমোহন ভাদুড়ী** বি-এল্ মাধেপুরার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল। তিনি বহু সাধারণের কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধি দিয়া সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

দুর্গাদাস বাগচির কনিষ্ঠ পুত্র **অতুলকৃষ্ণ বাগচি** ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

মঃ মঃ শিতিকণ্ঠ বাচস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য স্মৃতি-তীর্থ, এম-এ, বি-এল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-ল'র অধ্যাপক।

ডাঃ মণিলাল কুণ্ডু M. B. (Cal.), F. R. F. P. S. (Glas.), L. M. (Dub.)।—১২৯১ সালে মণিলাল কুণ্ডু নবদ্বীপে তিলিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। গোপীনাথ কুণ্ডু তাঁহার পিতা। তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে

তিনি কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হইতে যোগ্যতার সহিত এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুবর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। তিনি নবাব আবদুল গণি ও ডাঃ এফ, সি, চাটার্জ্জির বৃত্তিও লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টের অধীনে মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করেন। কার্য্যদক্ষতার গুণে তিনি 'বর্ম্মা-সিভিল-সার্জ্জন' পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অস্ত্র-চিকিৎসায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য দেখা যায়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মণিলাল বাবু ইংলণ্ড গমন করেন, এবং গ্লাসগো হইতে F. R. F. P. S. উপাধি ও ডবলিন হইতে ধাত্রীবিদ্যায় পরীক্ষা দান করিয়া L. M. উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রেঙ্গুন মেডিকেল কলেজের মেটিরিয়া মেডিকা ও সার্জারীর অধ্যাপক।

তিনি স্বজাতিবৎসল, দরিদ্রপোষক ও বদান্য। শিক্ষা প্রচার কল্পে, তিনি নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলে যে টাকা দান করিয়াছেন তাহার সুদ হইতে তিলি-জাতীয় দুইটী ছাত্রকে মাসিক ৬৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দান করা হয়। বিদেশীয় ছাত্রের নবদ্বীপে থাকিবার সুবিধার জন্য তিনি মাসিক সাহায্য করিয়া থাকেন। বহু দুঃস্থ পরিবারকে তিনি নিয়মিত সাহায্য করেন। এতদ্ব্যতীত যাদবপুর যক্ষ্মা হাঁসপাতাল ও নবদ্বীপ গ্যারেট হাঁসপাতালে তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য।

জষ্টিস্ বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল।—নবদ্বীপ-নিবাসী রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বিজন কুমার ১৮৯১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। রাখালবাবু হুগলী কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। বিজন বাবু হুগলীর ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকিল প্রাতঃস্মরণীয় শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। তিনি হুগলী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৩ খৃঃ তিনি ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করেন,

এবং ঐ বৎসরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯১৬ খৃঃ তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এল পরীক্ষা পাস করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ডি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষার জন্য তিনি "The Problems of Aerial Law" নামক প্রবন্ধ উপস্থিত করেন। উক্ত গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আইন-জ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি ১৯৩৬ খৃঃ নবেম্বর মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, পি-আর-এস, পি-এচ্‌ডি —বিমানবিহারী নবদ্বীপ-নিবাসী সুসাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র। তিনি ১৯১৭ খৃঃ নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় পাস করেন। হেতমপুর কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করিবার পর, তিনি পাটনা বি, এন কলেজে গমন করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অধ্যবসায়ী ও উৎসাহী—তাঁহার পঠন-স্পৃহাও অত্যন্ত বলবতী। ১৯২৯ খৃঃ তিনি পুনরায় অর্থনীতিতে এম-এ পাস করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও ১৯৩৫ খৃঃ 'মোয়াট স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের 'গ্রিফিত-স্মৃতি পুরস্কার'ও তিনি প্রাপ্ত হন। নবদ্বীপের টোলে বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি 'ভাগবতরত্ন' উপাধি পান। ১৯৩৬ খৃঃ তিনি পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পি-এচ্‌ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। ডাঃ মজুমদারের গবেষণার বিষয় ছিল—'সংস্কৃত, বাঙ্গালা, অসমীয়া, উড়িয়া ও হিন্দী ভাষায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত গ্রন্থ সমূহে শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানের ঐতিহাসিক বিচার'। বহু হস্তলিখিত পুথি অবলম্বনে তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিয়া ডক্টরেট উপাধি, বিমানবিহারীর পূর্ব্বে আর কেহ কোথাও পান নাই। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং তাঁহায় প্রবন্ধসমূহ প্রায় প্রতি সাময়িক পত্রেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থ "History of Political Thought from Ramananda to Dayananda" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

সঙ্গীত চর্চ্চা।

অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় সঙ্গীত ও বাদ্যে বঙ্গের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। নবদ্বীপেরও ইহাতে কৃতিত্ব কম নহে। কীর্ত্তন যেমন বাঙ্গালার নিজস্ব, সেইরূপ হাফ-আখরাই. পাঁচালী, কবি, তর্জ্জা, যাত্রা, বাউল, দেহতত্ত্ব, ঝাঁপান, বোলান প্রভৃতি বহুবিধ সঙ্গীত ও ছন্দে বাঙ্গালীর প্রতিভা আত্মবিকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালীর বহু পল্লীতে অনেক কবি ও গায়ক জন্মিয়াছেন, যাহাদের নাম বাঙ্গলার সাহিত্য-পঞ্জীতে উঠে নাই, শিক্ষিত বাঙ্গালী যাহাদের নাম শুনে নাই। তথাপি ভাবের ধারায় ও সুরের সঙ্গতিতে তাহারা বাঙ্গালীই ছিলেন, এবং জাতির মনের কথা সুরে ও ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ইহার মধ্যে অনেক জিনিস লুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দুই একখানি পদ যাহা পাওয়া যায়, ভাষার ভাণ্ডারে তাহা রত্নবিশেষ। মনসা পূজা উপলক্ষে এতদঞ্চলে বহু গুণিলোক একত্র হইয়া তাঁহাদের সর্পচিকিৎসার অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন ও **ঝাঁপান** গান গাহিতেন। ঝাঁপান গান মনসা দেবীর স্তোত্র, সর্পচিকিৎসার মন্ত্র ও সর্প বশীকরণ

সঙ্গীত। ইহা এত সুপ্রচারিত ছিল যে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও ইহার যথেষ্ট আদর ছিল।

চৈত্র মাসে শিবের গাজন বাঙ্গালাদেশের একটি প্রসিদ্ধ পর্ব্ব। এমন গ্রাম নাই যেখানে গাজন উপলক্ষে একজন সন্ন্যাসী হয় না, এমন শিব নাই যাহার গাজন হয় না, এমন গাজন নাই যাহাতে **বোলান** গান হয় না। শিবকে উপলক্ষ করিয়া যে সমস্ত উত্তর প্রত্যুত্তর-মূলক সঙ্গীত রচিত হইত সেইগুলিই বোলান গান, এবং তাহা বিশিষ্ট সুরে গীত হইত। এখন ইহা একবারেই লোপ পাইয়াছে।

বাউল ও দেহতত্ত্ব বাঙ্গালীজাতির সহজ সরল দার্শনিক জ্ঞানের অভিব্যক্তি। এই গানের ভিতর দিয়া "ক্ষেপা" দেহের নশ্বরত্ব এমন করিয়াই সুরে ও ভাষায়, একতারা ও গোপীযন্ত্রের তালে প্রকাশ করিয়াছে যে, তাহা শ্রোতার কাণের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্তরাত্মাকে নশ্বর সংসারের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিতে সক্ষম হয়। সে সুরের এমনি মোহিনী শক্তি, ভাষায় এমনি প্রাণের আবেগ যে, বাঙ্গালার অশিক্ষিত সম্প্রদায় এই বাউল গানের ভিতর দিয়াই তাহাদের আধ্যাত্মতত্ত্ব লাভের অনুসন্ধানে অনেকদিন ধরিয়া ফিরিয়াছে এবং এখনও ফিরে। কিন্তু এমন অমৃতময় জিনসও আজ ভাষার ভাণ্ডারে নূতন আসিতেছে না, গায়কের চক্ষে আর সে জলধারা দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী তাহার অতীত গৌরব ভুলিতে বসিয়াছে।

কবির গানের পর এদেশে **পাঁচালী** গানের প্রচলন হয়। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পীলা গ্রামবাসী দাশরথি রায় পাঁচালীর জন্মদাতা। তিনি নবদ্বীপ সমাজের লোক ছিলেন, এবং তাঁহার শিক্ষার উপর নবদ্বীপের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁহার পর আরও দুই একজন গ্রাম্য কবি পাঁচালী চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই দাশরথির সমকক্ষ ছিলেন না। পাঁচালীতে যে যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রভূত প্রচলন দেখা যায়,

অধুনাতন শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা দুরূহ। পাঁচালীর আর চলন নাই।

যাত্রা গান ও অভিনয় এখনও বাঙ্গালা দেশে সুপ্রচলিত আছে। আদিতে ইহা কৃষ্ণযাত্রাই ছিল। এখন ইহা বহুবিষয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। গোবিন্দ অধিকারী আদি যাত্রাওয়ালা। যাত্রা সম্বন্ধেও নবদ্বীপের অনেকখানি দান আছে। 'রাই উন্মাদিনী' প্রণেতা কৃষ্ণকমল গোস্বামী নবদ্বীপে ব্রজ বিদ্যারত্নের নিকট পাঠ শেষ করিয়া, এইখানেই প্রথম অভিনয় করেন। কিছুদিন পরে সমগ্র নবদ্বীপ নগরটি যাত্রার আসরে পরিণত হয়। একদিকে মতিলাল রায়, অপর দিকে বৌকুণ্ডু—এই উভয় সম্প্রদায়ের ও নবদ্বীপস্থ দুই একটি সখের দলের আখড়াই ও অভিনয়ে নবদ্বীপ মুখরিত থাকিত। এ স্থানের সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ও যাত্রার দল করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক মতিলালকে দিয়াই নবদ্বীপ বঙ্গের যাত্রা গানের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

মতিলাল রায়।[১]—১২৪৯ সালের (১৮৪৩ খৃঃ) মাঘ মাসে মতিলাল নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী ভাৎশালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মনোহর রায় নীলকুঠীর দেওয়ান ছিলেন। বাল্যকালে মতিলাল কিছুদিন কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে বিদ্যাভ্যাস করিবার পর, নবদ্বীপের মিশনারি স্কুলে যোগদান করেন। কিন্তু তাঁহার পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর মিশনারি সাহেবের অনুগ্রহে তিনি উক্ত স্কুলে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে কলিকাতা জেনারাল পোষ্ট অফিসে কেরাণীর কার্য্য প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তিনি শ্বশুরালয় বালীতে বাস করিতেন। বাল্যাবধি তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। বালীর ভদ্রমহোদয়গণের অনুরোধে মতিলাল 'তরণীসেন বধ' নামে একখানি নাটক

(১) ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রদত্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত।

রচনা করেন, বালীর সখের রঙ্গমঞ্চে এই নাটকখানি অভিনীত হইলে, সকলেই তাহার রচনাকৌশলে প্রীতিলাভ করে, এবং মতিলালের সুনাম প্রচারিত হয়। পরাধীন-জীবনে বীতরাগ হইয়া, মতিলাল পোষ্ট অফিসের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া বাটী ফিরিয়া আসেন।

কিছুদিন পরে পারুলিয়ার গঞ্জে, রায়দোগাছিয়া নিবাসী হরিনারায়ণ রায়ের যাত্রা শুনিতে গিয়া মতিলালের সহিত হরিরায়ের পরিচয় হয়, এবং ঐ দলে মতিলাল-রচিত 'তরণীসেন বধ' ও 'রাম-বিদায়' নামক দুইটী নাটক অভিনীত হইতে থাকে। ১২৮০ সালে রাজকৃষ্ণ দাস, গোবিন্দ দাস, নীলকণ্ঠ দত্ত, গোপালদাস প্রভৃতি দশজন অংশীদার লইয়া মতিলাল রায়ের যাত্রা সম্প্রদায় গঠিত হয়। এই দল গড়িবার সময় নবদ্বীপ-নিবাসী রত্নমণি কুণ্ডু মতিলালকে ১০০৲ টাকা দিয়া সাহায্য করেন। তাঁহার দলের প্রথম অভিনয় হইত নবদ্বীপের পোড়ামাতলায়, এবং অভিনয় দ্বারা পণ্ডিত-সমাজের অনুমোদন ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তিনি অন্যত্র গান করিতেন। তাঁহার অভিনয়ে জনসমূহ এমন আকৃষ্ট হইত যে, সকলেই রায় মহাশয়ের জয় গান করিত। তাঁহার রচিত গানগুলি এতই করুণ ও চিত্তাকর্ষক যে, আজও লোকের মুখে মুখে তাহার অনেকগুলি শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অভিনয়ের এক বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি অভিনয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্থান কাল ও পাত্র ভেদে এমন সারগর্ভ বক্তৃতা দিতেন যে তাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইত। তিনি শুধু যে কবি ছিলেন তাহা নহে—নিজে নিপুণ অভিনেতাও ছিলেন। তিনি মুণি ঋষির বেশে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তির উৎকর্ষ-সূচক বক্তৃতা করিতেন তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় স্পর্শ করিত। তাঁহার যাত্রাদলের এমন সুখ্যাতি হইয়াছিল যে, মতিরায়ের যাত্রা শুনিবার জন্য ১০।১৫ ক্রোশ দূর হইতে লোক আসিয়া আসর পূর্ণ করিয়া দিত। যাত্রার দল করিয়া তিনি যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

তিনি যে সকল নাটক লিখিয়া ও অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বিজয়চণ্ডী, সীতা-অন্বেষণ, রামবনবাস, রামরাজা, ভীষ্মের শরশয্যা, গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ, রাবণবধ প্রভৃতি গীতাভিনয় বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি নানাস্থানে অভিনয় করিয়া সম্মানসূচক বহু উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাটপাড়ার চন্দ্রকান্ত শিরোমণি প্রদত্ত 'কাব্যকণ্ঠ' উপাধি আদরের সহিত ব্যবহার করিতেন। তিনি কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও দয়ালু ছিলেন। ১৩১৫ সালের পৌষ মাসে কাশীধামে তিনি পরলোক গমন করেন।

১৩০৯ সালে মতিলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মদাস রায়ের হাতে দল পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। তিনিও যোগ্যতার সহিত দল চালাইয়াছেন। তাঁহার রচিত 'কবচ-সংহার', 'মারুতি-মিলন' প্রভৃতি গীতাভিনয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মদাসের মৃত্যুর পর এই দলের পরিচালনা ভার মতিলালের দ্বিতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণের হস্তে আসে। ইনিও বহুদিন দল চালাইয়াছিলেন। অধুনা দল উঠিয়া গিয়াছে।

বৌকুণ্ডু।—বৌকুণ্ডুর দল বাঙ্গালা দেশের আর একটী বিখ্যাত যাত্রার দল। ইহা নবদ্বীপ নিবাসিনী মুক্তামণি দাসীর অর্থে তাঁহার জামাতা রজনীকান্ত কুণ্ডুর দ্বারা ১২৮৫ সালে স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছিল। এই দল অল্পদিন স্থায়ী হইলেও, ইহাদের 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'ব্রজলীলা' প্রভৃতি অভিনয়গুলি সুললিত সঙ্গীত-মাধুর্য্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রজনীকান্ত কুণ্ডুর সঙ্গীতে ও অভিনয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে নবদ্বীপে প্রথম রঙ্গমঞ্চে অভিনয় প্রচলন করেন। তাঁহার কৃত বিল্বমঙ্গলের অভিনয়-সাফল্য এখনও লোকমুখে শুনা যায়।

নীলকণ্ঠ দত্ত।—মতিরায়ের যাত্রা দল হইবার পূর্ব্বে নীলকণ্ঠ ও তাঁহার সহচরবৃন্দের সখের যাত্রাদল ছিল। তিনি তন্তুবায়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সূর্য্যকান্ত দত্তের কাপড়ের ব্যবসায় ছিল—তাঁহার

অবস্থা মন্দ ছিল না। বাল্যকালে নীলকণ্ঠ পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি পৈতৃক ব্যবসায়ে যোগদান না করিয়া, সখের যাত্রা গান লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। এই সকল যাত্রার পালা তিনি নিজেই রচনা করিতেন—তাহাতে তাঁহার কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত বহু গান এখনও লোকমুখে প্রচলিত আছে; তাহার মধ্যে একটি বাউল-সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"একজন নবদ্বীপধামে, গৌর নামে, ভবের ঘাট দখল করেছে।
কাঙ্গালে কৃপা করে, ধরে করে, তরীতে তুলে নিতেছে॥
পার করে বিনা মূলে, নদীর কূলে, রাই নামের নিশান তুলেছে।
হরিনাম স্মরণ ক'রে, ডঙ্কা মেরে, ধর্ম্মরূপ খুটো গেড়েছে॥
যদি মন চাও তরিতে, যাও ত্বরিতে, তরীতে কাণ্ডারী আছে।
জীবকে করিতে ধন্য, শ্রীচৈতন্য, পারের জন্য হাল ধরেছে॥
এখন আর নাই বারবেলা, চল এই বেলা, হেলায় বেলা খোয়াস মিছে।
দীনহীন নীলকণ্ঠ বলে, হরি ব'লে, চল গৌরহরির কাছে॥"

তাঁহার রচিত কতকগুলি বাউল সঙ্গীত, দাতাকর্ণ, ধ্রুবচরিত, হরিশ্চন্দ্রের দানকীর্ত্তি, ব্রজলীলা বর্ণন ও সুধন্বা বধ পাঁচালীর পালা এবং কয়েকটি যাত্রার পালা বর্ত্তমান আছে। এই সকল পালা ১২৭০ সাল হইতে ১৩০০ সাল মধ্যে রচিত। ১৩০০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। ১২৮০ সালে মতিরায়ের যাত্রার দল গঠিত হইবার সময় তিনিও তাহার একজন অংশীদার হন, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ দলের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল।

নীলকণ্ঠ বাগচি নবদ্বীপ নিবাসী চন্দ্রশেখর বাগচির পুত্র। ইহাঁরা বন-বিষ্ণুপুরের বাগচিবংশীয়। এই বংশ চিরদিন সঙ্গীত-পারদর্শিতার জন্য বিখ্যাত। এই বংশে এমন কেহ জন্মেন নাই যিনি গাহিতে ও বাজাইতে না জানিতেন। নীলকণ্ঠ ছাত্রবৃত্তি পাস করিবার পর প্রাণে শান্তি না

পাইয়া হাঁটাপথে বন-বিষ্ণুপুর যান। সেস্থানে দীননাথ গোস্বামীর নিকট চারি বৎসর থাকিয়া গান ও বাজনা শিক্ষা করেন। অতঃপর শ্রীরামপুর-নিবাসী জমীদার রামদাস গোস্বামীর সভা-গায়ক রসুলবক্স সাহেবের নিকট তিনি ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন। ধ্রুপদ-গানে নীলকণ্ঠের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এইজন্য তিনি সাধারণে 'নীলু ওস্তাদজি' নামে পরিচিত হন। তিনি গান গাহিয়া বঙ্গ ও বঙ্গের বাহিরে রাজা ও জমীদারের সভায় আদৃত হইয়া বহু অর্থ ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপ 'বিবুধজননীসভা' হইতে, সভাপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী তাঁহাকে 'সঙ্গীতবিশারদ' উপাধি দেন। ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী গুণের আদর স্বরূপ তাঁহাকে সুবর্ণ-পদক উপহার দেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নীলকণ্ঠ সঙ্গীতের আলোচনায় বিরত হন নাই। সঙ্গীতই তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল। এমন কোন বাদ্যযন্ত্র নাই, যাহা তিনি বাজাইতে না জানিতেন তাঁহার ঘরে পাখোয়াজ, তবলা, সেতার, সুরবাহার, এস্রাজ, বীণা সকল বাদ্য যন্ত্রই বর্ত্তমান ছিল এবং সেগুলি তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় ছিল। নীলকণ্ঠ একজন সুকবিও ছিলেন—তিনি বহু গীত রচনা করিয়াছিলেন। ১৩৩৪ সালে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

নীলকণ্ঠের জ্ঞাতি ভ্রাতা শ্রীকণ্ঠ ভাল পাখোয়াজী ছিলেন। শ্রীকণ্ঠের পুত্র **সতীশ ওস্তাদ** একজন উচ্চশ্রেণীর পাখোয়াজী। সঙ্গীত রসজ্ঞ সমাজে তিনি সুপরিচিত। বর্ত্তমানে তিনি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ জগদীশনাথ রায়ের সভায় থাকেন।

নীলকণ্ঠের অপর জ্ঞাতি ভ্রাতা **দেবকণ্ঠ বাগচির** নাম বঙ্গবাসীর অপরিচিত নহে। তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের সুরদাতা ছিলেন। তিনি সুকবি ছিলেন, তাহার প্রণীত 'খেয়াল' 'হেস্তনেস্ত' ও 'উজ্জ্বলে মধুরে' প্রভৃতি গ্রন্থ সাহিত্যিক-সমাজে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। দেবকণ্ঠের পুত্র

তারকনাথ বাগচি বর্ত্তমানকালের প্রসিদ্ধ নৃত্যশিক্ষক। তাঁহার প্রকাশিত ভাবের অভিব্যক্তি পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে।

অদ্বৈতদাস বাবাজী।—ইনি পণ্ডিত বাবাজী বলিয়া খ্যাত। ইনি একজন ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন, এবং গরাণহাটী কীর্ত্তনে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার সঙ্গীতের বহু ছাত্র এখনও বর্ত্তমান আছেন।

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বহুদিন রামপুরহাটের স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুকণ্ঠ গায়ক কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন, এবং বহু ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কয়েকখানি গানের রেকর্ড আছে। গানের ন্যায় তিনি গল্পও করিতেন। তাহার মুখে গল্প শুনিলে, কিছুতেই হাস্য-সম্বরণ করিতে পারা যাইত না। তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গি অতি সুন্দর ছিল। তিনি কথকতাও করিতেন, সেই সমস্ত পালা তাঁহার স্বরচিত। তাঁহার রচিত গদ্যপদ্যময় গল্পের বই 'হাঁসি' প্রকাশিত হইয়াছে।

কানাইলাল ভট্টাচার্য্য গোস্বামী রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাঁহার গানের ভিতর দিয়া যথেষ্ট উন্মাদনা প্রকাশ পাইত। স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি স্বদেশী সভায় গান করিয়া বেড়াইতেন। শেষ জীবনে তিনি অনেক সময়ে কলিকাতার পার্কে বসিয়াও গান করিতেন। তাঁহারও কয়েকখানি রেকর্ড আছে।

বৈষ্ণব মহাত্মা ও আখড়া।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর হইতে, নবদ্বীপ বৈষ্ণবগণের প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বহু নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব মহাত্মা এই ভূমি আশ্রয় করিয়া সাধন-ভজন দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই সকল মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া, নবদ্বীপ-ভূমি গৌরব-মণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহারা এমনই নিষ্কিঞ্চনভাবে গোপনে জীবনযাপন করিতেন, যে তাঁহাদের বিষয় বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই। তাঁহাদের পবিত্র নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে।

তোতা রামদাস বাবাজি।—নবদ্বীপের বৈষ্ণব সাধুদিগের বিষয় যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার মধ্যে তোতা রামদাস বাবাজি প্রধান। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্য অতুলনীয় ছিল। শুনা যায় তিনি দ্রাবিড়ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার নাম রামদাসমিশ্র ছিল। তিনি প্রথম যৌবনে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বেই প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায়, বৃন্দাবন চলিয়া যান। সেইস্থানে বহুদিন ভজন করিবার পর, মহাপ্রভু স্বপ্নে তাঁহাকে নবদ্বীপ আসিয়া স্বীয় সেবা পর্য্যবেক্ষণ করিতে আদেশ করেন। সে সময়ে, মহাপ্রভুর সেবার শৃঙ্খলা ছিল না। এখানকার গোস্বামিগণ দরিদ্র বিধায় ঠাকুরের কোন মন্দির ছিল না। শ্রীবিগ্রহ পালা-অনুযায়ী সেবকদিগের গৃহে নীত হইয়া সেবিত হইতেন। এমন কি সময়ে সময়ে নবদ্বীপের পাষণ্ডী ও রাজাদিগের ভয়ে শ্রীবিগ্রহকে লুকাইয়া রাখিতে হইত। এই অবস্থায় তোতা রামদাস নবদ্বীপ আসিয়া, গঙ্গার নিকটবর্ত্তী দশ-অশ্বত্থতলায় আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার ললাটে তিলক, কণ্ঠে মালা, উদাসীন বেশ ও সাত্ত্বিক বিকারসকল দেখিয়া, উন্মাদ মনে করিয়া নবদ্বীপবাসীরা আমোদার্থে তাঁহাকে পীড়ন করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি অম্লানচিত্তে এই

সকল পীড়ন সহ্য করিতেন। একদিন কৌতুহল-পরবশ হইয়া তিনি জনৈক পীড়নকারীকে কয়েকটী ন্যায়শাস্ত্রীয় প্রশ্ন করেন। সে ব্যক্তি তাহার উত্তর দিতে না পারায়, স্বীয় অধ্যাপকের গোচরীভূত করে। অধ্যাপক প্রশ্নের কথা শুনিয়া, প্রশ্নকর্ত্তা যে অসামান্য পণ্ডিত তাহা বুঝিতে পারেন, ও তাহার সহিত শাস্ত্রালাপ করেন। তখন হইতেই তোতা রাম-দাসের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি হয়।

রামদাস একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। তখন কোন দুষ্ট লোক তাঁহার গলায় জুতার মালা পরাইয়া দেন। ঘটনা-ক্রমে সেই সময়ে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নৌকাযোগে যাইতেছিলেন। তিনি একজন বৈষ্ণবের অপমান দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন ও তাঁহাকে কে অপমান করিয়াছে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু রামদাস এতই তন্ময় ছিলেন যে, কে তাঁহাকে মালা দিয়াছে কিছুই জানিতেন না—অতএব কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার নির্ব্বিকার চিত্ত এই অপমানে কিছুই ক্ষুব্ধ হইল না। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না। তিনি ঘাটে নৌকা রাখিয়া, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে এই অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন, এবং এই অপরাধের জন্য তিনিই দোষী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই সময়ে রামদাসের সহিত শাস্ত্রালাপে, ষড়্দর্শনে তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য দেখিয়া মহারাজ তাঁহাকে 'তোতা' উপাধি দেন। এখন হইতে তিনি তোতা রামদাস নামে প্রসিদ্ধ হন।

রামদাস গিরিধারীর সেবা করিতেন। ঐ ঠাকুর তাঁহার নিকট গাছতলাতেই থাকিতেন। মহারাজের সহিত কয়েকবার আলাপের পর মহারাজ তাঁহার ঠাকুরের আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য ঐ গাছতলার পার্শ্ববর্ত্তী ৬/০ বিঘা জমী নিষ্কর দান করেন। ঐ জমীর উপর তোতারামদাস আখড়া করিয়া ঠাকুর সেবা করিতে থাকেন। ঐ আখড়ার নাম বড়

আখড়া। উহা এখনও তোতা রামদাসের শিষ্য পরম্পরা ভোগ করিয়া আসিতেছে। তোতা রামদাস হইতে অষ্টম মোহান্ত বাসুদেব দাস বড় অখড়ার বর্ত্তমান অধিকারী।

তোতারামদাসের যত্নে মহাপ্রভুর বর্ত্তমান অঙ্গনের জমী ও পুরাতন মন্দির নির্ম্মিত হয়। ঐস্থানে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া নিত্য সেবার ব্যবস্থা হয়।

কয়েকজন নবদ্বীপবাসী তোতারামদাস কি করেন দেখিবার উদ্দেশ্যে বড় আখড়ায় একখানি কালীমূর্ত্তি ফেলিয়া দেন। তোতারামদাস মূর্ত্তি পাইয়া কালীপূজার দিন অতি ভক্তিভরে ঐ মূর্ত্তির পূজা করেন। তাহাতে তাঁহার অসাম্প্রদায়িক ভাব দেখিয়া এখানে যথেষ্ট সুনাম হয়, এবং মহারাজ ইহা শুনিয়া প্রীতিভরে প্রতিবর্ষে কালীপূজার ব্যয় রাজসরকার হইতে প্রদত্ত হইবে স্থির করিয়া দেন। রাজসরকারের একখানি দলিল হইতে জানা যায়, তোতারামদাস ১২০২ সালে বর্ত্তমান ছিলেন। দলিলখানি এই—

"তরফ নবদ্বীপের নায়েব প্রতি আগে নিজ নবদ্বীপের শ্রীতোতারামদাস বৈরাগি জাহের করিনা গ্রাম মজন্দারে কাঠা কতক জমীতে আখড়া করিয়া শ্রীশ্রী৺সেবা অনেক দিবসাবধি করিতেছে ইমসন জরিব করিয়া তাহার খাজনা তলব কারতেছ অতএব লিখি এই স্থানে খাজনা তলব না করিয়া পশ্চাত তজবিজ করিবা। ইতি সন ১২০২ সাল ১৫ই শ্রাবণ।"

মাধবচন্দ্র দত্ত।—বড় আখড়ার সম্মুখেই প্রকাণ্ড নাটমন্দির আছে। প্রাচীন নাটমন্দির নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, রাজেন্দ্রকুমার রায় নামক একব্যক্তি অল্প দিন হইল বর্ত্তমান নাটমন্দির করিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন নাটমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কলিকাতার বিখ্যাত ধনী, মাধব বাবুর বাজারের প্রতিষ্ঠাতা মাধবচন্দ্র দত্ত। এই মাধব বাবুই নবদ্বীপে গান মেলার প্রতিষ্ঠাতা, বড় আখড়াই এই মেলার আদি স্থান। কলিযুগাদ্যা মাঘী পূর্ণিমা পুণ্যতিথির স্মরণ উপলক্ষেই ইহা সূচিত হইয়াছিল। নগর-কীর্ত্তনকালে মাধব

বাবু দুই হাতে করিয়া ভক্তগণের উপর রজ নিক্ষেপ করিতে থাকেন। এই ঘটনা হইতে এই পর্ব্বের নাম ধূলোট হইয়াছে। ১২৫০ সালে ধূলোট পর্ব্বের আরম্ভ।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার মন্দির।—লর্ড হেষ্টিংসের দেওয়ান কান্দি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষ বয়সে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ও চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। নবদ্বীপ চৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মভূমি এবং বৈষ্ণবপ্রধানগণের বাসস্থান হেতু তিনি নবদ্বীপে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তোতারামদাসের চরিত্র দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার সহিত দেওয়ানজীর প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল। স্বীয় পৌত্র লালাবাবুকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া তিনি দুই তিন শত বৈরাগীসহ নবদ্বীপ আগমন করেন, এবং গৌরগৃহ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন। তখন নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের গৃহ দেখিয়াছিলেন এমন অনেক লোক বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তাহাদের মুখে শুনিয়া এবং প্রমাণাদি দ্বারা গৌরগৃহের স্থান নিরূপণ করেন। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী ঐ স্থানকে তখন রামচন্দ্রপুর বলিত। তিনি সেই স্থানে ১১৯৯ সালের (১৭৯২ খৃঃ) ১লা অগ্রহায়ণ ৬০ ফুট হইতেও উচ্চ এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, তথায় শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণজী এবং মদনমোহনজীর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাদের সেবার জন্য বহু দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া যান। ১১৯৯ সালের একখানি দলিলে দেখা যায় যে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ স্বোপার্জ্জিত অর্থে প্রাণকৃষ্ণ সিংহের নামে কতকগুলি সম্পত্তি ক্রয় করেন। উক্ত মন্দির গঠন ও সেবা প্রতিষ্ঠা কার্য্যে লালাবাবু তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য কয়ায়, তিনি প্রীত হইয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পৌত্র লালাবাবুকে উহা দান করিয়া যান। এই মন্দিরটি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেও বর্ত্তমান ছিল, এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়। তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গকেও যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। ছাত্রদিগের

বাসের জন্য টোলগৃহ নির্ম্মাণ ও তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রতি মাসের প্রথমে আহার্য্য ও বস্ত্রাদি দান করিতেন। তিনি বৈষ্ণব সাধু ও তীর্থযাত্রিগণকে আহার্য্য দান করিতেন।[১]

মণিপুর রাজবাটী।—মণিপুরবাসিগণ চৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসক। তাহারা পরমবৈষ্ণব, এবং নরোত্তম দাস ঠাকুরের পরিবার। মণিপুরাধিপতি মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ বৃদ্ধ বয়সে নবদ্বীপে বাস করিবার অভিলাষে স্বীয় কন্যা 'লাইরোইবী'র সহিত এখানে আগমন করেন, এবং নবদ্বীপস্থ তেঘরি মৌজায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ভাগ্যচন্দ্রের

---

(১) Gunga Govind Singh, the Devan of Warren Hastings, after having acquired immense wealth, retired to Nudiya with two or three hundred Vairagis, leaving all his money to his grandson Lalla Babu. * * * Gunga Govind Singh erected a temple over 60 feet high, which was washed away 25 years ago by the river ; it was at Ramchandrapur and supplied food to many fakirs and pilgrims of the Vaishnavas. p. 424.

In 1819 there was a handsome temple of Krishna finely ornamented. p. 423.

Vide Calcutta Review, Vol. VI, 1846.

Gungagovind Singh also encouraged the Pandits of Nadiya; contributing largely to their support and that of their students, repairing their houses and providing them with food and clothing. The necessary articles were said to have been transmitted by him to every tol on the first of each month. He built temples at Ramchandrapur, on the very spot near Nadiya where Gauranga (Chaitanya) is said to have been born, for the worship of Sri Govind, Gopinath, Krishna Ji, and Madan Mohan Ji. We find him on 1st Agrahayana, 1199 B.S., making over certain lands, houses, &c., which had been bought in the name of Pran Krishna Singh, but (it is carefully stated) from self-acquired funds and "without using the patrimony," to the "dearer than life," Krishna Chandra Singh (his grandson). The deed thus runs: "Being very desirous to establish the worship of Sri Sri Isvar at Ramchandrapur, and you having afforded me great assistance in the construction of temples, &c., therefore, being well pleased with you, &c."

Vide, Territorial Aristocracy of Bengal—The Kandi Family, pp. 6-7.

সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন পূর্ব্বক, প্রীতির চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে তেঘরি মৌজায় ১৬/০ ষোল বিঘা জমি নাম মাত্র বাৎসরিক খাজনায় সমর্পণ করেন, এবং মণিপুরাধিপতির অধ্যুষিত স্থানের নাম 'মণিপুর' রাখেন।

ভাগ্যচন্দ্রের পর পরম ভক্তিমতী শাইরোইবী দেবী এই বিগ্রহ-সেবার ভার গ্রহণ করেন। তিনি মহাপ্রভুকে 'অনুপ' নামে সম্বোধন করিতেন। ইহাঁরা বংশ পরম্পরা এই দেবসেবা চালাইয়া আসিতেছেন। হোমেন্দ্রজিৎ সিংহ ইহার বর্ত্তমান সেবাধিকারী। ভাগ্যচন্দ্র সিংহের বংশীয়গণ রাজ্যচ্যুত হওয়ার পর বর্ত্তমান মণিপুর রাজগণ এই সেবা চালাইবার জন্য বহুদিন অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

১২২২ সালে নবদ্বীপের মহারাজ গিরিশচন্দ্র প্রদত্ত দুইখানি দলিলে জানা যায় যে, মণিপুরের মহারাজের বাসের নিমিত্ত গঙ্গাতীরে ২/০ বিঘা জমী দান করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান মণিপুরাধিপতি মহারাজ চূড়াচাঁদ সিংহ বাহাদুর কুণ্ড সেবাবিনোদ গৌরভক্তিরসার্ণব, নবদ্বীপে বাস করিবার জন্য প্রাচীন ঠাকুর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১৯৩৪ খৃঃ সুবর্ণময় মন্দিরে দেবসেবা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজ বৎসরের অধিকাংশ সময়েই নবদ্বীপে বাস করেন, এবং শিক্ষার উন্নতিকল্পে ও দেবকার্য্যে তাঁহার রাজোচিত যত্ন দেখা যায়।

সিদ্ধ চৈতন্যদাস।—বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সকল বৈষ্ণব মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, চৈতন্যদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম কোথায় ছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না। তিনি প্রথম যৌবনে নবদ্বীপে আসেন, সেই সময় ঘটনাক্রমে ভাগবতভূষণ তাঁহাকে দেখিতে পান ; তাঁহার কার্য্যকলাপ ও আকৃতি দেখিয়া ভাগবত ভূষণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে লইয়া বলাগড় যান। সেখানে চৈতন্যদাস জীয়ড় নৃসিংহের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, গোপীভাবে

ভজনা আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি শ্রীখণ্ডে যাইয়া কঠোর ভজন করেন, সেখান হইতে বৃন্দাবন যান। বৃন্দাবনেও কিছুকাল ভজন করিবার পর, তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু তাঁহার গৌরাগত চিত্ত কোথাও শান্তি না পাওয়ায়, তিনি নবদ্বীপে চলিয়া আসেন ও শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরেই বাস করিতে থাকেন। সে সময়ে এদেশের সকলেই বাবাজীকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। বাবাজীর নিষ্কিঞ্চন ভাব, স্বাভাবিক বিনয় ও ভক্তিভাব দেখিয়া, সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। বিড়াল কুকুরকেও তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত তৎকালে বৈষ্ণব-সমাজে কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। ছেঁড়া কাঁথা, নারিকেলের মালা ও একটি মাটির করোয়া ভিন্ন বাবাজীর আর কিছুই সম্পত্তি ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ভজনের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে, এবং বহু দূরদেশ হইতে বহু ভক্ত তাঁহার সঙ্গ করিতে নবদ্বীপে আসিতে থাকেন। তিনি নিজেকে গৌরাঙ্গের নাগরী বলিয়া অভিমান করিতেন, এবং সেই আবেশে নারীবেশ ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। বাহ্যজ্ঞানের উদয় হইলে তিনি নাগরীবেশ ত্যাগ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সেবাকার্য্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। তিনি প্রতিদিন গৌরাঙ্গের প্রসাদ পাইতেন। মধ্যাহ্নে তাঁহার নিয়ম ছিল, কোন অতিথি অভ্যাগত আসিয়াছে কিনা দেখিয়া পরে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। কোন অতিথি না পাইলে, দ্বারের নিকট যে কুকুর দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহাকেই আদর করিয়া ডাকিয়া লইয়া যাইতেন, আসন প্রদান করিয়া উত্তম ধৌত কদলী-পত্রে আগ্রহের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করাইতেন ও পরে নিজে গ্রহণ করিতেন।

নবদ্বীপে বাস কালে, নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী, তাঁহার বিনয় ও পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই তাঁহার সহিত মিশিতেন। ভুবন বিদ্যারত্ন,

ব্রজবিদ্যারত্ন, অজিত ন্যায়রত্ন, দীননাথ চূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। রুদ্রকণ্ঠ মাষ্টার ও তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রনাথ চৈতন্যদাসের বিশেষ অনুগত ছিলেন। নবদ্বীপবাসী অপর কোন বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এতাদৃশ সংশ্রব দেখা যায় না।

বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ সাধকগণের মধ্যে অনেকের জীবনেই চৈতন্য-দাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিশিরকুমার ঘোষ ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী অবস্থায় একবার নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যদাসের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবাজি, কিসে ভক্তি হয়?' বাবাজী উত্তর করেন, "দুটী পয়সায় ভক্তিলাভ হয়।"—উত্তর শুনিয়া শিশিরবাবু বলিলেন, 'সে কি বাবাজি! দু'পয়সায় ভক্তিলাভ! আপনি আমাকে উপহাস করিলেন?' বাবাজি বলিলেন, 'হরে কৃষ্ণ! উপহাস করি নাই, ঠিকই বলিয়াছি, দু'টী পয়সা দিয়া একখানা বটতলার ছাপা নরোত্তম দাসের প্রার্থনা এনে কিছুকাল পড়ুন, তাহা হইলেই ভক্তিলাভ হইবে।'

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের কিছুকাল পরে, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু, বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিসে ভক্তিলাভ হয় জিজ্ঞাসা করেন। বাবাজী তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া কোন উত্তর না দিয়া এক-দৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকেন। তাঁহার সমস্ত শরীরটি পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, মস্তকের শিখাটি খাড়া হইয়া উঠিল। বাবাজী অস্ফুটস্বরে একটি গভীর হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "কি বল্লে গোঁসাই? তুমি বল্লে ভক্তি কিসে হয়! তুমি বল্লে ভক্তি কিসে হয়!!" এই বলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইলেন। তিন ঘণ্টা কাল বাবাজীর আর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। সে সময়ে বাবাজীর শরীরে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া, গোঁসাই একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। সমাধি ভঙ্গের পর, বাবাজী সাষ্টাঙ্গ হইয়া গোঁসাইকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিষ্কিঞ্চন কাঙ্গাল

হইতে পারি। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত তো ভক্তির নাম গন্ধও নাই। এখন আপনি যে ভাবেই চলুন না কেন, আপনার ললাটে তিলক, কণ্ঠে মালা পরিষ্কার আমি দেখিতে পাইতেছি। ভক্তি তো আপনারই ভাণ্ডারের জিনিস, আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি ভক্তির অভাব আছে?"[২] বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছিল।

তাঁহার ভজনের নিয়ম শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি সর্ব্বদাই 'গোরা গোরা' নাম জপ করিতেন। দিবসের অধিকাংশ সময়ই আবেশে কাটিয়া যাইত। কোন দিন একঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন, কোন দিন তাহাও হইত না। নিদ্রাকালেও শ্বাস-প্রশ্বাসে গোরা গোরা ধ্বনি উত্থিত হইত। শেষ জীবনে তাঁহার আবেশ এত প্রগাঢ় হইয়া পড়িল, যে কদাচিৎ তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইত। তাঁহার দেহ-কদলীবন ভাব-মত্তমাতঙ্গে বিদলিত করিয়া ফেলিল, তিনি প্রাণনাথকে লাভ করিতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় একদিন আবেশে নাগরীবেশে তাঁহার প্রাণেশ্বর গৌরাঙ্গ প্রভুর বামে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘোম্‌টার ভিতর দিয়া আড় নয়নে গৌরাঙ্গের মুখচন্দ্রের সুধাপান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মত্ততা আসিয়া পড়িল—লজ্জা সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল; তিনি তাঁহার প্রাণের কথা—

"আমার ভজন হলো সারা, আমার পূজন হলো সারা।
শ্রীগৌরাঙ্গের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা॥"

গাহিতে গাহিতে তাঁহার প্রাণেশ্বরের নয়নে নয়ন রাখিয়া, তাঁহার আত্মা শ্রীগৌরাঙ্গে লীন হইয়া গেল।

গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে তাঁহার পুষ্প-সমাধি আছে। সেস্থানে তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয় বহুদিন সেবা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রশিষ্যেরা সেবা করেন। বৃন্দাবনবাসী গৌরশিরোমণি মহাশয়ও চৈতন্যদাসের শিষ্য ছিলেন।

(২) সদ্‌গুরুসঙ্গ ৩য় খণ্ড—পৃঃ ১৫৫।

সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী।—ইনি নবদ্বীপের আর একটি সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা। সিদ্ধ শব্দ ইঁহার ও চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ের নামের অঙ্গ-স্বরূপ হইয়া আছে। জগন্নাথদাস বাবাজী শৃঙ্গারবটের গোস্বামীদের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। লালাবাবুর ভেকদাতা গোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজীর শিষ্য সূর্য্যকুণ্ডবাসী মধুসূদন দাস বাবাজী তাঁহার ভেকের গুরু। জগন্নাথদাসের ব্রতপালনে অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি একাদিক্রমে তিন দিন পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস করিয়াও ব্রতপালন করিতেন। তিনি অতি কঠোর নিয়মে চাতুর্ম্মাস্য করিতেন। প্রথম মাস কিছু পাকা কলা, দ্বিতীয় মাস পাকা পেয়ারা, তৃতীয় মাস কিছু ঘোল এবং চতুর্থ মাস অলবণ মোচা সিদ্ধ খাইতেন। তাঁহার পুরশ্চরণের নিয়মও অতি কঠোর ছিল। তিনি বলিতেন—নিয়মমত জপ করিলে, এই দেহেই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পাওয়া যায়। তিনি ৩১ বৎসর বৃন্দাবনে সূর্য্যকুণ্ডে বাস করিয়া কঠোর ভজন করেন। তিনি ব্রজমণ্ডলের অন্যান্য স্থানেও বহুদিন বাস করিয়াছিলেন, এবং ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন। অতঃপর তাঁহার নবদ্বীপ বাসের ইচ্ছা হইলে, নবদ্বীপ আসিয়া বর্ত্তমানে যেখানে ভজন কুটীর আছে, সেই স্থানে মাধবদত্ত প্রদত্ত দশ কাঠা জমীতে স্বীয় আশ্রম স্থাপন করেন। তিনি বলিতেন, আমার ন'দেয় অপরাধ নাই এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহামন্ত্রেও কোন অপরাধের বিচার নাই।'

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥"

ইহাই মহাপ্রভুর মহামন্ত্র।

তিনি এতদূর নিরভিমান ছিলেন, যে মেথরের নিকট হইতেও মাধুকরী গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কালাবাবুর কুঞ্জে বাস করিবার সময় তিনি একদিন "মোচা ভাঙ্গির" নিকট মাধুকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছিলেন। শেষ বয়সে তাঁহার তিনমাথা এক হইয়া গিয়াছিল, তখনও তিনি নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন গমনাগমন করিতেন। এই সময়ে তাঁহার শিষ্য বিহারী ব্রজবাসী তাঁহার যথেষ্ট সেবাশুশ্রূষা করেন। তিনি উত্থান-শক্তিহীন স্বীয় গুরুদেবকে একটি ধামায় স্থাপন করিয়া মাথায় লইয়া আদিষ্ট স্থানে গমনাগমন করিতেন। জগন্নাথদাস ১৪৯ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে, প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে, দেহ রক্ষা করেন। সে সময়ে নবদ্বীপবাসী জনসাধারণ, বিশেষতঃ প্যারীলাল ও রাখালদাস গোস্বামী প্রভৃতি মিলিত হইয়া সংকীর্ত্তন সহকারে চন্দনকাষ্ঠের দ্বারা তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কাল্নার সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী, নবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী ও সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

নবদ্বীপে বর্ত্তমানে যে কয়টি আখড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই তোতারামদাস বাবাজির প্রশিষ্য দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। তোতারাম দাসের শিষ্য রঘুনাথ দাস বড় আখড়ার অধিকারী হন। তাহার পর তাঁহার শিষ্য বীরুদাস বড় আখড়ার অধিকারী হন। ইহাঁর অপর শিষ্য লছমন দাস পুরাণগঞ্জে রাধী কলুর পোঁতায় শ্রীবাসাঙ্গন স্থাপন করেন। ঐ অঙ্গন গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে, বর্ত্তমান স্থানে (১২৭৮ সন) শ্রীবাসাঙ্গন স্থাপিত হয়। লছমনদাসের শিষ্য রামদাস ও তৎশিষ্য হরিদাস বাবাজীর হস্ত হইতে শ্রীবাসাঙ্গন নিত্যানন্দবংশীয় নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর হস্তে যায়।

রঘুনাথদাসের শিষ্য রতনদাস নৃসিংহদেবের আখড়া স্থাপন করেন। ঐ আখড়ার বর্ত্তমান সেবাইত ভাগবত দাস। কৃষ্ণদাস মোহান্ত নূতন আখড়া স্থাপন করেন। এই আখড়া স্থাপনে তিনি কলিকাতার মাধব বাবু ও সোনামুদির রাজাদের নিকট যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই আখড়ায় অনেকগুলি প্রাচীন পুথি আছে; ইহার বর্ত্তমান মোহান্ত

বৃন্দাবনদাস কাব্যতীর্থ যেমন পণ্ডিত তেমনি সুগায়ক। গোরাচাঁদদাস বাবাজী গোরাচাঁদের আখড়া স্থাপন করেন। সিদ্ধেশ্বরদাস বাবাজী সিদ্ধেশ্বরের আখড়া স্থাপন করেন। এই সকল আখড়ার অনেকগুলিই এখন বিগতশ্রী, এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠাতার বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না।

'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' নামের প্রচারক রাধারমণ-চরণ-দাস বাবাজী 'নসীবাবুর বৈঠকখানা' ক্রয় করিয়া মঠ স্থাপন করেন। ঐ মঠে অদ্যাপি দেবসেবাদি চলিতেছে। তিনি সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজীর শিষ্য গৌরহরিদাস বাবাজীর নিকট ভেকাশ্রয় গ্রহণ করেন। 'চরিতসুধা' নামক গ্রন্থে ইহাঁর জীবনের বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

সাধু ভুবনেশ্বর বর্ম্মণ গোবিন্দজীর সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এখানে বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে বনচারী ও নিত্যানন্দদাস প্রভৃতি বহু সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। তাঁহাদের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না।

শিল্প ও বাণিজ্য।

যে সকল শিল্পী নবদ্বীপে বাস করেন তন্মধ্যে কাংস্যবণিক, তন্তুবায়, শংখবণিক ও কুম্ভকার প্রধান।

গুরুদাস দাস কাংস্যবণিককুলে রামপ্রসাদ দাসের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়া, বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক গুরুদাস বাবুর নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। কলিকাতা, দাঁইহাট, সিরাজগঞ্জ, ধুলিয়ান প্রভৃতি বাঙ্গালার নানাস্থানে এবং বাঙ্গালার বাহিরে—বিহার, উড়িষ্যা ও হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ নগর ও গ্রামে, প্রায় ৮০০ স্থানে তাঁহার ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল। নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট দান ছিল, সেই জন্যই এই বংশীয়গণ 'বাবু' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ব্যবসায়দ্বারা গুরুদাস বাবু কোটিপতি হইয়াছিলেন।

তাঁহার ন্যায় ধনী তৎকালে এতদঞ্চলে কেহ ছিলেন না। তাঁহার গৃহে একটি কামধেনু ছিল। কথিত আছে, এই কামধেনু জন্যই তাঁহারা এত উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন।[১]

গুরুদাস বাবু পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট সাহায্য ও ভক্তি করিতেন। পোড়ামাতলায় প্রতি প্রতিপদ্ ও অষ্টমীতে পণ্ডিত ও ছাত্রদের তর্কালোচনা হইত। গুরুদাসবাবু অনেক সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দান করিতেন। মাধববিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন।

গুরুদাসবাবুর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ১৩০৪ সালের প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরের আলয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার স্বচ্ছ স্তম্ভশ্রেণী মাত্র দণ্ডায়মান থাকিয়া, পূর্ব্বগৌরবের সাক্ষ্য দিতেছিল। সম্প্রতি তাঁহার পৌত্র অতুলচন্দ্র দাস মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীধরের মন্দির সংস্কৃত হইয়াছে।

নবদ্বীপের 'দ্বাদশমন্দির' গুরুদাস বাবুরই কীর্ত্তি। তিনি ১৭৫৭ শকে (১৮৩৫ খৃঃ) দ্বাদশটি সুদৃশ্য মন্দিরাভ্যন্তরে দ্বাদশটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মভাবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়—

ওঁ নমঃ শিবায়॥ শকাব্দা ১৭৫৭॥

অগস্ত্যাবনল তদাহরি বিধীয়স্যাধ ঊর্দ্ধে গতৌ
জ্ঞাতুং শ্রীগুরুদাসদাস ইতি যদ্ভক্তস্তবস্যঃ প্রভুঃ।
শাকে ধাতু কলম্বগোত্রশশিমে তস্তাম্বুমে মন্দিরে
সংসারার্ণব তারণৈকতরণিং তং শম্ভুমস্থাপয়ৎ॥

---

(১) The wealthiest man in Nuddea is a brazier by birth and profession, but who has risen to be a millionnaire. He has more than eight hundred braziery shops in all the principal towns and villages of Bengal, Orissa, and Hindoostan. In his house we saw a Kam-dhenu, reminding of old Vashishta's Nandini.
Vide, Travels of a Hindu, Vol. I. p. 38.

এতদ্ব্যতীত তিনি যে আর এক মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহার গৌরবমণ্ডিত নাম দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাৎকালিক জগন্নাথের দুর্গম পথে যাত্রীদিগের জলকষ্ট নিবারণের জন্য, তিনি পথের উভয় পার্শ্বে সুগভীর কূপ-সকল খনন করাইয়া দিয়াছিলেন সেই জল পান করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রিদল তৃপ্তিলাভ করিত, এবং সহস্রকণ্ঠে নবদ্বীপের গুরুদাসবাবুর নাম উচ্চারণ করিত।

গুরুদাসবাবুর পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যেও ধর্ম্মভাব ও বদান্যতা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার খুল্ল পিতামহ নীলমণিদাস ১১৬৬ সালে বৈশাখী পূর্ণিমায় আটটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে আটটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে যেখানে শ্রীবাসাঙ্গন রহিয়াছে, মন্দিরগুলি ঐস্থানে উত্তর দক্ষিণ সারিতে অবস্থিত ছিল। তদ্বংশীয় দ্বারিকানাথ দাস, মন্দিরসহ ঐ সকল স্থান লছমনদাস বাবাজীকে দান করেন। লছমনদাস ১২৭৮ সালে ঐস্থানে শ্রীবাসাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করেন। শিবমন্দির ভগ্ন হইলে লিঙ্গগুলিকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। সেই শিবলিঙ্গের মধ্যে একটি এখনও সিদ্ধেশ্বর বাবাজীর বাড়ীতে বর্ত্তমান আছে। নীলমণি দাসের পুত্র বৈকুণ্ঠনাথও কোলের গঞ্জে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

গুরুদাস বাবুর সময়েই নবদ্বীপের কাংস্যবণিক সম্প্রদায় চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে রাত্রি ৪॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত, কাংস্যকারের হাতুড়ির শ্রবণবধির শব্দে নবদ্বীপ প্রতিধ্বনিময় হইয়া থাকিত। আজকাল যদিও তাহাদের ব্যবসায়ে তাদৃশ উন্নতি নাই, তথাপি তাহাদের অনেকেই বেশ সমৃদ্ধির সহিত জীবিকার্জ্জন করিতেছেন।

এক্ষণে এস্থানে—নানাপ্রকার থালা, ডিস্, বাটি, ডিবা, গেলাস, হাতা, কাংস্যকুণ্ড, করতাল প্রভৃতি কাঁসার দ্রব্য; ঘড়া, ঘটি, হাতা, হাঁড়ী, বাটি প্রভৃতি পিত্তলের দ্রব্য; কোশাকুশি, আনন্দার্ঘ্য, তাম্রকুণ্ড প্রভৃতি

তামার পাত্র প্রস্তুত হইয়া, নানাদেশে প্রেরিত হয়। এখানকার উৎপন্ন পিতল কাঁসার দ্রব্য গুণে ও শিল্প-সৌন্দর্য্যে অন্যদেশজাত দ্রব্য হইতে ন্যূন নহে। এস্থানের ন্যায় হাতা অন্য কোথাও প্রস্তুত হয় না।

কাংস্যবণিক-কুলে, ত্রৈলোক্য লাখোদার, রাজকৃষ্ণ দাস ও কৃষ্ণলাল দাস, ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত ধন অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের বহু সদ্ব্যয় ছিল।

রত্নমণি কুণ্ডু ও নীলমণি কুণ্ডু।—নবদ্বীপবাসী তিলিবংশীয় জয়মণি কুণ্ডুর দুই পুত্র ১৮৩০ খৃঃ সমকালে জন্মগ্রহণ করেন। নীলমণি কুণ্ডু জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইহাঁরা দুই ভ্রাতাই গুরুদাস বাবুর অধীনে কার্য্য আরম্ভ করেন। গুরুদাস বাবুর ব্যবসায়ে অবনতি ঘটিলে, নীলমণি কুণ্ডু স্বীয় ভ্রাতা রত্নমণির সহযোগে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ে তাঁহারা প্রভূত উন্নতিলাভ করেন, এবং বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া প্রসিদ্ধ হন। পরে দুই ভ্রাতা পৃথক্‌ভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন, এবং রথ, দুর্গোৎসব, দোল, রাস, প্রভৃতি যাবতীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক উৎসব অতি সমারোহ-সহকারে সম্পন্ন করেন। দুই ভ্রাতা ১২৭৮ সালে, চারিটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কেদারেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, ও লক্ষ্মী জনার্দ্দন প্রতিষ্ঠা করেন এবং দুইটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন।

নীলমণি কুণ্ডুর সহধর্ম্মিনী মুক্তামণি দাসী 'বৌকুণ্ডু' নামে প্রসিদ্ধা। তিনিও অন্নমেরু, দেবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার যাত্রার দলের কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। কিন্তু বৌকুণ্ডুর বিষয়বুদ্ধির অভাব, অমিতব্যয়িতা ও অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়।

রত্নমণি কুণ্ডু স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা যে সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তন্মধ্যে হিন্দুস্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ১৮৭৮ খৃঃ ৮৭৫০৲ টাকা দান, ১৮৮০ খৃঃ দাতব্য ঔষধালয় ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা ও তুলাদান বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন রথ, প্রতিষ্ঠা, বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন ও কাশীতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা তাঁহার ধর্ম্মভাবের সাক্ষ্য দিতেছে।

ইহাদের পুত্র সন্তান না থাকায় দুই ভ্রাতার দৌহিত্রগণই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। রত্নমণির দৌহিত্রের পুত্রগণ তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ এখনও রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

তন্তুবায়গণ প্রাচীনকাল হইতে এখানে বাস করিতেছেন। তাঁহারা সূক্ষ্ম শিল্পে তেমন পারদর্শী না হইলেও, নানারূপ বস্ত্রবয়নে নিপুণ ছিলেন। এস্থানের বস্ত্র 'নদীয়া ধূতি' নামে অভিহিত হইত, এবং মুর্শিদাবাদের বাজারে সমাদরে বিক্রীত হইত। এখানে সূক্ষ্ম 'দোপাটা উরানি' প্রস্তুত হইত, তাহা সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে সাদরে ব্যবহৃত হইত। তখন স্ত্রীলোকেরা চরকায় সুন্দর সূতা কাটিতেন। বিলাতী সূতার আমদানী হওয়ায়, চরকায় সূতা কাটা লোপ পাইয়াছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সময়, এখন যেখানে শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যের পুষ্করিণী আছে, সেইস্থানে একটি সূতার কল স্থাপিত হইয়াছিল।[২] তাৎকালিক তন্তুবায়গণ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। এখন বিলাতী কাপড়ের আমদানী হওয়ায়, বয়নশিল্প একবারেই লোপ পাইয়াছে। তন্তুবায়গণও ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সম্প্রতি এখানে বহুপ্রকার ছাপা কাপড় ও নামাবলি প্রস্তুত হইতেছে।

শংখবণিকগণ তন্তুবায়গণের ন্যায় নবদ্বীপের প্রাচীন অধিবাসী। এস্থানের শংখকারগণ স্বীয় শিল্প ও ব্যবসায়ে বেশ নিপুণ ছিলেন। তাঁহারা নানা প্রকারের শাঁখা প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বত্র বিক্রয় করিতেন। তৎকালে রমণীগণ এক জোড়া শাঁখা পাইলে পরম কৃতার্থ হইতেন।

(২) The East Indian Company once had a cotton spinning factory here (Nabadwip), the site of which is pointed out by old inhabitants.
Vide, Bengal District Gazetteer, Nadia—p. 184.

শাঁখাই তাঁহাদের অঙ্গের শ্রীসম্পাদক ও শুভসূচক ভূষণ ছিল। প্রতি পূজা পার্ব্বণে ও বিবাহাদি শুভকার্য্যে শাঁখার বহুল ব্যবহার ছিল।[৩] আজকাল কাঁচের চুড়ির প্রচলন হওয়ায়, 'ভুবনদুর্লভ' শাঁখার আদর কমিয়া গিয়াছে। শংখকারের ব্যবসায়ও নষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এস্থানের স্মৃতি-শাঁখা, ও খিলান শাঁখা সর্ব্বত্র আদরের সহিত গৃহীত হয়। সম্প্রতি ঢাকার অনুকরণে নানাবিধ কারুখচিত সাদা শাঁখা প্রস্তুত হইতেছে।

নবদ্বীপের **কুম্ভকারগণ** প্রাচীন কাল হইতেই দেবদেবীর প্রতিমা গঠনে সিদ্ধহস্ত ; তাঁহারা প্রতিমা চিত্রণেও অদ্বিতীয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপের মৃৎশিল্প চরম উন্নতি লাভ করে। এস্থানের কুম্ভকারগণ মানবাদর্শের অনুকৃতি গঠনেও পারদর্শী। হরিসভায় রক্ষিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের প্রতিমূর্ত্তি নশিরাম পাল কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল। কান্তি পালের গঠিত প্রসন্ন চৌধুরী মহাশয়ের আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তিটীও সুন্দর। অধিকন্তু তাঁহারা ঘূর্ণির কুম্ভকারের ন্যায় মনোজ্ঞ পুত্তলিকা এবং ফলমূলাদি গঠনে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা ছাঁচে তুলিয়া প্রতিমার যে সকল সাজ প্রস্তুত করেন তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কুলালচক্রপ্রসূত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারও এখানে সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নীলকুঠী।—নদীয়া নীল চাষের প্রধান স্থান ছিল। প্রথমে এই ব্যবসায় কুটীরশিল্প হিসাবে এদেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। এখানকার নীল ইউরোপে রপ্তানি হইত। ইউরোপীয়েরা এদেশে আসার পর, নীলের বড় বড় কুঠী স্থাপন করেন। সে সময়ে, তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নবদ্বীপের পুরাতনগঞ্জ নিবাসী ঈশ্বর সান্যাল কুঠী পরিচালন করেন। অপর কোন দেশীয় কুঠীয়ালের নাম শুনা যায় না। তাঁহার কুঠী এখন গঙ্গা গর্ভে পতিত হইয়াছে। সাভি (Shavi)

(৩) It (Nabadwip) was in former times noted for its manufacture of conch shell bracelets. Ibid—p. 184.

সাহেবের ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের অনেকগুলি কুঠীর ভগ্নাবশেষ এতদঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল কুঠী দেখিলে নীল প্রস্তুত প্রণালীর আভাস পাওয়া যায়। যে দেশে অধিকাংশ জমীতেই নীলের চাষ হইত, সেখানে নীল গাছ এখন অপরিচিত। জর্ম্মানীতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীল উৎপন্ন হওয়ায়, এদেশে নীলের ব্যবসায় একেবারে ধ্বংস হইয়াছে। নীল-করদিগের অত্যাচারে যে প্রজা বিদ্রোহ হয় তাহাতেও নদীয়া অগ্রণী ছিল।

চিত্রশিল্পী **ভূষণচন্দ্র দাস** কাংস্যবণিককুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা আর্টস্কুলে চিত্রশিল্পে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার অঙ্কিত অনেকগুলি তৈল চিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভবনে রক্ষিত আছে। তিনি ভারতবর্ষ অফিসে হাফ্-টোন বিভাগের প্রধান শিল্পী।

প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবদ্বীপের আর একজন যশস্বী চিত্রশিল্পী। ইনিও আর্টস্কুলেই শিক্ষালাভ করেন। ইহাঁর অঙ্কিত বহু চিত্র সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি স্কুলপাঠ্য দুইখানি ড্রয়িং পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন। **কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যও** আর্টস্কুল হইতে চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যসভ্যতার প্রসারের সহিত, দেশমধ্যে নানাবিধ কল কার-খানা স্থাপিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার ও তাহার ভ্রাতাগণ এখানে 'পূর্ণচন্দ্র কট্‌লারি' নামে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহাতে নানাবিধ ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।

অন্যান্য শিল্পের মধ্যে নবদ্বীপে নানারূপ কাঠের মালা প্রস্তুত হয়। সোনারূপার অলঙ্কারও এখানে সুচারুরূপে গঠিত হইতেছে। খোল, করতাল, খুন্তি এবং তিলকমাটি এখান হইতে বহুস্থানে রপ্তানি হয়। এখানকার সাজের কাজ চিরকালই প্রসিদ্ধ। মাটির সাজের ন্যায় এখানে উৎকৃষ্ট শোলার সাজও প্রস্তুত হয়।

সাধারণ বিবরণ।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগরী ২৩° ২৪′ উত্তর অক্ষাংশ, ৮৮° ২৩′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এই নগরের নিম্নেই জলঙ্গী বা খড়িয়া নদী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নগরের নাম অনুসারেই সমস্ত জেলার নাম নদীয়া হইয়াছে।

মিউনিসিপালিটি।—১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ ইহা টাউন কমিটিরূপে কার্য্য আরম্ভ করে। অতঃপর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে করদাতৃগণদ্বারা নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, ৮ জন নির্ব্বাচিত ও ৪ জন গবর্ণমেণ্টের মনোনীত সভ্য স্থির হন। তখন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণই চেয়ারম্যান হইতেন, এবং ভাইস্-চেয়ারম্যান সভ্যগণদ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। নীলকুঠীর সাহেব মহেশগঞ্জবাসী Henry Shavi এই মিউনিসিপালিটির প্রথম ভাইস্-চেয়ারম্যান। তিনি সর্ব্বদা সভায় যোগদান করিতে না পারায়, সভ্যগণ তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়কে ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন।

নবদ্বীপে তোলা পায়খানার প্রবর্ত্তন লইয়া, গবর্ণমেণ্টের সহিত মিউনিসিপাল কমিসনারগণের মতবিরোধ হওয়ায়, (১৯০৪) গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে মিউনিসিপালিটি গ্রহণ করেন, এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ৯ জন কমিসনার নিযুক্ত করিয়া মিউনিসিপালিটির কার্য্য চালাইতে থাকেন। ১৯০৬ খৃঃ নবদ্বীপে তোলা পায়খানা প্রবর্ত্তিত হইলে, ১৯০৭ খৃঃ নবদ্বীপবাসিগণ পুনরায় স্বায়ত্তশাসন লাভ করেন। ১৯৩২ খৃঃ নলকূপ হইতে সহরে পানীয় জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৮৯১ খৃঃ ৮ই আগষ্ট নবদ্বীপে যাত্রীদিগের বাসের জন্য ‘পুরী সরাই-আইন’ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সরাই বাড়ীগুলি একটি স্বতন্ত্র কমিটী দ্বারা পরিচালিত হয়।

নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ ৪১/২ বর্গ মাইল, এবং গৃহ সংখ্যা ৪৭১০টি (১৯৩১ খৃঃ)। প্রতি বর্ষায় নগর জলমগ্ন হইয়া

যাইত, তাহার প্রতিবিধানকল্পে (১৭৯৩ খৃঃ) স্থানীয় জমীদারগণ দ্বারা নবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে বাঁধ নির্ম্মিত হয়, কিন্তু সংস্কারাভাবে ঐ সকল বাঁধ নষ্ট হইতে থাকে। বঙ্গের ছোট লাট স্যার জন উডবরণ সাহেবের সময়, উক্ত বাঁধগুলির সংস্কারের জন্য ১০,০০০৲ টাকা নিরূপিত হয়। ঐ টাকার অর্দ্ধেক ৫০০০৲ টাকা নবদ্বীপ হইতে উঠাইয়া দিলে, বাকি অর্দ্ধেক টাকা গবর্ণমেণ্ট দিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঐ টাকার কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই। সম্প্রতি মিউনিসিপালিটী বাঁধগুলির উপর দিয়া প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিতেছেন।

স্বাস্থ্য।—প্রাচীনকাল হইতেই নবদ্বীপের জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল। এই স্থান বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য ব্যবহৃত হইত। ১৭১৩ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতাস্থ গবর্ণর রাসেল (Russll) সাহেব অসুস্থ হইলে, চিকিৎসকগণের পরামর্শ অনুসারে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নবদ্বীপে আগমন করেন। তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যান, কিন্তু পুনরায় অসুস্থ হইলে, আবার নবদ্বীপে আগমন করেন।[১]

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, কলেরা রোগ নবদ্বীপ নগরেই প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। এই স্থান হইতে ক্রমে ইহা ১৮১৮ খৃঃ ভারতব্যাপী, ১৮২০ খৃঃ চীনে, ১৮২১ খৃঃ আরব ও পারস্যে, ১৮২৩ খৃঃ রুসিয়ায় এবং ১৮৩২ খৃঃ লণ্ডন নগরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।[২] নদীয়া জেলার সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও, নবদ্বীপ নগরে ম্যালেরিয়া নাই বলিলেও চলে।

---

(১) Bengal District Gazetteer, Nadia—p. 184.

(২) It has been said that cholera made its first appearance in India in the town of Nabadwip. B. D. G. Nadia—p. 68.

In May 1817, the cholera began in Nadiya, in 1819 it spread through India, then in 1820 to China, 1821 to Arabia and Persia, 1823 to Russia, and in 1832 to London.

Vide, Calcutta Review Vol. VI. pp. 421-26.

হাঁসপাতাল।—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়, এবং তদানীন্তন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট J. H. E. Garrett সাহেবের নামানুসারে উহার নাম 'গেরেট হাঁসপাতাল' রাখা হয়। এই হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ক্ষিতিশচন্দ্র রায়, নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ ও ভূকৈলাসের রাণী তারাসুন্দরীর দান উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তীকালে, নবদ্বীপ নিবাসী আনন্দময় রায়, সীতানাথ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ বাগচি, কিশোরী দাসী, রণজিৎ পাল চৌধুরী এবং ডাঃ মণিলাল কুণ্ডুর অর্থ-সাহায্য উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপ নিবাসী ব্রজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এল্‌-এম-এস এই হাঁসপাতালের প্রথম এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন। এই হাঁসপাতাল হইবার পূর্ব্বে রত্নমণি কুণ্ডুর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য ঔষধালয় ছিল।

লোক সংখ্যা।—লোকসংখ্যা গণনা প্রবর্ত্তিত হইবার পর, নবদ্বীপে যেরূপ লোকসংখ্যা দেখা যায় নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	মোট
১৮৭২ খৃঃ	৮৫২০	৩৩৫	৮	৮৮৬৩
১৮৮১ "	—	—	—	১৪১০৫
১৮৯১ "	—	—	—	১৩৩৩৪
১৯০১ "	১০৪১৬	৪৫৭	৭	১০৮৮০
১৯১১ "	—	—	—	১২৪৮০
১৯২১ "	—	—	—	১৫৫৮৪
১৯৩১ "	১৮৪১৬	৪৩১	১৪	১৮৮৬১

১৯৩১ খৃঃ শিক্ষিতের সংখ্যা, হিন্দু—পুরুষ ৪০৪৬ এবং স্ত্রী ১৯১৬; মুসলমান—পুরুষ ৫৮ ও স্ত্রী ২২ জন।

সভা সমিতি।—১২৯২ সালে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের যত্নে নবদ্বীপে **'সংস্কৃত বিদ্যাবিবর্দ্ধিনী বিদগ্ধ জননী সভা'** প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি বিধান ও সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণকে উৎসাহ দানই এই সভার

উদ্দেশ্য। প্রতি বৎসর এই সভা হইতে বিবিধ শাস্ত্রে পরীক্ষা গৃহীত হয়, এবং উপযুক্ত বিদ্যার্থিগণকে 'রত্ন'-সম্বলিত উপাধি, ও পারিতোষিক পদকাদি প্রদত্ত হয়। প্রথমাবধি পাইকপাড়াধিপতি রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ এই সভার সভাপতি, এবং মহেন্দ্রবাবু সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে সভার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'বঙ্গ বিবুধ জননী সভা' নামে পরিচিত হয়। সভার সহিত মতবিরোধ হওয়ায়, মহারাজ পদত্যাগ করিলে, ১৯০৬ খৃঃ জষ্টিস্ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এবং ১৯২৪ খৃঃ জষ্টিস রায় দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ইহার সভাপতি হন। বর্ত্তমানকালে স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ন্যায়রঞ্জন মহাশয় ইহার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই সভা বহু বিদ্বান্ ও গুণিজনকে উপযুক্ত উপাধিদান দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইহার কর্ত্তৃপক্ষগণ ১৯৩৫ খৃঃ পুরাতন পাকাটোলের গৃহাদি ক্রয় করিয়া, সেই স্থানে 'সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যাপীঠ' স্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ও তাহার বাহিরের যাবতীয় প্রধান অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণ এই সভার সদস্য। কুচবিহারাধিপতি ও বর্দ্ধমানাধিপতি এই সভা পরিচালন জন্য বার্ষিক সাহায্য করিয়া থাকেন।

পূর্ণিমা সম্মেলন ১৩৩৮ সালে নবদ্বীপবাসী কয়েকটি নবীন যুবকের উৎসাহ ও যত্নে স্থাপিত হয়। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য—বাঙ্গালা-ভাষার মধ্য দিয়া সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলন ও পুষ্টিসাধন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে **রাধারমণ সেবাশ্রম** সাধু নিত্যানন্দদাসের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হয়। আতুরের সেবা, দুঃস্থের সাহায্য, বিপন্নের রক্ষণ প্রভৃতি জন-হিতকর কার্য্য দ্বারা দেশবাসীর সেবা করাই এই আশ্রমের প্রধান কার্য্য। এই আশ্রম মধ্যেই রোগীদের থাকিবার স্থান ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা আছে। এই স্থানের সেবকেরা শব-সৎকারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন।

বৈদেশিক বিবরণ।—নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র হওয়ায়, ইউরোপীয়গণ ইহাকে 'Oxford of Bengal' নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচ্য-বিদ্যানুরাগী ইউরোপীয়গণের অনেকেই নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন। ফরাসী পর্য্যটক টাভারনিয়ার (Tavernier) ভারতসম্রাট্ সাহাজাহানের রাজসভায় অবস্থান করিতেন। তিনি ১৬৬৬ খৃঃ ১৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখে সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকাযোগে নবদ্বীপের নিম্ন দিয়া গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, যে নদীয়া একটি বৃহৎ নগরী, তৎকালে এই পর্য্যন্তই জোয়ার আসিত। সেই দিন প্রবল ঝটিকায় আক্রান্ত হওয়ায়, নৌকা তীরে লাগাইয়া প্রায় চারি ঘণ্টাকাল তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।[৩]

কোম্পানীর কাজের পরিদর্শক ষ্ট্রেন্‌সাম মাষ্টার (Sir Streynsham Master) ১৬৭৬ খৃঃ ২০এ সেপ্টেম্বরের ডায়েরী বহিতে লিখিয়াছেন, হুগলী হইতে নৌকাযোগে কাশীমবাজার যাইবার পথে তিনি নদীয়ায় আগমন করেন। ইহা ব্রাহ্মণদের প্রাচীন বিদ্যাস্থান।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোন্স (Sir William Jones) বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গোয়াড়ীতে (কৃষ্ণনগর) আসিয়া অবস্থিতি করেন। এই স্থানে তিনি বৎসরে তিন মাস বাস করিতেন। তিনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শিবচন্দ্রের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিবার মানসে, একজন পণ্ডিতের প্রার্থনা করেন। ম্লেচ্ছকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া, কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই এই কার্য্যে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে মহারাজের ও নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের অনুরোধে নবদ্বীপনিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব রামলোচন কবিভূষণ মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে স্যার উইলিয়ম জোন্সের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। রামলোচন সংস্কৃত সাহিত্যে ও বৈদ্যশাস্ত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, কোন ব্রাহ্মণ কুমারের চিকিৎসাকালে

(৩) Vide, Tavernier's Travels, Vol, I., p. 132-3.

রোগ-নির্ণয়ে তাঁহার ভ্রান্তি হওয়ায়, তিনি চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া, সাহিত্যের টোল স্থাপন পূর্ব্বক শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এক্ষণে নবদ্বীপে রামলোচনের প্রপৌত্রের দৌহিত্রবংশ বর্ত্তমান আছে। উইলিয়ম জোন্স 'এসিয়াটিক সোসাইটীর' স্থাপয়িতা, এবং মনুসংহিতা, গীতগোবিন্দ, ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া পাশ্চাত্য জগতে সংস্কৃত সাহিত্যের মাধুর্য্য প্রচার করেন।

১৭৯৪ খৃঃ ডাক্তার কেরী (Dr. Carey) নবদ্বীপে আগমন করেন, এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই স্থানে বাস করিতে ইচ্ছুক হন। ১৮০৫ খৃঃ লর্ড ভেলেণ্টাইন লিখিয়াছেন, যে নদীয়ায় একটী সুন্দর মুসলমান কলেজ ছিল। ইহা তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের দৃষ্টি পথে ছিল। ডাঃ লীডন (Dr. Leyden) সাহেব (১৮০৯) নদীয়ায় কয়েক মাস ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তিনি এখানে প্রায়ই ব্যাঘ্র শিকারে নিযুক্ত থাকিতেন। ১৮২৯ খৃঃ অধ্যাপক উইলসন (H. H. Wilson) নবদ্বীপ বিদ্যামন্দিরে আগমন করিয়া, এখানে ৫০০।৬০০ ছাত্র দেখিতে পান। এস্থানের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। পণ্ডিতগণ তাঁহার মুখে বেদের একটি অংশ উচ্চারিত হইতে দেখিয়া, কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন। তাহাতে উইলসন সাহেব উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "আপনারা কি জানেন না, ম্লেচ্ছের মুখে বেদ উচ্চারিত হইলে, তাহা আর বেদ থাকে না?"[৪] কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব ১৮৬৪ খৃঃ নবদ্বীপের টোল পরিদর্শনে আগমন করেন। তিনি এখানে ১২টি টোলে প্রায় ১৫০ ছাত্রকে অধ্যয়ন করিতে দেখিয়াছিলেন। ইটালি দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক টুচি সাহেব (Prof. Tucci) ১৯২৬ খৃঃ ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য আগমন করেন। সেই সময়ে তিনি বৈষ্ণবদর্শনে

(৪) Travels of a Hindu, Vol. I. p.-42-3.

জ্ঞানলাভ করিবার জন্য নবদ্বীপ আসেন, এবং কয়দিন অবস্থান করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে উপপত্তি লাভ করেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের বঙ্গপাড়ায় এক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার ১০০ স্ত্রীর মধ্যে ৩৭ জন সতী হন। তাঁহারা তিন দিন ধরিয়া মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। প্রথম দিন তিন জন, দ্বিতীয় দিন ১৫ জন, এবং তৃতীয় দিন ১৯ জন প্রাণত্যাগ করেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে স্বামি-কর্ত্তৃক ব্যভিচারের অভিযোগে তাহার যুবতী স্ত্রীর উপর, সাত হাজার দর্শকের সমক্ষে 'তপ্তমুক্তি' বা 'অগ্নি পরীক্ষা' অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫ খৃঃ এখানে 'দশঠাকুরী' নামে একটী ধর্ম্মসভা স্থাপিত ছিল। গ্রামের প্রধান প্রধান দশজন একত্র হইয়া, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদি যাবতীয় মোকদ্দমার বিচার করিতেন। মহারাজ গিরিশচন্দ্রের নায়েব হরগোবিন্দ প্রামাণিক উক্ত দশঠাকুরের প্রধান ছিলেন। তাঁহারা দোষীকে সমাজচ্যুত করিয়া, এবং ধোপা, নাপিত ও ধাত্রী বন্ধ করিয়া শাস্তি দিতেন।[৫] ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের গঙ্গা গর্ভে একটি তরুণ যোগী বাস করিতেন।

নবদ্বীপের পর্শ্ববর্ত্তী জাহান্নগর গ্রামে ব্রহ্মাণীদেবীর মন্দির আছে। প্রতি ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে এই স্থানে মনসাদেবীর পূজা হয়, এবং 'গাছ পূজার মেলা' নামে একটী বৃহৎ মেলা বসে। পূর্ব্বে এই স্থানে নরবলি হইত। পূর্ব্বে জাহান্নগর সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ গ্রাম ছিল। নবদ্বীপে ডাকঘর হইবার পূর্ব্বে এইস্থানে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপ জাহান্নগর ডাকঘরের অন্তর্গত ছিল।

১৯১২ খৃঃ ১লা এপ্রিল নবদ্বীপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ খোলা হয়, এবং ১৯২৫ খৃঃ নবদ্বীপের অপর পারে ইষ্ট বেঙ্গল রেলপথে কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ ঘাট পর্য্যন্ত রেলপথ খোলা হয়।

---

(৫) Vide, Calcutta Review, Vol. VI., p. 424.

গ্রন্থকারের জীবনী।

১২৫৩ সালে ২০এ অগ্রহায়ণ নবদ্বীপে তন্তুবায়কুলে দীননাথ রায়ের ঔরসে ও অন্নপূর্ণা দাসীর গর্ভে কান্তিচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। দীননাথ দরিদ্র হইলেও, অতি স্বাধীনচিত্ত ও পরোপকারী ছিলেন। উত্তরকালে কান্তিচন্দ্র পিতার এই দুই গুণের, এবং মাতামহের বিচারদক্ষতা, সৎসঙ্গ ও সত্যনিষ্ঠার অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে শিবনাথ রায় মহাশয়ের প্রভাবও যথেষ্ট লক্ষিত হইত। তাঁহার মাতামহ গৌরচন্দ্র প্রামাণিক ও তাঁহার অগ্রজ হরগোবিন্দ প্রামাণিক বহুদিনাবধি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরিশচন্দ্রের, নবদ্বীপের নায়েব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কান্তিচন্দ্রের ভরণপোষণের ভার তাঁহারা গ্রহণ করিলেও, তিনি কখন পিতার শাসন অতিক্রম করেন নাই। তিনি প্রতিদিন একখানি ৮ হাতী কাপড় বয়ন শেষ করিয়া পিতাকে দিয়া, রাত্রে মাতুলালয়ে যাইয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন। দিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁহার বিদ্যালয়ে ও বস্ত্র বয়নে ব্যয়িত হইত। কাজেই তাঁহাকে রাত্রে পাঠ-অভ্যাস করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইত। পিতার কঠোর শাসন ও দারিদ্র্য তাঁহার বিদ্যার্জ্জনের পথে বাধা সৃষ্টি কধিতে পারে নাই।

এইরূপে অতিকষ্টে নবদ্বীপের পাঠ শেষ করিয়া, তিনি হুগলীর নর্ম্মাল স্কুলে ১৮ বৎসর বয়সে পড়িতে যান। সেই সময়ে হুগলীর নর্ম্মাল স্কুলে, হুগলী নিবাসী স্বনামধন্য ব্রহ্মমোহন মল্লিক প্রধান শিক্ষক ছিলেন; কাল্‌নানিবাসী বাঙ্গালা-ব্যাকরণ প্রণেতা কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রধান পণ্ডিত, আদর্শ-শিক্ষক শিবচন্দ্র সোম দ্বিতীয় শিক্ষক, ও ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁদের প্রত্যেকেই আদর্শ-শিক্ষক রূপে বাঙ্গলা দেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। হুগলীতে পাঠকালে হুগলীর তৎকালীন প্রধান উকীল চুপীনিবাসী পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় শিবনাথ

রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া, কান্তিচন্দ্র বিদ্যালাভ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ন্যায় আরও অনেক ছাত্র শিবনাথ রায়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেন। এখানে পাঠকালে, হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যাপক চুচুড়া তোলাফটক-নিবাসী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

নর্ম্মাল স্কুল হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইবার পর, কয়েক স্থানে কার্য্য করিয়া তিনি বালী বারাকপুরের বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত হইয়া আসেন। বালী বাসের সময়, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত মাধবচন্দ্র গোস্বামী তর্কসিদ্ধান্ত, কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী, প্রভৃতি মনস্বিবর্গের সংস্রবে আসেন। এই সময়ে স্কুলের পাঠাগারের পুস্তক সংগ্রহের জন্য তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কলিকাতায় যান। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিতেন না। সে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘরে কয়েকজন ভদ্রলোক চৌকির উপর বসিয়া ছিলেন। তাহাদেরই মধ্যে কেহ বিদ্যাসাগর হইবেন মনে করিয়া, কান্তিচন্দ্র তাঁহাদের নিকট পুস্তক প্রাপ্তির আবেদন জানান। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বারান্দায় বসিয়া ক্ষৌর-কার্য্য করিতেছিলেন। ঘরের লোকেরা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইলেন, 'উনিই বিদ্যাসাগর।' বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরস বাক্যে কহিলেন, "আজ কাল দেখি সবারই উঁচু নজর, নীচের দিকে দৃষ্টি পড়িবে কেন?" তাহাতে কান্তিচন্দ্র কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া, উত্তর করিলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও, আমরা তাঁহার আশায় উঁচু দিকেই তাকাই।" এই উত্তর শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন, এবং স্কুলের জন্য এক প্রস্থ ও তাঁহাকে পৃথক্ এক প্রস্থ গ্রন্থ দান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরজীবনে তাঁহার পরিচয় আরও গাঢ় হইয়াছিল, এবং এই সূত্রে প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহাত্মগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে।

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার গ্রন্থাদি

নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন না; তিনি অবকাশ অনুসারে বলিয়া যাইতেন, ও তদনুযায়ী অপরে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। কান্তিচন্দ্র তাঁহার লিপিকরদের মধ্যে অন্যতম। এই সকল দৃষ্টান্তের প্রভাবে তাঁহার চরিত্র সমধিক উন্নত হইয়াছিল, এবং তাঁহার মনে এই সময় হইতেই নবদ্বীপের ইতিহাস প্রণয়নের আশা উদ্ভূত হয়। তদনুযায়ী তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

কান্তিচন্দ্র একজন উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন। বালীতে শিক্ষকতা করিবার সময়, তিনি বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী বঙ্গভাষায় একখানি ইতিহাসের অভাব অনুভব করেন। ১২৮১ সালে তাঁহার 'ভারতের ইতিহাস' দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁহার পুস্তক দুইখানি বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। তখন নীলমণি মুখোপাধ্যায়, ও তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ইতিহাস ব্যতীত অন্য কোন ইতিহাস বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। বালীতে কান্তিচন্দ্রের কৃতী ছাত্রদিগের মধ্যে—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হরিপদ ভট্টাচার্য্য, কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, হুগলীর উকীল অরুণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকার শশিশেখর সান্ন্যাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী কান্তিচন্দ্র শিক্ষকতায় সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া, কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী ও দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বিশেষ উৎসাহে মোক্তারী পড়িতে প্রবৃত্ত হন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হাওড়ায় মোক্তারী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি সর্ব্বদাই আসামী পক্ষ সমর্থন করিতেন। ব্যবসায়ে তাঁহার বেশ প্রসার হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি এক গরু চুরির মামলা পান। তাঁহার মোহরার মক্কেলের নিকট হইতে, মোকদ্দমা সংক্রান্ত যথাযথ খরচের ফর্দ্দ করিয়া টাকা বুঝিয়া লইল, পরে কান্তিচন্দ্রের অসাক্ষাতে, মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করিল, "গরুটা বলদ, না গাই ?" মক্কেল বলিল, "বলদ"। মোহরার বলিল, 'তোমাকে আর আট

আনা খরচ অধিক দিতে হইবে।' এইরূপে গরিবের আট আনা আত্মসাত করিল। এই ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায়, কান্তিচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হন, এবং বুঝিতে পারেন এ ব্যবসায়ে ধর্ম্মপথে থাকা অসম্ভব। অতঃপর তিনি হাওড়া ত্যাগ করিয়া হুগলী আসেন, ও রেভিনিউ এজেণ্টসিপ পাস করিয়া ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। তিনি, বর্দ্ধমানের মহারাজ ব্যতীত, হুগলী জেলার প্রায় সমস্ত বড় বড় জমীদারের আম-মোক্তার ছিলেন। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, মহারাজ স্যার দুর্গাচরণ লাহা, রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, দীঘাপতিয়ার রাজা শরৎকুমার রায়, কলিকাতার শীল বাবুরা, বাঁশবেড়িয়ার রাজা প্রভৃতি জমীদারবর্গের তিনি আমমোক্তার ছিলেন। কার্য্যসূত্রে তাঁহদের সহিত পরিচিত হইয়া, তিনি তাঁহাদের বিশেষ স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। হুগলীর বার লাইব্রেরীতে তিনি 'মোক্তার-জেনারল' আখ্যা পাইয়াছিলেন।

তিনি প্রায় ৪০ বৎসরকাল সুখ্যাতির সহিত মোক্তারী করেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার মক্কেলদের ২।৩ পুরুষ অবধি পরিবর্ত্তন তিনি দেখিয়াছিলেন। তিনি যে জমীদার ঘরে কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, জীবিতকালের মধ্যে তাহা ত্যাগ করিতে হয় নাই। তিনি জয়কৃষ্ণ বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহার প্রপৌত্র বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায় নাবালক থাকা কালে, তাঁহার এষ্টেটেরও কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল ব্যবসায়সূত্রে তাঁহাকে বহু রাজা-মহারাজা, ও উকীল-ব্যারিষ্টারের সহিত মিশিতে হইয়াছে। অপর পক্ষে তেমনি অতি দীন-দরিদ্রের সহিতও তাহার পরিচয় করিতে হইয়াছিল। হুগলী জেলার অতি দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকও তাঁহার নাম জানিত।

হুগলী বাসের সময়ে, তিনি উকীল মোক্তার ও অন্যান্য ভদ্রলোক সকলেরই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বিশেষ করিয়া হুগলীর প্রসিদ্ধ উকীল



শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য ছিল। রায় ঈশান চন্দ্র মিত্র বাহাদুর, রায় মহেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, মৌলবী মজাহার আন্ওয়ার সাহেব, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই স্থানেই কবিবর হেমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ঈশানবাবুর সহিত পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়, এবং নবদ্বীপ মহিমার প্রথম সংস্করণ প্রকাশে তিনি ঈশানবাবুর যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল, যদুনাথ কাঞ্জিলালের সহিত হুগলীতেই তাঁহার পরিচয় হয়। ইহাঁরা সকলেই বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত ও সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদিত 'পূর্ণিমা' পত্রের লেখক ছিলেন। রায় বাহাদুর রসময় মিত্রের সহিতও এই সময়েই তাঁহার পরিচয় হয়, এবং কীর্ত্তনানুরাগী গৌরভক্ত রসময়ের সহিত নবদ্বীপবাসী কান্তি চন্দ্রের পরিচয় প্রণয়ে পরিণত হয়। বয়োজ্যেষ্ঠদের সহিত মেশাই কান্তি চন্দ্রের স্বভাব ছিল। সেই জন্য রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও হুগলীর উকিল ঈশানচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব দেখা যায়।

বাল্যকাল হইতেই নবদ্বীপের গৌরব তাঁহার জীবনের গর্ব্ব ছিল। তিনি নবদ্বীপকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভালবাসিতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মুখে শুনিয়া এবং নানা উপায়ে অন্যান্য বিষয় অবগত হইয়া— তিনি নবদ্বীপের ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং ১২৯৮ সালে "নবদ্বীপ-মহিমা" গ্রন্থ প্রচার করেন। এই গ্রন্থপাঠে বঙ্কিম বাবু বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুশয্যায় শায়িত ভূদেব বাবু গ্রন্থকারকে ডাকাইয়া পদধূলি দান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। কলিকাতা গেজেট, এডুকেশন গেজেট, জন্মভূমি, হিতবাদী প্রভৃতি তাৎকালিক পত্রিকা সমুদায় নবদ্বীপ-মহিমার ভুয়সী প্রশংসা করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। দেবদ্বিজে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দরিদ্রের সেবায় তাঁহার অপার আনন্দ ছিল—সর্ব্বোপরি লোক-ভোজনে তিনি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ পাইতেন, তাহা বলা যায় না। পরদুঃখে তাঁহার অন্তর সর্ব্বদা কাঁদিত—তিনি দরিদ্রের দুঃখমোচনে সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। দাতা বলিয়া নাম কিনিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না—তাঁহার দান এত গোপনীয় ছিল যে তাঁহার আত্মীয়েরাও তাহা জানিতে পারিতেন না। তাঁহার মাতৃভক্তি আদর্শস্থানীয় ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের তিনি সভ্য ছিলেন। সাধারণের হিতকর কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলের মোকদ্দমায়, তিনিও একজন বাদী ছিলেন। রায় বাহাদুর ভগবানদাস বগলার নবদ্বীপস্থ কাঁচাটোলের বৃত্তি বন্ধ হইলে, কান্তিচন্দ্রেরই যত্নে উক্ত বৃত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কাঁচাটোলের বর্ত্তমান গৃহাদি (১৯০৭ খৃঃ) নির্ম্মিত হয়। তিনি আমরণ ঐ টোলের ব্যবস্থাপক ছিলেন।

সন ১৩০০ সালে "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা" স্থাপিত হইয়া মিঞাপাড়াকে মায়াপুর বলিয়া ঘোষণা করেন; তাহাতে দেশমধ্যে এক আন্দোলন পড়িয়া যায়। বৈষ্ণবদিগের অনেকেই মিঞাপাড়াকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর বলিয়া গ্রহণ করিতে থাকেন। ধামপ্রচারিণী সভার, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য, কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও ক্ষমতাশালী জমীদার নেতা ছিলেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি অসম্ভব ঠিক করিলেন, ও যাঁহারা ভ্রমের বিষয় অবগত হইলেন, তাঁহারাও প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু কান্তিচন্দ্র সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সেই নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিক, সত্যনিষ্ঠ গৌরভক্ত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি তিন দিবসের মধ্যে "নবদ্বীপ-তত্ত্ব" নামে উহার এক সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ পুস্তক মায়াপুর

প্রতিষ্ঠার উৎসবের সময় বিতরণ করেন। তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে এই প্রতিবাদ লিখিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়জনক। এত ক্ষিপ্রতা-সহকারে এই পুস্তক লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল যে, মুদ্রাযন্ত্র হইতে পুস্তকগুলি সিক্ত অবস্থায় বিতরিত হয়। এই প্রতিবাদের জন্য তাঁহাকে কটূক্তি শ্রবণ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সত্যপ্রিয় কান্তি-চন্দ্র কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হন নাই। নবদ্বীপের অবস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে পূর্ণিমা পত্রিকাতেও তিনি কয়েকটী যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহার, এদেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান, তর্কে যুক্তিপ্রদর্শনের, অদ্বিতীয় ক্ষমতা এবং রহস্য-প্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

নবদ্বীপের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে বাদানুবাদ উপলক্ষে স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পূর্ণিমা পত্রিকায় কান্তিচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া এক সুন্দর সন্দর্ভ প্রকাশিত করেন। কান্তিচন্দ্রের প্রতিবাদ, পণ্ডিত-মণ্ডলী, রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, পল্লীবাসী-সম্পাদক শশিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত গৌরভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়।

কান্তিচন্দ্র বড় নিষ্কিঞ্চন ছিলেন—নাম কিনিবার স্পৃহা তাঁহার কখনই ছিল না। এই কারণে, বাদপ্রতিবাদ-মূলক "নবদ্বীপতত্ত্বে" তিনি নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই। এই প্রতিবাদ গ্রন্থ দেখিয়া, মহেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, ডি-এল্ মহাশয় গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি ইউরোপে এই কাজ করিতে, তাহা হইলে সমস্ত দেশ তোমার কীর্ত্তির আদর করিত, ও এই এক প্রতিবাদেই তোমাকে অমর করিয়া দিত।"

১৩২১ সালে ২৬এ ভাদ্র হুগলীতে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

চিত্র-পরিচয়।

"পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্ত্তি","বিষ্ণুমূর্ত্তি" ও "মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি" কয়টি নবদ্বীপের যুগনাথ শিবমন্দিরে পাওয়া যায়, এবং ১৯৩০ খৃঃ ২২এ মার্চ্চ বঙ্গদেশীয় আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরীক্ষার্থ লইয়া যান। এগুলি ব্রোঞ্জধাতু নির্ম্মিত। বুদ্ধ মূর্ত্তিটি প্রায় ২০০০ বৎসরের প্রাচীন, এবং বিষ্ণু ও মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দুইটি সেন রাজগণের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। "উগ্রতারা মূর্ত্তিটি" দেপাড়ায় পাওয়া গিয়াছে —এ সম্বন্ধে ৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মঃ মঃ অজিতনাথ ন্যায়রত্নের চিত্রটী নবদ্বীপ-নিবাসী ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের চিত্র, পূর্ব্বস্থলী নিবাসী (কৃতনিবাস নবদ্বীপ) জয়গোপাল দত্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য মহামহোপাধ্যায়গণের চিত্র তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের নিকট পাওয়া যায়।

গ্রন্থকারের চিত্র তাঁহার ৫৫ বৎসর বয়সের আলোক-চিত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

"View of the large Pagoda at Nuddea" নামক চিত্রটি কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ২৮নং কক্ষে রক্ষিত ২০৯৯ সংখ্যক চিত্রের প্রতিলিপি। ঐ চিত্রটি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে I. Moffat সাহেব কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে চিত্রটি পাওয়া গিয়াছে।

নবদ্বীপ-মহিমা সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের অভিমত।

Calcutta Gazette, 27th April, 1892 :—

Nabadwip-Mahima—gives the traditional account of Nabadwipa its Sanskrit Tols and the great teachers and authors flourished in the city. This is a valuable book containing, as it does, all that has been handed down from generation to generation about the great men who lived there during the last 8 or 10 centuries from its foundation under the Sen Rajas of Bengal.

জন্মভূমি ১২৯৯। ভাদ্র—পৃ ৫৬৪ :—

* * * আমরা এমনই হৃদয়হীন, মনুষ্যত্বহীন, অধম হইয়া পড়িয়াছি। এমত অবস্থায় যে একজনও নবদ্বীপ-মহিমা-রহস্যের উদ্ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাই পরম সুখের বিষয় বলিতে হইবে। ইতিহাসাংশ খুব সংক্ষিপ্ত হইলেও এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ খুব প্রশংসনীয়।

এ ছাড়া নবদ্বীপ-মহিমার আর এক প্রকাণ্ড অংশ আছে; তাহা অধিকতর উজ্জ্বল ও মহান্। রাজলক্ষ্মীই নবদ্বীপে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সরস্বতী এতকাল সমান-সমুজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছিলেন। বিশদ প্রভায় সমস্ত বঙ্গ কেন, জগৎ আলোকিত করিতেছিলেন।

* * * ইহার পর গ্রন্থকার,—নবদ্বীপের যে সকল মহাত্মা নবদ্বীপের গৌরব তাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কীর্ত্তিকলাপ একে একে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। ঐ সকল জীবনীর মর্ম্মগ্রহণ ও রসাস্বাদন, হীন বাঙ্গালী-জাতি করিতে পারিবে কি না সন্দেহ; কিন্তু ও গুলি বাস্তবিকই অমূল্য। আমরা বাল্যাবধি মহৎ জীবনের আদর্শ খুঁজিবার জন্য—ফ্রান্সের অন্তঃপাতী আর্টনী গ্রমে কাহার জন্ম হইয়াছিল,—কে কোথায় বিড়াল মারিয়া তাহার চর্ম্ম বিক্রয় করিয়া পুস্তক কিনিয়াছিল,—কে কবে পোড়া রুটি খাইয়া অঙ্ক-শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিত, এই সকল আদর্শের জন্য ইউরোপের গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই। আমরা বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ, রঘুনন্দন, চৈতন্য প্রভৃতি অলোক-সামান্য মহানুভবদিগের জীবন-চরিত

বুঝিব কি ? এদেশেও যে চরিতের আবলী আছে, অন্ধকারে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এ জ্ঞান আমরা সাগরে ডুবাইয়াছি।

দিন দিন যেরূপ ভাবগতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে মহিমার কাল অস্তগতপ্রায়,—এখন কালিমার কালই পড়িল। এখনই "নবদ্বীপ-মহিমা" প্রচার করিবার উপযুক্ত সময়। জীবন গিয়াছে, এখন জীবনী পাঠ করিয়া পাঠকগণ অশ্রুবর্ষণ করুন।

এডুকেশন গেজেট,—১২৯৮। ১১ই পৌষ :—

অমরা এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার নবদ্বীপ-নিবাসী। অনেক আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক তিনি নবদ্বীপের যে প্রাচীন তত্ত্বগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন সে সকলের কোনস্থান অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইল না। বিশেষতঃ নবদ্বীপের প্রাচীন মহাত্মগণ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে সেগুলি পাঠ করিতে করিতে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। * * আমরা বরাবর এইরূপ গ্রন্থের পক্ষপাতী। বিদেশীয় মহানুভব চরিত্রের পরিবর্ত্তে দেশীয় উৎকৃষ্টতর অনুকরণীয় পবিত্র চরিত্র যতই আমাদিগের বালক বালিকাগণের হৃদয়ে চিত্রিত হয় ততই মঙ্গল।

হিতবাদী, ১২৯৮। ৩রা মাঘ :—

এই গ্রন্থখানি অতি সুচারুরূপে বিরচিত হইয়াছে। নবদ্বীপ বঙ্গদেশের একটী গৌরবের স্থল। বাঙ্গালা ভাষার জন্মভূমি বলিলে বলা যায়। সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন বাঙ্গালাদেশের মধ্যে আর কুত্রাপিও উন্নতিলাভ করে নাই। গ্রন্থকার নবদ্বীপে সংস্কৃতচর্চ্চার একটী মনোরম ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন। যত প্রধান অধ্যাপক ঐস্থান অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিবরণ সকল প্রাঞ্জল সুশৃঙ্খল বাঙ্গালাতে লিপিবদ্ধ করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য তিনি ভালরূপে সিদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালার জাতীয় গৌরবের শ্লাঘাকারী ব্যক্তি মাত্রেরই উচিত এই গ্রন্থখানি পাঠ করা।

১৮৯৬ খৃঃ ২রা ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটের ১২৯৫ পৃষ্ঠায়, 'নবদ্বীপ-মহিমা' প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে মনোনীত হইয়াছে।

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী প্রণীত

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ তত্ত্ব

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মানচিত্র সমন্বিত নবদ্বীপের প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ।
কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি-এ, ভাগবতরত্ন লিখিত ভূমিকা ও সাহিত্যাচার্য্য
অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিত সমালোচনা সম্বলিত।

মূল্য—আট আনা।

নবদ্বীপতত্ত্ব সম্বন্ধে Calcutta Review, 1895, Vol. 101, বলেন,

This is a short work on some points in connection with the antiquities of Nabadwip, the last Hindu Capital of Bengal.

শ্রীবেণুগোপাল দত্ত প্রণীত

নবদ্বীপ

(A GUIDE TO NABADWIP)

বা নবদ্বীপ পরিচয়

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

এই গ্রন্থে শ্রীধামের যাবতীয় দেবালয়ের ইতিহাস ও অবস্থান সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। এখানি শ্রীধামের পরিচয় পুস্তক। সাথীর সাহায্য ব্যতীত এই পুস্তকের সাহায্যে নবদ্বীপস্থ সকল দেবালয় দর্শন করা যাইবে, এবং কোথায় কত ভেট দেয় তাহাও জানা যাইবে। বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকারের পুস্তক—বিশেষ নবদ্বীপ সম্বন্ধে—আর নাই। তীর্থ দর্শনান্তে ফিরিয়া ঘরে বসিয়া এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে গৌরলীলার স্মরণ, মনন ও শ্রীধামের দর্শন জনিত সুখ উপভোগ হইবে। মূল্য এক আনা মাত্র।

নবদ্বীপ সম্বন্ধে **অমৃতবাজার** পত্রিকা বলেন—

Nabadwip—This pamphlet is a chronology of some of the holy places in Sri Dham and Nabadwip-Mandal which every true Vaishnava needs must visit as places of pilgrimage. The author Sj. Benu Gopal Datta's attempt is laudable in that he has not satisfied himself by mere giving the names but has also put in short details of their holy character.

শ্রীফণিভূষণ দত্ত প্রণীত

শ্রীচৈতন্য-জাতক

এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিনের পঞ্জিকা সম্যক্‌রূপে গণিত হইয়াছে, এবং তাঁহার কোষ্ঠী প্রস্তুত করা হইয়াছে। অতঃপর ফলিতগ্রন্থ সাহায্যে মহাপ্রভুর জীবনের ফলগুলি সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ আর নাই। মূল্য— দুই আনা মাত্র।

১৩৩৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা **'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়'** এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"* * * এই পুস্তিকা প্রণয়ণে গ্রন্থকারের সাধু উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় এবং পুস্তিকাখানি বিশেষভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট যথাযুক্ত সমাদর লাভ করিবে।"

১৯৩২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের উড়িষ্যার **"The Vaitarani"** পত্রিকা বলেন—

"The book has been treated scientifically and astrology has been shewn not to be bogus and therefore not to be discarded without understanding."

গ্রন্থগুলির প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমিয়গোপাল দত্ত,

নবদ্বীপ-মহিমা কার্য্যালয়, নবদ্বীপ।

